আন্দালুসের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

ড. রাগিব সারজানী



Scanned with CamScanner

লেখক পরিচিতি

ড. রাগিব সারজানী

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধ্যাপক; আরববিশ্ব যাকে চেনে বিশিষ্ট ইতিহাসগবেষক, লেখক ও লেকচারার হিসেবে।

জন্ম ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে মিশরের 'আলগারবিয়্যা' প্রশাসনিক অঞ্চলের 'আলমহল্লা আলকুবরা'তে।

ইসলামী ইতিহাস ও গবেষণানির্ভর বিভিন্ন বিষয় তার বুদ্ধিবৃত্তিক পদচারণার মূল অঙ্গন।

ইসলামী ইতিহাসকেন্দ্রিক সর্ববৃহৎ ওয়েবসাইট www.islamstory.com-এর তত্ত্বাবধায়ক।

অনবদ্য লিখনীগুণে লাভ করেছেন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার।

সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে।

লেখক-আলোচক রাগিব সারজানীর সবচে' বড় বৈশিষ্ট্য– তিনি কেবল ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন না; ইতিহাসের ধারাবর্ণনা থেকেই তিনি তুলে আনেন সুপ্ত নানা শিক্ষা ও নির্দেশনা, আগামীর পথচলার পাথেয় এবং জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চিরন্তন সব সূত্র।

তার লেখালেখি, দাওয়াতি প্রোগ্রাম, লেকচার-বক্তৃতা ইত্যাদি কর্মতৎপরতার মূল লক্ষ্য–

> জাতির জাগরণের কার্যকারণসমূহ নির্ণয় ও পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে তার সদ্ব্যবহার করা। উম্মাহর সদস্যদের হৃদয়জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা ও প্রত্যাশা সৃষ্টি করা। তাদেরকে চিন্তা ও চেতনা, জ্ঞান ও কর্মে অগ্রবর্তী হতে পথনির্দেশ করা। ইসলামী ইতিহাসের সঠিক ও প্রকৃত রূপ উন্মোচিত করা। সভ্যতার বিনির্মাণে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অবদান সুস্পষ্ট করা।

তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধ শতাধিক, যার বেশ কয়েকটি অনূদিত হয়েছে ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ইন্দোনেশিয়ান, রুশ ও তুর্কি ভাষায়।

বাংলা ভাষায় অনূদিত লেখকের বেশ কিছু বই মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও কিছু প্রকাশিতব্য-তালিকায় রয়েছে।

Scanned with CamScanner

আন্দালুসের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

Scanned with CamScanner

আন্দালুসের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

[মুসলিম স্পেন ও পর্তুগালে সুদীর্ঘ আট শ' বছর ব্যাপ্ত
মুসলিম শাসনামলের এক প্রামাণ্য ইতিহাস]

মূল
ড. রাগিব সারজানী

অনুবাদ
আবু মুসআব ওসমান

মাকতাবাতুল হাসান

Scanned with CamScanner

আন্দালুসের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত
ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়নগঞ্জ।
✆ ০১৭৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

ISBN : 978-984-93533-0-0

মূল্য : ৭৪০/= টাকা মাত্র

ANDALUSER ITIHAS (1st part)
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan
Online distributer : Rokomari.com

Scanned with CamScanner

©
প্রকাশক

"আন্দালুসের ইতিহাস" বইটি কপিরাইট আইন ২০০০(২৮)-এর ৫৬ ধারায়
কপিরাইট অধিদপ্তরে নিবন্ধিত ও ২০০৫ (সংশোধিত) ধারা অনুযায়ী
বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার এ সংরক্ষিত আছে।

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোন অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না,
কোন যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে
উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

Scanned with CamScanner

উৎসর্জন

শাইখুল ইসলাম
সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানী
রহিমাহুল্লাহ

ভারতবর্ষে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষায়
আজীবন-আমরণ সংগ্রাম করেছেন যিনি
ত্যাগ ও কুরবানীর বেনজির 'নাযরানা' পেশ করেছেন যিনি
সে ইতিহাস আমরা ক'জন জানি!

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অনুবাদকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ। ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ শোকর; অনুবাদ ও পরবর্তী সকল ধাপ পেরিয়ে অবশেষে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ড. রাগিব সারজানী লিখিত আরবী গ্রন্থ *'কিস্‌সাতুল আন্দালুস মিনাল ফাতহি ইলাস সুক্বুত'*-এর অনুবাদগ্রন্থ *'আন্দালুসের ইতিহাস'*। এই শুভক্ষণে পুরো অস্তিত্ব জুড়ে কেবল একটিই স্পন্দন ও উচ্চারণ; তোমার-ই শোকর, আয় রাব্বে কারীম! সবকিছু তোমার-ই অনুগ্রহ-দান, ওহে মহামহিম!

* * *

'আন্দালুস'! ছোট্ট একটি শব্দ! কিন্তু ...।

আন্দালুসকে যিনি জানেন, আন্দালুসের ইতিহাস যিনি জানেন, ছোট্ট এই শব্দটি-ই তার হৃদয়ে সৃষ্টি করে আন্দোলিত তরঙ্গমালা, আনন্দ ও বেদনার যুগপৎ ফল্গুধারা।

অতীত পৃথিবীতে একটি সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আন্দালুস শব্দটি প্রতিটি মুসলমানের কর্ণকুহরে মধুর ঝঙ্কার সৃষ্টি করত; যখন আন্দালুস শব্দটি অবিশ্বাসীদের অন্তরে সমীহ-ভাব সৃষ্টি করত। আন্দালুস ছিল ইসলামী শৌর্য-বীর্যের আধার, আন্দালুস ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূতিকাগার। আন্দালুস ছিল খেলাফতে ইসলামিয়ার কেন্দ্রভূমি এবং আন্দালুস ছিল ইউরোপের বুকে একখণ্ড ইসলাম-ভূমি!

'আন্দালুস' শব্দের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সেই শৈশবে। সবেমাত্র মাদরাসায় ভর্তি হয়েছি। জানার পরিধি তখনও আলিফ-বা এর গণ্ডি পেরোয়নি। আমাদের সময়ে মাদরাসার বিভিন্ন সেমিনার-অনুষ্ঠানে আল্লামা ইকবালের 'মিল্লী তারানা' প্রায়ই আবৃত্তি করা হত।[১] অর্থ যদিও বুঝতাম না; কিন্তু ভাব ও শব্দতরঙ্গ ভালোভাবেই হৃদয় স্পর্শ করত এবং অনেকটা এ কারণেই সেই শৈশবেই 'মিল্লী তারানা' মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। মিল্লী তারানার

---

[১] এখন তো এ জাতীয় কবিতা আমাদের পরিমণ্ডলেও আদমের গন্দম! আমার কয়েকজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলাম; অধিকাংশই আল্লামার নাম-পরিচয় জানে না, মিল্লী তারানার কথা তো কেউ-ই জানে না। আলিমের আস্ফালন, নাকি মজলুমের অসহায় আত্মসমর্পণ, কোনটি যে কারণ- জানি না। তবে এখান থেকে আমরা একটা তত্ত্ব লাভ করতে পারি- কেবল দূর-অতীত নয়, ধীরে ধীরে আমরা নিকট-অতীতকেও হারাতে বসেছি।

Scanned with CamScanner

মাধ্যমেই আন্দালুস শব্দের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।[২]

এরপর কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। একটু বড় হয়েছি; জানার আগ্রহ ও বোঝার পরিধিও বেড়েছে। আল্লামা তকী উসমানী দা. বা.-এর সফরনামা বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রথমবারের মত প্রকাশিত হল। একে তো হযরতের লেখা, তার ওপর ভ্রমণবৃত্তান্ত! দ্রুত সংগ্রহ করে পড়তে বসলাম। হযরতের সফরনামার মাধ্যমে নতুন করে পরিচয় হল আন্দালুসের সঙ্গে; জানলাম অতীতের আন্দালুস ও বর্তমান স্পেনের অনেককিছু। জানলাম, একদিন আমরাও ইউরোপে ছিলাম; বরং ইউরোপ আমাদের ছিল। জানলাম, আইবেরিয়ান উপদ্বীপে আমাদের গৌরবময় পদচারণার দাস্তান এবং আমাদের নির্বুদ্ধিতার উপাখ্যান! জানলাম, আন্দালুসের ইতিহাস যেন প্রাচ্যের কবির এই পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের ভাব-সম্প্রসারণ,

মায়ঁ তুম কো বাতাতা হোঁ তাকদীরে উমাম কিয়া হ্যায়/
শামশীর ওয়া সিনাঁ আওয়াল, তাউস ওয়া রিবাব আখির।

অর্থ : শোন, বলছি তোমাকে জাতির উত্থান-পতনের তাকদীর/
শেষ দৃশ্যে বেহালা-সেতার; শুরুতে যদিও তীর-শামশীর।

সফরনামার আন্দালুস-অংশের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ছত্র আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত করল; কখনও আনন্দে, কখনও-বা বেদনায়।

এরপর কেটে গেল আরও কয়েক বছর। আমি তখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের শেষপ্রান্তে। একদিন শুনলাম হিন্দুস্তানের প্রখ্যাত দাঈ আলিম হযরত মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব দা.বা.-এর একটি বয়ান।[৩] মাওলানার আলোচনা যারা

---

[২] মিশ্রী ভাষানার একটি লাইন হল,

আয় গুলিস্তানে আন্দালুস! ওহ দিন হ্যায় ইয়াদ তুজকো/যা তেরী ডালিয়োঁ মেঁ জব আশিয়া হামারা?

অর্থ : ওহে আন্দালুস-উদ্যান! মনে আছে তোমার সেই সোনালী অতীত, যখন তোমার শাখা-প্রশাখায় ছিল আমাদের আবাস-নীড়?।

[৩] দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র-শিক্ষক মজলিসে প্রদত্ত মাওলানার ভাষণটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় উসতায মাদানীনগর মাদরাসার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাজ্ঞ শিক্ষক মুফতী ফারুকুযযামান সাহেব দা.বা. কিতেবন্দী করেছিলেন এবং পরবর্তীতে আমাদের শুনিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, অনুবাদের জন্য '*আন্দালুসের ইতিহাস*' গ্রন্থটি নির্বাচন, অনুবাদের প্রতিটি স্তরে সস্নেহ তত্ত্বাবধান; সর্বোপরি আমার লেখালেখিতে উৎসাহদান– সর্বক্ষেত্রেই আছে হুযুরের অসামান্য অবদান। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন হযরতুল উসতাযকে আপন শান মুতাবিক আজর দান করুন।

Scanned with CamScanner

শুনেছেন, তারা জানেন, তিনি একজন দরদী দাঈ; একজন হৃদয়গ্রাহী আলোচক। কিন্তু তার সেদিনের সেই আলোচনায় দরদ ও মর্মযাতনা যেন উপচে পড়ছিল। ক'দিন আগেই তিনি স্পেন সফর করে এসেছিলেন। তার আলোচনায় বারবার আসছিল আন্দালুস-প্রসঙ্গ এবং বারবারই দমকে ওঠা কান্নার ধ্বনি। মাওলানার বয়ান সেদিন সকল শ্রোতাকে কাঁদিয়েছিল এবং হৃদয়ে জাগ্রত করেছিল অনুভব-অনুভূতির অনেককিছু।[৪]

এরপর এই সেদিন ড. রাগিব সারজানীর *'কিসসাতুল আন্দালুস মিনাল ফাত্হি ইলাস সুকূত'* হাতে পাওয়া, তন্ময় হয়ে আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলা এবং ...। বাকিটুকু, প্রিয় পাঠক! এখন আপনার সামনে।

* * *

ইতিহাস একটি জাতির কেবল উন্নতি ও উত্তরণের সোপান-ই নয়; ইতিহাস জাতিগত অবক্ষয় হতে নিষ্কৃতির হাতিয়ার-ও বটে। আজ আমাদের ইতিহাস-বিমুখতাকে পুঁজি করেই শত্রুপক্ষ তাদের সবচে' সফল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ-বিরোধী অপপ্রচারকে। জ্ঞানপাপী শত্রুরা ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করছে, ইসলাম ও ইসলামের নবীর ইতিহাস-জীবনেতিহাস বিকৃত করে তুলে ধরছে আর আমরা গোগ্রাসে তা-ই গিলছি! আমরা বিশ্বাস করছি– ইসলামের প্রচার-প্রসার তরবারির জোরে! মুসলিম জাতি সন্ত্রাসী জাতি! আরও কত কী! আমরা পড়ি সূর্যসেনের বীরত্বের ইতিহাস; জানি না, কে তিতুমীর? আমরা মন্ত্রমুগ্ধ চে গুয়েভারা-য়; কিন্তু নাম শুনিনি আবু বকর বিন ওমর লামতুনীর! আছে আরো কত শত উদাহরণ!

আজকের পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর যে অবক্ষয় ও অধঃপতন, নিজেদের অতীত বিস্মৃতি তার অন্যতম কারণ। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস একটি জাতির

---

[৪] মাওলানা তার বয়ানে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলেছিলেন, যে কর্ডোভা পাঁচ শ' বছরের অধিক কাল ধরে ছিল মুয়াযযিনের 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে আলোড়িত, কাযী মুনযিরের ন্যায় অনলবর্ষী খতীবের অগ্নিঝরা উচ্চারণে প্রকম্পিত এবং আল্লামা কুরতুবী, ইবনে রুশদ, আল্লামা শাতিবীর ন্যায় হাজারও আলিম ও তালিবানে ইলমের ক্বালাল্লাহু, ক্বালার রাসূল গুঞ্জরনে মুখরিত, আজ তার অম্বির আকাশে-বাতাসে তরঙ্গায়িত হয় মা আযানের ধ্বনি! কর্ডোভার দুর্ভাগা ভূমিতে অঙ্কিত হয় না মুমিনের সিজদা-চিহ্ন। জামে কর্ডোভার মিম্বরে আজ খতীব মুনযিরের অগ্নিঝরা কণ্ঠস্বরের পরিবর্তে বেজে ওঠে বাদ্যের সুরবীণা! ইবনে রুশদ ও শাতিবীর সিজদাগাহে আজ শোভা পাচ্ছে প্রাণিআকর্ষ! কুরতুবী ও ইবনুল খতীবের দরসগাহ আজ খৃস্টের বাণী প্রচারের মঞ্চ! ... আহ! বদনসীব চোখ এ দৃশ্য দেখার পূর্বে কেন দৃষ্টিহীন হয়ে গেল না! দুর্ভাগা আত্মা এ মর্মজ্বালা সহ্য করার পূর্বে কেন দেহ-সঙ্গ ত্যাগ করল না! ... হৃদয়ের কানে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম জামে কর্ডোভা চিৎকার করে বলছে, 'সুন্নাতুল্লাহ চিরন্তন! আল্লাহ তা'আলার রীতি ও বিধান অলঙ্ঘনীয়!'

Scanned with CamScanner

শিকড়ের ন্যায়; আর ইতিহাস-বিমুখতা তাই শিকড়চ্যুত হওয়ারই নামান্তর। বলতে দ্বিধা নেই, ইতিহাসঅধ্যয়নই পারে আমাদেরকে শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করতে এবং অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল ও সুমজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের নিশ্চয়তা দিতে। ইতিহাস-গ্রন্থ তাই হওয়া উচিত আমাদের দৈনন্দিন পাঠাভ্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

* * *

আন্দালুস একসময় ছিল মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, স্থাপত্য-প্রকৌশলসহ সভ্যতার বিচিত্র সব অঙ্গনে মুসলিম আন্দালুসের অবদান এত অধিক যে, নিশ্চিত করেই বলা চলে, সভ্যতা ও পৃথিবী মুসলিম আন্দালুসের কাছে চির ঋণী হয়ে আছে। ইউরোপের মানচিত্রে মুসলিম আন্দালুসের অভ্যুদয় ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে যুগান্তকারী এক ঘটনা। আন্দালুসে ইসলামের আগমনের পূর্বে আজকের সভ্য ইউরোপ ছিল চিন্তা ও বিশ্বাস, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জীবনাচার ও সামাজিক রীতি–সর্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ একটি অঞ্চল। হানাহানি, অরাজকতা, মূর্খতা ও প্রবৃত্তি-পূজা-ই ছিল সমকালীন ইউরোপের বৈশিষ্ট্য। মুসলিম আন্দালুসই ইউরোপকে দেখিয়েছিল আলোকিত সভ্যতার পথ ও সমৃদ্ধির ঠিকানা। *The Making of Humanity*-গ্রন্থের লেখক রবার্ট ব্রিফল্ট (Robert Briffault)-এর মতে,

> ইউরোপের উন্নতি ও অগ্রগতির এমন কোন অঙ্গন নেই, যেখানে নেই (আন্দালুসের) ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অসামান্য অবদান।

সেই আন্দালুস কীভাবে আমাদের হয়েছিল এবং কীভাবে হয়েছিল হাতছাড়া; কী কী কার্যকারণ সক্রিয় ছিল বিজয়ের ক্ষেত্রে এবং পতনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলমান সে ইতিহাস জানবেন না, তাও কি মেনে নেওয়া যায়?!

* * *

আরববিশ্বে ড. রাগিব সারজানী অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন লেখক, আলোচক ও ইতিহাসগবেষক। আরবীতে ইতিহাস নিয়ে অনেকেই কলম ধরেছেন, কিন্তু রাগিব সারজানীর কৃতিত্ব ও স্বকীয়তা হল তিনি পাঠক-শ্রোতার সামনে একজন নির্মোহ সাংবাদিকের ন্যায় কেবল ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন না; বরং ইতিহাসের বর্ণনা থেকেই তিনি তুলে আনেন সুপ্ত নানা শিক্ষা, আগামীর পথচলার পাথেয় এবং জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চিরন্তন সব সূত্র। তিনি পাঠককে পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখান এবং হতাশার মাঝেও জেগে ওঠার অনুপ্রেরণা যোগান। রাগিব সারজানীর পাঠক তাই কেবল অতীতের পাতায়

Scanned with CamScanner

বিচরণ করে না; আগামীর অঙ্গীকারেও মুষ্টি বদ্ধ করে। আন্দালুসের ইতিহাস এমনিতেই তো যথেষ্ট উদ্দীপক ও প্রেরণাদায়ক; নিঃসন্দেহে রাগিব সারজানীর কলম সেখানে নবমাত্রা যোগ করেছে।

* * *

প্রতিটি ছোট-বড় কর্ম সম্পাদনের পেছনে কতজনের কত রকম অবদান জড়িয়ে থাকে! জীবনের প্রথম শিক্ষাঙ্গন মাতৃক্রোড়ে আধো আধো উচ্চারণে এক-একটি অক্ষর শেখা, এরপর পিতার হাত ধরে শিক্ষার নবদিগন্তে প্রবেশ করা, আসাতেযায়ে কেরামের সযত্ন তত্ত্বাবধান ও নিরবচ্ছিন্ন দিকনির্দেশনায় সামনের পথে এগিয়ে চলা– আজকের এই সামান্য কর্ম তো এ সবকিছুরই ফল, তাদের সকলের অসামান্য পরিশ্রম ও ত্যাগেরই ফসল। তাই *'আন্দালুসের ইতিহাস'* প্রকাশের এই শুভ মুহূর্তে আবারও রাব্বে কারীমের শোকর এবং তারপর পরম শ্রদ্ধেয় মাতা-পিতা ও সকল আসাতেযায়ে কেরামের শুকরিয়া!

হাজার পৃষ্ঠা ব্যাপ্ত এই অনুবাদ-কর্ম সমাপ্ত করতে গিয়ে পদে পদে কতজনের সাহায্য-অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা লাভ করেছি, তেমনই বঞ্চিত করেছি কতজনকে! পরিবার-পরিজন, সহকর্মীবৃন্দ এবং আমার প্রিয় তালিবানে ইলম; এই স্মরণীয় মুহূর্তে তাদের সকলের জন্য 'কল্যাণ-কামনা' মহান আল্লাহ পাকের দরবারে।

* * *

প্রিয় পাঠক! দিবস-রজনীর কোন এক প্রহরে *'আন্দালুসের ইতিহাস'* হাতে নিয়ে আপনি হয়তো একটু আয়েশ করে বসেছেন, অতীতের ভেলায় চড়ে কিছুক্ষণের জন্য কয়েক শ' বছর পূর্বের পৃথিবীতে ফিরে যেতে; কিছুটা তৃপ্তি এবং কিছুটা রোমাঞ্চ অনুভব করতে। কিন্তু শুরুতেই বলে রাখছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি চারপাশ, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিস্মৃত হবেন, আনন্দে উদ্বেলিত হবেন এবং কান্নায় সিক্ত হবেন। অবশ্য এ কথাও সত্যি, *'আন্দালুসের ইতিহাস'* আপনাকে কেবল কাঁদাবেই না; নব-চেতনায় সমৃদ্ধ করবে এবং নতুন করে জেগে উঠতে উদ্বুদ্ধ করবে। তাহলে আসুন, শুরু করি বিসমিল্লাহ বলে!

বিনীত

১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরী
০২ ডিসেম্বর ২০১৭ খৃস্টাব্দ

আবু মুসআব ওসমান
শিক্ষক
দারুল উলূম মাদানীনগর, ঢাকা
osmanbd14@gmail.com

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা
কেন ইতিহাস নিয়ে লিখছি? ২৭
কেন আন্দালুসের ইতিহাস লিখছি? ২৯
আন্দালুস-ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধ্যায় ৩০

প্রথম অধ্যায় : আন্দালুসের পথে

প্রথম পরিচ্ছেদ :
আন্দালুসের পরিচিতি ৩৯
ভৌগোলিক অবস্থান ৪০
'আন্দালুস' নামকরণের কারণ ৪১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামপূর্ব আন্দালুস
জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৎকালীন ইউরোপের পশ্চাদ্‌গামিতা ৪৩
গোথ জাতির আন্দালুস শাসন ৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : আন্দালুস বিজয়ের ইতিহাস

আন্দালুস অভিযানের কার্যকারণ ৪৯
প্রথম পরিচ্ছেদ : আন্দালুস বিজয় উমাইয়া সালতানাতের এক গৌরবময় অধ্যায়
বনু উমাইয়ার শাসনামল, একটি নির্মোহ পর্যালোচনা ৫২
আন্দালুস-বিজয়ের পূর্বে উত্তর আফ্রিকায় মুসলমানদের অবস্থা ৫৬
মুসা বিন নুসাইর একজন জাত সেনাপতি ৫৬
আফ্রিকায় ইসলামের অবস্থান সুদৃঢ়করণে মুসা বিন নুসাইরের প্রচেষ্টা ৫৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুসা বিন নুসাইর ও আন্দালুস অভিযানের সিদ্ধান্ত
আন্দালুস বিজয়ের অতীত-পরিকল্পনা ৬৩
মুসা বিন নুসাইর ও আন্দালুস বিজয়ের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ৬৪
প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে মুসা বিন নুসাইরের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ৬৭
সিউটা সমস্যা ও কুদরতি সাহায্য ৭০
সারিয়্যায়ে তরীফ বিন মালিক : আন্দালুসে প্রথম ইসলামী অভিযান ৭৫
আন্দালুস বিজয় এবং জুলিয়ান ও ইহুদিদের সহায়তা ৭৬

Scanned with CamScanner

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তারিক বিন যিয়াদের আন্দালুস বিজয়
তারিক বিন যিয়াদের অভিযান ও নৌযানে সমুদ্রপাড়ি ৭৯
আন্দালুস-ভূমিতে তারিক বিন যিয়াদ ৮২
আন্দালুস অভিযানের প্রাথমিক বিজয়সমূহ ৮৪
বারবাত প্রান্তরের ঐতিহাসিক যুদ্ধ ও আন্দালুস বিজয় ৮৪
দুই পক্ষের প্রকৃত তুলনা ৮৬
বারবাত উপত্যকা ও রমযান মাস ৮৮
বারবাত যুদ্ধে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফলাফল ৮৯
তারিক বিন যিয়াদের ভাষণ প্রসঙ্গ ৯০
এই ভাষণের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে আমাদের অবস্থান ৯৩
তারিক বিন যিয়াদের নৌবহর জ্বালিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গ ৯৪
তারিক বিন যিয়াদের অব্যাহত অভিযান
ও আন্দালুসের বিভিন্ন অঞ্চল জয় ৯৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামী বিজয়াভিযানে প্লাবিত আন্দালুস উপদ্বীপ
১. জিযিয়ার পরিচিতি ও সংজ্ঞা ১০১
২. জিযিয়া বিধান কার ওপর আরোপ করা হবে? ১০২
৩. জিযিয়ার পরিমাণ ১০৩
উত্তরে তারিক বিন যিয়াদের অব্যাহত অভিযান ১০৪
টলেডোর দোরগোড়ায় তারিক বিন যিয়াদ ১০৬
তারিকের শক্তিবৃদ্ধিতে মুসা বিন নুসাইরের আগমন ১০৭
কোথা থেকে এল এরা? ১০৮
পথে মুসা বিন নুসাইরের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিযান ১০৮
মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদ
দুই মহান বীরের সাক্ষাৎ এবং বিজয়াভিযানের পূর্ণতা ১১০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : খলীফা কর্তৃক বিজয়াভিযান মুলতবীর সিদ্ধান্ত
এবং সেনাপতিদ্বয়কে দামেশকে তলব ১১৫
সুউচ্চ সংকল্প ও উচ্চাভিলাষের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত ১১৬
প্রত্যাবর্তন ও শেষ ইচ্ছা ১১৮
সাখরা ও একটি কঠিন শিক্ষা ১২০

তৃতীয় অধ্যায় : উমাইয়া প্রশাসক-যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রতাপ ও সমৃদ্ধির যুগ
১. আন্দালুস-ভূমিতে ইসলামের প্রচার-প্রসার ১২৭

Scanned with CamScanner

২. মিশ্র প্রজন্মের উৎপত্তি ১২৮
৩. শ্রেণিতন্ত্রের বিলোপ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রসার ১২৯
৪. নাগরিক সভ্যতার বিনির্মাণে বিশেষ গুরুত্বারোপ ১২৯
৫. সকল ক্ষেত্রে আন্দালুসবাসীর মুসলিম-অনুকরণ ১৩০
৬. মুসলিম প্রশাসন কর্তৃক কর্ডোভাকে আঞ্চলিক রাজধানী নির্ধারণ ১৩০
৭. ফ্রান্সে সামরিক অভিযান পরিচালনা ১৩১
সামাহ বিন মালিক আলখাওলানী রহ. ১৩১
সামাহ বিন মালিক রহ.-এর যুদ্ধ-তৎপরতা ১৩২
আমবাসা বিন সুহাইম রহ. ১৩৩
আমবাসা বিন সুহাইমের যুদ্ধ-তৎপরতা ১৩৩
আবদুর রহমান আলগাফিকী রহ. ১৩৪
কে এই আবদুর রহমান আলগাফিকী? ১৩৫
আবদুর রহমান আলগাফিকীর সামরিক মেধা ও চিন্তাকুশলতা ১৩৬
আবদুর রহমান আলগাফিকীর চরিত্র ১৩৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধ, অব্যাহত বিজয়াভিযানে সামরিক বিরতি
ইতিহাস ও যুদ্ধইতিহাস-গ্রন্থ নিয়ে একটি পর্যালোচনা ১৪০
সংখ্যাধিক্য ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ-প্রাচুর্য পরাজয়ের অন্যতম কার্যকারণ ১৪১
বিপর্যয়কর বিজয়! ১৪৭
ইতিহাস ও বাস্তবতা ১৪৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইতিহাস পর্যালোচনা
১. প্রাথমিক অবস্থায় আন্দালুসে মুসলিম বাহিনী দুর্বল থাকা সত্ত্বেও আন্দালুসবাসী কেন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি? ১৫৩
২. পুরো আন্দালুস-ভূমিতে একজন ব্যক্তিও কি এমন ছিল না, যে ক্ষমতার মোহে বা ব্যক্তিস্বার্থে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা করবে? ১৫৬
৩. নবী ও সাহাবাযুগের এত নিকট সময়ের মহান তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন-কাফেলার সদস্যদের অন্তরে কীভাবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও পার্থিব সম্পদ-প্রীতি জাগ্রত হল? কীভাবে তাদের মাঝে গোত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল? ১৫৯
জাতীয়তাবাদ ও গোত্রবাদের সমস্যা ১৬২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : (উমাইয়া প্রশাসনের) অবসন্নতার যুগ
বালাতুশ শুহাদা যুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ
আবদুল মালিক বিন কাত্তান আলফিহরী ১৬৫
জুলুম ও যুদ্ধ! ১৬৫

Scanned with CamScanner

উকবা ইবনুল হাজ্জাজ ১৬৬
উকবা ইবনুল হাজ্জাজ-এর বিজয়াভিযান ১৬৭
প্রশাসক আমলের দ্বিতীয় ধাপ ১৬৯
মাগরেবে খারেজীদের বিদ্রোহ ১৬৯
খারেজী ফিতনা ও বিদ্রোহ এবার আন্দালুস-ভূমিতে ১৭১
কায়সী-ইয়ামানী সংঘাত ১৭৩
সামীল বিন হাতিম ও ইউসুফ আলফিহরী ১৭৮
চলমান সময়কালে মুসলিম প্রাচ্যে খেলাফত-পরিস্থিতি ১৮২
প্রশাসক-আমলের দ্বিতীয় ধাপে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ ১৮৪
প্রশাসক-আমলের দ্বিতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্যাবলি
১. সম্পদপ্রীতি ১৮৫
২. গোত্রবাদ ও সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার আত্মপ্রকাশ ১৮৬
৩. প্রশাসনিক নিপীড়ন ১৮৬
৪. অমুসলিম রাষ্ট্রে বিজয়াভিযানের ধারা পরিত্যাগ ১৮৭

চতুর্থ অধ্যায় : স্বাধীন উমাইয়া প্রশাসকদের আমল

প্রথম পরিচ্ছেদ : আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া রহ.

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার কাহিনী ১৯১
আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার আন্দালুস-প্রবেশ পরিকল্পনা ১৯৮
আন্দালুস-ভূমিতে আবদুর রহমান আদদাখিল ২০০
মাসারার যুদ্ধ ২০১
আবদুর রহমান আদদাখিলের মহত্ত্ব, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার নিদর্শন ২০২
আবদুর রহমান আদদাখিল ও আবুস সবাহর মধ্যে দ্বন্দ্ব ২০৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আবদুর রহমান আদদাখিলের শাসনামল

আবদুর রহমান আদদাখিল-এর বিরুদ্ধে সংঘটিত বিদ্রোহসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২০৮
আব্বাসীদের অভ্যুত্থান চেষ্টা ও 'কুরাইশী ঈগল' উপাধি ২০৯
আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া ও আব্বাসী খেলাফত ২১২
বিদ্রোহ দমনে আবদুর রহমান আদদাখিলের নীতি পর্যালোচনা ২১৬
আবদুর রহমান আদদাখিলের নতুন এক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিনির্মাণ ২১৭
এক. সুদৃঢ় সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠা ২১৭
দুই. জ্ঞানচর্চা ও ধর্মীয় বিষয়াদিতে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান ২১৯
তিন. নাগরিক সুবিধাদির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ ২২০

Scanned with CamScanner

চার. শত্রুদের শ্যেন দৃষ্টি ও লালসা থেকে (নিরাপত্তার জন্য)
সীমান্ত অঞ্চলের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ ২২১
আবদুর রহমান আদদাখিল ... একজন সুদক্ষ প্রশাসক ২২২
ব্যক্তি আবদুর রহমান আদদাখিল ২২৫
আবদুর রহমান আদদাখিলের সামরিক চিন্তা-কুশলতা
১. অতর্কিতে হামলার নীতি ও শত্রুর পূর্বে পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা ২২৭
২. শক্তির মিতব্যয়িতা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অটলতা ২২৮
কয়েক ছত্রে কুরাইশী ঈগলের পুরো জীবন ২২৯
ইন্তেকাল ২২৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শক্তিশালী যুগে (স্বাধীন) উমাইয়া প্রশাসন
স্বাধীন উমাইয়া প্রশাসনের তিনটি স্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২৩১
(স্বাধীন) উমাইয়া প্রশাসনের প্রথম যুগ ২৩১
হিশাম বিন আবদুর রহমান আদদাখিল রহ. ২৩২
হাকাম বিন হিশাম বিন আবদুর রহমান আদদাখিল রহ. ২৩৪
আবদুর রহমান আলআওসাত (দ্বিতীয় আবদুর রহমান) রহ. ২৩৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উমাইয়া-প্রশাসক আমলের দ্বিতীয় স্তর
উমাইয়া প্রশাসনের দুর্বলতার কারণ ও কার্যকারণ
১. সম্পদের অবাধ আগমন এবং অবারিত প্রাচুর্যের দ্বার উন্মোচন ২৪৪
২. যিরইয়াব ২৪৫
৩. উমাইয়া প্রশাসনের দুর্বলতার অন্যতম কারণ ওমর বিন হাফছুন....২৪৯
দুর্বল যুগের শেষসময়ে আন্দালুস পরিস্থিতির ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি.....২৫০
১. আন্দালুসের অভ্যন্তরে ক্রমাগত বিদ্রোহের ঘটনা ২৫১
২. তৃতীয় খৃস্টান রাষ্ট্রের উদ্ভব ২৫২
৩. যুবরাজকে হত্যা ২৫২
৪. মাগরেবে শিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব ২৫৩
৫. ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য ভূখণ্ডের পরিস্থিতির অধঃপতন ২৫৪

পঞ্চম অধ্যায় : উমাইয়া খেলাফতের যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ : আবদুর রহমান আননাসির রহ.
আবদুর রহমান আননাসির-এর শাসনভার গ্রহণ ২৫৯
কে এই আবদুর রহমান আননাসির? ২৫৯
আবদুর রহমান আননাসির সম্পর্কে কিছু তথ্য :
প্রাথমিক জীবন, উন্নতির পথে অব্যাহত সাধনা ২৬১

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আবদুর রহমান আননাসির-এর রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রাম

ইতিহাসের পট পরিবর্তন

১. গুরুত্বপূর্ণ পদ ও দায়িত্ব পুনঃবন্টন
(কর্ডোভা প্রশাসনে পরিশুদ্ধি অভিযান) ২৬৫

২. বিদ্রোহ দমন ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ২৬৭

স্যামুয়েলের বিদ্রোহ দমনের পথে ২৬৯

সবাইকে অবাক করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আকস্মিক অভিযান ২৭১

আনমাসিরের নেতৃত্বে একক আন্দালুস রাষ্ট্রের পথে পুনঃযাত্রা ২৭৩

নতুন যুগের সূচনা, উমাইয়া খেলাফতের যুগ ২৭৫

আবদুর রহমান আননাসিরের অব্যাহত সম্প্রসারণমূলক সমরনীতি ২৭৬

একটি মানবিক বিচ্যুতি : 'সুন্নাতে ইলাহী' দেখে না বংশ-পরিচিতি ২৭৭

আপন দায়িত্ব পালনে অটল-অবিচল আবদুর রহমান আননাসির ২৭৯

উত্তর আফ্রিকার ক্ষেত্রে আবদুর রহমান আননাসিরের অবস্থান ২৭৯

আবদুর রহমান আননাসিরের সামরিক চিন্তা-কুশলতা

১. শত্রুপক্ষকে চমকে দেওয়ার কৌশল ২৮৬

২. স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও রাষ্ট্রের সামরিক তত্ত্বাবধান
দুই দায়িত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন ২৮৭

আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলে
আন্দালুসের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিস্থিতি

১. লিওন রাষ্ট্র ২৮৮

ক্যাস্টোলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টা ২৯০

লিওন রাষ্ট্র সম্পর্কে বাকি কথা ২৯১

২. নাফার রাষ্ট্র ২৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলে

আন্দালুসের নাগরিক সভ্যতার উন্নয়ন.....২৯৫

স্থাপত্য ও নির্মাণখাত ২৯৫

অর্থনৈতিক খাত ২৯৮

নিরাপত্তা খাত ২৯৯

বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গন ৩০০

১. হাসসান বিন আবদুল্লাহ বিন হাসসান রহ. ৩০০

২. মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আলগাইছী রহ. ৩০১

আবদুর রহমান আননাসিরের পররাষ্ট্রনীতি ৩০১

ব্যক্তি আবদুর রহমান আননাসির ৩০২

আবদুর রহমান আননাসির রহ. সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত ৩০৩

Scanned with CamScanner

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হাকাম আলমুসতানসির রহ.
হাকাম আলমুসতানসির ও উত্তরণের যুগ..... ৩০৫
১. আবু বকর যুবাইদী রহ..... ৩০৭
২. ইবনুল কুতিয়া রহ. ৩০৯
উত্তর আফ্রিকার ক্ষেত্রে হাকাম আলমুসতানসিরের অবস্থান..... ৩১১
আলমুসতানসিরের শাসনামলে খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিস্থিতি
১. লিওন রাষ্ট্র ও ক্যাস্টোলার স্বাধীনতা..... ৩১৭
২. ক্যাস্টোলার স্বাধীনতা..... ৩২১
৩. নাবার রাষ্ট্র..... ৩২২
হাকাম আলমুসতানসিরের যুদ্ধ ও সম্প্রসারণনীতি ৩২২
আন্দালুসের উপকূলীয় অঞ্চলে আইকিং জলদস্যুদের হামলা ৩২৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : হিশাম আলমুআইয়াদ ইবনুল হাকাম ও আমিরিয়া সাম্রাজ্যের সূচনা
হাকাম বিন আবদুর রহমান, মহান ব্যক্তির মহা স্খলন ৩২৭
সাকলাবী পরিচারকদের প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র ৩২৮
মুগীরা কি সাকলাবী পরিচারকদের পরিকল্পনায় শরীক ছিলেন? ৩৩২
মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের পরিচয় ৩৩৬
মুহাম্মাদ বিন আবু আমির ও আমিরিয়া সালতানাতের অঙ্কুরোদ্গম ... ৩৩৯
মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের উত্থান ৩৪৪
আমিরিয়া সাম্রাজ্য (৩৬৬-৩৯৯ হি./৯৭৬-১০০৯ খৃ.) ৩৪৯
আমিরিয়া সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধ্যায় ৩৫০
১. আযযাহিরা নগরী নির্মাণ ৩৫২
২. দৃশ্যপটে জাফর বিন হামদূনের আগমন ৩৫৩
৩. গালিব আননাসিরের বিদ্রোহ ৩৫৪
নিয়তির আশ্চর্য লিখন ৩৫৫
৪. খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোতে উপর্যুপরি অভিযান ৩৫৭
৫. 'আলহাজিব আলমানসূর' ৩৫৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :
হাজিব ইবনে আবু আমির আলমানসুরের রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রাম
এক. রণাঙ্গনের সংগ্রামী সৈনিক ৩৬১
আলমানসুরের সৈনিকজীবনের উজ্জ্বল কিছু খণ্ডচিত্র ৩৬৪
দুই. নাগরিক উন্নয়নের অনন্য রূপকার ৩৬৭
তিন. বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলামুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার সফল নির্মাতা ৩৬৯

Scanned with CamScanner

আলমানসুরের আমলে আন্দালুসের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিস্থিতি
১. ক্যাস্টোলা ৩৭০
২. লিওন ৩৭০
৩. নাফার ৩৭২
সপ্তম পরিচ্ছেদ : আন্দালুস-ইতিহাসের সমৃদ্ধতম যুগ
(হাজিব মুবাফফার বিন আলমানসুর)
আমিরিয়া সাম্রাজ্যের খ্যাতিমান কয়েকজন আলিম
১. আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন যাকওয়ান রহ. ৩৭৮
২. ইবনে জুলজুল রহ. ৩৭৯
৩. আন্দালুসে গণিতশাস্ত্রের পথিকৃৎ মাসলামা আলমাজরীতি রহ. ৩৮০
৪. ইবনুল ফারাযী রহ. ৩৮২
৫. বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক আবুল কাসিম যাহরাবী রহ. ৩৮৪
অষ্টম পরিচ্ছেদ : আমিরিয়া সালতানাতের পতন
আবদুর রহমান বিন আলমানসুরের দায়িত্ব গ্রহণ
এবং আমিরিয়া সালতানাতের পতন ৩৯১
নবম পরিচ্ছেদ : অব্যাহত অরাজকতা
উমাইয়া খেলাফতের পতন ৩৯৫
মুখোমুখি মাহদী-সুলাইমান : এক বিস্ময়কর ঘটনা ৩৯৭
মুখোমুখি সুলাইমান-মাহদী : অতি-বিস্ময়কর ঘটনা! ৩৯৮
দৃশ্যপটে ওয়াযিহ ও পদচ্যুত খলীফা হিশাম বিন হাকাম ৪০১
সুলাইমান বিন হাকামের গর্হিত কিছু পদক্ষেপ,
ইতিহাস যার স্মরণে আজও ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ ৪০২
সুলাইমানের বিরুদ্ধে বার্বারদের বিদ্রোহ : নতুন সংঘাত ৪০৩
খলীফানির্ভর শাসনযুগের সমাপ্তি এবং গুরা-পদ্ধতির সূচনা ৪০৬
দশম পরিচ্ছেদ : পতনের কারণ অনুসন্ধান
১. ভোগ-বিলাস ও শৌখিনতার ব্যাপক প্রচলন ৪০৯
২. অযোগ্য ব্যক্তির কাছে দায়িত্ব অর্পণ ৪১২
একাদশ পরিচ্ছেদ : পৃথিবীর রত্নখণ্ড কর্ডোভা নগরী
কর্ডোভার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ৪১৭
কর্ডোভার উল্লেখযোগ্য কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন
১. কর্ডোভা সেতু ৪১৮
২. কর্ডোভা মসজিদ ৪১৯

Scanned with CamScanner

৩. কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ৪২৩
কর্ডোভা এক সর্বাধুনিক নগরী ৪২৪
আলিমসমাজ ও কবি-সাহিত্যিকদের চোখে কর্ডোভা ৪২৬

ষষ্ঠ অধ্যায় : বিভক্ত রাষ্ট্র-শাসকদের যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিভক্ত রাষ্ট্র-শাসকদের পরিচয়
গোষ্ঠীভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ৪৩১
বিভক্ত রাষ্ট্র-শাসকদের ইতিহাস ৪৩২
এক. কর্ডোভায় বনু জাহওয়ারের শাসনামল
স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ৪৩৩
১. উযীর আবুল হায্ম বিন জাহওয়ার ৪৩৫
আবুল হায্ম বিন জাহওয়ারের শাসনামল ৪৩৯
আবুল হায্মের স্বরাষ্ট্রনীতি ৪৪২
আবুল হায্মের পররাষ্ট্রনীতি ৪৪৪
সেভিলে হিশাম আলমুআইয়াদ বিল্লাহর আত্মপ্রকাশের
দাবির ক্ষেত্রে আবুল হায্মের অবস্থান ৪৪৪
বহিঃরাষ্ট্রসমূহের দ্বন্দ্ব নিরসন এবং শান্তির আহ্বান ৪৪৫
উযীর আবুল হায্ম ইবনে জাহওয়ারের মৃত্যু ৪৪৬
২. আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ বিন জাহওয়ার ৪৪৮
ভয়াবহ দুর্যোগ ৪৪৯
কর্ডোভা রাজদরবারের বিখ্যাত কয়েকজন আলিম ৪৫২
১. ইবনে হায্ম আন্দালুসী রহ. ৪৫৩
২. আবু মারওয়ান ইবনে হাইয়ান রহ. ৪৫৬
দুই. সেভিলে বনু আব্বাদের শাসনামল
বনু আব্বাদের বংশ-পরিচিতি ৪৫৭
১. কাযী আবুল ওয়ালিদ ইসমাঈল বিন আব্বাদ ৪৫৯
২. কাযী আবুল কাসিম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন আব্বাদ ৪৬০
৩. আলমু'তাযিদ বিল্লাহ ইবনে আব্বাদ ৪৬৪
৪. আলমু'তামিদ বিন আব্বাদ ৪৭১
সেভিল রাজপ্রাসাদের আলিমসমাজ ৪৭৬
তিন. বাতালইয়ুসে বনু আফতাসের শাসনামল
বনু আফতাসের শাসনের সূচনা ৪৭৭
১. আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আফতাস ৪৭৮
২. আলমুযাফফার মুহাম্মাদ বিন আফতাস ৪৮০

Scanned with CamScanner

৩. আলমানসুর ইয়াহইয়া বিন আফতাস ৪৮৪
৪. মুতাওয়াক্কিল আ'লাল্লাহ বিন আফতাস ৪৮৫
বনু আফতাসের দুর্যোগ ৪৮৭
বাতালইয়ুস রাজদরবারের বিখ্যাত কয়েকজন আলিম ৪৮৯
১. আবুল ওয়ালিদ আলবাজী রহ. ৪৯০
২. ইবনু আবদিল বার রহ. ৪৯১
চার. টলেডোতে বনু যিননূনের রাজত্ব
টলেডোর (ভৌগোলিক) গুরুত্ব ৪৯২
বনু যিননূনের মূলধারা ও ইতিহাস ৪৯৩
টলেডোতে বনু যিননূনের শাসন ৪৯৬
১. আযযাফির ইসমাঈল বিন যিননূন ৪৯৬
২. আলমামুন ইয়াহইয়া বিন ইসমাঈল ৪৯৭
৩. আলমামুনের পৌত্র আলকাদির বিল্লাহ ইয়াহইয়া ৫০৪
টলেডো রাজদরবারের বিখ্যাত আলিমগণ ৫০৭
১. ছুয়িদ আন্দালুসী রহ. ৫০৮
২. ইবনে ওয়াক্কিদ রহ. ৫১০
পাঁচ. জারাগোযায় বনু হুদের রাজত্ব
জারাগোযার ভৌগোলিক অবস্থান ও সামরিক গুরুত্ব ৫১১
জারাগোযায় বনু তুজাইব গোত্রের শাসন ৫১২
জারাগোযায় বনু হুদের শাসনামল ৫১৪
১. সুলাইমান আলমুসতাঈন বিন হুদ ৫১৪
২. আলমুকতাদির বিল্লাহ আহমাদ বিন হুদ ৫১৫
বারবাস্ট্রোর ট্রাজেডি ৫১৬
৩. ইউসুফ আলমু'তামিন বিন হুদ ৫২৪
৪. আহমাদ আলমুসতাঈন বিন হুদ ৫২৬
বনু হুদের সাম্রাজ্যের পতন ৫২৮
জারাগোযা রাজদরবারের বিখ্যাত কয়েকজন আলিম ৫২৯
ফকীহ তুরতুশী রহ. ৫৩০
ছয়. মুসলিম আন্দালুসের অন্যান্য বিভক্ত রাষ্ট্র ৫৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :
বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকবর্গের পারস্পরিক বিভেদ-হানাহানি ৫৩৭
এক. সেভিল ও বাতালইয়ুসের মধ্যে বিরোধ ৫৩৯

Scanned with CamScanner

দুই. সেভিল ও গ্রানাডার মধ্যে বিরোধ ৫৪৫
তিন. সেভিল ও কর্ডোভার মধ্যে সংঘাত ৫৫৩
চার. টলেডো ও জারাগোযার মধ্যে সংঘাত ৫৫৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : খৃস্টান আন্দালুস দৃশ্যপট খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিস্থিতির ক্রমবিবর্তন
এক. উত্তরের তৎকালীন খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিচিতি ৫৬৯
দুই. ফার্ডিনান্ড ও বিভক্ত খৃস্টান ফ্রন্টের একত্রিকরণ ৫৭১
তিন. ফার্ডিনান্ড ও প্রথম পুনরুদ্ধার যুদ্ধ ৫৭৩
চার. ফার্ডিনান্ডের মৃত্যু ও উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ৫৭৮
পাঁচ. লিওনের সিংহাসনে আলফোন্সো ৫৮০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ষষ্ঠ আলফোন্সো ও পুনরুদ্ধার যুদ্ধ
এক. বিভক্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর হামলা, দ্বিতীয় পুনরুদ্ধার যুদ্ধ..... ৫৮৩
দুই. মুসলমানদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় ৫৮৫
তিন. আকস্মিক বীরত্ব! ৫৮৯
সেভিল অবরোধ ৫৯১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : টলেডোর পতন
টলেডোর পতন যেভাবে, যে পথে ৫৯৭
এক. আলমামুন বিন যিননূনের অতিসরলতা ৫৯৮
দুই. কাদির বিন যিননূনের দুঃশাসন ৫৯৯
তিন. টলেডোবাসীর বিদ্রোহ ৬০০
চার. আলফোন্সো কর্তৃক আলকাদিরকে ক্রুশেড যুদ্ধ-বৃত্তে পুনঃআনয়ন ৬০০
পাঁচ. আলফোন্সোর টলেডো অবরোধ ৬০১
ছয়. এবং অবশেষে টলেডোর পতন ৬০২
আত্মসমর্পণের শর্তাবলি ৬০৩
টলেডো-শাসক আলকাদির বিন যিননূনের হিস্যা! ৬০৩
সাত. মুরাবিতীদের তলব ৬০৬

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

লেখকের ভূমিকা

হামদ ও সালাতের পর ...

কেন ইতিহাস নিয়ে লিখছি?

আমাদের এই ভূমণ্ডল এবং এতে বিদ্যমান প্রকৃতির সবকিছু একটি সুনির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয় রীতি ও নিয়ম মেনে পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য সেই রীতি ও নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা আমাদের জন্য এ পৃথিবীতে যে অসংখ্য নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের ব্যবহার-উপযোগী করেছেন; এই পরিচিতির মাধ্যমে আমরা তার সঠিক ব্যবহার করতে পারব। বরং বলা ভালো, এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআ'লার চিরন্তন রীতি ও শাশ্বত বিধান অনুধাবন করতে পারব এবং অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সঠিক ও সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারব।

জগতে মহান আল্লাহ তাআ'লার রীতি ও বিধান চিরন্তন ও শাশ্বত, অটল ও অপরিবর্তনীয়। সকল যুগে সবার ক্ষেত্রে তা একই ধারায় কার্যকর। আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন,

﴿ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾

> তোমরা আল্লাহর স্থিরীকৃত নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না এবং তোমরা আল্লাহর স্থিরীকৃত নিয়মকে কখনো টলতেও দেখবে না। [সূরা ফাতির : ৪৩]

পবিত্র কোরআনে ঘোষিত এ বিধানের মর্ম ও বাস্তবতা অনুধাবন করা এবং তা কাজে লাগানো আমাদের সকলের পক্ষেই সম্ভব। এর একটি সহজবোধ্য ও প্রায়োগিক উদাহরণ নিন।

আমরা দেখি, পানির তাপমাত্রা যখন এক শ' ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছয়, তখন উত্তপ্ত পানি ফুটতে থাকে এবং বাষ্পে পরিণত হয়। পানির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআ'লার এই বিধান অতীতে যেমন কার্যকর ছিল, বর্তমানে আছে, কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এই সুনির্ধারিত বিধান আমাদের প্রতি আল্লাহ

Scanned with CamScanner

তাআ'লার অনেক বড় দয়া ও অনুগ্রহ। অন্যথায় বিষয়টি যদি এমন হত যে, আজ পানি ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে টগবগ করে, আগামীকাল ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, পরশু ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, তাহলে আমাদের জীবনযাত্রা কত কঠিন হয়ে যেত। পরিবেশ ও প্রকৃতির সবকিছু যদি নিয়ম মেনে না চলত, প্রতিদিন নতুন নতুন নিয়মের অনুসরণ করত, তাহলে এই সুপরিচিত প্রকৃতিই আমাদের অপরিচিত হয়ে যেত। ঠিক তদ্রূপ আগুনের ধর্ম পুড়িয়ে ফেলা। কেয়ামত পর্যন্ত আগুন তা-ই করবে এবং আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ম মেনে চলবে।

হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, রীতির ব্যতিক্রমও ঘটে। যে আগুনের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে জ্বালিয়ে দেওয়া, সেই আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েও হযরত ইবরাহীম আ.-এর কিছুই হয়নি। কিন্তু এ তো নিতান্তই ব্যতিক্রমী বিষয় বা অলৌকিক ঘটনা। একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মুমিন বান্দা অলৌকিকতার অপেক্ষায় থাকে না, ব্যতিক্রমী বিষয়কে জীবনের রীতি ও আদর্শরূপে গ্রহণ করে না। মুমিন ব্যক্তি তো এমন রীতিরই অনুসরণ করে, যা তার উপলব্ধিতে অপরিবর্তনীয়। কারও জন্য কি এটা সমুচিত হবে যে, সে আগুনে হাত দিয়ে বসে থাকবে আর বলবে, আমার ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটবে, যা ঘটেছিল হযরত ইবরাহীম আ.-এর ক্ষেত্রে?! এ ধরনের আচরণ ও উচ্চারণ একেবারেই অবৈধ। কেননা, তা খোদায়ী রীতি-বিরুদ্ধ। এভাবে অন্যান্য বিষয়গুলোও বুঝে নিন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সুন্নাত বা রীতি হল মানুষসহ সকল প্রাণী পানাহার ছাড়া বাঁচতে পারবে না। এখন যদি কোন মানুষ দীর্ঘ সময় পানাহার থেকে বিরত থাকে, স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু-ই হবে তার অনিবার্য পরিণতি।

ঠিক তদ্রূপ জাতি-গোষ্ঠীর উত্থান-পতন ও অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ তাআ'লার সুনির্ধারিত রীতি আছে। প্রবল প্রতাপশালী জাতির পতন কিংবা ক্ষয়িষ্ণু কোন জাতির উত্থান সবই একটি সুনির্ধারিত নিয়মের অধীনে সংঘটিত হয়। সুতরাং যে কোন জাতি যে কোন কালে পৃথিবীর যে কোন ভূখণ্ডে উত্থান বা পতনের সুনির্ধারিত রীতি যেভাবে অনুসরণ করবে, তার পরিণতিও তেমনই হবে। আর যখনই আমরা ইতিহাসের পাতায় বিচরণ করব, উত্থান-পতনের এ খোদায়ী নীতির বাস্তবায়ন দেখতে পাব। অবাক বিস্ময়ে অনুধাবন করব, ইতিহাস যেন বারবার ফিরে এসেছে। এক হাজার বছর বা তারও পূর্বের কোন ইতিহাস আপনি হয়তো পাঠ করছেন,

Scanned with CamScanner

আপনার মনে হবে, আরে! এ তো হুবহু এই সেদিন ঘটে যাওয়া ঘটনাটির ধারাবর্ণনা; চরিত্র ও কুশীলবদের নামগুলোই কেবল বদলে দেওয়া হয়েছে। আর তাই আপনি যখন কোন অতীত ইতিহাস পাঠ করবেন, বাস্তবতা হল, আপনি তখন ভবিষ্যৎ ঘটনাবলিরই বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করবেন। কেননা, ভবিষ্যতের ঘটনা ও দুর্ঘটনা তো সেই শাশ্বত নীতির অধীনেই বাস্তবায়িত হবে, যা মহান আল্লাহ তাআ'লা জাতিসমূহের পরিবর্তন ও উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত করেছেন এবং যার আলোকে ইতিহাসে বর্ণিত জাতিবর্গের ভাগ্যে উত্থান-পতন ঘটেছে। অন্যভাবে বললে, ইতিহাস পাঠ করলে আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন, আপনার বর্তমান পদচারণা আপনাকে ভবিষ্যতে কোথায় পৌঁছিয়ে দেবে। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহই আপনার আগামী-গন্তব্য নির্ধারণ করে দেবে।

অধিকন্তু জ্ঞানী মুসলমান কোন কাজ শূন্য থেকে শুরু করে পূর্ববর্তীদের কৃত ভুলের পুনরাবৃত্তি করে না; বরং বিগতদের ইতিহাসের আলোকে নিজের লক্ষ্য ও চলার পথ নির্ধারণ করে, সফলদের পদক্ষেপ অনুসরণ করে এবং ব্যর্থ ও আঁধার-পথের যাত্রীদের পথ ও পদক্ষেপ থেকে শত ক্রোশ দূরে থাকে।

আন্দালুসের ইতিহাস এই শাশ্বত খোদায়ী রীতির এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। আর এ কারণেই আমরা আন্দালুসের ইতিহাস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। ইতিহাসের ধূসর পাতাগুলো ঝেড়ে আমরা সেসব ঘটনাবলি তুলে আনার চেষ্টা করেছি, মাটির এই পৃথিবী যা শত শত বছর অবলোকন করেছে। ইতিহাসের সেসব অজানা অধ্যায় আমরা পাঠকের পড়ার টেবিলে পরিবেশন করতে চেয়েছি, যা ইতিহাসের পাতা হতে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে, অকাট্য সত্যকে মিথ্যারূপে, মিথ্যাকে সত্যরূপে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের ইসলামী ইতিহাসকে নিয়ে জালিয়াতি করার এমন অপচেষ্টা বহুবার বহুভাবে অনেকেই করেছে। আমাদের কর্তব্য, এই ঐতিহাসিক অন্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ করা।

কেন আন্দালুসের ইতিহাস লিখছি?

আন্দালুসের ইতিহাস তো প্রকৃত অর্থে ইসলামী ইতিহাসেরই এক বৃহৎ অধ্যায়। নির্দিষ্ট করে বললে ৯২ হিজরী হতে ৮৯৭ হিজরী (৭১১-১৪৯২ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত দীর্ঘ ৮০৫ বছরের ইতিহাস। গ্রানাডাপতন-পরবর্তী

Scanned with CamScanner

ঘটনাপ্রবাহের সময়কালকে যদি আমরা হিসাব থেকে বাদ দিই, তারপরও আট শ' বছরের অধিক সময়। সুতরাং ইসলামী ইতিহাসের দুই-তৃতীয়াংশের চেয়েও অধিক কাল-ব্যাপ্ত এ দীর্ঘ সময়ের বিবরণ একজন মুসলমানের অজানা থাকবে, তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। আন্দালুসের ইতিহাসকে বেছে নেওয়ার এটি প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আন্দালুসের এই দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে কালের অনেকগুলো পরিক্রমা পূর্ণতা লাভ করেছে এবং সমাপ্তিও লাভ করেছে। আর সুন্নাতুল্লাহও তাই আন্দালুসের ইতিহাসে বারবার প্রত্যক্ষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়কালে আন্দালুস-ভূমিতে অনেক সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছে, তাদের ভাগ্যতারা উদ্ভাসিত হয়েছে; আবার অনেক জাতি-রাষ্ট্রের পতন হয়েছে, ভাগ্যতারকা অস্তমিত হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র শক্তি ও সামর্থ্যে উচ্চতার শিখরে উন্নীত হয়েছে এবং আপন শক্তিবলে আশেপাশের বিভিন্ন দেশ জয় করেছে। আবার অনেক রাষ্ট্র রণশক্তিতে দুর্বলতার কারণে নিজ ভূখণ্ডকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে কিংবা নতজানু নীতি গ্রহণ করে অন্যের করদ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে; ঠিক যেমনটি ঘটছে আজকের পৃথিবীতে।

আন্দালুসের ইতিহাসে একদিকে যেমন আছে সাহসী বীর যোদ্ধাদের গৌরবময় কীর্তিগাথা ও দাস্তান, তেমনই আছে ভীরু-কাপুরুষদের লজ্জামাখা উপাখ্যান। আন্দালুসের ইতিহাসের পরতে পরতে আছে খোদাভীরু বিশ্বাসী বান্দার বিবরণ, আছে খোদাদ্রোহী অবিশ্বাসীর আস্ফালন। আপন ধর্ম ও মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বস্ততা কিংবা স্বধর্ম ও স্বজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অসংখ্য নমুনা পাওয়া যাবে আন্দালুসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে। শাসক বা জনগণ, নেতৃস্থানীয় আলিম কিংবা নিরক্ষর সাধারণ জনসাধারণ, সব শ্রেণির মাঝেই আছে এসব উদাহরণ।

কাজেই নিশ্চিত করেই বলা যায়, এ ধরনের অসংখ্য ধারার যুগপৎ শিক্ষায় সমৃদ্ধ আন্দালুসের ইতিহাস বর্তমান পৃথিবীর মুসলমানদের আপন অবস্থার বিশ্লেষণে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

আন্দালুসের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধ্যায়

আন্দালুসের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য যেসব অধ্যায়ের কথা না জানলেই নয়, তার মধ্যে সর্বাগ্রে আসবে বারবাত (Barbate) উপত্যকায় সংঘটিত যুদ্ধের

Scanned with CamScanner

কথা। এ যুদ্ধ তো পুরো ইসলামী ইতিহাসেরই অন্যতম প্রাতঃস্মরণীয় যুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ যুদ্ধের মাধ্যমে আন্দালুস বিজিত হয়েছে বলেই নয়; গুরুত্ব, ঐতিহাসিক মানদণ্ড ও ঘটনাপ্রবাহের বিচারে এ যুদ্ধকে তুলনা করা যেতে পারে ইয়ারমুক ও কাদিসিয়ার ঐতিহাসিক যুদ্ধদ্বয়ের সঙ্গে। অথচ নির্মম বাস্তবতা হল, অনেক মুসলমান বারবাত উপত্যকার নামই শোনেনি!

এ বিষয়টিও আমাদের জানা আবশ্যক যে, লোকমুখে প্রসিদ্ধ তারিক বিন যিয়াদের যুদ্ধ-জাহাজ জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা বাস্তব, নাকি নিছক কল্পনাপ্রসূত? অনেকেই এ ঘটনার বাস্তবতা ও বিবরণ সম্পর্কে অনবগত। এ ঘটনা যদি ঘটেই থাকে, তাহলে তার বিবরণ কী? আর বাস্তবে না ঘটে থাকলে কেন এবং কীভাবে তা লোকমুখে প্রসিদ্ধি লাভ করল, এসব বিষয় সকলের জানা আবশ্যক।

তেমনই আমাদের জানতে হবে আবদুর রহমান আদদাখিল-এর পরিচয়; যার সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন, 'আন্দালুস-ইতিহাসে আবদুর রহমানের পদার্পণ ও বিচরণ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তার আগমন না ঘটলে আন্দালুস-ভূমি হতে ইসলামের চিহ্ন চিরতরে মুছে যেত'।

জানতে হবে আবদুর রহমান আননাসির নামের সেই মহান ব্যক্তির অজানা ইতিহাসও, যিনি ছিলেন পুরো মধ্যযুগের ইতিহাসেই ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম শাসক। জানতে হবে, কীভাবে তিনি এই উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিলেন এবং কীভাবে তার শাসনামলে মুসলিম আন্দালুস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিল?

ভুলে গেলে চলবে না যাল্লাকার যুদ্ধক্ষেত্রের মহানায়ক ইউসুফ বিন তাশফীন নামের সেই আল্লাহওয়ালা মহান নেতার কথাও। জানতে হবে তার জীবন ও কর্মের কথা, কীভাবে তিনি নিজে ঈমানী চেতনায় বেড়ে উঠেছেন আর কেমন করেইবা মানুষকে সংগ্রামী জীবনের দীক্ষায় দীক্ষিত করেছেন, কীভাবে এই সুবিশাল ও সুমহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং কীভাবে সেই বিস্তৃত রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, মুসলমানদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে যার জুড়ি মেলা ভার?! কিংবা আবু বকর বিন ওমর লামতুনীর কথা, যে মহান সেনাপতির হাত ধরে ইসলামের পতাকাতলে শামিল হয়েছে পনেরটির অধিক আফ্রিকান রাষ্ট্র।

ঐতিহাসিক 'আরিক' রণাঙ্গনের মহানায়ক আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলমানসুরের ইতিহাস জানাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আরিকের যুদ্ধে খৃস্টানশক্তির গর্বের প্রতীক দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো ধুলোয় মিশে গিয়েছিল আর

Scanned with CamScanner

মুসলমানগণ লাভ করেছিল নিরঙ্কুশ বিজয়।

তেমনই জানতে হবে মুরাবিতী ও মুওয়াহহিদী শাসনের কথা এবং কীভাবে এই দুই শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই ইতিহাস।

জানতে হবে কর্ডোভা মসজিদের কথা, যাকে পৃথিবীর সবচে' বৃহৎ পরিসরের মসজিদরূপে গণ্য করা হত। সে ইতিহাসও জানতে হবে যে, কীভাবে এই মসজিদ গির্জায় রূপান্তরিত হল এবং এখনও গির্জারূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তেমনই জানতে হবে সেভিলের ঐতিহাসিক মসজিদের কথাও।

আরও জানতে হবে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়, উমাইয়া গ্রন্থাগার, আযযাহরা রাজপ্রাসাদ এবং অবশ্যই মাদীনাতুয যাহরার ইতিহাস।

জানতে হবে আলহামরা প্রাসাদসহ সেসব সুবিখ্যাত স্থাপনার কথাও, যা আজ কেবল ঐতিহাসিক নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষরূপে টিকে আছে এবং আধুনিক স্পেনের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে মুসলিম-অমুসলিম অসংখ্য দর্শনার্থীর 'নয়ন' জুড়াচ্ছে।

'ইকাব' রণক্ষেত্রের কথাও জানতে হবে, যেখানে শত্রুবাহিনীর চেয়ে জনবল ও অস্ত্রবলে শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছিল। হুনাইন যুদ্ধের স্মৃতি যেন অতীত ইতিহাসের পাতা থেকে ফিরে এসে 'ইকাব' রণপ্রান্তরে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এ যুদ্ধ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন, 'ইকাব' যুদ্ধের পর আন্দালুসে লড়াই করতে সক্ষম কোন যুবককে আর দেখা যায়নি।

তেমনই আমাদের জানতে হবে কীভাবে আন্দালুসে মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল? এর কারণ ও কার্যকারণ কী ছিল? কেননা, সেসব কারণ ও কার্যকারণের পুনরাবৃত্তি ঘটলে নিশ্চিত করেই আল্লাহ পাকের চিরন্তন সুন্নাত ও নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এবং মুসলিম উম্মাহ আবারও পতনের শিকার হবে।

আমাদের জানতে হবে আন্দালুসের পতনের পর কীভাবে কোথায় নতুন ইসলামী সূর্যের অভ্যুদয় হয়েছিল? যে সময় পূর্ব ইউরোপে কনস্টানটিনোপলে (ইস্তাম্বুলে) ইসলামী সূর্য উদিত হয়েছিল, সেই একই সময়ে কেন ও কীভাবে পশ্চিম ইউরোপের আন্দালুসে ইসলামী সূর্য অস্তমিত হয়েছিল?

তেমনই আমাদের কর্তব্য ভ্যালেন্সিয়া-ট্রাজেডির কথা ভুলে না যাওয়া। জানা দরকার, কীভাবে সেখানে একদিনে সত্তর হাজার মুসলমান লাশে পরিণত

Scanned with CamScanner

হয়েছিল? কিংবা উক্বাযার ট্রাজেডির কথা, যেখানে একদিনে আরও সত্তর হাজার মুসলমান নিহত হয়েছিল?

স্মরণ রাখতে হবে বারবাস্ট্রো (Barbastro) নগরীর ট্রাজেডির কথাও, যেখানে মাত্র একদিনে চল্লিশ হাজার মুসলমান নিহত হয়েছিল, বন্দী হয়েছিল সাত হাজার মুসলিম তরুণী। আমরা তো আজ এসব মর্মান্তিক ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি বসনিয়া-হার্জেগোভিনাসহ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে।

মুসলিম আন্দালুসের ইতিহাসের এসব অধ্যায়ের কথা যখন আমরা জানব এবং জানতে পারব এসব ঘটনায় মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ-সংগ্রামের কথা, জানব কীভাবে তারা এসব ভয়াবহ ট্রাজেডির পরও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন, কেবল তখনই আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব যে, আজকের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে কীভাবে আমরা নতুন করে জাগব এবং উঠে দাঁড়াব।

* * *

আমরা জানি, এ গ্রন্থ পাঠ করার পরও পাঠক-মনে অনেক প্রশ্ন থেকে যাবে, আবার নতুন করে সৃষ্টি হবে হাজারও প্রশ্ন। স্বীকার করতেই হবে, মুসলিম আন্দালুসের আট শতাব্দী-বিস্তৃত ইতিহাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে গ্রন্থবদ্ধ করা অসম্ভব না হলেও সুকঠিন তো অবশ্যই। আর তাই আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এই মহা মূল্যবান ঐতিহাসিক সময়কালের একটি সাধারণ চিত্ররূপে 'আন্দালুসের ইতিহাস' গ্রন্থটিকে উপস্থাপন করতে, যেন সংক্ষিপ্ত কলেবরের এ গ্রন্থটি পাঠকসমাজের একটি বড় অংশের কাছে; বিশেষত বর্তমানের সম্ভাবনা এবং আগামীর শুভ বার্তাবাহী তরুণপ্রজন্মের কাছে সহজে ও সুলভে পৌঁছতে পারে এবং তাদের চিন্তা ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

কিছু প্রশ্ন অবশ্য উত্তরহীনই থেকে যাবে। কেননা, আন্দালুসের ইতিহাসে এমন কিছু ধূসর অধ্যায়ও আছে, যার বিবরণ উৎসগ্রন্থগুলোতে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগেও এখনও পর্যন্ত তৎকালীন আন্দালুস ও মাগরেবের[৫] ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের মহা মূল্যবান

[৫] বর্তমানে আফ্রিকান রাষ্ট্র মরক্কোকে আরবীতে 'মাগরেব' বলা হলেও অতীতে মাগরেব বলে উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত একটি অঞ্চলকে বোঝানো হত। বর্তমান মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার যেসব অংশে সুউচ্চ অ্যাটলাস পর্বতমালার উত্তরে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল, সেগুলোকে বলা হত 'মাগরেব'। ব্যাপকতর অর্থে কেউ কেউ লিবিয়া ও মৌরিতানিয়াকেও এর অন্তর্ভুক্ত ধরতেন। অ্যাটলাস

Scanned with CamScanner

অনেক পাণ্ডুলিপিই অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। কিছু কিছু প্রামাণ্যগ্রন্থ তো একেবারেই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে আর অতি মূল্যবান কিছু প্রামাণ্যগ্রন্থ এখনও অমুদ্রিত (হস্তলিখিত) পাণ্ডুলিপিরূপে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। প্রাজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ আলিম-গবেষকগণের কর্তব্য, এসব পাণ্ডুলিপির তাহকীক-গবেষণা-সম্পাদনা করা এবং যথার্থ যত্নে প্রকাশের ব্যবস্থা করে অধ্যয়ন ও তথ্যগ্রহণের পথ উন্মুক্ত করা।

এ তো গেল প্রশ্নগুলোর উত্তর না পাওয়ার একটি কারণ। আরেকটি কারণ হচ্ছে, ঐতিহাসিকগণের স্বভাব-রীতি হল তারা যখন ইতিহাসের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করেন, তখন ঘটনার ধারাবর্ণনার সঙ্গে নিজেদের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাও জুড়ে দেন। আর এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, একজন ইতিহাস-সংকলক মানবিক সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নন। তার চিন্তা ও চেতনা, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিও ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে। যদিও আমাদের ইসলামী ইতিহাস এমন অনেক ঐতিহাসিকের কলম-সেবায় ধন্য ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যারা একদিকে যেমন কোন মহান ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরতে কুণ্ঠাবোধ করেননি, অপরদিকে ইতিহাসের মানদণ্ডে ঘৃণিত কোন চরিত্রের সদ্‌গুণের কথা উল্লেখ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি; কিন্তু বাস্তবতা হল, তারাও মানুষ; তাদের চিন্তা ও অবস্থানও ঐতিহাসিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রভাবিত হওয়াই স্বাভাবিক।

অবশ্য আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি, ঐতিহাসিক যেসব বিবরণের ক্ষেত্রে বর্ণনা-বিরোধ রয়েছে, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলোকে বিরোধমুক্ত করতে এবং আমাদের গবেষণায় যা সত্য, তা প্রমাণ করতে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের যাবতীয় বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেন এবং আমাদের প্রতিটি কাজকে উত্তমরূপে কবুল করে নেন।

* * *

পর্বতমালা ও সাহারা মরুভূমির কারণে মাগরেব অঞ্চলটি ছিল আফ্রিকার বাকি অংশ থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন। অদ্রূপ বর্তমানে আরবীতে 'শাম' বলে সিরিয়াকে বোঝানো হলেও অতীতের শাম ছিল আরও বিস্তৃত একটি অঞ্চল। সুতরাং অতীত ইতিহাসের মাগরেবকে যেমন মরক্কোর পরিসরে সীমাবদ্ধ মনে করা ঠিক হবে না, তেমনই ঠিক হবে না অতীতের শামকে বর্তমান সিরিয়ার পরিসরে সীমাবদ্ধ মনে করা।

বস্তুত উদ্দেশ্যগত এই পার্থক্যের কারণেই আমরা অনুবাদে বিভিন্ন স্থানে মরক্কোর পরিবর্তে মাগরেব শব্দ ব্যবহার করেছি এবং অতীতের সেই বিস্তৃত অঞ্চলকে বুঝিয়েছি। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

আন্দালুসের ইতিহাস বড় বেদনাদায়ক এক ইতিহাস। কেননা, সামনে আমরা যদিও উজ্জ্বল ও গৌরবময় এক ইতিহাস উপস্থাপন করব; কিন্তু আমরা জানি, আমাদের সে গৌরব ইতোমধ্যে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আন্দালুস আজ এক হৃত উদ্যানের নাম। কিন্তু তারপরও আমাদের এই লুণ্ঠিত গৌরব এবং এই সমৃদ্ধ ইতিহাসের পাতা ওল্টাতেই হবে। আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে– মর্যাদা ও গৌরব কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কীভাবে লুণ্ঠিত হয়? আমরা যদি আমাদের জাতিকে নতুন করে জাগাতে-ই চাই, তাহলে সে চেষ্টা কি এমন অবস্থায় করা শ্রেয় যে, আমাদের থাকবে না কোন অতীত-জ্ঞান, থাকবে না অতীত-অভিজ্ঞতা; না অতীতের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হবে সে চেষ্টা করা শ্রেয়তর?

* * *

আট শ' বছর সময়কাল-ব্যাপ্ত আন্দালুসের সুদীর্ঘ ইতিহাসকে একটি অনন্য ঐতিহাসিক সম্পদরূপে গণ্য করা হয়। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও অর্জনের সমৃদ্ধ জ্ঞান-সম্পদ এই ইতিহাস। স্বাভাবিকভাবেই এ গ্রন্থ হতে আন্দালুসের ইতিহাসের সকল ঘটনা ও সব বিবরণ জানা সম্ভব নয়; বরং বাধ্য হয়েই আমরা অনেক বিষয় এড়িয়ে গেছি। এর কারণ এই নয় যে, গুরুত্বের বিচারে সেসব ঘটনা উল্লেখের দাবিদার নয়; গ্রন্থের কলেবর সীমিত রাখতেই আমাদের এ কাজটি করতে হয়েছে।

আমাদের সকলের কর্তব্য মুসলিম আন্দালুসের আট শ' বছরের বিস্তৃত ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করা। মহা মূল্যবান এ ইতিহাসের দাবি দু'-একজনের কলম ধরা নয়; বরং আরও অনেক অনেক বেশি।

* * *

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রথম অধ্যায়
আন্দালুসের পথে

প্রথম পরিচ্ছেদ
আন্দালুসের পরিচিতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামপূর্ব আন্দালুস

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রথম পরিচ্ছেদ
আন্দালুসের পরিচিতি

বর্তমান বিশ্বমানচিত্রের স্পেন ও পর্তুগাল– এই দু'টি দেশ জুড়ে ছিল তৎকালীন আন্দালুস। এ ভূখণ্ডকে আইবেরিয়ান উপদ্বীপও (Iberian Peninsula)[৬] বলা হয়। উভয় দেশের সম্মিলিত আয়তন প্রায় ছয় লক্ষ বর্গকিলোমিটার। অর্থাৎ তৎকালীন আন্দালুস ছিল বর্তমান মিশরের দুই-তৃতীয়াংশের চেয়ে কিছুটা ছোট।[৭]

আন্দালুস উপদ্বীপকে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মরক্কো হতে একটি প্রণালী[৮] বিভক্ত করে রেখেছে, যা মুসলমানদের আন্দালুস বিজয়ের সময় থেকেই জাবালে তারিক প্রণালী[৯] নামে পরিচিত। প্রণালীটির আয়তন প্রস্থে ১২.৮ কিলোমিটার; যার দক্ষিণ প্রান্তে আছে মরক্কোর সিউটা[১০] (Ceuta) নগরী আর উত্তর প্রান্তে আন্দালুসের 'জাবালে তারিক' বা তারিক পর্বত।

---

[৬] বলকান উপদ্বীপের পর ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপদ্বীপ হল আইবেরিয়ান উপদ্বীপ। ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আইবেরিয়ান উপদ্বীপের আয়তন ৫,৮২,০০০ বর্গ কি.মি. (২,২৫,০০০ বর্গমাইল)। পিরেনিজ পর্বতমালা একে অবশিষ্ট ইউরোপ থেকে পৃথক করে রেখেছে। স্পেন, পর্তুগাল ও অ্যান্ডোরা এই তিনটি দেশের পাশাপাশি ফ্রান্সের কিছু অংশ আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। (অনুবাদক)

[৭] মিশরের আয়তন দশ লক্ষ দুই হাজার চার শ' পঞ্চাশ (১০,০২,৪৫০) বর্গ কি.মি.। লেখক মিশরের নাগরিক বিধায় মিশরের সঙ্গে তুলনা করে আন্দালুসের আয়তন পাঠক-কল্পনায় তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। আমাদের বাংলাদেশের মোট আয়তন এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচ শ' সত্তর (১,৪৭,৫৭০) বর্গ কি.মি.। অর্থাৎ তৎকালীন আন্দালুস ছিল আয়তনে বাংলাদেশের প্রায় চারগুণ বড়। (অনুবাদক)

[৮] দু' পাশে বৃহৎ স্থলভূমিবিশিষ্ট সংকীর্ণ যে জলপ্রবাহ দু'টি নদী বা সমুদ্রকে সংযুক্ত করে, তাকে প্রণালী বলা হয়। একটি প্রণালী যেহেতু পৃথক দু'টি জলভূমির সংযোগ ঘটিয়ে যোগাযোগব্যবস্থার দূরত্ব হ্রাসে ব্যাপক ভূমিকা রাখে, তাই সব যুগেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রণালী বিশ্ব-রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে এবং প্রণালী দখল নিয়ে সংঘটিত হয়েছে বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনা। (অনুবাদক)

[৯] উত্তর আফ্রিকা ও আইবেরিয়ান উপদ্বীপের মাঝে অবস্থিত এই প্রণালীটি ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করেছে। আন্দালুস-বিজয়ী মহান বীর তারিক বিন যিয়াদের নামে প্রণালীটির দক্ষিণ তীরে অবস্থিত শৈলাস্তরীপের নাম 'জাবালে তারিক' এবং প্রণালীর নাম 'জাবালে তারিক প্রণালী' রাখা হয়। ইউরোপীয়রা একে 'জিব্রাল্টার প্রণালী' (The Strait of Gibraltar) বলে থাকে। আরব লেখক ও ঐতিহাসিকগণ এই প্রণালীকে 'দারব আল্‌যুকাক' নামেও অভিহিত করে থাকেন। (অনুবাদক)

[১০] 'সিউটা' জিব্রাল্টার প্রণালীর তীরে অবস্থিত মরক্কোর অধিভুক্ত একটি শহর, যা বর্তমানে স্পেন জবরদখল করে রেখেছে। মরক্কোর আরও একটি বন্দর-নগরী 'ম্যালিলা' (Mellila)-ও স্পেনের দখলে রয়েছে। আরবীতে 'সিউটা' নগরীকে 'সাবতাহ' (سبتة) বলা হয়। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

ভৌগোলিক অবস্থান

ত্রিভুজ-সদৃশ আইবেরিয়ান উপদ্বীপ ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত। পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত এ উপদ্বীপটি পূর্ব দিকে ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে গেছে, আর পশ্চিমে যতই অগ্রসর হয়েছে, ততই প্রসারিত হয়েছে। আন্দালুসের উত্তর সীমানা ঘেঁষে প্রাকৃতিক প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিরেনিজ পর্বতমালা (Pyrenees Mountains), যা এ ভূখণ্ডকে ফ্রান্স থেকে পৃথক করেছে। এই একটি দিক বাদে বাকি সব দিক থেকে আইবেরিয়ান উপদ্বীপটি জলভাগ দ্বারা বেষ্টিত। এ কারণেই রূপক অর্থে আরবগণ একে 'আন্দালুস দ্বীপ'[১১] বলে থাকেন। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আইবেরিয়ান উপদ্বীপকে ঘিরে আছে ভূমধ্যসাগর, আর দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে ঘিরে আছে আটলান্টিক মহাসাগর।

সুতরাং পিরেনিজ পর্বতমালাই একমাত্র স্থল প্রাচীর, যা ইউরোপের সঙ্গে উপদ্বীপটিকে সংযুক্ত করেছে। কেননা, উত্তর দিকে এটি আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে আর দক্ষিণ দিকে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত।

অবাক করা বিষয় হল পিরেনিজ পর্বতমালা স্পেন ও ফ্রান্সের মাঝে এমনভাবে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে, মানচিত্রের দিকে তাকালে মনে হয়, স্পেন যেন ইউরোপ থেকে মুখ ফিরিয়ে মরক্কোর দিকে মুখ করে আছে! এ কারণেই মুসলিম ভূগোলবিদগণ সর্বসম্মতভাবে আন্দালুসকে ইউরোপ মহাদেশের ভূখণ্ড গণ্য না করে আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর এ বিষয়টি তো সুবিদিত যে, জীববৈচিত্র্য, উদ্ভিদ-বিন্যাস ও প্রাকৃতিক দিক থেকে মরক্কোর সঙ্গে, বিশেষত সিউটা ও তানজা (Tangier) অঞ্চলের সঙ্গে আন্দালুসের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।[১২]

আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অভ্যন্তরে বিশাল এলাকা জুড়ে আছে সুবিস্তৃত মালভূমি, যা মেসেতা মালভূমি (The Meseta Central Platea) নামে পরিচিত। এই মালভূমি অঞ্চলকে সমান্তরালভাবে ভেদ করে আইবেরিয়ান

---

[১১] চারদিক পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডকে 'দ্বীপ' বলে; আর তিনদিক পানি দ্বারা বেষ্টিত ও একদিক স্থল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলে 'উপদ্বীপ'। আইবেরিয়ান অঞ্চল যেহেতু একদিক থেকে পানিবেষ্টিত নয়, তাই তাকে দ্বীপ না বলে উপদ্বীপ বলাই যুক্তিযুক্ত। এ কারণেই তাকে দ্বীপ বলে অভিহিত করা বাস্তব অর্থে নয়; বরং রূপকার্থে। (অনুবাদক)

[১২] মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ১৬।

Scanned with CamScanner

উপদ্বীপে আছে দীর্ঘ পর্বতসারি। আর পুরো ভূখণ্ডে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদী-নালা; যে কারণে (ওপর থেকে) আইবেরিয়ান উপদ্বীপকে দেখলে মনে হয়, পানির তৈরি জালের ওপর ভেসে থাকা এক খণ্ড মৃত্তিকাভূমি!

'আন্দালুস' নামকরণের কারণ

এ অঞ্চলের নাম আন্দালুস রাখার পেছনে জড়িয়ে আছে এক সুপ্রাচীন ইতিহাস। অতীতকালে অসভ্য কিছু জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়েসহ ইউরোপের উত্তর স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ থেকে এসে আগ্রাসন চালিয়ে আন্দালুস দখল করে নিয়েছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে এ অঞ্চলেই বসবাস করেছিল। অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এসব জনগোষ্ঠী জার্মানি থেকে এসেছিল। এ জনগোষ্ঠীকে ভান্ডাল গোত্র বলা হত আর এর বাসিন্দাদের নামের সঙ্গে মিল রেখে এ ভূখণ্ডকে বলা হত 'ভান্ডালুসিয়া'। 'আন্দালুস' মূলত এই 'ভান্ডালুসিয়া' শব্দেরই অপভ্রংশ। কালের বিবর্তনে 'ভান্ডালুসিয়া' প্রথমে 'আন্দালুসিয়া', এরপর 'আন্দালুস' রূপ ধারণ করে।

প্রাচীন এই জনগোষ্ঠী বর্বরতা ও নৃশংসতার জন্য সুপরিচিত ছিল। এ কারণেই ইংরেজিতে সন্ত্রাস, নৃশংসতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডকে ভান্ডালিজম (Vandalism) বলা হয়। তদ্রূপ বর্বর ও অসভ্য আচরণকেও ভান্ডালিজম বলে। আর ভান্ডাল জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব বিষয় পুরোপুরিই বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী সময়ে এ জনগোষ্ঠী আন্দালুস ছেড়ে চলে যায়। এরপর এক খৃস্টান জনগোষ্ঠী এ অঞ্চল শাসন করতে থাকে। ইতিহাসে এরা গোথ বা পশ্চিমা গোথ (Visigoths) জাতি নামে পরিচিত। মুসলমানদের আন্দালুস বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই গোথ জাতিই আন্দালুস শাসন করেছিল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামপূর্ব আন্দালুস

জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৎকালীন ইউরোপের পশ্চাদ্‌গামিতা

প্রসঙ্গত এ আলোচনাও নিশ্চয়ই যথার্থ হবে যে, ইসলামী বিজয়াভিযানের প্রাক্কালে ইউরোপের বা বিশেষ করে আন্দালুস অঞ্চলের পরিবেশ-পরিস্থিতি কেমন ছিল এবং আন্দালুস অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার পর বিদ্যমান অবস্থা ও পরিস্থিতি কীভাবে বদলে গিয়েছিল?

সে সময় ইউরোপ ছিল মূর্খতা ও পশ্চাদ্‌গামিতার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি অঞ্চল। ইউরোপে তখন একটি আইনই সদা কার্যকর ছিল, আর তা হল 'শোষণ' ও 'অবিচার'। শাসকগোষ্ঠীই ধন-সম্পদসহ দেশের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের মালিক হত আর জনসাধারণ জীবন নির্বাহ করত প্রচণ্ড অভাব ও দারিদ্র্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হবে। শাসকগোষ্ঠী নিজেদের বিলাসী জীবন নিশ্চিতকরণে একের পর এক নির্মাণ করত রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও নিরাপত্তা-প্রাচীর আর সাধারণ জনগোষ্ঠী আশ্রয় ও বসবাসের ন্যূনতম জায়গাটুকুও খুঁজে পেত না। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যই ছিল তাদের নিয়তি। বরং সাধারণ জনগণের অবস্থা এত করুণ ছিল যে, জমি-জমার সঙ্গে তাদেরও কেনা-বেচা হত।

ইউরোপের জাতিবর্গ তখন অবস্থান করছিল নীতি-নৈতিকতার নিম্নতম স্তরে। ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠিত হওয়া ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এমনকি মানবজীবনের অতি স্বাভাবিক ও সাধারণ রীতি-নীতিও তারা হারিয়ে ফেলেছিল। উদাহরণস্বরূপ ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা একটি স্বভাবজাত বিষয়। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা বলে কোন কিছু তাদের মধ্যে ছিল না। দীর্ঘদিনের ময়লা জমে থাকা মাথাভর্তি লম্বা চুল তারা বিক্ষিপ্তভাবে চেহারার ওপর ফেলে রাখত। তৎকালে এ অঞ্চল ভ্রমণকারী মুসলিম পরিব্রাজকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তৎকালীন আন্দালুসের অধিবাসীগণ বছরে এক-দু'বারের বেশি

Scanned with CamScanner

গোসল করত না। বরং তারা মনে করত, শরীরে জমে থাকা ময়লা শারীরিক সুস্থতা এবং কল্যাণ ও বরকতের কারণ।[১৩]

এ অঞ্চলের কিছু অধিবাসী এমন ছিল, যারা ইশারা-ইঙ্গিতে পারস্পরিক ভাব বিনিময় করত। লিখনরীতি দূরে থাক, তাদের কোন বাক-রীতিই ছিল না। তারা হিন্দু ও অগ্নিপূজারীদের বিভিন্ন আকীদা ও বিশ্বাস লালন করত; যেমন, মৃত ব্যক্তির লাশ জ্বালিয়ে দেওয়া, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার স্ত্রী, দাসী বা অন্য কোন আপনজনকে জীবন্ত ভস্ম করা ইত্যাদি। এসব অমানবিক কাজ গোপনে সংঘটিত হত না; বরং সমাজের সকলের জ্ঞাতসারে সকলের চোখের সামনেই ঘটত সবকিছু। এককথায় মুসলমানদের বিজয়াভিযানের পূর্ব পর্যন্ত পুরো ইউরোপ আচ্ছন্ন ছিল পশ্চাদ্‌গামিতা, অন্যায়-অবিচার ও চরম দরিদ্রতায়। তারা অবস্থান করছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলো থেকে শত ক্রোশ দূরে।[১৪]

আশ্চর্যের বিষয় হল, দীর্ঘকাল এই অসভ্যতায় নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও ইউরোপবাসীর মাঝে নিজেদের পশ্চাদ্‌গামিতা নিয়ে কোন মাথা-ব্যথাই ছিল না, ছিল না কোন অনুভূতি ও চিন্তা। বস্তুতঃ খৃস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের পূর্বে আজকের ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি সামান্য অনুরাগও ছিল না।[১৫]

গোথ জাতির আন্দালুস শাসন

খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকে পশ্চিমা গোথ জাতি এলারিক (Alaric)-এর নেতৃত্বে রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের বিভিন্ন নগরীর ওপর কর্তৃত্ব বিস্তারে সক্ষম হয়। এর নেপথ্য কারণ এই ছিল যে, গোথ জাতি রোমান সম্রাট থিয়োডোসিয়াস (Theodosius)-এর সহায়তায় এমন কিছু পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছিল, যা তাদের ক্ষমতা লাভের পথ সুগম করেছিল। ৩৯৫ খৃস্টাব্দে রোমান সম্রাটের মৃত্যু হলে গোথ নেতা এলারিক পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে অন্যতম শক্তিশালী নেতারূপে আবির্ভূত হন। এরপর তিনি রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম নগরীর কর্তৃত্ব অর্জনে তৎপর হন এবং ৪১০

---

[১৩] আবু ওবায়দ আলবাকরী, *কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক* ('জুগরাফিয়াতুল আন্দালুস ওয়া উরুবা' অধ্যায়), পৃ : ৮১।

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ : ১৮৬-১৮৭।

[১৫] গোন্জাত পি বোন, *তারিখ-রাতুল আরব*, পৃ : ৫৬৭।

Scanned with CamScanner

খৃস্টাব্দে এক রক্তক্ষয়ী ঘটনার মাধ্যমে আপন লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হন। বিয়োগান্ত সেই ঘটনাকে ইউরোপের ইতিহাস আজও স্মরণ করে থাকে।

এ সময় রোমান সাম্রাজ্যের নেতৃবৃন্দ আইবেরিয়ান উপদ্বীপে বসবাসরত বর্বর ভান্ডাল জাতিগোষ্ঠীকে এই শর্তে উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম অংশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি প্রদান করে যে, তারা আশেপাশের অন্যান্য অঞ্চলের স্থিতিশীলতার প্রতি কোন ধরনের হুমকি সৃষ্টি করবে না। কিন্তু বাস্তবতা হল, তখন রোমান রাষ্ট্রযন্ত্র ছিল শক্তি-সামর্থ্যে ক্ষয়িষ্ণুপ্রায় আর ভান্ডাল গোষ্ঠী ছিল যেমন সংখ্যায় অধিক, তেমনই অসভ্যতা ও বর্বরতায় পটু। ফলে যা হওয়ার, তা-ই হল। ভান্ডাল গোষ্ঠী পুরো অঞ্চল জুড়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করল এবং পার্শ্ববর্তী গল (Gaule) রাষ্ট্রের (বর্তমান ফ্রান্স) জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াল।

এর কিছুদিন পর এলারিকের মৃত্যুতে রোমে বিরাজমান সংঘাতময় পরিস্থিতির অবসান ঘটে। এরপর গোথ নেতা আটাউফ (Ataulf) তার স্থলাভিষিক্ত হন। পরিস্থিতির উন্নতি হলে তৎকালীন রোম সম্রাট আটাউফকে প্রথমে গল রাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে শাসনের অনুমতি দান করেন এবং পরবর্তী সময়ে তাকে ভান্ডাল গোত্রের ওপরও কর্তৃত্ব প্রদান করেন। এর ফলে শুরু হয় ভান্ডাল জনগোষ্ঠীর ওপর শক্তিশালী গোথ জাতির উপর্যুপরি নিষ্পেষণ ও বলপ্রয়োগ। ফলে ভান্ডাল গোষ্ঠী উপদ্বীপের দক্ষিণ দিকে বিতাড়িত হয়। তবে পিছু হটার সময় প্রতিশোধস্বরূপ তারা দ্বীপে বিদ্যমান রোমান সভ্যতার সকল নিদর্শন ধ্বংস করে ফেলে।

এভাবে ধীরে ধীরে গোথ জাতি এ অঞ্চলে নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তি অর্জন করে। বিশেষ করে তাদের শক্তিশালী নেতা ভ্যালিয়া (Valia)-এর শাসনামলে পুরো উপদ্বীপের ওপর তারা একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

কালের পরিক্রমায় একসময় রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হলে গোথ জাতি রোমান সাম্রাজ্য হতে স্বাধীন হয়ে উপদ্বীপে নিজেদের স্বতন্ত্র শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে এবং গোথ নেতা ইউরিক (Euric) ৪৬৭ খৃস্টাব্দে 'সম্রাট' উপাধি ধারণ করেন। ইতিহাসের পরবর্তী প্রতিটি ধাপে গোথ নামে সুপরিচিত পশ্চিমা গোথ জাতির স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতারূপে এই ইউরিককেই গণ্য করা হয়।[১৬]

---

[১৬] বিস্তারিত জানতে : হুসাইন মু'নিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ১৫।

Scanned with CamScanner

মুসলিম বাহিনীর আন্দালুস বিজয়ের বছরখানেক বা তার কিছু পূর্বে রডারিক (Roderic) নামক জনৈক সেনাপতি তৎকালীন গোথ-নৃপতি গিত্শাকে (Wittiza) পরাভূত করে আন্দালুসের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করেন। এই রডারিকের শাসনামলেই রচিত হয় মুসলমানদের আন্দালুস বিজয়গাথা।[১৭]

ইসলামের বিজয়ের পূর্বে অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ, জরাগ্রস্ত সমাজব্যবস্থা ও ভ্রষ্ট শাসনব্যবস্থার কারণে তৎকালীন আন্দালুসবাসী গোষ্ঠীগত হানাহানি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার শিকার ছিল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সমকালীন আন্দালুসের শাসকগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা দুর্বল ছিল কিংবা তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি বলতে কিছুই ছিল না। বরং যে কোন শত্রু বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা, অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করা এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো সামরিক শক্তি তাদের পুরোপুরি ছিল। রণশক্তির বিচারে আন্দালুসে প্রতিষ্ঠিত গোথ রাষ্ট্রকে ষষ্ঠ শতকের প্রথম সময়কাল পর্যন্ত জার্মান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সবচে' শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গণ্য করা হত। তারা সবসময় এমন একটি শক্তিশালী ও প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী লালন করত, যারা সবধরনের পরিস্থিতি ও আক্রমণের মোকাবেলা করতে সক্ষম ছিল।[১৮]

---

[১৭] আবদুর রহমান আলহাজ্জী, *আততারীখুল আন্দালুসী*, পৃ : ৩০।

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ : ৩০-৩১।

Scanned with CamScanner

❁

দ্বিতীয় অধ্যায়
আন্দালুস বিজয়ের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ
আন্দালুস বিজয়
উমাইয়া সালতানাতের এক গৌরবময় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মুসা বিন নুসাইর ও আন্দালুস অভিযানের সিদ্ধান্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
তারিক বিন যিয়াদের আন্দালুস বিজয়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ইসলামী বিজয়াভিযানে
প্লাবিত আন্দালুস উপদ্বীপ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
খলীফা কর্তৃক বিজয়াভিযান মুলতবীর সিদ্ধান্ত
সেনাপতিদ্বয়কে দামেশকে তলব

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আন্দালুস অভিযানের কার্যকারণ

মুসলিম অভিযাত্রীগণ কেন তাদের চলমান বিজয়াভিযানের গতিপথ পরিবর্তন করলেন? কেন তারা নিজেদের অভিযাত্রা দক্ষিণে অব্যাহত রেখে আফ্রিকা মহাদেশের আরও গভীরে প্রবেশ করলেন না? এর পরিবর্তে কেন তারা দিক পরিবর্তন করে উত্তরে অগ্রসর হলেন এবং আন্দালুস অভিমুখী হলেন? আর আন্দালুস অভিযানের জন্য মুসলিম অভিযাত্রীগণ কেন এ সময়কালকেই (৯২ হিজরী/৭১১ খৃস্টাব্দ) বেছে নিলেন? পাঠক-মনে এ ধরনের নানা প্রশ্ন উদিত হওয়া অতি স্বাভাবিক বিষয়।

এসব প্রশ্নের উত্তর এই যে, এ সময়ের মধ্যে মুসলমানগণ উত্তর আফ্রিকার সকল দেশ বিজয় সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। মিশর, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো প্রভৃতি দেশের বিজয়াভিযান ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল। মুসলিম বাহিনী পৌঁছে গিয়েছিল মরক্কোর প্রান্তসীমায় এবং আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে। কাজেই চলমান বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখতে মুসলিম বাহিনীর সামনে তখন মাত্র দু'টি পথ খোলা ছিল: দিক পরিবর্তন করে উত্তর অভিমুখী হওয়া এবং জাবালে তারিক প্রণালী পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে (বর্তমান স্পেন ও পর্তুগালে) প্রবেশ করা, কিংবা উত্তরেই অভিযান অব্যাহত রেখে আফ্রিকার সুবিশাল সাহারা মরুভূমির[১*] দিকে অগ্রসর হওয়া; যে অঞ্চল আয়তনে বিশাল হলেও অধিবাসীর সংখ্যা খুবই কম।

মুসলমানগণ কখনোই সুবিশাল ভূখণ্ড অনুসন্ধান কিংবা সম্পদ অন্বেষণের উদ্দেশ্যে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেননি। সকল মানুষকে এক আল্লাহর বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান করা এবং তাদের দ্বীন শিক্ষা দেওয়াই ছিল ইসলামী অভিযানসমূহের মৌলিক উদ্দেশ্য। হিজরী আশির দশকের শেষ দিকে যেহেতু উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে দ্বীনের দাওয়াত ও শিক্ষার কাজ একটি

[১*] সাহারা মরুভূমি বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি। আফ্রিকায় অবস্থিত এ মরুভূমির আয়তন প্রায় ৯২,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। পাহাড়, মালভূমি, বালুকাভূমি ও অনুর্বর ভূমি দ্বারা গঠিত সাহারা মরুভূমির মোট জনসংখ্যা ২০ লক্ষের উর্ধ্বে নয়। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

সুদৃঢ় অবস্থানে পৌঁছেছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের সার্বজনীন দাওয়াত-নীতির দাবি ছিল বিজয় অগ্রযাত্রার দিক পরিবর্তন করে আন্দালুস ভূমির দিকে পরিচালিত করা।

মুসলমানগণ তাদের সকল অভিযানের ক্ষেত্রে এ নীতি ও পন্থাই অবলম্বন করেছেন। ঐতিহাসিক কাদিসিয়ার যুদ্ধের পূর্বে মহান সাহাবী রিবয়ী বিন আমির রাযি. ও বিখ্যাত পারসিক যোদ্ধা রুস্তমের মাঝে যে কথোপকথন হয়েছিল, তাতেও ইসলামী দাওয়াতের এই নীতিটি মূর্ত হয়ে ওঠে। সাহাবী রিবয়ী যখন রুস্তমকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করলেন, তখন সে জিজ্ঞেস করল, কিসের আকর্ষণে আপনারা আমাদের দেশে এসেছেন? উত্তরে এই মহান সাহাবী দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, আমরা যেন আল্লাহ যাদের তাকদীরে মঞ্জুর করেন, তাদেরকে সৃষ্টির দাসত্ব-লাঞ্ছনা হতে উদ্ধার করে স্রষ্টার দাসত্ব-গৌরবের পথে নিয়ে আসি; পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে এবং ভ্রষ্ট ধর্মসমূহের অবিচার হতে ইসলামের ন্যায়-ইনসাফ নীতির দিকে নিয়ে আসি। আল্লাহ আমাদেরকে তার দ্বীন দিয়ে এ দ্বীনের পথে আহ্বান করার জন্য মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। যারা এ দ্বীন গ্রহণ করবে, আমরা তাদেরকে আপন করে নেব এবং অভিযান প্রত্যাহার করে ফিরে যাব; আর যারা এ দ্বীনের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের সঙ্গে আমরা লড়াই করে যাব; যতক্ষণ না আল্লাহর নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি লাভ করি। রুস্তম জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি কী? উত্তরে রিবয়ী বিন আমির রাযি. বললেন, অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি জান্নাত আর জীবিত থাকলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি 'বিজয়-সুবাস'।[২০]

[২০] তাবারী, *আরীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, ২/৪০১ ও ইবনুল আছীর, *আলকামিল ফিততারীখ*, ২/৩১১।

Scanned with CamScanner

প্রথম পরিচ্ছেদ
আন্দালুস বিজয়
উমাইয়া সালতানাতের এক গৌরবময় অধ্যায়

আন্দালুস বিজিত হয়েছিল হিজরী ৯২ সনে উমাইয়া শাসনামলে, নির্দিষ্ট করে বললে উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক রহ.-এর শাসনকালে; যিনি ৮৬ হিজরী থেকে ৯৬ হিজরী (৭০৫-৭১৫ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের খলীফা ছিলেন। অর্থাৎ খলীফা ওয়ালিদের শাসনকালের মধ্য সময়ে এই মহান বিজয় অর্জিত হয়েছিল।

এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, ইসলামী ইতিহাসে উমাইয়া সালতানাত অত্যন্ত কঠিন ও ব্যাপক তথ্য-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অপপ্রচারের মাধ্যমে উমাইয়া শাসনব্যবস্থাকে বিকৃতরূপে তুলে ধরতে অপবাদ, মিথ্যা ও জাল ঘটনা তৈরি করে শাসকদের চরিত্র কলুষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ উমাইয়া শাসনামল হল নবীযুগ ও খেলাফতে রাশেদার যুগের পর ইসলামী ইতিহাসের সমৃদ্ধতর ও উজ্জ্বলতম যুগ; যে যুগের ইতিহাস রচিত হয়েছে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের মহান জামাতের যুগপৎ কর্মধারায়। উল্লিখিত ঐতিহাসিক তথ্যবিকৃতির অবশ্যম্ভাবী ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, একশ্রেণির লোক বিশেষত ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তিরা মনে করে যে, ইসলামী ইতিহাস তো কেবল আবু বকর রাযি. ও ওমর রাযি. এই দুই খলীফার শাসনামলের ইতিহাস। বরং কেউ কেউ তো নিজেদের অভিযোগের তীর থেকে এই মহান সাহাবীদ্বয়কেও রেহাই দেয় না; অথচ তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুবিদিত ও সর্বজনস্বীকৃত।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এসব অপপ্রচার ও অপবাদ রটানোর পেছনে বিরুদ্ধবাদীদের মূল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের মন-মস্তিষ্কে এ ভ্রান্ত বিশ্বাস বদ্ধমূল করে তোলা যে, নতুন করে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিনির্মাণ কিছুতেই সম্ভব নয়। তারা যেন প্রকারান্তরে এ কথাই বলতে চায় যে, দেখ, আবু বকর ও ওমরের খেলাফতকাল তো নবীযুগের অতি নিকটবর্তী আর উমাইয়া ও আব্বাসী শাসনামলও নবীযুগের সন্নিকটেই। তারাই যখন (বিরুদ্ধবাদীদের ধারণামতে) প্রকৃত ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে

Scanned with CamScanner

পারেননি, তাহলে শেষ যুগের মুসলমানদের অবস্থা আর কী হবে?! এই মিথ্যা বার্তা তারা প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দিতে চায়। এর পেছনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল কোরআনের ভাষায়,

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

তারা আল্লাহর নূরকে তাদের মুখের (ফুঁ) দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তার নূরের পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া আর কিছুতেই সম্মত নন, তাতে কাফিরগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক। [সূরা তাওবা : ৩২]

বনু উমাইয়ার শাসনামল ... একটি নির্মোহ পর্যালোচনা

অন্যান্য ইসলামী সালতানাতের ন্যায় উমাইয়া সালতানাতেরও (৪০-১৩২ হিজরী/৬৬০-৭৫০ খৃস্টাব্দ) পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডের মুসলমান জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভূত অনুগ্রহ ও বিরাট অবদান রয়েছে। আমরা যদি উমাইয়া শাসনামলে যে পরিমাণ মানুষ ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছে কেবল তাদের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, শুধু এতটুকুই বনু উমাইয়ার প্রতি আরোপিত মিথ্যা অপবাদ ও অভিযোগ খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। বনু উমাইয়ার শাসনামলেই লিবিয়া থেকে শুরু করে মরক্কো পর্যন্ত পুরো উত্তর আফ্রিকা ইসলামের ছায়াতলে শামিল হয়েছিল। যদিও এসব অঞ্চলে ইসলামী বিজয়াভিযান তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান বিন আফফান রাযি.-এর যুগেই সূচিত হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তী সময়ে এখানকার অধিবাসীরা ধর্মত্যাগ করেছিল। এরপর উমাইয়া শাসনামলে নতুন করে এসব অঞ্চল বিজিত হয়।

উমাইয়া শাসকবৃন্দ একই সঙ্গে আরবের চতুর্দিকে ইসলামের বিজয়াভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন। পশ্চিমে তাদের অভিযান আন্দালুস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। পূর্বে মুহাম্মদ বিন কাসিম আসসাকাফীর হাতে বিজিত হয়েছিল সিন্ধু অঞ্চল, কুতায়বা বিন মুসলিম আলবাহিলীর হাতে বিজিত হয়েছিল ট্রান্স অক্সিয়ানা (মধ্য এশিয়া) অঞ্চল; তার বিজয়াভিযান বিস্তৃত হয়েছিল সুদূর চীন পর্যন্ত, আর মাসলামা বিন আবদুল মালিক আলমারওয়ানীর হাতে বিজিত হয়েছিল উত্তরের বিস্তীর্ণ ককেশীয় অঞ্চল।

Scanned with CamScanner

মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেছিল। পৃথিবীর সেসব ভূখণ্ডে ইসলামের সূর্য উদ্ভাসিত হয়েছিল, যেখানের অধিবাসীগণ হাতে গড়া নিষ্প্রাণ মূর্তি-প্রতিমা, আগুন ও রাজন্যবর্গের পূজা করত। ইসলামের আগমনে এসব ভূখণ্ড থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল অসংখ্য ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার। আল্লাহর অনুগ্রহে বনু উমাইয়ার মাধ্যমে মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল আল্লাহ তাআ'লার সুস্পষ্ট অনুগ্রহ-কিরণ। এ কারণেই তারা দলে দলে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের প্রতি অগ্রসর হয়েছিল। অব্যবহিত পরে তারাই শামিল হয়েছিল ইসলামের সাহসী সৈনিক, বিদগ্ধ আলিম ও দূরদর্শী নেতাদের দলে; অনন্যসাধারণ অবদান রেখেছিল ইসলামের খেদমতের বিস্তৃত অঙ্গনে। বনু উমাইয়া যে চারা রোপণ করেছিল, মুসলিম উম্মাহ তার সুদীর্ঘ ইতিহাস জুড়ে তারই যত্ন ও ফসল সংগ্রহ করে ধন্য হয়েছে। ফিকহ ও তাফসীর, সাহিত্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভূগোল ও প্রকৌশলবিদ্যা, রসায়ন ও দর্শনশাস্ত্র– মোটকথা, জ্ঞানচর্চার বিস্তৃত সব অঙ্গনে যুগে যুগে যারা ছিলেন নেতৃত্বের আসনে, তারা প্রায় সবাই উমাইয়া শাসনামলে বিজিত অঞ্চলসমূহের আলো-বাতাসেই বড় হয়েছেন, বিদ্যা ও জ্ঞানে পরিশীলিত হয়েছেন। হাদীসশাস্ত্রের মহান সেবক বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী; ইতিহাস ও রিজাল-শাস্ত্রের পথিকৃৎ তাবারী, ইবনে খালদূন, যাহাবী; কিংবা চিকিৎসাশাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ইবনে সীনা, ফারাবী, আলকিন্দী ও আলবেরুনী; এ এক দীর্ঘ তালিকা, যা গুনে শেষ করা যাবে না!

ইসলামী বিজয়াভিযানে প্রথমে তাদের দেশ বিজিত হয়েছে, এরপর বিজিত হয়েছে তাদের অন্তঃদেশ। এভাবে একের পর এক অঞ্চলের আবাসভূমি ও হৃদয়ভূমি বিজিত হয়েছে উমাইয়া শাসনামলে আর সূচিত হয়েছে কালান্তরব্যাপী বিস্তৃত সেবার এক অনন্য ধারা।

উমাইয়া আমলে বিজয়াভিযান ও আল্লাহর পথে লড়াই ছিল মুসলমানদের সহজাত আকর্ষণের বিষয়। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলে দলে রণ-কাফেলায় শরীক হত আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যাশায় এবং 'রাব্বুল আলামীনের' দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে। অধিকন্তু উমাইয়া শাসনামলেই ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস সুন্নাতে নববী সংকলিত হয় এবং উমাইয়া শাসনভুক্ত অঞ্চলে ইসলামী আইনব্যবস্থা কার্যকর করা হয়।

সুবিখ্যাত আলিম ইমাম ইবনে হাযম রহ. উমাইয়া শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট সত্য উচ্চারণ করেছেন। বনু উমাইয়ার শাসনব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে

Scanned with CamScanner

তিনি বলেছেন,

> উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল একটি নির্ভেজাল আরব রাষ্ট্র। উমাইয়া শাসকবৃন্দ নিজেদের জন্য কোন রাজকীয় নগরীর পত্তন করতেন না, বিলাসী জীবনযাপনের জন্য রাজপ্রাসাদ নির্মাণ বা সম্পদ কুক্ষিগতকরণে ঝাঁপিয়ে পড়তেন না। খেলাফতলাভের পূর্বে তারা যে বাড়িতে বাস করতেন, পরবর্তী সময়েও তারা সেখানেই বসবাস করতেন। আপন প্রজাদেরকে তারা 'হে আমার মাওলা', 'হে সায়্যিদ' ইত্যাদি সম্বোধন ব্যবহার করতে দিতেন না। তারা অধীনস্থদের তুচ্ছতাপ্রকাশক শব্দে আহ্বান করতেন না। তাদের বার্তার সূচনা এভাবে হত না– 'বাদশাহর পক্ষ হতে দাসের প্রতি'। সম্মানপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হস্তদ্বয়ে, পদযুগলে বা সম্মুখভূমিতে চুম্বনের কোন রীতি তাদের দরবারে প্রচলিত ছিল না।[১] শাসনভূমির বিভিন্ন অংশে আমীর-প্রশাসক নিয়োগ-বরখাস্তের পেছনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকত সঠিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত থাকা। এ কারণেই তারা আন্দালুস, সিন্ধু, খোরাসান, আর্মেনিয়া, ইয়ামেনসহ বিভিন্ন অঞ্চলে কখনো কখনো এক প্রশাসককে বরখাস্ত করে অন্য একজনকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন, প্রয়োজনে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন এবং তাদের দৃষ্টিতে উপযুক্ত ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তৎকালে পৃথিবীর যে বিস্তৃত অঞ্চল তারা শাসন করেছেন, অন্য কোন শাসকগোষ্ঠী তা পারেনি। একপর্যায়ে কালের পরিক্রমায় আব্বাসীরা মুসলিম প্রাচ্যে তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা বনু উমাইয়ার হস্তচ্যুত হয়। তখন বনু উমাইয়ার (যুবরাজ) আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া আন্দালুসে চলে আসেন এবং তিনি ও তার পুত্র এ অঞ্চল শাসন করেন। পরবর্তী প্রায় তিন শ' বছর আন্দালুসে বনু উমাইয়ার শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তৎকালে আন্দালুস ছিল একদিকে পুরো ইসলামী বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, আভিজাত্য-মর্যাদায়

---

[১] বনু উমাইয়া-পরবর্তী বিভিন্ন মুসলিম শাসকের দরবারের রীতি ছিল জনসাধারণ খলীফার হাতে চুম্বন করত; আবার কোন কোন শাসক-দরবারের রীতি ছিল জনগণ খলীফার সম্মুখভূমিতে চুম্বন করত। একে শাহী আদব বলে গণ্য করা হত, যাকে বর্তমানের পরিভাষায় 'রাজকীয় প্রটোকল' হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

Scanned with CamScanner

এবং সম্পদ-প্রাচুর্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র; অপরদিকে তৎকালীন বিশ্বের তাবৎ পৌত্তলিক শক্তির জন্য সবচে' আসের কারণ।[২২]

এতৎসত্ত্বেও আমরা এ দাবি করছি না যে, উমাইয়া শাসকগণ যাবতীয় ভুল-ত্রুটি মুক্ত ছিলেন। ভুল-ত্রুটি ও অপূর্ণতা তো মানবিক বৈশিষ্ট্যেরই অংশ। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, বনু উমাইয়ার শাসন-ইতিহাসে অনেক ভুল-ত্রুটি রয়েছে; তদ্রূপ এ কথাও সত্য যে, মুসলিম উম্মাহর প্রতি উমাইয়া সালতানাতের যে অনুগ্রহ-অবদান, তা বিবেচনা করলে সেসব ভুল-ত্রুটিকে উপেক্ষা করা যায়; বরং তা ধুয়ে মুছে যায়। বনু উমাইয়ার শাসনামল ৪০ হিজরী থেকে ১৩২ হিজরী (৬৬০-৭৫০ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত ৯২ বছর স্থায়ী ছিল। উমাইয়া সালতানাতের প্রথম খলীফা ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাযি.। মুয়াবিয়া রাযি. সেই সুমহান সাহাবী, যিনি অনেক সমালোচকের বচন-আঘাত ও কলম-আঁচড় থেকে নিষ্কৃতি পাননি। তারা তার জীবনেতিহাস ও খেলাফত নিয়ে মিথ্যাচার করেছে, আরোপ করেছে নানা অপবাদ। হায়! ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এ মহান সাহাবী যে অনন্যসাধারণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তার প্রতি অপবাদ আরোপের পূর্বে আমরা যদি তার এক-দশমাংশও আঞ্জাম দিতে পারতাম!

যদিও আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় বনু উমাইয়ার শাসনামলের ভালো-মন্দ বিশ্লেষণ করা নয়; কিন্তু এই সামান্য আলোচনাও আল্লাহ চাহে তো আন্দালুসের আলোচনার জন্য সহায়ক হবে। হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর পর একের পর এক অন্যান্য উমাইয়া শাসকগণ রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধতম ছিলেন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান রহ. এবং তার পরবর্তী বংশধরগণ; যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ওয়ালিদ, সুলাইমান, ইয়াযিদ ও হিশাম। এদের মাঝেই অতিক্রান্ত হয়েছেন খলীফায়ে রাশেদ ওমর বিন আবদুল আযীয রহ.। তিনিও সেই বনু উমাইয়ারই সন্তান, একশ্রেণির সমালোচক যাদের সমালোচনায় সদা মুখর। তিনিই সেই মহান খলীফা, যার শাসনামলে পৃথিবী লাভ করেছিল ন্যায় ও দয়া, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির দিশা। তাই তো ঐতিহাসিকগণ তাকে খোলাফায়ে রাশেদীনের 'পঞ্চম সদস্য' বলে গণ্য করেছেন।

উমাইয়া সালতানাতের ইতিহাসে মন্দ যা কিছু, তা মূলত ছড়িয়ে আছে

---

[২২] ইবনে হাযম, *রাসাইলু ইবনি হাযম*, ২/১৪৬।

Scanned with CamScanner

তাদের শেষ সাত বছরের ইতিহাসে। এ সাত বছরের ইতিহাস বিভিন্ন ট্রাজেডি এবং ইসলামী মানহাজ হতে বিচ্যুতির নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় ভরপুর। কুদরতের নিয়ম মেনেই তখন 'সুন্নাতুল্লাহ' কার্যকর হয়, উমাইয়া সালতানাতের পতন ঘটে আর বনু আব্বাসের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আন্দালুস ও তার বিজয়াভিযানের ইতিহাস উমাইয়া সালতানাতের অনন্য কীর্তি হিসেবেই ইতিহাসের পাতায় চিরদিন সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

আন্দালুস বিজয়ের পূর্বে উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের অবস্থা

আন্দালুস বিজয়ের সত্তর বছর পূর্বেই (২২ হিজরী/৬৪৪ খৃস্টাব্দ) আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়েছিল। আফ্রিকার এ অঞ্চলে আমাজিগ (Amazighs) গোত্র (বা বার্বার[২৩] গোত্র) নামে বিখ্যাত একটি গোত্র বসবাস করত। বার্বাররা ছিল অত্যন্ত একরোখা, যুদ্ধবাজ ও সাহসী জাতি। তারা একাধিক বার ইসলাম গ্রহণ করার পরও ধর্মত্যাগ করেছিল। ফলে বেশ কয়েকবার তাদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে মুসা বিন নুসাইর রহ.-এর হাতে ৮৫ হিজরীর শেষদিকে বা ৮৬ হিজরীতে (৭০৪ বা ৭০৫ খৃস্টাব্দে) এ অঞ্চলে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং যুদ্ধাবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে।

মুসা বিন নুসাইর ... একজন জাত সেনাপতি

মুসা বিন নুসাইর ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি, আল্লাহভীরু ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চলে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি একজন তাবেয়ী ছিলেন। বিখ্যাত

---

[২৩] 'বার্বার' শব্দটি চারটি ভিন্ন যুগে ভিন্ন চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হোমারের যুগে (খৃস্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে) 'বার্বার' বলে পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের সেসব জাতি-গোষ্ঠীকে বোঝানো হত, যাদের ভাষা ও ধ্বনি ছিল দুর্বোধ্য। এরপর হেরোডোটাস-এর যুগে (খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে) শব্দটি ব্যবহৃত হত সেসব জাতি-গোষ্ঠীর জন্য, যারা গ্রিক ভাষা ও সভ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। ফালভোসের আমলে রোমা নগরীর অধিবাসীগণ ব্যতীত রোমান সাম্রাজ্যের অন্যান্য অধিবাসীদের বলা হত 'বার্বার'। আর আরবগণ তাদের সময়ে আফ্রিকান উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জাতিসমূহকে 'বার্বার' বলত। কেননা, তারা যে ভাষায় কথা বলত, আরবদের কাছে তা ছিল দুর্বোধ্য। আরবগণ অবোধগম্য ধ্বনির ক্ষেত্রে 'বার্বার' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। দেখুন : তাহির আহমাদ যাবী, *জামীউল কাওয়াইদ আরাবী ফী লীবিয়া*, পৃ : ২০।

Scanned with CamScanner

সাহাবী তামীম দারী রাযি.-সহ বিভিন্ন সাহাবী থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ ধী-শক্তিসম্পন্ন, উদার, সাহসী, খোদাভীরু ও আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিত্ব। তার নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়নি।[২৪]

তার পিতা নুসাইর বিন আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ একজন বীর সৈনিক ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত মুয়াবিয়া রাযি. তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। হযরত ওমর রাযি. ও উসমান রাযি.-এর খেলাফতকালে হযরত মুয়াবিয়া রাযি. যখন শামের গভর্নর ছিলেন, তখন নুসাইর রহ. ছিলেন শামের পুলিশবাহিনীর প্রধান।[২৫] অবশ্য কোন কোন বর্ণনামতে তিনি স্বয়ং মুয়াবিয়া রাযি.-এর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা-বাহিনীর প্রধান ছিলেন।[২৬]

মুয়াবিয়া রাযি. যখন সিফ্ফীন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন নুসাইর রহ. তার সঙ্গী হননি। পরবর্তী সময়ে মুয়াবিয়া রাযি. তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ ও স্নেহশীল আচরণ সত্ত্বেও তুমি কেন (সিফ্ফীন যুদ্ধে) আমার সঙ্গী হলে না? উত্তরে নুসাইর বললেন, যিনি আপনার তুলনায় আমার শোকর ও কৃতজ্ঞতার বেশি হকদার, তার প্রতি অকৃতজ্ঞ আচরণ করে আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। মুয়াবিয়া রাযি. প্রশ্ন করলেন, তিনি কে? নুসাইর উত্তর দিলেন, আল্লাহ তাআ'লা। নুসাইরের উত্তর শুনে মুয়াবিয়া রাযি. একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কাছে ইসতেগ্ফার করছি। এরপর মুয়াবিয়া রাযি. তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।[২৭]

ইতিহাসের পাতায় মুসা বিন নুসাইর-এর মহীয়সী মাতার অসীম সাহসিকতার একটি ঘটনাও সংরক্ষিত আছে। তিনি তার স্বামী ও পিতার সঙ্গে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের ঘোরতর এক মুহূর্তে

---

[২৪] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৫/৩১৮।

[২৫] ইবনে হাজার, *আলইসাবা ফী তামযীযিস সাহাবা*, ৫/১১০, ৬/৪৯৬।

[২৬] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৫/৩১৯।

[২৭] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৫/৩১৯ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব মিন গুহনিল আন্দালুসির রাত্বীব*, ১/২৪০।

Scanned with CamScanner

মুসলিম বাহিনী যখন প্রতিপক্ষের প্রবল চাপে পিছু হটছিল, মুসার বীরজনা মা দেখতে পেলেন, প্রতিপক্ষ কাফিরবাহিনীর জনৈক যোদ্ধা একজন মুসলিম সৈন্যকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। ঘটনার পরবর্তী অংশ স্বয়ং উম্মে মুসার ভাষ্যেই পড়ুন। তিনি বলেন,

> এ দৃশ্য দেখে আমি তাঁবুর একটি খুঁটি তুলে নিলাম এবং কাফির সৈন্যটির কাছে গিয়ে সজোরে আঘাত করে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললাম। এরপর আমি তার যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ-পোশাক সংগ্রহ করতে অগ্রসর হলে মুসলিম সৈন্যটি আমাকে সহায়তা করলেন।[২৮]

এমনই বীর পিতা-মাতার সন্তান হলেন মুসা বিন নুসাইর রহ.। তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন নেতৃত্বের পরিবেশে, দারুল খেলাফতের সন্নিকটে খলীফা হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর সন্তানাদিসহ অন্যান্য প্রশাসক ও আমীরদের সন্তানদের সঙ্গে। ফলে শৈশব থেকেই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন ঈমানী প্রেরণা ও দ্বীনী চেতনাকে লালন করে। এরপর পূর্ণ যৌবনে উপনীত হতেই তিনি বিভিন্ন সম্মান ও পদমর্যাদার জন্য বিবেচিত হতে থাকেন।

প্রথমে তিনি বসরায় কর (খারাজ) আদায়ের দায়িত্বে (সহকারী গভর্নর পদে) নিযুক্ত হন।[২৯] এরপর হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর আমলেই তিনি নৌবাহিনী-প্রধানের পদ লাভ করেন এবং সাইপ্রাস-অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।[৩০] পরবর্তীতে ৮৯ হিজরীতে (আরেক মতে ৭৭ হিজরীতে) খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে তিনি লাভ করেন ইফ্রীকিয়া[৩১] ও মাগরেবের প্রশাসকের দায়িত্ব।[৩২] এ দায়িত্ব লাভের মধ্য দিয়েই মুসা বিন নুসাইর-এর সামনে সেই মহান খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার অনুকূল সুযোগ এসে যায়, যা তার পূর্ববর্তীগণ সম্পাদন করতে পারেননি।

প্রশাসকের দায়িত্ব লাভ করার পর প্রথমেই তিনি এ অঞ্চলে স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনলেন। এরপর মাগরেবের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং সেখানে ইসলামী বাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করলেন। মাগরেবে তখন প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ চলছিল। তিনি সেখানকার অধিবাসীদেরকে নামায-রোযা আদায় ও

---

[২৮] ইবনে হাজার, *আলইসাবা ফী আসমাইস সাহাবা*, ৮/৩১৪।

[২৯] যিরিকলী, *আলআ'লাম*, ৭/৩৩০।

[৩০] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৪/৪৯৬।

[৩১] ইফ্রীকিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল বর্তমান তিউনিসিয়া অঞ্চল। তৎকালে ইফ্রীকিয়া ও মাগরেব বলে বর্তমান মিশর ও লিবিয়ার পূর্বাঞ্চল বাদে আফ্রিকার পুরো উত্তরাঞ্চলকে বোঝানো হত।

[৩২] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৫/৩১৯।

Scanned with CamScanner

আত্মিক অবস্থা সংশোধনের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হতে আদেশ করলেন এবং তাদেরকে নিয়ে মরুভূমিতে সমবেত হলেন। সবাইকে নিয়ে তিনি মরুভূমিতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অবস্থান করলেন। এরপর নামায পড়লেন, সমবেত জনতার উদ্দেশে খোতবা প্রদান করলেন এবং দোয়া করলেন। খোতবা ও দোয়াতে তিনি খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের নাম নিলেন না। তাকে বলা হল, আপনি আমীরুল মুমিনীনের জন্য দোয়া করবেন না? তিনি উত্তর দিলেন, এটি এমন একটি উপলক্ষ, যেখানে আল্লাহ তা'আ'লা ছাড়া আর কাউকে ডাকা যায় না। এরপর বৃষ্টি হল এবং সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে গেল।[৩৩]

আফ্রিকায় ইসলামের অবস্থান সুদৃঢ়করণে মুসা বিন নুসাইরের প্রচেষ্টা

মাগরেবের গভর্নর হওয়ার পর মুসা বিন নুসাইরের সর্বপ্রথম চিন্তা ও পরিকল্পনা ছিল এ অঞ্চলে ইসলামের অবস্থানকে সুদৃঢ় করা। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এ অঞ্চলের জনসাধারণ ইতঃপূর্বে একাধিকবার মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তাই এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য তার প্রথম কর্তব্য ছিল এ বিষয়টি অনুসন্ধান করা যে, কেন তারা বারবার ধর্মত্যাগ করে? এবং কেনইবা মুসলমান হওয়ার পরও তারা বারবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়?

তাদের এই ধর্মত্যাগের কারণ অনুসন্ধানের পর মুসা বিন নুসাইর দু'টি বিষয় খুঁজে পেলেন; বরং বলা ভালো, পূর্ববর্তীদের কর্মপন্থার দু'টি ত্রুটি তার চোখে ধরা পড়ল।

প্রথম ত্রুটিটি হল, হযরত উকবা বিন নাফে' রাযি. ও তার সঙ্গীগণ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাদের বিজয়াভিযান পরিচালনা করেছিলেন। উকবা বিন নাফে' রাযি. একেকটি জনপদ জয় করার পর বিজিত অঞ্চলে মুসলিম বাহিনীর অবস্থান সুদৃঢ় না করেই আরও গভীরে প্রবেশ করেছিলেন এবং অন্যান্য আরও অনেক অঞ্চল বিজয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। আমাজিগ গোত্র এ বিষয়টি খেয়াল করে পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছে এবং হযরত উকবা রাযি.-এর পিছু নিয়ে তাকে ঘেরাও করে শহীদ করে দিয়েছে। এ বিষয়টিকে

---

[৩৩] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৫/৩১৯, ইবনে কাসীর, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৯/১৯৬ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৯।

Scanned with CamScanner

নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মুসা বিন নুসাইর রহ. অত্যন্ত ধীরগতিতে এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর ন্যায় সতর্কতা অবলম্বন করে তার বিজয়াভিযান শুরু করলেন। প্রতিটি পদক্ষেপের পর প্রথমে তিনি নিজের পৃষ্ঠদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন, এরপর নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। এভাবে সতর্কতার সঙ্গে ধীরগতিতে অভিযান পরিচালনা করার ছয়-সাত বছরের মধ্যে আল্লাহ পাক তার হাতে পুনরায় এ অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ বিজয় দান করলেন। অথচ উকবা বিন নাফে' রাযি. অল্প কয়েক মাসেই এ সুবিশাল অঞ্চল জয় করেছিলেন।

দ্বিতীয় ত্রুটিটি হল, তিনি দেখতে পেলেন, এ অঞ্চলের অধিবাসীগণ ইসলাম ও ইসলামের শিক্ষাকে যথার্থভাবে অনুধাবন করেনি; লাভ করেনি ইসলামের সঠিক শিক্ষা। তাই তিনি তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা প্রদানে মনোযোগী হলেন এবং শাম ও হেজায থেকে তাবেয়ী আলিমদেরকে নিয়ে এসে এ অঞ্চলের জনসাধারণের ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ইসলামের প্রতি অগ্রসর হল, ইসলামকে মনে-প্রাণে ভালোবাসতে শিখল। দলে দলে তারা ইসলামের পতাকাতলে শামিল হল। যারা একসময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করত, তারাই এবার ইসলামের সৈনিকে পরিণত হল।[৩৪] এভাবে মুসা বিন নুসাইর উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের ভিত্তিকে দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। আল্লাহ তাআ'লা তার মাধ্যমে সিউটা নগরী ব্যতীত পুরো মাগরেব অঞ্চলে ইসলামের বিজয় পূর্ণ করলেন।

মুসা বিন নুসাইর যদিও তানজা (Tangier) বন্দর জয় করেছিলেন; কিন্তু তানজা বন্দরের মতোই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী সিউটা তখনও জয় করতে পারেননি। এ কারণেই তিনি তার সবচে' সুদক্ষ সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদকে তানজা বন্দরের দায়িত্ব প্রদান করলেন। উল্লেখ্য, কৌশলগত দিক থেকে তানজা বন্দরের অবস্থানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা, তা সিউটা বন্দর ও আন্দালুস ভূখণ্ডের খুবই নিকটবর্তী ছিল।

তারিক বিন যিয়াদ আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন না। তিনি ছিলেন উত্তর আফ্রিকার আমাজিগ (বার্বার) বংশোদ্ভূত। আফ্রিকা অঞ্চলের অধিবাসী নিগ্রোসমাজের দেহ-বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে আমাজিগ গোত্রের লোকেরা ছিল

---

[৩৪] ইবনে আ'যারী, আলবায়ানুল মুগরিব, ১/৪৩, ইবনে খালদুন, তারীখে ইবনে খালদুন, ৬/১১০, মাক্কারী, নাফহুত তীব, ১/২৩৯ ও আলনাসিরী, আলইসতিক্সা লি আখবারি দুওয়ালিল মাগরিবিল আক্সা, ১/১৫২।

Scanned with CamScanner

শেতাঙ্গ, নীলাভ চোখ ও সুন্দর কেশবিশিষ্ট।[৩৫] এ কারণেই কেউ কেউ তাদেরকে বংশ-মূলের বিবেচনায় ইউরোপীয় মনে করে থাকেন। অনন্যসাধারণ নেতৃত্বগুণের অধিকারী তারিক বিন যিয়াদ দৈহিক দিক থেকে এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তো ছিলেনই; পাশাপাশি তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী ও কমনীয় দেহ-সৌন্দর্যের অধিকারী। কিন্তু এই শারীরিক সৌন্দর্য তার অন্তরে আল্লাহর পথে লড়াইয়ের প্রতি অনুরাগ এবং তাকওয়া ও সৎকর্মের মাধ্যমে দ্বীন প্রচারের স্পৃহা সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

মুসা বিন নুসাইর রহ. যুদ্ধবিক্ষুব্ধ মাগরেব অঞ্চলের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমেই যে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তা হল, নিজেদের ঘাঁটি ও যাত্রাপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এরপর তিনি চলমান ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ, বিদ্রোহ দমন, শত্রুঘাঁটি ধ্বংসকরণ এবং নতুন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হলেন।

তিনি দেখতে পেলেন, এ অঞ্চলে বসবাস করে অত্যন্ত শক্তিশালী এক জাতি, যাদেরকে ইসলামের খেদমতের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে ইসলামের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। তিনি তাদের স্বাধীন কর্মশক্তিকে কাজে লাগালেন এবং সৈন্যসংগ্রহ, বিন্যস্তকরণ ও তাদেরকে একের পর এক বিজয়াভিযানের উদ্দেশে প্রেরণে মনোযোগী হলেন।

এসব কর্ম-উদ্যোগ ও ফিতনা দমনের ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে আমাদের সামনে এ বিষয়টি প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, মুসা বিন নুসাইর ছিলেন হিজরী প্রথম শতকের শ্রেষ্ঠতম সেনানায়ক ও প্রশাসকদের একজন। তিনি যখন যে দায়িত্বই গ্রহণ করেছেন, সবক্ষেত্রেই তার প্রশাসনদক্ষতা ও সমরকুশলতা প্রকাশ পেয়েছে। তার পরিচালিত প্রতিটি স্থল ও নৌ অভিযানে তার সামরিক দক্ষতা প্রস্ফুটিত হয়েছে। আর তার এই উভয় দক্ষতা যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে মাগরেব অঞ্চল শাসনকালে। এ অঞ্চলে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলমানগণ এক অদম্য গোত্রের মুখোমুখি হয়েছিল, যারা প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চালাত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্রোহ প্রশমনে মুসা বিন নুসাইর একদিকে যেমন বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে একই সময়ে জাতি-গোষ্ঠীর মনস্তত্ত্ব অনুধাবনে অনুপম দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রেও অসামান্য যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন।[৩৬]

---

[৩৫] শাওকী আবু খলীল, *কাওছল আন্দালুস*, পৃ : ২০।

[৩৬] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ১/৫৯।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মুসা বিন নুসাইর ও আন্দালুস অভিযানের সিদ্ধান্ত

আন্দালুস বিজয়ের অতীত-পরিকল্পনা

অবশ্য মুসা বিন নুসাইরই আন্দালুসে অভিযান পরিচালনার সর্বপ্রথম পরিকল্পনাকারী নন। বহু পূর্ব থেকেই মুসলিম শাসকগণ এ অভিযানের পরিকল্পনা করে আসছিলেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান বিন আফফান রাযি.-এর খেলাফতকালে মুসলিম বাহিনী তৎকালীন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্টানটিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) পর্যন্ত পৌঁছতে এবং তা অবরোধ করতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য তারা কন্‌স্টানটিনোপল জয় করতে পারেনি। খলীফা উসমান রাযি. তখন মন্তব্য করেছিলেন,

> কন্‌স্টানটিনোপল বিজিত হবে সমুদ্রপথে। (আর এ কারণেই) তোমরা যখন আন্দালুস জয় করবে, তখন তোমরা শেষ যুগের কন্‌স্টানটিনোপল বিজেতা বাহিনীর সাওয়াব ও পুণ্যে অংশীদার হবে।[৩৭]

অর্থাৎ কন্‌স্টানটিনোপল জয় করার সক্ষমতা অর্জন করতে হলে মুসলমানদের কর্তব্য হল প্রথমে আন্দালুস জয় করা। এরপর সেখান থেকে পূর্ব ইউরোপে কন্‌স্টানটিনোপল অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করা।[৩৮] সমুদ্রপথ বলতে হযরত উসমান রাযি. বুঝিয়েছিলেন কৃষ্ণসাগরের কথা। কিন্তু মুসলমানগণ বনু উমাইয়ার শাসনামলের পূর্বে, নির্দিষ্ট করে বললে মুসা বিন নুসাইরের উত্তর আফ্রিকায় শাসনকালের পূর্বে আন্দালুসে পৌঁছতে পারেনি।

---

[৩৭] তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, ২/৫৯৮। আরও দেখুন : ইবনে কাসীর, *আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া*, ৭/১৭১ ও হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার ফী খবারিল আক্তার*, পৃ : ৩৩।

[৩৮] প্রিয় পাঠক! বিশ্ব-মানচিত্রের দিকে একটু লক্ষ্য করুন। প্রথমে মদীনা থেকে সরাসরি উত্তরে তুরস্কের দূরত্ব অনুমান করুন। এরপর দৃষ্টিপথ পরিবর্তন করুন; মদীনা থেকে পশ্চিমে মিশর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো হয়ে জাবালে তারিক প্রণালী পাড়ি দিয়ে উত্তরে স্পেন, ফ্রান্স, পূর্বে ইতালি, বলকান অঞ্চল, গ্রিস-পথে কৃষ্ণসাগর হয়ে তুরস্কের দূরত্ব অনুমান করুন। আল্লাহু আকবার! কত সুদূরপ্রসারী ছিল সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর চিন্তাধারা! আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে কী পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন তারা! (অনুবাদক)।

Scanned with CamScanner

মুসা বিন নুসাইর ও আন্দালুস বিজয়ের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

মুসা বিন নুসাইর উত্তর আফ্রিকার গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এ অঞ্চলে স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হল। জনসাধারণের মাঝে ইসলামের গণজাগরণ সৃষ্টি হল, মানুষ দ্বীনের শিক্ষা অর্জনে মনোযোগী হল। মুসা বিন নুসাইর রহ. যখন এ অঞ্চলে তার কর্মপ্রচেষ্টার সুফল প্রত্যক্ষ করলেন, তখন সেসব অঞ্চলেও ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনা করতে লাগলেন, যেখানে তখনও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছয়নি। আর তখনই তিনি আন্দালুসে অভিযান পরিচালনার চিন্তা করলেন। বাহ্যত এপারের মুসলিম ভূখণ্ড উত্তর আফ্রিকা এবং ওপারের খৃস্টান-ভূখণ্ড আন্দালুসের মাঝে বাধা ছিল কেবল একটি প্রণালী, ইসলামী বিজয়াভিযানের পর যা 'জাবালে তারিক প্রণালী' নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু মুসা বিন নুসাইরের তীক্ষ্ণ সামরিক দৃষ্টিতে আরও কিছু প্রতিবন্ধকতা ধরা পড়ল। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল,

প্রথম বাধা : নৌযানের স্বল্পতা

মুসা বিন নুসাইর হিসেব করে দেখলেন, আন্দালুসে অভিযান পরিচালনা করতে হলে তাকে মাগরেব ও আন্দালুসের মধ্যকার যে সমুদ্রপথ পাড়ি দিতে হবে, তার দূরত্ব ১৩ কিলোমিটারের কম নয়। অথচ সে সময় তার কাছে এই সামুদ্রিক দূরত্ব অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনীকে ওপারে পৌঁছিয়ে দেওয়ার মতো উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত নৌযান ছিল না। কেননা, যাতুস সাওয়ারীর যুদ্ধ[৪৯] ও সাইপ্রাস অভিযানের[৫০] মতো দু'-একটি অভিযানের কথা বাদ দিলে

---

[৪৯] যাতুস সাওয়ারীর যুদ্ধ (Battle of the Masts) ৩৫ হিজরীতে (৬৫৫ খৃস্টাব্দে) মুসলিম বাহিনী ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘটিত একটি নৌ-যুদ্ধের নাম। ভূমধ্যসাগর উপকূলবর্তী বর্তমান এশিয়া মাইনরের (আনাতোলিয়া) অন্তর্ভুক্ত লিকিয়া উপকূলীয় এলাকায় এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তৎকালীন মিশরের গভর্নর আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী এ যুদ্ধে দ্বিতীয় কন্সটাইন-এর নেতৃত্বাধীন বাইজান্টাইন বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। (অনুবাদক)

[৫০] সাইপ্রাস তৎকালে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মুসলমানগণ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যভুক্ত শাম অঞ্চল জয় করতে সক্ষম হন। ফলে শাম ও আশেপাশের অঞ্চলে মুসলিম শক্তির ওপর হামলা চালানোর জন্য বাইজান্টাইন খৃস্টশক্তি বিভিন্ন ঘাঁটি গড়ে তোলে। সাইপ্রাস ছিল তেমনই একটি ঘাঁটি। আর তাই তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান রাযি.-এর আমলে যখন মুসলিম নৌবহর প্রতিষ্ঠিত হল, তখন মুসলিম বাহিনীর অন্যতম টার্গেট হিসেবে বিবেচিত হল সাইপ্রাসের খৃস্টান নৌ-ঘাঁটি। ২৮ হিজরীতে মিশর ও শাম উপকূল থেকে সাইপ্রাসের উদ্দেশে মুসলিম নৌবাহিনী রওয়ানা করে। এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম সামুদ্রিক অভিযান। এ অভিযানে বিখ্যাত

Scanned with CamScanner

মুসলমানদের অধিকাংশ যুদ্ধাভিযান ছিল স্থলপথে। তাই মুসলমানদের বিশালাকৃতির যুদ্ধ-জাহাজের তেমন প্রয়োজনও পড়েনি। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। প্রণালী পাড়ি দিয়ে মুসলিম বাহিনীর আন্দালুস পৌঁছতে প্রয়োজন বিশালাকার সব নৌযানের।

দ্বিতীয় বাধা : পৃষ্ঠদেশে খৃস্টানঅধ্যুষিত ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জের উপস্থিতি

মুসা বিন নুসাইর তার পূর্ববর্তীদের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি পেছনের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে সামনে এক কদমও অগ্রসর হতে প্রস্তুত ছিলেন না। আন্দালুসের পূর্বদিকে কয়েকটি দ্বীপ ছিল, যা ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জ (Balearic Islands) নামে পরিচিত। আন্দালুসের পূর্ব উপকূলের সম্মুখভাগেও বেশ কয়েকটি দ্বীপ ছিল। এর মধ্যে সামরিক কৌশলগত দিক থেকে তিনটি দ্বীপের অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; মায়োর্কা (Palma de Mallorca), ম্যানোর্কা (Menorca) ও ইবিযা (Ibiza) দ্বীপ। প্রাচীন আরবী উৎসগ্রন্থসমূহে এসব দ্বীপকে 'প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। খৃস্টান-শাসনাধীন এসব দ্বীপ আন্দালুসের একেবারেই সন্নিকটে ছিল। তাই আন্দালুসে প্রবেশ করলে মুসা বিন নুসাইরের পৃষ্ঠদিক মোটেই নিরাপদ থাকত না। এ কারণে প্রয়োজন ছিল প্রথমে পৃষ্ঠদিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

অনেক সাহাবী অংশগ্রহণ করেন এবং তৎকালীন শামের গভর্নর বিশিষ্ট সাহাবী মুয়াবিয়া রাযি. এতে নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে ৩৪ হিজরীতে খলীফা মুয়াবিয়া রাযি. পুনরায় সাইপ্রাসে অভিযান পরিচালনা করেন এবং দ্বিতীয়বারের মতো সাইপ্রাস বিজয় করেন।

উল্লেখ্য, সমুদ্রপথের প্রথম অভিযাত্রীদের জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ ঘোষণা করেছিলেন। ইমাম বুখারী রহ. বিশুদ্ধ সনদে উল্লেখ করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا»

আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি নৌ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, তারা যেন (জান্নাত) অনিবার্য করে ফেলল।

এ কথা শোনার পর (হাদীসের রাবী) সাহাবিয়া উম্মে হারাম রাযি. নবীজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত হব? নবীজী উত্তরে বললেন, «أَنْتِ فِيهِمْ» হ্যাঁ, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২৭ হিজরীর সাইপ্রাস অভিযানে উম্মে হারাম রাযি. তার স্বামী উবাদা বিন সামিত রাযি.-এর সঙ্গী হয়েছিলেন আর এভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছিল সত্যনবীর ভবিষ্যদ্বাণী। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

তৃতীয় বাধা : জাবালে তারিক প্রণালীর সন্নিকটে আন্দালুসের মিত্রশক্তি সিউটার উপস্থিতি

মুসলিম বাহিনী তখনও বন্দরনগরী সিউটা জয় করতে পারেনি। রণ-কৌশলগত দিক থেকে সিউটা নগরী ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। সিউটার নৌবন্দর থেকে জাবালে তারিক প্রণালীর প্রতি অতি সহজেই নজর রাখা যেত। তৎকালে সিউটা নগরী জুলিয়ান (Julian) নামক জনৈক খৃস্টান প্রশাসকের শাসনাধীন ছিল। তার সঙ্গে আন্দালুসের সাবেক শাসক গিত্শার (Wittiza) ছিল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, গিত্শা তারই সেনাবাহিনীর জনৈক সেনাপতি রডারিক (Roderic)-এর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার শিকার হয়ে ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং রডারিক আন্দালুসের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। মুসা বিন নুসাইর আশঙ্কা করছিলেন, তিনি যদি আন্দালুসে আক্রমণ করেন, পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার নীতিতে অথবা অন্য কোন কারণে জুলিয়ান ও রডারিক পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হবেন এবং মুসলিম বাহিনীকে পরাভূত করার চেষ্টা চালাবেন।

চতুর্থ বাধা : মুসলমানদের সৈন্যস্বল্পতা

চতুর্থ যে প্রতিবন্ধকতাটি মুসা বিন নুসাইর উপলব্ধি করলেন, তা হল আরব উপদ্বীপ, শাম ও ইয়ামেন থেকে আগত মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল একেবারেই সীমিত। আর এ সময় তারা পুরো উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তাই এই অল্পসংখ্যক সৈন্য দিয়ে আন্দালুসে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া তার মনে এ আশঙ্কাও ছিল যে, তিনি বাহিনী নিয়ে আন্দালুসের উদ্দেশে রওয়ানা হলে উত্তর আফ্রিকার গোত্রভিত্তিক রাষ্ট্রগুলো তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে।

পঞ্চম বাধা : খৃস্টানদের সংখ্যাধিক্য

মুসলমানদের সীমিতসংখ্যক সৈন্যের বিপরীতে খৃস্টান বাহিনীর বিশালতা ও যুদ্ধাস্ত্রের পর্যাপ্ততাও মুসা বিন নুসাইরের আন্দালুস বিজয়ের পথে প্রতিবন্ধক ছিল। আন্দালুসে জনবল, অস্ত্রবল, দুর্গ ও নগর-প্রাচীর ইত্যাদির বিচারে খৃস্টানরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। অধিকন্তু তাদের নেতৃত্বে ছিল রডারিক-এর মতো পরাক্রমশালী ও বীর যোদ্ধা শাসক।

Scanned with CamScanner

ষষ্ঠ বাধা : আন্দালুসের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে মুসলিম বাহিনীর অজ্ঞতা

আন্দালুসের পথে মুসলমানদের বাধা হয়ে ছিল সমুদ্র। ফলে মুসলমানগণ এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও মানচিত্র সম্পর্কে মোটেই অবগত ছিল না। তাই এ অঞ্চলে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা ছিল অত্যন্ত জটিল ও সুকঠিন। তাছাড়া আন্দালুসে ছিল প্রচুর পাহাড়-পর্বত ও নদী-নালা, যা এ অঞ্চলে যে কোন বাহিনীর অভিযানের পথে এক অনতিক্রম্য বাধারূপে বিবেচিত হত। বিশেষত অভিযাত্রী বাহিনীর সরঞ্জামাদি স্থানান্তরের মূল বাহন যদি হয় ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর, তাহলে তো কোন কথাই নেই।

প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে মুসা বিন নুসাইরের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

আন্দালুস বিজয়ের পথে এতগুলো বাধা ও প্রতিবন্ধকতা উপলব্ধি করেও মুসা বিন নুসাইর হতোদ্যম হলেন না; বরং বাধার পাহাড় যেন তার বিজয়-স্পৃহা ও সংকল্প আরও বাড়িয়ে তুলল। তিনি ধীরে-সুস্থে এসব প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করলেন এবং প্রথমে এসব প্রতিবন্ধকতাসমূহকে বিন্যস্ত করে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য দিকগুলো নির্ধারণ করলেন। এরপর এসব বাধা দূর করতে নিম্নবর্ণিত পন্থায় কাজ শুরু করলেন।

এক. নৌবন্দর প্রতিষ্ঠা ও জাহাজ নির্মাণ

মুসা বিন নুসাইর ৮৭/৮৮ হিজরী মোতাবেক ৭০৬/৭০৭ খৃস্টাব্দে নৌযান নির্মাণ-উপযোগী নৌবন্দর প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করলেন। যদিও এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প; কিন্তু উচ্চাভিলাষ ও ইস্পাতকঠিন মনোবলকে কাজে লাগিয়ে তিনি কাজ শুরু করলেন এবং উত্তর আফ্রিকায় একাধিক নৌবন্দর প্রতিষ্ঠা করলেন।[৪১]

দুই. আমাজিগ (বার্বার) জাতিকে ইসলামের শিক্ষা প্রদান

এ সময়ই মুসা বিন নুসাইর বিভিন্ন বিশেষ মজলিসের মাধ্যমে আমাজিগ গোত্রকে ইসলামের শিক্ষা প্রদানে পূর্ণ সচেষ্ট হলেন, যাকে আমরা বর্তমানের

[৪১] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৫৭।

Scanned with CamScanner

পরিভাষায় 'বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা' (Intensive course) বলতে পারি। তিনি তাদেরকে ইসলামের আকীদা ও বিশ্বাস, আমল ও কর্মপদ্ধতি এবং বিধি-বিধান শিক্ষা দিলেন এবং তাদের হৃদয়ে আল্লাহর রাহে নিজের জান-মাল ব্যয় করার স্পৃহা সৃষ্টি করলেন। যখন তিনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হলেন যে, তারা ইসলামের মর্মজ্ঞান সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে, তখন থেকে তিনি তাদের ওপর আস্থা রাখতে শুরু করলেন এবং তাদেরকে মুসলিম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করতে লাগলেন। ফলে অনধিক পাঁচ বছর পূর্বেও যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, সেই আমাজিগ গোত্রই ইসলামী সেনাবাহিনীর বৃহত্তর অংশ ও মূল স্তম্ভে পরিণত হল।[৪২]

তিন. তারিক বিন যিয়াদকে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান

একজন সেনাপতি হলেন বাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু ও মূল স্তম্ভ। এ উপলব্ধিবোধ থেকেই মুসা বিন নুসাইর তার আন্দালুস অভিযানের উদ্দেশ্যে তৈরি মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বের জন্য আমাজিগ গোত্রীয় অভিজ্ঞ নেতা তারিক বিন যিয়াদকে (৫০-১০২ হিজরী/৬৭০-৭২০ ঈসায়ী) নির্বাচিত করলেন। তারিক বিন যিয়াদের মাঝে তাকওয়া ও ধার্মিকতা, বিনয় ও নির্মোহতা, সমরকুশলতা ও আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ঐকান্তিক বাসনা ইত্যাদি গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তারিক বিন যিয়াদ যদিও আরব বংশীয় ছিলেন না; ছিলেন আমাজিগ গোত্রীয়, তারপরও মুসা বিন নুসাইর বেশ কয়েকটি কারণে সেনাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাকে আরব যোদ্ধাদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল,

---

[৪২] নিঃসন্দেহে মুসলিম জাতি ব্যতীত অন্যান্য জাতির ইতিহাসে এ ধরনের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত বিরল। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোন আক্রমণকারী বা বিজয়ী রাষ্ট্র বিজিত জাতির জনসাধারণের স্বভাব-চরিত্র, অনুরাগ-প্রীতি ও মৈত্রী-বন্ধুত্বকে এভাবে আমূল বদলে দিতে পারেনি। একমাত্র ইসলামই বিজিত জাতিসত্তাকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছে যে, বিজিত জাতি ইসলামী রাষ্ট্রের সমর্থক, প্রহরী ও ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ প্রচারক-এ পরিণত হয়েছে। বিশেষত রাষ্ট্রবিজয়ের বা নতুন ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই এমন আচরণ যে অন্য ধর্ম বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কল্পনাই করা যায় না। মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এটি একটি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। একমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রেই এরূপ দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সের কথা বলা যেতে পারে। ফরাসী জাতি ১৩০ বছর আলজেরিয়া জবরদখল করে রেখেছিল। পরবর্তী সময়ে ফরাসী বাহিনী যখন আলজেরিয়া ভূমি ত্যাগ করল, দেখা গেল, এত দীর্ঘ সময় অধিকৃত থাকার পরও আলজেরিয়াবাসীর ইসলামপ্রীতিতে কোন ভাটা তো পড়েইনি; বরং ইসলামের প্রতি তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনই বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের ইসলামী চেতনা ও আত্মবোধ।

Scanned with CamScanner

ক. সহজাত দক্ষতা

মুসা বিন নুসাইরের কাছে তারিক বিন যিয়াদের অনারবী বংশপরিচয় নেতৃত্বলাভের ক্ষেত্রে বাধা মনে হয়নি। কেননা, তিনি জানতেন, তাকওয়া ও আল্লাহভীতির গুণ ব্যতিরেকে অনারবীর ওপর আরবীর বা আরবীর ওপর অনারবীর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আর মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদের মাঝে অন্যদের তুলনায় অধিক সহজাত দক্ষতা এবং এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পরিপূর্ণ যোগ্যতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মুসা বিন নুসাইরের এই নির্বাচন একদিকে যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার দূরদর্শিতা প্রমাণ করে, অপরদিকে এ কথাও প্রমাণ করে যে, ইসলামের দাওয়াত কোন গোত্রবাদ বা জাতীয়তাবাদের দাওয়াত নয়, বা সাম্প্রদায়িকতা যা গোত্রপ্রীতি সৃষ্টি করে; বরং ইসলাম হচ্ছে এক সার্বজনীন দাওয়াত। পবিত্র কোরআনের ভাষায়,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾

(হে নবী!) আমি তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমত করেই পাঠিয়েছি। [সূরা আম্বিয়া : ১০৭]

খ. আপন গোত্রের নেতৃত্ব ও ভাববিনিময়ের যোগ্যতা

উপরিউল্লিখিত স্বতন্ত্র দক্ষতাসমূহ ছাড়াও এ নির্বাচনের পেছনে আরেকটি কারণ এই ছিল যে, তারিক বিন যিয়াদ আমাজিগ বংশীয় হওয়ায় অল্প কিছুদিন পূর্বে ইসলাম ধর্মে পুনঃপ্রবেশকারী আমাজিগ গোত্রীয় যোদ্ধাদের অন্তরে সৃষ্ট সম্ভাব্য যে কোন প্রবৃত্তি-চাহিদাকে দমন করতে সক্ষম ছিলেন। এ কারণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে মুসলিম বাহিনীকে পরিচালনা ও বশে রাখার জন্য তিনিই ছিলেন সবচে' যোগ্য ব্যক্তি। উপরন্তু তিনি আমাজিগ গোত্রীয় হওয়ায় আপন গোত্রের যোদ্ধাদের ভাষা বুঝতে সক্ষম ছিলেন। কেননা, আমাজিগ গোত্রীয় যোদ্ধাদের সকলে অনর্গল আরবীতে কথা বলতে পারত না। আর

Scanned with CamScanner

তারিক বিন যিয়াদ আরবী ও আমাজিগ উভয় ভাষায় সমান দক্ষ ছিলেন।[৪৩] এসব কারণ ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণে মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদকেই বাহিনীর নেতৃত্বদানে উপযুক্ত মনে করলেন এবং তাকেই এই দায়িত্ব প্রদান করলেন।

চার. ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জ জয়

আন্দালুস বিজয়ের পথ সুগমের লক্ষ্যে এবং নিজেদের পৃষ্ঠ-প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও যে কাজটি মুসা বিন নুসাইর করলেন, তা হল ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জ জয় এবং একে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তকরণ। এর মাধ্যমে তিনি পূর্ব দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেন। মুসা বিন নুসাইরের এ সমস্ত পদক্ষেপ পরিকল্পনা ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তার সহজাত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতারই স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হল, এতৎসত্ত্বেও ইসলামী ইতিহাসের পাতায় তার কীর্তি ও অবদানের কথা অনেকটাই উপেক্ষিত থেকে গেছে।

সিউটা সমস্যা ও কুদরতি সাহায্য

মুসা বিন নুসাইর তার সৈন্যস্বল্পতা-সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিলেন আমাজিগ গোত্রের মাধ্যমে। নৌযান স্বল্পতার আপেক্ষিক সমাধান করেছিলেন নৌবন্দর প্রতিষ্ঠা ও নতুন নতুন নৌযান নির্মাণের মাধ্যমে। কিন্তু আন্দালুস-ভূমি তখনও মুসলমানদের কাছে অচেনাই রয়ে গিয়েছিল। তেমনই সিউটা নৌ-বন্দরজনিত সমস্যার তখনও পর্যন্ত কোন সমাধান হয়নি। সিউটা বন্দর ছিল খৃস্টান শাসক জুলিয়ানের নিয়ন্ত্রনাধীন অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি

---

[৪৩] ইবনে আ'যারী রহ. 'আলবায়ানুল মুগরিব' গ্রন্থে তারিক বিন যিয়াদের বংশ পরিচিতি এভাবে উল্লেখ করেছেন: তারিক বিন যিয়াদ বিন আবদুল্লাহ বিন ওয়ালগু বিন ওয়ারানজুম বিন নাবারগাসিন বিন ... । এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারিকের পিতামহ আবদুল্লাহ ছিলেন বংশের প্রথম মুসলমান। আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, তার প্রপিতামহ ওয়ালগু ছিলেন এ বংশের প্রথম মুসলমান, যিনি আপন জাহেলী খুসের নামই বহাল রেখেছিলেন এবং ছেলের জন্য ইসলামী নাম 'আবদুল্লাহ' নির্বাচন করেছিলেন। বস্তুবতা যাই হোক, এ থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে, তারিক বিন যিয়াদ বংশপরম্পরাভাবেই মুসলমান ছিলেন এবং আরবী ভাষা শেখার পাশাপাশি তাতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এছাড়াও আন্দালুস বিজয়ের পূর্বে তার প্রদত্ত ঐতিহাসিক আরবী ভাষণ থেকেও তার আরবী-দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়; যদি আমরা সেসব ঐতিহাসিকের মতামতকে প্রাধান্য দিই, যারা এ ভাষণের ঐতিহাসিক সত্যতাকে স্বীকার করেছেন।

Scanned with CamScanner

নৌবন্দর। এ দুই সমস্যার সমাধানের জন্য মুসা বিন নুসাইর তার সর্বোচ্চ চেষ্টা ও মেধা ব্যয় করে সম্ভাব্য সবকিছুই করলেন; কিন্তু কোন সমাধান খুঁজে পেলেন না। আর তখনই কার্যকর হল কুদরতি নেযাম ও তাদবীরে ইলাহী,

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতিরক্ষা করেন, যারা ঈমান এনেছে। জেনে রেখো, আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।
[সূরা হাজ্জ : ৩৮]

﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾

এবং (হে নবী!) তুমি যখন (তাদের ওপর মাটি) নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তা তুমি নিক্ষেপ করনি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।
[সূরা আনফাল : ১৭]

গায়ব থেকে খোদায়ী নুসরত নেমে এল এবং সিউটা অধিপতি জুলিয়ানের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা মূর্ত হয়ে উঠল। সামনে আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা করব।

সিউটা-প্রশাসক জুলিয়ান এ সময় গুরুত্বের সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, তার চারপাশের জগত ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে আসছে। মুসলমানগণ দিনে দিনে বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নিচ্ছে এবং দিনে দিনে তাদের শক্তি বেড়েই চলছে। নিজেকে তিনি প্রশ্ন করলেন, মুসলমানরা যদি তার রাজত্বে আক্রমণ করে বসে, কতদিন তিনি এ অজেয় শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন?

আরেকটি বিষয় তার হৃদয়জগতে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আন্দালুস-শাসক রডারিকের প্রতি জুলিয়ানের অন্তরে লুকিয়ে ছিল প্রচণ্ড বিদ্বেষ ও শত্রুতা। এই রডারিক তার বন্ধু গিত্শাকে হত্যা করেছে। গিত্শার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। গিত্শা নিহত হওয়ার পর তার পিতৃহারা সন্তানেরা রডারিকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে জুলিয়ানের কাছে সাহায্য প্রার্থনাও করেছে। কিন্তু জুলিয়ান বা গিত্শা-পরিবার কারোরই রডারিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো শক্তি-সামর্থ্য নেই। জুলিয়ান ভাবতে লাগলেন, মুসলমানগণ যদি সিউটা বন্দর দখল করে নেয়, তাহলে তিনি পালিয়ে কোথায় আশ্রয় নেবেন?

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন বর্ণনামতে সিউটা-প্রশাসক জুলিয়ান ও আন্দালুস-শাসক রডারিকের মধ্যকার সম্পর্কের টানাপোড়নের মূল কারণ হল, রডারিক জুলিয়ানের কন্যাকে অপহরণ করেছিলেন। এ সংবাদ জানামাত্র জুলিয়ান রডারিকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু সামরিক শক্তিতে রডারিকের চেয়ে দুর্বল জুলিয়ানের সামনে এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি পথই খোলা ছিল। আর তা হল, আন্দালুস আক্রমণের প্রস্তুতিরত মুসলমানদের সহযোগিতা করা।[৪৪]

সর্বশেষ যে বিষয়টি জুলিয়ানের চিন্তাজগতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বলে আমাদের ধারণা, তা হল, আন্দালুসের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি পুরোপুরি মুসলমানদের অনুকূলে চলে যাচ্ছিল। আন্দালুসবাসী মুসলমানদের বিজয়াভিযানের জন্য অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে ছিল। জুলিয়ান জানতেন, শাসক রডারিক আন্দালুসবাসীর ওপর সীমাহীন অবিচার ও জুলুম করেন। তিনি জনগণের ওপর বিশাল করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। ফলে বর্তমানে আন্দালুসবাসীর জীবন কাটছে সীমাহীন অভাব ও দারিদ্র্যের মাঝে। অথচ রডারিক নিজে ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের মাঝে জীবন কাটাচ্ছেন। এসব কারণে আন্দালুসের জনগণ শাসক হিসেবে রডারিককে মোটেই পছন্দ করতে পারছিল না এবং তারা তার শাসন ও শোষণ থেকে নিষ্কৃতি লাভের পথ খুঁজছিল।

অধিকন্তু রডারিক নতুন করে ইহুদিদের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতন শুরু করেছিলেন। ইতঃপূর্বে গিত্শার আমলে ইহুদিদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন পুরোপুরি বন্ধ ছিল। রডারিক এসেই পুনরায় এমন কঠিন মাত্রায় নিপীড়ন ও নির্যাতন আরম্ভ করে দিয়েছিলেন যে, আন্দালুসের ইহুদিসমাজ সেখানে অভিযান পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে তারিক বিন যিয়াদের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে।[৪৫]

তাছাড়া আন্দালুসে গিত্শা-পরিবারের অনেক সহায়-সম্পত্তি ছিল, রডারিক যেগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিজে ভোগ করছিলেন। জুলিয়ান চাচ্ছিলেন সেসব সম্পদ পুনরুদ্ধার করে গিত্শার সন্তানদের ফিরিয়ে দিতে।

---

[৪৪] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে : হিময়ারী, *আরয়াওলুল মি'তার ফী খবারিল আক্তার*, পৃ : ৩৪ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৫১-২৫২।

[৪৫] হুসাইন মুনিস, *মাওসূআ'তু তারীখিল আন্দালুস*, ১/১৫-১৬ ও মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ২৩-৩৩।

Scanned with CamScanner

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরতে এ জাতীয় বিভিন্ন চিন্তা জুলিয়ানের মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এদিকে একই সময় মুসা বিন নুসাইর তার সমস্যা সমাধানে সব রকম চেষ্টা করেও কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ঠিক তখনই জুলিয়ান পারস্পরিক সমঝোতার উদ্দেশ্যে (সিউটা নৌবন্দর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত) তানজার প্রশাসক তারিক বিন যিয়াদের নিকট কয়েকজন দূত প্রেরণ করলেন। জুলিয়ানের পাঠানো প্রস্তাবের ধারাসমূহে এবং তার আশ্চর্য দাবিতেই লুকিয়ে ছিল প্রকৃত বিস্ময়। তার প্রস্তাব ছিল,

- আমরা আপনাকে সিউটা বন্দরের নিয়ন্ত্রণভার প্রদান করব। (মুসলমানগণ বিগত কয়েক বছর যাবৎ এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতেই দিশেহারা ছিল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর সমাধান ছিল তাদের সাধ্যের বাইরে।)
- আমরা আপনাকে আন্দালুস ভূমি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করব।

বিনিময়ে জুলিয়ানের দাবি ছিল, রডারিক গিত্শার যে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি ও ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও অধিগ্রহণ করেছেন, তা তাকে উদ্ধার করে দিতে হবে। গিত্শার তিন হাজার ফসলী জমির মালিকানা ছিল। তার মৃত্যুর পর এগুলোর মালিকানা তার সন্তানদের লাভ করার কথা থাকলেও রডারিক জোরপূর্বক তা ভোগ করছিলেন।[৪৬]

আল্লাহু আকবার! কী অপূর্ব প্রস্তাব! কী চমৎকার দাবি! প্রকৃতপক্ষে এ যে নুসরতে ইলাহী, ঐশী সাহায্য!

সিউটা-প্রশাসক জুলিয়ানের প্রত্যাশা ছিল, তিনি মুসলমানদের জন্য সিউটা নগরী ছেড়ে দিবেন এবং মুসলমানদের আন্দালুস পৌঁছতে সহায়তা করবেন। এরপর মুসলমানগণ যখন আন্দালুস শাসন করবে, তখন তিনি মুসলমানদের নিঃশর্ত আনুগত্য করবেন। বিনিময়ে মুসলমানগণ আন্দালুস জয়ের পর গিত্শার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তার পরিবারকে ফিরিয়ে দেবে। সব বিবেচনাতেই এ প্রস্তাব ছিল মুসলমানদের জন্য লাভজনক। এ যে বড় সস্তায় পাওয়া সওদা!

মুসলিম বাহিনী কোন দেশে অভিযান পরিচালনার সময় কখনোই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা অর্থ-সম্পদ লাভের চিন্তা করেনি। তারা কোনদিনই গিত্শা, জুলিয়ান, রডারিক বা অন্য কারও রাজত্ব জয় করে তার মালিক হওয়ার

---

[৪৬] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৫৮।

Scanned with CamScanner

লালসা করেনি। মুসলমানদের প্রতিটি অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষকে ইসলামের সুমহান শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত করা এবং তাদেরকে রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব শিক্ষা দেওয়া। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে মুসলমানগণ যেসব অধিকার ও সম্পদ লাভ করে, তারাও তা-ই লাভ করবে; মুসলমানগণের ওপর যেসব দায়িত্ব বর্তায়, তাদের ওপর সেসব দায়িত্ব বর্তাবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে এবং জিযিয়া কর দিতে সম্মত হয়, তাহলে তাদের মালিকানাভুক্ত সম্পদ তাদেরকেই অর্পণ করা হবে।

এ বিবেচনায় জুলিয়ানের এই প্রস্তাব ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত অনুকূল এবং বিনিময়ে তার দাবি ছিল একেবারেই যৎসামান্য। তাই তারিক বিন যিয়াদ দূত মারফত জুলিয়ানের প্রস্তাবনা মুসা বিন নুসাইরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তখন তৎকালীন উত্তর আফ্রিকার রাজধানী কায়রোয়ানে (বর্তমান তিউনিসিয়ায় অবস্থিত) অবস্থান করছিলেন।

সংবাদ পেয়ে মুসা বিন নুসাইর অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের কাছে বিস্তারিত জানিয়ে বার্তা পাঠালেন এবং আন্দালুস অভিযানের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। উত্তরে ওয়ালিদ লিখে পাঠালেন, প্রথমে আন্দালুসে ছোট ছোট বাহিনী পাঠিয়ে সেখানকার খোঁজ-খবর নাও। প্রথমেই মূল বাহিনীকে দুর্গম সমুদ্রপথের অভিযানে প্রেরণ করে বিপদে ফেলো না। প্রত্যুত্তরে মুসা বিন নুসাইর বার্তা পাঠালেন, আন্দালুসে অভিযান পরিচালনার জন্য যে পথটুকু পাড়ি দিতে হবে, তা সমুদ্র নয়; উপসাগর মাত্র। এপার থেকে ওপারের সীমা দৃষ্টিগোচর হয়।[৪৭] তখন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক আন্দালুস অভিযানের অনুমতি দিলেন। তবে তিনি এমন একটি শর্ত আরোপ করলেন, স্বয়ং মুসা বিন নুসাইরও যা পূর্বেই ভেবে রেখেছিলেন। আর তা হল, আন্দালুসে প্রবেশ করার পূর্বে অবশ্যই মুসলমানগণ একটি ক্ষুদ্র অগ্রবর্তী বাহিনী প্রেরণ করে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে নেবে। কেননা, জুলিয়ান আন্দালুস সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রদান করবেন, তা কতটুকু সত্য হবে কে জানে? কী নিশ্চয়তা আছে যে, জুলিয়ান কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না? কিংবা অগোচরে রডারিক বা অন্য কারও সঙ্গে গোপন-চুক্তি করবেন না?

---

[৪৭] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমুআ*, পৃ : ১৬, ইবনুল আছীর, *আলকামিল ফিত্তারীখ*, ৪/২৬৭, হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ৩৫ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৫৩।

Scanned with CamScanner

সারিয়্যায়ে তরীফ বিন মালিক

আন্দালুসে প্রথম ইসলামী অভিযান

খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের অনুমতি পাওয়ামাত্রই মুসা বিন নুসাইর চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন এবং তরীফ বিন মালিকের নেতৃত্বে পাঁচ শ' সৈনিকের একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন। তরীফও আমাজিগ গোত্রীয় ছিলেন।

তরীফ বিন মালিক (যার উপনাম আবু যুরআ') পাঁচ শ' মুসলিম সৈনিকের বাহিনী নিয়ে মাগরেব থেকে আন্দালুসের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। এদের মধ্যে এক শ' ছিলেন অশ্বারোহী, বাকি চার শ' পদাতিক সৈন্য। চারটি জাহাজে করে রওয়ানা হবে ৯১ হিজরীর রমযান মাসে (৭১০ খৃস্টাব্দে) তারা আন্দালুস-ভূমিতে পা রাখলেন। কতক ইতিহাসগ্রন্থের বিবরণমতে তারীফ এ সফরে আন্দালুস-ভূমির অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন এবং সফল হন।[৪৮]

অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি তরীফ বিন মালিক রহ. তার মূল দায়িত্বও পুরোপুরি পালন করলেন এবং কিছুদিন পর মুসলিম বাহিনী যেখানে অবতরণ করবে, সেই দক্ষিণ আন্দালুসের পরিবেশ-পরিস্থিতি পুরোপুরি নিরীক্ষণ করলেন। তিনি যে দ্বীপে অবতরণ করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে তা তার নামানুসারে 'তরীফ দ্বীপ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অভিযান শেষ করে তিনি মুসা বিন নুসাইরের কাছে উপস্থিত হলেন এবং স্বচক্ষে দেখা অভিজ্ঞতা ও ভূ-চিত্র তার সামনে তুলে ধরলেন।

তরীফ রহ. ফিরে আসার পর দীর্ঘ এক বছর ধরে অত্যন্ত ধীরস্থিরতা, সাধনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে মুসা বিন নুসাইর আন্দালুস অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন এবং প্রয়োজনীয় যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহের পাশাপাশি এক বছরে সাত হাজার যোদ্ধা প্রস্তুত করলেন। তারপর এই বাহিনী নিয়েই শুরু করলেন খৃস্টানশক্তির বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে তার 'আন্দালুস বিজয়াভিযান'।[৪৯]

---

[৪৮] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমূআ*, পৃ : ১৬-১৭, হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ৩৫ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৫৪।

[৪৯] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ৩৫ ও হুসাইন মু'নিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ৬৬।

Scanned with CamScanner

আন্দালুস বিজয় এবং জুলিয়ান ও ইহুদিদের সহায়তা

আন্দালুস বিজয় প্রসঙ্গে আরবী ও অন্যান্য ভাষার বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে বারবার সিউটা-প্রশাসক জুলিয়ানের নাম আলোচিত হয়েছে এবং মুসলমানদের আন্দালুস বিজয়াভিযানের প্রতিটি ধাপে তার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, শুরুতে মুসলমানদের আন্দালুস অভিযানের কোন চিন্তা-ভাবনা বা পরিকল্পনা ছিল না। জুলিয়ান মুসলমানদেরকে সাহায্য করার প্রস্তাব দেওয়ার পর কিংবা পিতৃশার সন্তানদের আন্দালুসের শাসনক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের কাছে সহায়তা কামনার পর কিংবা জুলিয়ান-কন্যাকে অমর্যাদাকারী রডারিকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে সাহায্য কামনার পরই কেবল মুসলমানদের মাথায় আন্দালুস অভিযানের পরিকল্পনা ও চিন্তা এসেছিল।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, আফ্রিকা-প্রশাসক মুসা বিন নুসাইর যে সময় আন্দালুস বিজয়ের পরিকল্পনা করছিলেন, ঠিক একই সময় তারিক বিন যিয়াদ ও মুসা বিন নুসাইরের সঙ্গে সিউটা-শাসক জুলিয়ান যোগাযোগ করেছিলেন এবং তা মুসলমানদের পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল মাত্র; উদ্ভাবকের ভূমিকা নয়। মূলত তার এই সাহায্যপ্রস্তাব এসেছিল আন্দালুস অভিযানের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে মুসলিম বাহিনীর তানজা নগরী জয়ের পর। তানজা বিজয়ের পর মুসা বিন নুসাইর যে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে আন্দালুস বিজয়ের পরিকল্পনা করবেন, এটা একেবারেই অনুমেয় ছিল।

অর্থাৎ আমরা উত্তর আফ্রিকান মুসলিম প্রশাসনের সঙ্গে জুলিয়ানের যোগাযোগের বিষয়টি অস্বীকার করছি না; কিন্তু এ যোগাযোগকেই আমরা আন্দালুস বিজয়পরিকল্পনার মূল প্রভাবক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজী নই, বা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের আন্দালুস বিজয়ের ঐতিহাসিক মর্যাদা ও মূল্যকে অন্যায়ভাবে হ্রাস করার নামান্তর।

ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ দাবি করেছেন, জুলিয়ানের সাহায্য-সহযোগিতাই মুসলমানদের আন্দালুস বিজয়ের মূল অনুঘটকরূপে কাজ করেছে। আমরা এ বিষয়টিকে বিজয় তৎপরতা সফল হওয়ার অন্যতম সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করতে পারি; যেমন আমরা এ সম্ভাবনাকেও মেনে নিই যে, জুলিয়ান কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুসলমানদের বেশ সাহায্য করেছেন, বিশেষত আন্দালুস-ভূমির

Scanned with CamScanner

সামগ্রিক নকশা, প্রবেশ ও বহিঃগমন পথ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য দিয়ে। কিন্তু জুলিয়ানের সাহায্যই মুসলমানদের আন্দালুস বিজয়ের একমাত্র বা প্রধান কার্যকারণ, এ বিষয়টি ঐতিহাসিক বাস্তবতায় মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বাকি রইল আন্দালুসে বসবাসরত ইহুদিদের পক্ষ থেকে মুসলিম বাহিনীকে সহায়তা প্রদান এবং বিজয় নিশ্চিতকরণে অত্যাবশ্যকীয় সহযোগিতার দাবি, বিভিন্ন কারণে এ দাবি অসত্য ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়। যথা:

১. প্রাচীন আরবী ইতিহাস-গ্রন্থগুলোতে এমন সামান্য কোন ইঙ্গিতও নেই যে, আন্দালুসের অধিবাসী ইহুদিরা মুসলমানদের কোন ধরনের সহযোগিতা করেছিল। বাস্তবেই যদি এ ধরনের কিছু ঘটত, তাহলে আন্দালুসের ইতিহাস-সংকলনকারীগণ, যারা সংখ্যায় অনেক, এ ঐতিহাসিক তথ্যটি অবশ্যই উল্লেখ করতেন এবং বর্ণনা পরম্পরায় তা সংরক্ষণ করতেন, যেভাবে তারা জুলিয়ানের সহযোগিতার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন।

২. এমন কোন কারণ নেই যার ভিত্তিতে আমরা আন্দালুস বিজয়াভিযানে ইহুদিদের সম্পৃক্তির দাবিটি মেনে নেব; বিশেষত এ বিষয়টি সুস্পষ্ট জানার পর যে, এ বিজয়-পরিকল্পনা ছিল একান্তই নিখাদ একটি ইসলামী পরিকল্পনা, যা জুলিয়ান, গিত্শা-পরিবার বা ইহুদিদের সাহায্য-প্রস্তাব প্রদানের পূর্বেই করা হয়েছিল। হ্যাঁ, এটি স্বতন্ত্র বিষয় যে, অনন্যসাধারণ নেতৃত্বগুণের অধিকারী মুসা বিন নুসাইর অপূর্ব প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে আন্দালুস-ভূমি সম্পর্কে তুলনামূলক অধিক অবগত এসব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর তথ্য-সহায়তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন।

৩. মুসলমানদের আন্দালুস বিজয়াভিযানের পর্যায়ক্রমিক ঘটনাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করলে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, আন্দালুসে যে প্রচুরসংখ্যক ইহুদি বসবাস করত, মুসলমানগণ তা জানত-ই না। 'আখবারুন মাজমুআ' গ্রন্থের লেখক এলভিরা (Elvira) বিজয়ের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন,

> মুসলিম বাহিনী এলভিরা শহর অবরোধ করল। এরপর তা বিজিত হল। মুসলিম বাহিনী এ শহরে কিছু ইহুদিদের বসবাসরত দেখতে পেল।[৫০]

---

[৫০] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ। ২১-২২।

Scanned with CamScanner

'আলইহাতা ফী আখবারি গারনাতা' গ্রন্থের রচয়িতা লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব রহ. তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক এলভিরার গ্রানাডা অঞ্চল বিজয়ের ইতিহাস লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন,

> মুসলিম বাহিনী গ্রানাডা শহর অবরোধ করল এবং যুদ্ধের মাধ্যমে তা জয় করল। মুসলিম বাহিনী সেখানে কিছু ইহুদিকে বসবাসরত দেখতে পেয়ে গ্রানাডার দুর্গে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করল। মুসলিম বাহিনীর রীতি ছিল তারা কোন শহর জয় করার পর সেখানে কোন ইহুদি নাগরিক পেলে নগরীর দুর্গে তাদের থাকার ব্যবস্থা করত এবং দুর্গের নিরাপত্তার জন্য সেখানে একদল মুসলিম নাগরিকেরও থাকার ব্যবস্থা করত।[৫১]

এসব তথ্য আন্দালুস বিজয়ে ইহুদিদের সামান্য সম্পৃক্তির সম্ভাবনাও অস্বীকার করে। আন্দালুস বিজয়ে যদি ইহুদিদের কিঞ্চিৎ সম্পৃক্তিও থাকত, তাহলে মুসলিম অভিযাত্রীগণ আগে থেকেই জানত যে, কোন কোন অঞ্চলে ইহুদি নাগরিক পাওয়া যাবে। বিশেষত ঐতিহাসিকদ্বয়ের উল্লিখিত 'দেখতে পেল' শব্দ মুসলমানদের এ বিষয়ে পূর্বধারণা না থাকার দিকেই ইঙ্গিত করে এবং এ কথা বোঝায় যে, এ সাক্ষাৎ ধারণাতীত ঘটেছে।

৪. এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, ইহুদিরা স্বপ্রণোদিত হয়ে আন্দালুস বিজয়াভিযানের কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছিল। এর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীর এই গৌরবময় বিজয়ের কৃতিত্বকে হ্রাস করা। আন্দালুসী বাহিনীর তুলনায় মুসলিম বাহিনীর সৈন্য-সংখ্যা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও তারিক বিন যিয়াদ গোথ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছেন এবং যা তার বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে বহু গুণে বৃদ্ধি করেছে, তার মূল্যমান হ্রাস করাই ছিল ইহুদিদের লক্ষ্য।

---

[৫১] লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব, *আলইহাতা ফী আখবারি গারনাতা*, ১/১০১।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
তারিক বিন যিয়াদের আন্দালুস বিজয়

তরীফ বিন মালিক রহ.-এর সফল তথ্যসন্ধানী অভিযানের প্রায় এক বছর পর মুসা বিন নুসাইরের অভিযান পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি চূড়ান্ত হল। ৯২ হিজরীর শাবান মাসে[৫২] (৭১১ খৃস্টাব্দের জুন মাসে) মাত্র সাত হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত মুসলিম বাহিনী তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে আন্দালুসের উদ্দেশে রওয়ানা হল।

ইবনুল কার্দাবুস লিখেছেন,

> তারিক বিন যিয়াদের বাহিনীকে আন্দালুসের উদ্দেশে প্রেরণ করার সময় মুসা বিন নুসাইর কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন। তিনি তখন সিজদায় পড়ে অনুনয়-বিনয় করছিলেন এবং আল্লাহর কাছে মুসলিম বাহিনীর বিজয় কামনা করছিলেন।[৫৩]

তারিক বিন যিয়াদের অভিযান ও নৌযানে সমুদ্রপাড়ি

ইতিহাস-গ্রন্থগুলোতে আন্দালুস বিজয়ের ইতিহাস প্রসঙ্গে বারবার সেসব জাহাজের প্রসঙ্গ এসেছে, যেগুলোতে করে মুসলিম বাহিনী সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুস পৌঁছেছিল। সামনের আলোচনায় আমরা এসব নৌযান সম্পর্কিত লোকমুখে বহুল প্রচলিত ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের বাস্তবতা বিশ্লেষণ করব এবং এর সঙ্গে সিউটা-প্রশাসক জুলিয়ানের কতটুকু সংশ্লিষ্টতা ছিল, তাও পর্যালোচনা করব।[৫৪]

- মুসলমানগণ আন্দালুস বিজয়ের কয়েক দশক পূর্বেই উত্তর আফ্রিকার জনপদগুলোতে বিজয়াভিযান পূর্ণ করেছিলেন। আর এ তথ্যটি তো

---

[৫২] তারিক বিন যিয়াদ কোন মাসে জাবালে তারিক প্রণালী পাড়ি দিয়েছিলেন, তা নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বর্ণনাগত বিরোধ রয়েছে। ইবনুল আছীর, ইবনে আ'ষারী, যাহাবী ও মাক্কারীর মতে তিনি রজব মাসের ৫ তারিখে প্রণালী পাড়ি দিয়েছিলেন। অপরদিকে হিময়ারী ও ইবনুল খতীব অনির্দিষ্টভাবে রজব ও শাবান উভয় মাসের নাম উল্লেখ করেছেন।

[৫৩] আবদুর রহমান আলমাক্কী, *আততারীখুল আন্দালুসী*, পৃ : ৬৭-৬৮।

[৫৪] বিস্তারিত জানতে : প্রাগুক্ত, পৃ : ৪৭-৪৯।

Scanned with CamScanner

সর্বজনবিদিত যে, উত্তর আফ্রিকার উপকূল ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের যে কোন আক্রমণ থেকে এ অঞ্চলের প্রতিরক্ষার অনিবার্য দাবি ছিল মুসলমানগণ এর জন্য পর্যাপ্ত নৌযানের যোগান ও পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন। এ বিষয়টি ছিল একেবারেই প্রত্যাশিত। কারণ, তৎকালীন ইসলামী সালতানাতের সঙ্গে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত বৈরিতাপূর্ণ। কাজেই মুসলমানগণ নিজস্ব মালিকানাধীন নৌযানের ব্যবস্থা করবেন, এটাই ছিল পরিস্থিতির দাবি। কারও কাছ থেকে নৌযান চেয়ে নিয়ে তারা এ প্রয়োজন পূরণ করবেন, তৎকালীন পরিস্থিতি এ সম্ভাবনাকে মোটেও সমর্থন করে না।

- মুসলিম বাহিনী এর পূর্বেও উত্তর আফ্রিকায় নৌযুদ্ধ-তৎপরতা চালিয়েছিল। ৪৬ হিজরীতে মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ হযরত আবদুল্লাহ বিন কায়সকে সিসিলি (Sicily) অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। এটি ছিল সিসিলিতে পরিচালিত সর্বপ্রথম অভিযান। এটি হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাযি.-এর খেলাফতকালের ঘটনা।[৫৫]

- আফ্রিকা বিজয়ের পর থেকেই জাহাজ-নির্মাণশিল্পে মুসলমানদের গুরুত্ব প্রদান একটি ঐতিহাসিক স্বীকৃত বিষয়। উত্তর আফ্রিকার গভর্নর হাস্‌সান বিন নোমানের সময়ে (৭৬-৮৬ হিজরী) মুসলমানগণ তিউনিসিয়ায় একটি জাহাজ নির্মাণ-কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিল।

- হযরত উকবা বিন নাফে রাযি.-এর নেতৃত্বে ৬৩ হিজরীতে মুসলিম বাহিনী তানজা নগরী জয় করেছিল। আর তানজায় জাহাজনির্মাণ-উপযোগী একটি নৌবন্দর ছিল।

- তরীফ বিন মালিকের নেতৃত্বাধীন পাঁচ শ' সৈন্যের মুসলিম বাহিনী পূর্বের তথ্যসন্ধানী অভিযানে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য চারটি জাহাজ ব্যবহার করেছিল।[৫৬] প্রকৃতপক্ষে তারিক বিন যিয়াদও তার বাহিনীর জন্য এ জাহাজগুলোই ব্যবহার করেছিলেন।[৫৭] এ প্রসঙ্গে কোথাও জুলিয়ানের নাম আলোচনায় আসেনি। বরং কোন কোন বর্ণনায় সুস্পষ্ট ভাষায় এ

---

[৫৫] ইবনে খালদূন, তারীখে ইবনে খালদূন, ১/২৫৩।

[৫৬] লেখক অজ্ঞাত, আখবারুল মাজমূআ', পৃ। ১৬।

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ। ১৭।

Scanned with CamScanner

তথ্য উল্লেখ আছে যে, মুসা বিন নুসাইর বেশ কয়েকটি জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক মাক্কারী রহ. এক স্থানে লিখেছেন,

> মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদকে আন্দালুসে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকেই জাহাজ নির্মাণ শুরু করেন। তিনি বেশ কয়েকটি জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন। এসব জাহাজে করে তিনি তারিক বিন যিয়াদের বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য জানবাজ আরও পাঁচ হাজার যোদ্ধা প্রেরণ করেন। এর ফলে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বার হাজারে পৌঁছয়। এদের সঙ্গে মুসা বিন নুসাইরের নিকট নিরাপত্তাপ্রার্থী জুলিয়ান, তার নিজস্ব বাহিনী ও বিশিষ্ট কর্মকর্তাগণও ছিল। তিনি (আন্দালুসের) বিভিন্ন গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়ে মুসলিম বাহিনীকে সহায়তা করছিলেন।[৫৮]

অবশ্য কোন কোন বর্ণনামতে মুসলিম বাহিনী যে জাহাজগুলোর মাধ্যমে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল, সিউটা-প্রশাসক জুলিয়ানই সেগুলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।[৫৯] ইবনে আ'যারী 'আলবায়ানুল মুগরিব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

> সিউটা-শাসক জুলিয়ান তারিক বিন যিয়াদের সঙ্গীদের কাঠমিস্ত্রিদের বহনকারী জাহাজে করে পার করিয়েছিলেন। এসব জাহাজ নিয়মিত আন্দালুসে আসা-যাওয়া করত। আন্দালুসবাসী মুসলিম বাহিনীর আগমন সম্পর্কে কিছুই টের পায়নি। তারা মনে করেছিল, জাহাজে করে কাঠমিস্ত্রিরা আসা-যাওয়া করছে। নৌযানগুলো দলে দলে মুসলিম বাহিনীকে আন্দালুসে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।[৬০]

এ বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, জাহাজগুলো জুলিয়ানের ছিল না; বরং তার জানা-শোনা থাকায় তিনি এগুলো ভাড়া নিতে সহায়তা করেছিলেন।

- অন্যের কাছ থেকে নৌযান চেয়ে নিয়ে আন্দালুসের ন্যায় ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা সম্ভব নয়। বিশেষ করে সমুদ্র অভিযান ছিল মুসলমানদের কাছে একান্ত কাম্য বিষয়। আর তাই আন্দালুস অভিযানের প্রস্তুতি কয়েক বছর পূর্বেই শুরু করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এই দীর্ঘ প্রস্তুতির একটি বড় কারণ ছিল জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজের মালিকানা অর্জন।

---

[৫৮] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৫৭।

[৫৯] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার ফী খবারিল আক্তার*, পৃ : ৩৫।

[৬০] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব ফী আখবারিল আন্দালুসি ওয়াল মাগরিব*, ২/৬।

Scanned with CamScanner

এই সব পয়েন্টকে সামনে রেখে আমরা নিশ্চিত করেই বলতে পারি যে, আন্দালুস-অভিযানে মুসলমানদের ব্যবহৃত অধিকাংশ জাহাজ মুসলমানদেরই তৈরি ছিল, যা নিকটবর্তী কোন কারখানায় প্রস্তুত করা হয়েছিল অথবা দূরবর্তী বিভিন্ন জাহাজ-কারখানায় তৈরি করে নিয়ে আসা হয়েছিল।

আন্দালুস-ভূমিতে তারিক বিন যিয়াদ

মুসলিম বাহিনী রওয়ানা হল এবং জাহাজে করে প্রণালী পার হল। সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ প্রণালী পার হয়ে তীরবর্তী এক পাহাড়ে অবতরণ করলেন। তাই এ পাহাড়ের নাম হল 'জাবালে তারিক' আর প্রণালীটি পরিচিত হল 'জাবালে তারিক প্রণালী' নামে। তখন থেকে আজও পর্যন্ত এ পাহাড় এবং এ প্রণালী স্প্যানিশসহ সকল ভাষাতে এ নামেই পরিচিত। 'জাবালে তারিক' থেকে তারিক বিন যিয়াদ নিকটবর্তী এক বিস্তৃত এলাকায় পৌঁছলেন, যা আলজেসিরাস (Algeciras) বা জাযিরাতুল খাযরা (সবুজ উপদ্বীপ) নামে পরিচিত। এখানে মুসলিম বাহিনী আন্দালুসের দক্ষিণ অঞ্চলীয় বাহিনীর মুখোমুখি হল। এ বাহিনীটি ছিল আন্দালুসের মূল বাহিনীর একটি আঞ্চলিক শাখা ও সহায়ক বাহিনী। এটি শক্তিশালী কোন বাহিনী ছিল না।

ইসলামের বিধান অনুযায়ী তারিক বিন যিয়াদ প্রথমে তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন এবং জানালেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করলে মুসলমানগণ যেসব সুবিধাদি লাভ করে, সবই লাভ করবে এবং মুসলমানদের ওপর যেসব দায়িত্ব বর্তায়, তাদের ওপরও তা বর্তাবে। তখন তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের মালিকানা তাদেরই থাকবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে এবং তখনও তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের মালিকানা তাদেরই থাকবে। আর যদি তারা এ দু'টির একটিও গ্রহণ করতে সম্মত না হয়, তাহলে অনিবার্য পরিণতি হল যুদ্ধ। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাদের তিনদিনের বেশি অবকাশ দেওয়া হবে না।

কিন্তু ঠুলকো আত্মমর্যাদাবোধ তাদেরকে এসব প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধা দিল এবং তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হবে গেল। দু' পক্ষের মাঝে তীব্রতর যুদ্ধের পর আল্লাহ তাআ'লা তারিক বিন যিয়াদের বাহিনীকে বিজয় দান করলেন।

Scanned with CamScanner

পরাজিত বাহিনীর প্রধান টুডমির তৎক্ষণাৎ আন্দালুস-শাসক রডারিকের কাছে জরুরী বার্তা প্রেরণ করল। রডারিক এ সময় তৎকালীন আন্দালুসের রাজধানী টলেডোতে[৯১] অবস্থান করছিলেন। বার্তায় টুডমির লিখল,

> মহামান্য রডারিক! আমাদের রক্ষা করুন। আমরা এমন এক জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছি, জানি না, তারা কি মর্ত্যলোকের কেউ, না আকাশ ফুঁড়ে নেমে আসা অপার্থিব কোন জাতি? বাস্তবতা হল, তারা আমাদের মাতৃভূমিতে এসেছে এবং আমরা তাদের মুখোমুখি হয়েছি। রাষ্ট্রভূমি রক্ষা করতে চাইলে আপনি নিজে তাদের মোকাবেলায় দ্রুত ছুটে আসুন।[৯২]

বাস্তবেই তাদের দৃষ্টিতে মুসলিম বাহিনী ছিল দুর্বোধ্য এক জাতি। সারা জীবন তারা দেখে এসেছে, বহিরাগত কোন বাহিনী কোন নগরী জয় করলে কিংবা অবরোধ করলে তাদের মূল লক্ষ্য থাকে নগরীর মূল্যবান ধন-সম্পদ লুট করা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাগরিকদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা ইত্যাদি। বিজয়ী বাহিনী এসব কিছু না করে তাদেরকে আপন ধর্মের দাওয়াত দেবে এবং দাওয়াত গ্রহণ করলে কিংবা জিযিয়া প্রদান করলে তাদের 'জান-মান-সামান' সবই নিরাপদ থাকবে; বরং বিজয়ী বাহিনী তাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে শত্রু-আক্রমণ প্রতিহত করবে, এমন প্রস্তাব তারা নিজেরা শোনা দূরে থাক, তাদের জাতি-ইতিহাসে কখনো ঘটেনি।

পাশাপাশি তারা নবআগন্তুক এ জাতির রণকুশলতা, গভীর রাতের রোনাজারি ও সিজদায় লুটিয়ে পড়ার দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই সেনাপতি টুডমির রডারিকের কাছে পাঠানো বার্তায় নিজেকেই যেন প্রশ্ন করছিল– এরা কি মাটির পৃথিবীর কেউ, না আকাশ ফুঁড়ে নেমে আসা অপার্থিব কোন জাতি? বস্তুত সে এক শাশ্বত সত্য কথাই উচ্চারণ করেছে। মুসলিম বাহিনী তো আল্লাহর সৈনিক, আসমানী জামাত, অপার্থিব এক কাফেলা। কোরআনের ভাষায়,

﴿ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

তারা আল্লাহর দল। স্মরণ রেখো, আল্লাহর দলই কৃতকার্য হয়। [সূরা মুজাদালা : ২২]

---

[৯১] আরবী নাম طليطلة (তুলাইতিলা)। (অনুবাদক)

[৯২] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৪।

Scanned with CamScanner

আন্দালুস অভিযানের প্রাথমিক বিজয়সমূহ

যখন আন্দালুসের উত্তর প্রান্তে অবস্থানরত রডারিকের কাছে তারিক বিন যিয়াদের আগমন-সংবাদ পৌঁছল, প্রথমে তিনি মোটেই বিচলিত হলেন না। তার ধারণা ছিল এটি সম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে আগমনকারী কোন শত্রু বাহিনীর সাময়িক অভিযান। তাই বিষয়টি ঘোরতর যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াবে না; বরং সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই তারা পিছুটান দেবে বা সমূলে ধ্বংস হবে। কিন্তু যখন তার কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, মুসলিম বাহিনী কর্ডোভার[৩৩] দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন তিনি দ্রুত সৈন্যসমাবেশ ঘটালেন এবং তার ভায়ে বেনশিয়োর নেতৃত্বে মুসলমানদের প্রতিহত করার জন্য শক্তিশালী একটি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করলেন। বেনশিয়ো ছিল রডারিকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। সবুজ উপদ্বীপের সন্নিকটে উভয় বাহিনীর মধ্যে লড়াই হল। কিন্তু এবারও খৃস্টান বাহিনী পরাজিত হল এবং তাদের সেনাপতি বেনশিয়ো নিহত হল। বেঁচে যাওয়া সৈনিকরা রডারিককে যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং দক্ষিণ দিক থেকে ধেয়ে আসা আসন্ন বিপদের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করতে উত্তর দিকে পালিয়ে গেল।[৩৪]

বারবাত প্রান্তরের ঐতিহাসিক যুদ্ধ ও আন্দালুস বিজয়

পলাতক-পরাজিত সৈনিকদের বার্তা পেয়ে রডারিকের মাথায় যেন বজ্রপাত হল। ক্রোধে তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন। দাম্ভিক রডারিক তৎক্ষণাৎ এক লক্ষ অশ্বারোহীর এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করলেন[৩৫] এবং তাদেরকে নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করতে দক্ষিণে রওয়ানা হলেন। তারিক বিন যিয়াদের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র সাত হাজার, যাদের অধিকাংশই ছিল পদাতিক। হাতেগোনা কয়েকজন ব্যতীত কারও সঙ্গে ঘোড়া ছিল না। রডারিকের বিশাল বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তারিক চিন্তায় পড়ে

---

[৩৩] আরবী নাম قرطبة (কুরতুবা)। (অনুবাদক)

[৩৪] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব ফী আখবারিল আন্দালুসি ওয়াল মাগরিব*, ২/৮ ও মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ৩৭-৩৮।

[৩৫] রডারিক-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সর্বনিম্ন ধারণা মতে তার সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪০ হাজার, যেমনটি ইবনে খালদুন উল্লেখ করেছেন; আর সর্বোচ্চ ধারণা হল ৬ লক্ষ, যেমনটি হিময়ারী উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক মাক্কারী ও আধুনিক গবেষক হুসাইন মুনিস-এর মতে রডারিক বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ।

Scanned with CamScanner

গেলেন। এক লক্ষের সামনে মাত্র সাত হাজার! এ যে এক অসম লড়াই! তিনি মুসা বিন নুসাইরের কাছে সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠালেন। বার্তা পেয়ে মুসা বিন নুসাইর তরীফ বিন মালিকের নেতৃত্বে জাহাজযোগে আরও পাঁচ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন।[৬৬]

তরীফের বাহিনী যুক্ত হওয়ায় তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা হল বার হাজার। এবার তারিক বিন যিয়াদ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি যুদ্ধের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করলেন। তার দৃষ্টিতে বারবাত উপত্যকা (de Guadalete)[৬৭] যুদ্ধের জন্য সবচে' উপযুক্ত বিবেচিত হল।

স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারিক বিন যিয়াদ গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামরিক ও কৌশলগত বিষয় বিবেচনা করেছিলেন। এ উপত্যকার পেছনদিক ও ডানদিকে ছিল সুউচ্চ পাহাড়। ফলে মুসলিম বাহিনীর পৃষ্ঠদিক ও ডানদিক নিরাপদ হয়ে গেল এবং এই দু'দিক থেকে কোন আক্রমণের আশঙ্কা রইল না। বামদিকে ছিল একটি প্রাকৃতিক হ্রদ। ফলে এ দিকটিও পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে গেল। এরপর তিনি বাহিনীর শক্তিশালী একটি অংশকে তরীফ বিন মালিকের নেতৃত্বে উপত্যকার দক্ষিণ প্রবেশমুখে (অর্থাৎ মূল বাহিনীর পেছনে) মোতায়েন করলেন, যেন কোন শত্রু-সৈন্য আকস্মিকভাবে মুসলমানদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে। এভাবে খৃস্টান বাহিনীর প্রবেশ করার জন্য উপত্যকার কেবল সামনের দিক খোলা রইল এবং বাকি তিন পাশে সৈন্য সমাবেশের সব ধরনের পথ বন্ধ হয়ে গেল।

দূর দিগন্তে রডারিক-বাহিনীর সুবিশাল অবয়ব ধীরে ধীরে দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। রডারিক নিজেই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। মাথায় স্বর্ণের মুকুট পরিধান করে এবং স্বর্ণখচিত পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে প্রবল প্রতাপে রডারিক যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি উপবিষ্ট ছিলেন স্বর্ণের তৈরি একটি সিংহাসনের উপর, দু'টি খচ্চর মিলে যা টেনে আনছিল।[৬৮] এই কঠিন মুহূর্তেও তিনি তার বিলাসী জীবন থেকে বের হতে পারেননি! সঙ্গে নিয়ে এসেছেন এক লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী। সঙ্গে করে আরও এনেছেন কয়েক খচ্চর বোঝাই দড়ি! কারণ তার ধারণামতে এই অসম যুদ্ধে

---

[৬৬] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমুআ'*, পৃ: ১৭ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩২।

[৬৭] কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থে একে লুক্কা বা লিকা উপত্যকাও বলা হয়েছে।

[৬৮] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৭।

Scanned with CamScanner

তার জয় সুনিশ্চিত, আর পরাজয়ের পর মুসলিম বাহিনীর পরাজিত সৈন্যদের ক্রীতদাস হিসেবে বেঁধে নিয়ে যেতে দড়ি তো লাগবেই! তাই এই আগাম প্রস্তুতি! রডারিক ভাবছিলেন, যুদ্ধের ফলাফল তো নির্ধারিত হয়েই আছে। মুখে যেমন সগর্বে উচ্চারণ করছিলেন, আকারে-ইঙ্গিতেও বোঝাচ্ছিলেন যে, এক লক্ষ সৈন্যের সামনে বার হাজারের এই ক্ষুদ্র বাহিনী তো করুণার পাত্র!

৯২ হিজরীর ২৮ রমযান মোতাবেক ৭১১ খৃস্টাব্দের ১৯ জুন তারিখে বারবাত উপত্যকায় উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল। শুরু হল মুসলমানদের সুদীর্ঘ যুদ্ধ-ইতিহাসের অন্যতম অসম যুদ্ধ।

বারবাত যুদ্ধক্ষেত্রের উভয় পক্ষের দিকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকালে যে কারও অন্তরেই মুসলিম বাহিনীর প্রতি করুণা জাগবে। যাদের সৈন্যসংখ্যা কোনমতেই বার হাজারের বেশি হবে না, তারা কী করে পুরো এক লক্ষ সৈন্যের মোকাবেলায় ময়দানে অবতীর্ণ হল?! বারবার এ প্রশ্নই মনে জাগবে যে, জয় দূরে থাক, এরা লড়াই করবে কীভাবে?!

দুই পক্ষের প্রকৃত তুলনা

কিন্তু বাস্তবতা হল, সংখ্যা ও শক্তিগত এই সুস্পষ্ট ব্যবধান থাকার পরও একজন বিশ্লেষক দর্শকের দৃষ্টিতে বরং মনে হবে, মুসলিম বাহিনী নয়, করুণার পাত্র আসলে এক লক্ষ সৈন্যবিশিষ্ট গোথ খৃস্টান বাহিনী-ই!

ভালো করে দেখুন উভয় পক্ষের পরিচিতি। প্রভু-পরিচয় নিয়ে বিবাদমান দু' পক্ষ! আল্লাহু আকবার! দু' পক্ষের মাঝে কত পার্থক্য! এক পক্ষ বের হয়েছে স্বেচ্ছায়, সম্পূর্ণ নিজেদের ইচ্ছায়; দ্বীনের জন্য লড়াইয়ের প্রবল আগ্রহ নিয়ে; আর অন্য পক্ষ বের হয়েছে বাধ্য ও নিরুপায় হয়ে।

কত পার্থক্য দু' দলের মাঝে! এক পক্ষ রণক্ষেত্রে সমবেত হয়েছে আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করার স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষা বুকে ধারণ করে, আপন আকীদা ও বিশ্বাসের তরে জীবনকে অতি তুচ্ছ জেনে, জাগতিক সকল বন্ধন ও মুনাফা-চিন্তার ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়ে। তাদের শ্রেষ্ঠতম তামান্না আল্লাহর পথে শাহাদাত। আরেক পক্ষ জানেই না শাহাদাতের অর্থ কী, জীবনের মানে কী এবং এ জীবন কার তরে নিবেদিত। তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য কেবল নিজেদের পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্ভতির কাছে প্রত্যাবর্তন।

কত পার্থক্য দু' দলের মাঝে! এক দল দাঁড়িয়ে আছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাযের মতো এক কাতারে; ধনী দরিদ্রের পাশে, বড় ছোটর কাছে, শাসক

Scanned with CamScanner

প্রজার সঙ্গে; কোন বিভেদ নেই। আরেক দল? কেউ কারও প্রভু, কেউ কারও দাস! একই দলের মাঝে কত বিভেদ, কত বিভাজন!

এক পক্ষের নেতৃত্বে আছেন তারিক বিন যিয়াদ নামের মহান এক ধার্মিক সেনাপতি, যার মাঝে সমাবেশ ঘটেছে তাকওয়া ও খোদাভীতির, সামরিক দক্ষতা ও রণকুশলতার, বীরত্ব ও দয়ার্দ্রতার, আত্মবিলোপ ও নির্মোহতার। আরেক পক্ষের নেতৃত্বে আপন শক্তিমত্তায় উন্মাদ দাম্ভিক এক শাসক, যিনি জীবন কাটাচ্ছেন ভোগ-বিলাসের মাঝে; অথচ তার প্রজারা দিন গুজরান করছে চরম দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে; চাবুকের আঘাতে ও ক্ষুধার কষাঘাতে যাদের পিঠ-পেট ক্ষত-বিক্ষত।

এক পক্ষ যুদ্ধজয়ের পর লাভ করবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের চার-পঞ্চমাংশ, অপর পক্ষ কিছুই পাবে না। তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যাবে এক দাম্ভিক শাসকের শোষণের রাজত্বে। যেন, তাদের শাসক একাই যুদ্ধ করেছেন!

এক পক্ষকে সাহায্য করবেন তাদের প্রভু ও প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যিনি বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, বিশ্ব অধিপতি। অপর পক্ষ তো লড়াই করতে নেমেছে স্রষ্টার বিরুদ্ধে, ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে তার বিধান ও শরীয়তের প্রতি!

এককথায় এক দিকে পরকালে বিশ্বাসী শক্তি, আরেক দিকে পার্থিব চেতনায় আচ্ছন্ন শক্তি। এবার বলুন, কারা করুণার পাত্র?

কাদের প্রতি করুণা করবেন, স্বয়ং আল্লাহ যেখানে ইরশাদ করেছেন,

﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই জয়যুক্ত হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি শক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। [সূরা মুজাদালা : ২১]

কারা করুণার হকদার, যেখানে রাব্বে কারীমের ঘোষণা,

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

এবং আল্লাহ মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের (চূড়ান্ত বিজয়ের) কোন পথ রাখবেন না। [সূরা নিসা : ১৪১]

সুতরাং যুদ্ধের ফলাফল তো নির্ধারিত হয়েই আছে! এ যেন যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই মীমাংসিত এক যুদ্ধ!

Scanned with CamScanner

বারবাত উপত্যকা ও রমযান মাস

এভাবেই পবিত্র মাহে রমযানে বারবাত উপত্যকায় শুরু হল বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসম আর সুন্নাতুল্লাহর বিবেচনায় মীমাংসিত এক যুদ্ধ। যুদ্ধ শুরু হল রোযা ও কোরআন নাযিলের মাসে। মাহে রমযানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত যুদ্ধ-ইতিহাস! কত অভিযান ও বিজয়ের দাস্তান!

টানা আটদিন ধরে চলল প্রচণ্ড লড়াই, উভয় বাহিনীর মাঝে রক্তক্ষয়ী ভয়ানক এক যুদ্ধ। খৃস্টান বাহিনী প্রবল ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়তে লাগল মুসলিম বাহিনীর উপর। কিন্তু মুসলিম বাহিনী যেন সীসাঢালা প্রাচীর; দৃঢ় মনোবলে অটল-অবিচল। এ যেন,

﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

> এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তাদের নযরানা আদায় করেছে এবং আছে এমন কিছু লোক, যারা এখনও প্রতীক্ষায় আছে, আর তারা (তাদের ইচ্ছার ভেতর) কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটায়নি। [সূরা আহযাব : ২৩]

আটদিন একটানা যুদ্ধ চলার পর মুসলিম বাহিনীর নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হল। আল্লাহ তাআ'লা পাহাড়সম অটলতা ও নির্ভেজাল ঈমানী পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের বিনিময়ে মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করলেন। তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে মুসলমানগণ বীরত্বের এমন এক মহাকাব্য রচনা করল, যার নমুনা মাগরেব ও আন্দালুস-ভূমি ইতঃপূর্বে প্রত্যক্ষ করেনি।

একটানা আটদিন ধরে চলেছে তরবারির সংঘাত, প্রতিদিন নিহত কিংবা শহীদ হয়েছে উভয় পক্ষের কত যোদ্ধা! গোথ বাহিনী লড়াই করেছে বীর বিক্রমে, প্রবল প্রতাপে। কিন্তু যে ঈমানী দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মুসলিম বাহিনী লড়াই করেছে, আস্থা রেখেছে নুসরতে ইলাহীর উপর, তার সামনে কীভাবে টিকবে গোথ বাহিনীর বীরত্ব ও প্রতাপ! ঐতিহাসিক ইবনে আ'যারী রহ. বারবাতের রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর চিত্র

Scanned with CamScanner

এভাবে তুলে ধরেছেন,

> তারিক বিন যিয়াদ তার পদাতিক বাহিনী নিয়ে খৃস্টান বাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। মুসলিম বাহিনীর অল্প কয়েকজন ব্যতীত কেউ অশ্বারোহী ছিল না। তারা সবাই এমনভাবে লড়াই করতে লাগল, যেন এ যুদ্ধই চূড়ান্ত যুদ্ধ।[৬৯]

ঐতিহাসিক মাক্কারী রহ. 'নাফহুত তীব' গ্রন্থে লিখেছেন,

> রমযান শেষ হওয়ার দু' দিন পূর্বে রবিবার যুদ্ধ শুরু হল। শাওয়াল মাসের পাঁচ তারিখ রোববার পর্যন্ত একটানা আট দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলল। তারপর আল্লাহ তাআ'লা মুশরিক বাহিনীর প্রতিরোধ শক্তি ভেঙে দিলেন। তাদের বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হল। নিহত মুশরিক সৈন্যদের অস্থি ও মাংসে দীর্ঘদিন এ রণাঙ্গনের শোভা (!) হয়ে পড়ে ছিল।[৭০]

রডারিকের পরিণতি সম্পর্কে ইতিহাস-গ্রন্থগুলোতে দু' রকম মত পাওয়া যায়। কারও কারও মতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হয়েছিলেন। বিপরীত আরেকটি মত হল তিনি পালিয়ে উত্তর দিকে চলে গিয়েছিলেন। বাস্তবতা যাই হোক, বারবাত যুদ্ধের পর রডারিক চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেলেন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে।

বারবাত যুদ্ধে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফলাফল

১. এ যুদ্ধের মাধ্যমেই আন্দালুসে জুলুম-অন্যায়, জাহিলিয়্যাত-মূর্খতা এবং অনাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার দীর্ঘ ইতিহাসের পাতা উল্টে সূচিত হয় সভ্যতা ও সমৃদ্ধির এক নব দিগন্ত।

২. মুসলিম বাহিনী অশ্ব-সম্পদসহ প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করে। ফলে পদাতিক বাহিনী অশ্বারোহী বাহিনীতে পরিণত হয়।

৩. যুদ্ধের পূর্বে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল বার হাজার। যুদ্ধ শেষে এদের মধ্য হতে জীবিত ছিলেন নয় হাজার। তিন হাজার শহীদ বীর যোদ্ধা তাদের অমূল্য রক্তে সিঞ্চিত করেন আন্দালুস-ভূমি আর এ অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেন তাদের ঈমানী আমানত। আল্লাহ পাক ইসলামের এই মহান সৈনিকদের ইসলামের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

---

[৬৯] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব ফী আখবারিল আন্দালুসি ওয়াল মাগরিব*, ২/৭।
[৭০] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৫৯।

Scanned with CamScanner

তারিক বিন যিয়াদের ভাষণ প্রসঙ্গ[৭১]

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান 'ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান' গ্রন্থে এবং মাক্কারী 'নাফহুত তীব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রডারিক-বাহিনী মুসলিম বাহিনীর নিকটবর্তী হলে তারিক বিন যিয়াদ মুসলিম বাহিনীর সামনে দণ্ডায়মান হলেন এবং প্রথমে আল্লাহ তা'আলার শানে হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। এরপর তিনি মুসলিম বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করে বললেন,

أيها الناسُ أين المفرُّ؟ البحر مِنْ ورائكم، والعدوُّ أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيعُ من الأيتام في مأدبة اللئام، وقد استقبلكم عدوّكم بجيشه وأسلحته، وأقواته موفورة، وأنتم لا وزر لكم إلّا سيوفكم، ولا أقوات إلّا ما تستخلصونه من أيدي عدوّكم، وإن امتدّت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرًا ذهبتْ ريحكم، وتعوّضتِ القلوب من رعبها منكم الجراءة عليكم، فادفعوا عن أنفسكم خذلانَ هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية، فقد ألقتْ به إليكم مدينتُه الحصينة، وإنّ انتهاز الفرصة فيه لممكنٌ إنْ سمحتم لأنفسكم بالموت، وإنّي لم أحذّركم أمرًا أنا عنه بنجوة، ولا حملتُكم على خطةٍ أرخص متاعٍ فيها النفوس إلا وأنا أبدأ بنفسي، واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشقّ قليلًا، استمعتم بالأرفه الألذّ طويلًا، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي، فما حظكم فيه بأوفى من حظي، وقد بلغكم ما أنشأتْ هذه الجزيرة من الحور الحسان، من بنات اليونان، الرافلات في الدرّ والمرجان، والحلل المنسوجة بالعقيان، المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان، وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أميرُ المؤمنين من الأبطال عربانًا، ورضيكم لملوك هذه الجزيرة صهارًا وأختانًا، ثقةً منه بارتياحكم للطعان، واستماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان، ليكون حظه منكم ثواب الله على

---

[৭১] প্রাগুক্ত, ৭ : ৫৯-৬১।

Scanned with CamScanner

إعلاء كلمته، وإظهار دينه بهذه الجزيرة، وليكون مغنمها خالصةً لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم، والله تعالى ولي إنجادكم على ما يكون لكم ذكرًا في الدارين، واعلموا أني أوّل مجيب إلى ما دعوتكم إليه، وأني عند مُلْتَقَى الجَمْعَيْنِ حاملٌ بنفسي على طاغية القوم لذريق، فقاتلُه إن شاء الله تعالى، فاحملوا معي، فإن هلكتُ بعده، فقد كفيتُكم أمره، ولم يعوزكم بطلٌ عاقل تسندون أموركم إليه، وإن هلكتُ قبلَ وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه، احملوا بأنفسكم عليه، واكتفوا الهمّ من فتح هذه الجزيرة بقتله، فإنهم بعده يخذلون.

আমার ভাইয়েরা! পালাবার পথ কোথায়?! তোমাদের পেছনে উত্তাল সমুদ্র, আর সামনে উন্মত্ত দুশমন। আল্লাহর শপথ, নিঃসন্দেহে এটি (আল্লাহর প্রতি) নির্ভেজাল আনুগত্য প্রদর্শন ও অটল-অবিচল থাকার চূড়ান্ত পরীক্ষা।

মনে রেখো, কৃপণের দস্তরখানে উপবিষ্ট এতিম-অনাথ শিশুদের চেয়েও তোমরা এ ভূখণ্ডে বেশি অসহায়। শত্রুবাহিনী তোমাদের মোকাবেলা করার জন্য নিজেদের পূর্ণ অস্ত্রবল ও জনবল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। তাদের কাছে যথেষ্ট রসদপত্র আছে। পক্ষান্তরে তরবারি ছাড়া তোমাদের কোন সহায় নেই। তোমাদের খাদ্যসামগ্রী কেবল তা-ই, যা তোমরা শত্রুবাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে। যদি খাদ্যাভাবের এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় আর এ সময়ের মধ্যে তোমরা উল্লেখযোগ্য কোন সফলতা অর্জন করতে না পার, তাহলে শত্রুপক্ষের অন্তরে তোমাদের প্রতি যে প্রভাব-ভীতি রয়েছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং পরিবর্তে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। সুতরাং (এ ধরনের পরিস্থিতি হতে রক্ষা পেতে চাইলে তোমাদের কর্তব্য হল) তোমরা এই উদ্ধত শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদেরকে লাঞ্ছনাকর পরিণতি হতে রক্ষা করো। নিজের সুরক্ষিত ভূখণ্ড তাকে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্ররোচিত করেছে। তোমরা যদি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ময়দানে অবতীর্ণ হতে পার, তাহলে এ সুযোগ তোমরা কাজে লাগাতে পারবে।

Scanned with CamScanner

আমি তোমাদেরকে এমন পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করছি না, যা থেকে আমি নিজে মুক্ত এবং এমন কাজের প্রতিও উদ্বুদ্ধ করছি না, যার মধ্যে সবচে' সস্তা পুঁজি হল মানব-প্রাণ। আমি যে বিষয়ে তোমাদের উৎসাহিত করছি, তার সূচনা আমি নিজ হাতেই করব। স্মরণ রেখো, আজকের এই কঠিন দিনের সামান্য সময়ের অটলতা দীর্ঘকালের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। সুতরাং তোমরা ভেবো না, আজকের যুদ্ধে আমার চেয়ে তোমাদের ঝুঁকি ও আশঙ্কা বেশি।

তোমরা নিশ্চয়ই জেনেছ যে, এ দ্বীপের মুকুটধারী নৃপতিদের প্রাসাদে আবদ্ধ আছে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণের বুনন-পোশাকে সুসজ্জিত সুন্দরী হুর গ্রিক রমণী। (খলীফা) ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক বহু বীর যোদ্ধাদের মধ্য হতে তোমাদেরকে নির্বাচন করেছেন এবং এ দ্বীপের নৃপতিদের বর-জামাতা হিসেবে তোমাদের পছন্দ করেছেন। তিনি তোমাদের প্রতি আস্থাশীল যে, তোমরা রণাঙ্গনের সঙ্গীন পরিস্থিতিতেও আনন্দ খুঁজে নেবে এবং প্রতিপক্ষের বীর-বাহাদুরদের মোকাবেলায় প্রশান্তি লাভ করবে। তিনি কেবল এ আশাই করেন যে, এই দ্বীপে আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার এবং তার দ্বীনকে বিজয়ী করার নেক আমলের সাওয়াবে তিনি তোমাদের অংশীদার হবেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তো কেবল তোমাদের জন্য; খলীফাতুল মুসলিমীন বা (তোমরা ছাড়া) অন্য মুসলমানগণ তাতে অংশীদার হবেন না।

আল্লাহ তাআ'লার সাহায্য সর্বদা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত। তোমাদের এই মহান কীর্তি উভয় জগতে তোমাদের চির অম্লান করে রাখবে। মনে রেখো, যার প্রতি আমি তোমাদের আহ্বান করছি, তাতে সর্বপ্রথম সাড়া আমিই দেব। আমি এ সংকল্পও করেছি যে, যুদ্ধ শুরু হওয়া-মাত্র আমি হামলা চালাব এ জাতির স্বৈরাচার শাসক রডারিকের উপর। ইনশাআল্লাহ, আমিই তাকে হত্যা করব। আমার সঙ্গে তোমরাও তখন হামলা করবে। রডারিকের ইহলীলা সাঙ্গ হওয়ার পর আমি যদি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে তো আমি তোমাদেরকে তার ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত করেই দিলাম। তখন তোমাদের মধ্যে বীর-সাহসী ও দূরদর্শী ব্যক্তির অভাব হবে না, যাকে তোমরা নিজেদের নেতা হিসেবে বরণ করে নেবে। আর যদি রডারিকের নাগাল পাওয়ার পূর্বেই আমার মৃত্যু এসে যায়, তাহলে তোমাদের কর্তব্য,

Scanned with CamScanner

আমার এ সংকল্প বাস্তবায়নে তোমরা আমার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং সবাই মিলে তাকে হত্যার চেষ্টা করবে। পুরো দ্বীপ বিজয়ের চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু রডারিককে হত্যার চেষ্টা করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে। কারণ, তার মৃত্যু শত্রুবাহিনীর মনোবল ভেঙে দেবে।[৭২]

এই ভাষণের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে আমাদের অবস্থান[৭৩]

১. পূর্বতন ও পরবর্তী যুগের (আন্দালুস বিজয়ের) ইতিহাস-সংকলকগণ কেউ-ই এ ভাষণের কথা উল্লেখ করেননি, যা ভাষণটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের অনবগতির সুস্পষ্ট বার্তা বহন করে। আর এর ফলে এর ঐতিহাসিক সত্যতার সম্ভাবনাও হ্রাস পেয়ে যায় কিংবা নিঃশেষ হয়ে যায়।

২. ভাষণটির বাক্য ও বর্ণনাশৈলী হিজরী প্রথম শতকে প্রচলিত আরবী-শৈলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া একজন সেনাপতি তার যুদ্ধপূর্ব ভাষণে পরিশীলিত ও ছন্দবদ্ধ ভাষা ব্যবহার করবেন, এ বিষয়টিও অস্বাভাবিক।

৩. উল্লিখিত ভাষণে একটি বাক্য আছে– 'ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক আরব বেদুঈনদের মাঝ থেকে তোমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন'। অথচ আন্দালুস অভিযানের জন্য উপযুক্ত যোদ্ধাদের বাছাই ও নির্বাচন আফ্রিকা-প্রশাসক মুসা বিন নুসাইর কর্তৃক হয়েছিল, খলীফা ওয়ালিদ কর্তৃক নয়।

৪. পরিস্থিতির দাবি ছিল এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভাষণ হবে পরিস্থিতি-উপযোগী কোরআনের আয়াত, হাদীসে রাসূল, যুদ্ধকৌশল সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা ও ইসলামী তাৎপর্যসমৃদ্ধ।

৫. তারিক বিন যিয়াদ নিজে যেমন আমাজিগ গোত্রীয় ছিলেন, মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন আমাজিগ গোত্রের। সুতরাং প্রদত্ত ভাষণ তাদের ভাষায় হওয়াই ছিল সঙ্গত। কেননা, আমাজিগ গোত্রের অধিবাসীদের আরবীর মান উন্নত না হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

---

[৭২] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৫/৩২১-৩২২ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৪০-২৪১।

[৭৩] আবদুর রহমান আলহাজ্জী, *আতলাসুল আন্দালুসী*, পৃ : ৫৯-৬১।

Scanned with CamScanner

তারিক বিন যিয়াদের নৌবহর জ্বালিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গ

বারবাত প্রান্তরে সংঘটিত ঐতিহাসিক যুদ্ধের আলোচনা শেষে পরবর্তী প্রসঙ্গে যাওয়ার পূর্বে আমরা আরেকটি বিষয়ে পর্যালোচনা করতে চাচ্ছি। ঐতিহাসিক এ প্রসঙ্গটি ইউরোপীয় ইতিহাসের পাতায় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে এবং ইসলামী ইতিহাসের পাতায় প্রাসঙ্গিকভাবে বিবৃত হয়েছে। আর তা হল, বারবাত প্রান্তরে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক সেসব নৌযান পুড়িয়ে ফেলার ঘটনা, যাতে আরোহণ করে মুসলিম বাহিনী আবালে তারিক প্রণালী পাড়ি দিয়েছিল এবং আন্দালুস-ভূমিতে অবতরণ করেছিল।

এর তাৎপর্য হিসেবে বর্ণিত আছে যে, মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ-স্পৃহা বৃদ্ধি করতে এবং তাদেরকে মরণপণ লড়াইয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেই মূলত তারিক বিন যিয়াদ সবগুলো জাহাজ পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। এ কারণেই পরবর্তী ভাষণে তিনি বলেছিলেন,.'তোমাদের পেছনে উত্তাল সমুদ্র, আর সামনে উন্মত্ত দুশমন। সুতরাং তরবারি ছাড়া তোমাদের কোন সহায় নেই।'

ঐতিহাসিকগণের অনেকেই এ বর্ণনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন, আবার অনেকে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একে জাল ও বানোয়াট বলেছেন। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা এ বর্ণনাটিকে একটি জাল বর্ণনা বলে গণ্য করেছি। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হল,

১. ইসলামী ইতিহাসে এ বর্ণনাটির বিশুদ্ধ কোন সনদ নেই। অথচ ইসলামী জ্ঞান-শাস্ত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্যই হল, এর প্রতিটি বর্ণনা ইলমুর রিজাল (বর্ণনাকারীর পরিচয় নির্ণয়-শাস্ত্র) ও ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল (বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা-অনির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়-শাস্ত্র)-এর নিক্তিতে বিশুদ্ধ। অর্থাৎ কোন একটি বর্ণনা তখনই আমরা বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃতি দেব, যখন তা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণের পরম্পরায় আমাদের কাছে পৌঁছবে। আলোচ্য বর্ণনাটি ইসলামী ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহে কখনোই বর্ণিত হয়নি। বর্ণনাটি আমাদের ইতিহাস-গ্রন্থগুলোতে স্থান পেয়েছে বারবাত যুদ্ধ সম্পর্কে লিখিত ইউরোপীয় বিভিন্ন বর্ণনা ও উৎসগ্রন্থ থেকে।

২. যদি বাস্তবেই এমন কিছু ঘটত এবং তারিক বিন যিয়াদ নৌযানগুলো জ্বালিয়ে দিতেন, তাহলে প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসা বিন নুসাইর বা খলীফা

Scanned with CamScanner

ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে অবশ্যই তারিক বিন যিয়াদের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হত, এ বিষয়ে মূসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদের মতবিনিময়ের কোন বিবরণ ইতিহাস-গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যেত; উম্মাহর প্রাজ্ঞ আলিমবৃন্দ এ ধরনের কাজের বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, যেসব ঐতিহাসিক উৎসসমূহে এ বর্ণনা এসেছে, কোথাও এ ধরনের কোন প্রতিক্রিয়ার বিবরণ নেই, যা এ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে বড় ধরনের সংশয় সৃষ্টি করে।

৩. ইউরোপীয় ঐতিহাসিক উৎসগ্রন্থসমূহে এ বর্ণনাটি ব্যাপক প্রচার পেয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ ভেবেই পান না যে, মাত্র বার হাজার পদাতিক মুসলিম সৈন্য কীভাবে এক লক্ষ অশ্বারোহী খৃস্টান-গোথ সৈন্যকে তাদের মাতৃভূমিতে, তাদেরই পরিচিত অঙ্গনে পরাজিত করল? এই অভাবনীয় বিজয়ের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করতে গিয়েই তারা বলেন, তারিক বিন যিয়াদ এ উদ্দেশ্যে জাহাজগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, যেন মুসলমানগণ অনিবার্য দুই পরিণতির মুখোমুখি হয়; পালাতে গেলে অথৈ সমুদ্রে সলিল সমাধি আর যুদ্ধ করতে চাইলে সম্মুখে বিদ্যমান খৃস্টান বাহিনীর হাতে অত্যাসন্ন মৃত্যু। উভয় ক্ষেত্রেই যেহেতু মৃত্যু সুনিশ্চিত, তাই কঠিন এই সমীকরণের একমাত্র সমাধান হল জান বাজি রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করে যাওয়া। একমাত্র তাহলেই চতুর্দিক থেকে ঘিরে থাকা মৃত্যুকে এড়ানো সম্ভব হবে। মূলত এই 'জান বাজি রেখে লড়াই'-এর ফলেই মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করেছে। পশ্চাদ্‌গমনের সামান্য সুযোগ থাকলেও মুসলিম বাহিনী অবশ্যই তাদের নৌযানে করে পালিয়ে যেত।

এভাবেই ইউরোপীয় খৃস্টান ঐতিহাসিকগণ (তাদের দাবি অনুযায়ী) বারবাত উপত্যকায় মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছেন! বস্তুত এক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা অপারগই বিবেচনা করব। তারা তো আর পবিত্র কোরআনে বর্ণিত শাশ্বত সেই মূলনীতিটি অনুধাবন করার স্বভাব-যোগ্যতাই রাখেন না, যাতে বলা হয়েছে,

﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

Scanned with CamScanner

এমন কত ছোট দলই না রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে বড় দলের ওপর জয়যুক্ত হয়েছে! আর আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন, যারা সবরের পরিচয় দেয় । [সূরা বাকারা : ২৪৯]

ইসলামী ইতিহাসের সাধারণ পাঠকও ইতিহাসের পাতায় এমন অনেক উদাহরণ পাবেন যে, সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনী অস্ত্রবল ও সেনাশক্তিতে বলীয়ান শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে । বরং বিস্ময়কর ব্যাপার হল, যেসব যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল, আর তারা এই সংখ্যাধিক্যের কারণে প্রবঞ্চিত হয়েছে, সেসব যুদ্ধে পরাজয়ই ছিল মুসলিম বাহিনীর নিয়তি । ঐতিহাসিক হুনাইন যুদ্ধের দিন এমনই ঘটেছিল । পবিত্র কোরআনের ভাষায়,

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾

এবং (বিশেষ করে) হুনাইনের দিন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে আত্মপ্রসাদে লিপ্ত করেছিল । কিন্তু সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং যমীন তার প্রশস্ততা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল । অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) পলায়ন করেছিলে । [সূরা তাওবা : ২৫]

বস্তুত এই অজ্ঞতা ও অন্তরে লুকায়িত দুরভিসন্ধি এ দু'য়ের যুগপৎ সম্মিলনেই ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এই ভিত্তিহীন ও অমূলক যুক্তি-ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন এবং প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, খৃস্টান বাহিনী ভারসাম্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে পরাজিত হয়নি; অপরদিকে মুসলিম বাহিনী কেবল বিশেষ পরিস্থিতির কারণেই জয়লাভ করেছে ।

৪. ইসলামের ইতিহাসে কবে কোথায় মুসলমানদের বীরত্ব ও লড়াই-উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে এভাবে জাহাজ পোড়ানোর প্রয়োজন হয়েছে? মুসলিম বাহিনী তো অনেক যুদ্ধক্ষেত্রেই এ ধরনের সঙ্গীন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, সেক্ষেত্রে তারা কী করেছে বিশেষত যেসব পরিস্থিতিতে সমুদ্র ও নৌযানের উপস্থিতি ছিল না?! বাস্তবতা হল, মুসলমানগণ আন্দালুস-ভূমিতে অবতরণই করেছেন শাহাদাতের মৃত্যুর সন্ধানে । তাই

Scanned with CamScanner

তাদের এমন সেনাপতির কী প্রয়োজনই-বা আছে, যিনি নৌযান পুড়িয়ে দিয়ে ঈমানী চেতনা জাগ্রত করতে চেষ্টা করবেন? অন্যান্য জাতিবর্গের ক্ষেত্রে এরূপ পরিস্থিতি তৈরি করে কৃত্রিম উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রয়োজন পড়তে পারে, অনন্যসাধারণ ঈমানী চেতনার অধিকারী মুসলিম জাতির ক্ষেত্রে নয়।

৫. এ বিষয়টিও বোধগম্য নয় যে, তারিক বিন যিয়াদের ন্যায় একজন প্রাজ্ঞ ও সুদক্ষ সেনাপতি নৌযান ধ্বংস করে ফেলবেন এবং নিজেদের প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করে ফেলবেন। যুদ্ধে পরাজয় তো একান্ত স্বাভাবিক একটি বিষয়। কাজেই নৌযান পুড়িয়ে ফেলার পর মুসলিম বাহিনী কোন কারণে যদি এ যুদ্ধে পরাজিত হয়, তখন তাদের অবস্থা কী হবে? যুদ্ধ পরিস্থিতি মুসলিম বাহিনীর প্রতিকূলে যাওয়া কি কোনভাবেই সম্ভব নয়? বিশেষত মুসলমানগণ তো জানেন আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ۝ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা হানাদার কাফিরদের মুখোমুখি হও, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, যুদ্ধের জন্য কৌশল অবলম্বন অথবা নিজ দলে স্থানগ্রহণের উদ্দেশ্য ছাড়া, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা অতি মন্দ ঠিকানা। [সূরা আনফাল : ১৫-১৬]

সুতরাং অন্যান্য যুদ্ধের মতো এখানেও তো এ সম্ভাবনা আছে যে, মুসলিম বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করবে; হয়তো পরবর্তী যুদ্ধের কৌশলরূপে কিংবা বৃহত্তর মুসলিম সৈন্যদলের আশ্রয়গ্রহণ অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকায় বিদ্যমান মুসলিম বাহিনীর কাছে গমনের উদ্দেশ্যে। তাহলে সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ কীভাবে তার বাহিনীর প্রত্যাবর্তন, নতুন লড়াইয়ের প্রস্তুতি কিংবা বৃহত্তর মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার পথ রুদ্ধ করতে পারেন?! এসব বিবেচনায় নিজেদের নৌযান জ্বালিয়ে দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে গর্হিত সীমালঙ্ঘন হিসেবেই গণ্য হবে এবং তারিক বিন

Scanned with CamScanner

যিয়াদের ন্যায় প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ একজন সেনাপতি তা করতেই পারেন না। আর তিনি এ ধরনের সীমালঙ্ঘন করে থাকলে তৎকালীন মুসলিম শাসক-প্রশাসক ও আলিমসমাজ কিছুতেই নীরব থাকতেন না।

৬. এই বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করার সর্বশেষ কারণ এই যে, তারিক বিন যিয়াদের সবগুলো জাহাজ পোড়ানোর অধিকারই ছিল না। কেননা, পূর্বেও আমরা বলে এসেছি যে, কোন কোন বর্ণনামতে[৭৪] সিউটা-প্রশাসক জুলিয়ান যুদ্ধের পর ফেরত দেওয়ার শর্তে কয়েকটি জাহাজ তারিক বিন যিয়াদকে ভাড়া দিয়েছিলেন। সুতরাং তারিক বিন যিয়াদের এসব জাহাজ পোড়ানোর অধিকারই নেই। উল্লিখিত সকল বিবেচনায় আমরা বলতে পারি যে,

> জাহাজ পোড়ানোর এই ঘটনা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও জাল, যা রচনা ও প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের আন্দালুস বিজয়ের কৃতিত্বকে একটি তুচ্ছ ও সাধারণ ঘটনা হিসেবে প্রমাণ করা।

তারিক বিন যিয়াদের অব্যাহত অভিযান ও আন্দালুসের বিভিন্ন অঞ্চল জয়

বারবাত প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর ঐতিহাসিক বিজয়ের পর মাগরেব ও উত্তর আফ্রিকা থেকে বাঁধভাঙা জোয়ারের ন্যায় দলে দলে অভিযাত্রীরা মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিতে লাগল।[৭৫] ফলে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ধারণাতীত বৃদ্ধি পেল।[৭৬] তারিক বিন যিয়াদ ভেবে দেখলেন, বিজয়কে পূর্ণতা দানের এবং সামান্য ক্ষয়ক্ষতি স্বীকারের মাধ্যমেই পূর্ণাঙ্গ বিজয় বাস্তবায়নের এটিই শ্রেষ্ঠ সময়। কেননা,

১. শত্রুপক্ষের এক লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে বার হাজার মুসলিম সৈনিকের অভাবনীয় বিজয়ের অনিবার্য ফলাফল হিসেবে মুসলিম বাহিনী এখন অত্যুচ্চ মনোবল ও প্রাণশক্তির অধিকারী।

২. মাগরেব ও উত্তর আফ্রিকা থেকে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী যোগ দেওয়ায় মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যাও এখন প্রচুর।

৩. এই লাঞ্ছনাকর পরাজয়ে খৃস্টান গোথ বাহিনীর আত্মবিশ্বাস বলতে গেলে তলায় গিয়ে ঠেকেছে। ফলে তাদের মানসিক প্রাণশক্তিও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

---

[৭৪] ইবনে আ'মারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৬ ও হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ৩৫।

[৭৫] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৫৯।

[৭৬] হুসাইন মু'নিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ৭২।

Scanned with CamScanner

৪. শুধু মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলাই নয়, যুদ্ধে গোথ বাহিনী হারিয়েছে প্রচুর সৈন্য, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে আরও অনেকে। কাজেই তাদের সামরিক শক্তিও বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৫. তারিক বিন যিয়াদ দেখতে পেলেন, নিহত বা পলাতক স্বৈরাচারী শাসক রডারিকের পতনের যে প্রভাব জনগণের মাঝে পড়েছে, তা এ অঞ্চলের জনসাধারণকে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে পরিচিতকরণের এবং ইসলামের শিক্ষা প্রদানের একটি বড় উপলক্ষ হতে পারে। আশা করা যায়, এখন তাদের সামনে ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরা হলে তারা সহজে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হবে।

৬. সিউটা-প্রশাসক জুলিয়ান যে ভবিষ্যতেও তার অঙ্গীকারে অটল থাকবেন, এমন কোন নিশ্চয়তা তারিক বিন যিয়াদের কাছে ছিল না। তাই তার কর্তব্য ছিল এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা এবং বিজয়ের পূর্ণতার উদ্দেশ্যে আন্দালুসের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনা করা।

এ সমস্ত কারণে তারিক বিন যিয়াদ বারবাত প্রান্তরে যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই আন্দালুসের অন্যান্য অঞ্চল জয় করার লক্ষ্যে তার বাহিনী নিয়ে গোথ সাম্রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী টলেডোর উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। রডারিকের অন্তর্ধানের পর উত্তর আন্দালুসে অবস্থিত টলোডো তখন নতুন কোন শাসককে বরণ করে নেওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল। সেখানে তখন রডারিক-অনুসারী ও গিত্শা-অনুসারীদের মধ্যে চলছিল ক্ষমতা দখলের প্রাণপণ লড়াই।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ইসলামী বিজয়াভিযানে প্লাবিত আন্দালুস উপদ্বীপ

আন্দালুস বিজয়াভিযানের বাকি অংশের আলোচনার পূর্বে আমরা এখানে ইসলামের জিযিয়া-বিধান সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা অপরিহার্য মনে করছি, যেন জিযিয়ার তাৎপর্য আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয় এবং জিযিয়া নিয়ে সমালোচকদের আরোপিত বিভিন্ন সংশয় ও সন্দেহ দূর হয়ে হয়ে যায়।

প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন, কোন দেশ জয় করার পর সে দেশের অধিবাসীদের কাছ থেকে কর গ্রহণের সূচনা মুসলমানদের মাধ্যমে হয়নি; বরং পূর্ব থেকেই এ রীতি চলে আসছিল। বিজয়ী জাতি কর্তৃক বিজিত জাতি হতে জিযিয়া গ্রহণের অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে। কিন্তু সব আপত্তি ও সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু যেন ইসলাম ও ইসলামী বিধান! আপত্তি কেবল ইসলামের জিযিয়া বিধান নিয়ে। এমনকি ইসলামবিদ্বেষী ও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ কেউ কেউ মনে করে যে, জিযিয়া অবিচার ও নির্যাতনেরই একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এবং মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া এক ধরনের লাঞ্ছনা। বস্তুত, এসব জ্ঞানান্ধদের পক্ষপাতমূলক এ দাবি সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সামনের আলোচনায় আমরা বিষয়টির প্রকৃত তাৎপর্য ও বাস্তবতা তুলে ধরতে সচেষ্ট হব ইনশাআল্লাহ।

১. জিযিয়ার পরিচিতি ও সংজ্ঞা

জিযিয়া শব্দটি (جزي) শব্দমূল দ্বারা গঠিত, যার আভিধানিক অর্থ কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া। শব্দটির উৎপত্তি (الجزاء) শব্দ হতে, যার অর্থ প্রাপ্ত নিরাপত্তার বিনিময়ে অর্থ প্রদান করা।[৭৭]

---

[৭৭] জাওহারী, *আসসিহাহ*, ৬/২৩০২-২৩০৩, ইবনে মানযূর, *লিসানুল আরব*, (جزي) শব্দমূল ও *আলমু'জামুল ওয়াসিত*, ১/১২১-১২২।

Scanned with CamScanner

পারিভাষিক অর্থে জিযিয়া বলা হয় ঐ রাজস্বকে, যা সাধারণত আহলে কিতাব নাগরিকগণ ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নিরাপত্তার বিনিময়ে ইসলামী সরকারকে প্রদান করে থাকে। (অধিকাংশ আলিমের মতে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অগ্নিপূজারী নাগরিকদের কাছ থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা হবে; কতক ফকীহের মতে মুশরিকদের থেকেও গ্রহণ করা হবে।) মুসলিম রাষ্ট্র-সরকার যদি তার দেশে বসবাসরত জিযিয়া প্রদানকারী অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের জিযিয়া ফিরিয়ে দিতে হবে, যেমনটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাসে বহুবার ঘটেছে।

২. জিযিয়া বিধান কার ওপর আরোপ করা হবে?

ইসলামের কোমল ও ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রনীতির একটি উদাহরণ এটিও যে, ইসলাম মুসলিম রাষ্ট্রের সকল অমুসলিম নাগরিকের ওপর নির্বিশেষে জিযিয়া আরোপ করেনি; বরং অনেকের কাছ থেকেই জিযিয়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে। যেমন,

- অমুসলিম পুরুষ নাগরিকদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে; কিন্তু নারী নাগরিকদের কাছ থেকে নয়।
- প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের থেকে নয়।
- সুস্থ ব্যক্তিদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে; অসুস্থ বা যুদ্ধ করতে অক্ষম প্রতিবন্ধীদের কাছ থেকে নয়।
- সম্পদশালীদের কাছ থেকে নেওয়া হবে, দরিদ্র নাগরিকদের কাছ থেকে নয়। বরং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিচালিত দেশে খৃস্টান, ইহুদি, অগ্নিপূজারী, পৌত্তলিক শ্রেণিসহ সকল অমুসলিম দরিদ্র নাগরিক মুসলমানদের বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সহায়তা লাভ করবে।

অর্থাৎ জিযিয়া কেবল সেসব সামর্থ্যবান অমুসলিম নাগরিকদের ওপর আরোপিত হবে, যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম। এমনকি যে সমস্ত অমুসলিম সামর্থ্যবান নাগরিক স্বাভাবিক সংসারজীবনের পরিবর্তে ইবাদতে নিমগ্ন (সন্ন্যাস) জীবন বেছে নেবে, তাদেরও জিযিয়া দিতে হবে না।

Scanned with CamScanner

৩. জিযিয়ার পরিমাণ

যারা ইসলামের জিযিয়া-বিধানের কটুর সমালোচনা করেন এবং একে অমুসলিম জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া নিপীড়ন, অবিচার ও লাঞ্ছনা বলে অভিহিত করেন, তারা বিশেষত যখন জানবেন যে, অমুসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হয় মুসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে গৃহীত যাকাতের বিপরীতে; আরও জানবেন যে, মুসলিম সামর্থ্যবান নাগরিকদের প্রদত্ত যাকাতের চেয়ে অমুসলিম সামর্থ্যবান নাগরিকদের ওপর আরোপিত জিযিয়ার পরিমাণ অনেক কম, তখন তারা কী মন্তব্য করবেন কিংবা তখন তাদের কী মন্তব্য করা উচিত?

অধিকন্তু কোন জিযিয়া প্রদানকারী নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করলে তার অনাদায়ী জিযিয়া মওকুফ হয়ে যায়। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হলে অমুসলিম নাগরিককেও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হতে একটি অংশ প্রদান করা হয়।

মুসলিম বাহিনী যখন আন্দালুস জয় করে, তখন পূর্বোল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে উপযুক্ত একজন অমুসলিম নাগরিকের ওপর আরোপিত জিযিয়ার পরিমাণ ছিল বার্ষিক এক দীনার (একটি স্বর্ণমুদ্রা)। অপরদিকে একজন মুসলিম নাগরিক নেসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হলে এবং এ অবস্থায় এক বছর গত হলে প্রদান করতে হত মোট সম্পদের ২.৫%। সুতরাং আহলে কিতাব ও অন্যান্য অমুসলিম নাগরিকগণ যে জিযিয়া প্রদান করত, তার তুলনায় মুসলিম নাগরিকদের প্রদত্ত যাকাতের পরিমাণ ছিল অনেক গুণ বেশি।

আরও দেখুন, ইসলামের যাকাতের পরিমাণ বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত যে কোন কর-ব্যবস্থার চেয়ে কম। বর্তমান কর-ব্যবস্থায় স্থান ও ব্যক্তিভেদে ১০%, ২০%, এমনকি কোথাও কোথাও মোট সম্পদের ৫০ থেকে ৭০%ও কর ধার্য করা হয়। আর ইসলামের যাকাতের পরিমাণ কখনোই মোট সম্পদের ২.৫%-এর বেশি হয় না, আর জিযিয়া তো সেই যাকাতের চেয়েও অনেক কম। এ বিবেচনায় জিযিয়াকে বলা যায় পৃথিবীর সবচে' কম পরিমাণের রাজস্ব কর। বিভিন্ন রাষ্ট্রশাসকগণ নিজ দেশের জনগণের ওপর যে রাজস্ব আরোপ করেন, তার চেয়ে জিযিয়ার পরিমাণ অনেক কম।

অধিকন্তু রহমতের নবী হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহলে কিতাবদের ওপর সাধ্যাতীত কিছু আরোপ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। শুধু নিষেধ করেই ক্ষান্ত হননি; যারা তাদের ওপর জুলুম করবে

Scanned with CamScanner

বা তাদের কোন ক্ষতি করবে, তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শনপূর্বক ইরশাদ করেছেন,

«أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের প্রতি অবিচার করবে, তাদের অপদস্থ করবে, তাদের ওপর সাধ্যাতীত কোন কিছু চাপিয়ে দেবে অথবা মনোতুষ্টি ব্যতিরেকেই তাদের কোন সম্পদ ছিনিয়ে নেবে, কাল কিয়ামতের দিন আমি তার প্রতিপক্ষ হব (অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করব)।[৭৮]

উত্তরে তারিক বিন যিয়াদের অব্যাহত অভিযান

বারবাত প্রান্তরের ঐতিহাসিক যুদ্ধে জয়লাভ করার পর তারিক বিন যিয়াদ তার মূল বাহিনী নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন এবং পরে যোগ দেওয়া সৈন্যদেরকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে উপদ্বীপের বিভিন্ন অংশে ঝটিকা অভিযানে প্রেরণ করলেন। তিনি নিজে মূল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন উত্তর দিকে; দক্ষিণ আন্দালুসের অন্যতম নগরী ইসিজা (Ecija)-এর উদ্দেশে। বারবাত প্রান্তরে পরাজিত গোথ বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যরা সেখানে সমবেত হয়েছিল এবং মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে পুনরায় লড়াই করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ইসিজা যাওয়ার পথে তারিক বিন যিয়াদ সিডোনিয়া (Medina-Sidonia) ও মুরুর (Moron di la Frontera) নগরী জয় করলেন। ইসিজা পৌঁছার পর সেখানে জড়ো হওয়া খৃস্টান বাহিনীর সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। অবশ্য তীব্রতা ও প্রচণ্ডতায় বারবাত প্রান্তরের যুদ্ধের সঙ্গে এ যুদ্ধের কোন তুলনা হতে পারে না। কেননা, বারবাতের যুদ্ধে খৃস্টান বাহিনী তাদের সিংহভাগ শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।[৭৯]

যাই হোক, যুদ্ধের শেষদিকে মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্বেই খৃস্টান যোদ্ধারা দুর্গের প্রধান ফটক খুলে দিল এবং তারিক বিন যিয়াদের সঙ্গে

---

[৭৮] *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ৩০৫২।

[৭৯] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ১৯, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৮ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৬০।

Scanned with CamScanner

জিযিয়া প্রদানের চুক্তি করল।

মুসলিম বাহিনী কর্তৃক কোন শহর যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা আর জিযিয়া চুক্তির মাধ্যমে জয় করা– এ দু'য়ের মাঝে মোটা দাগের পার্থক্য রয়েছে। মুসলিম বাহিনী কোন নগরী যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করলে সে নগরীর সকল সম্পদের কর্তৃত্ব লাভ করে; অপরদিকে জিযিয়া চুক্তির বিনিময়ে জয় করার অর্থ নগরীর মালিকানা পরাজিত জাতিরই থাকবে, তারা কেবল জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকার করবে। পূর্বেই উল্লেখ করে এসেছি, সেকালে জিযিয়ার পরিমাণ ছিল বার্ষিক এক দীনার। উল্লেখ্য, ইসিজা জয়ের সময় তারিক বিন যিয়াদের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা নয় হাজারের বেশি ছিল না।

ইসিজা বিজয়ের পর তারিক বিন যিয়াদ দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য শহর জয়ের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলেন[৮০] আর নিজে মূল বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন আরও উত্তরে আন্দালুসের তৎকালীন রাজধানী টলেডোর উদ্দেশে। ক্ষুদ্র বাহিনীগুলো প্রেরিত হয়েছিল কর্ডোভা, গ্রানাডা, মালাগা ও মুরসিয়ার উদ্দেশে। এগুলো প্রত্যেকটি ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী জাবালে তারিক প্রণালী-সংলগ্ন দক্ষিণ আন্দালুসের গুরুত্বপূর্ণ নগরী। প্রেরিত এসব সৈন্যদলের কোনটির সদস্য-সংখ্যাই সাত শ'-এর বেশি ছিল না। কিন্তু সাত শ' সৈন্যের হাতেই বিজিত হল রণশক্তি ও আয়তনে সমৃদ্ধ নগরী কর্ডোভা। কোরআনের ভাষায়,

﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾

এবং (হে নবী!) তুমি যখন (তাদের ওপর মাটি) নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তা তুমি নিক্ষেপ করনি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।
[সূরা আনফাল : ১৭]

অন্যান্য ক্ষুদ্র বাহিনীর অভিযানও সফল হল; গ্রানাডা, এলেবেরা ও মালাগা বিজিত হল যুদ্ধের মাধ্যমে আর মুরসিয়া ও তার ঘাঁটি এরোলিয়া বিজিত হল জিযিয়া চুক্তির মাধ্যমে।[৮১]

---

[৮০] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ১৯, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৬০-২৬১, হুসাইন মুনিস, *তারীখুল আন্দালুস*, পৃ : ৭২ ও মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ৪১।

[৮১] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ১/৫০।

Scanned with CamScanner

টলেডোর দোরগোড়ায় তারিক বিন যিয়াদ

টলেডো স্পেনের প্রাচীনতম শহরগুলোর একটি। এটি আইবেরিয়ান উপদ্বীপের মধ্যভাগে বর্তমান স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ থেকে ৯১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। সুগভীর উপত্যকা-বেষ্টিত ও উচ্চভূমিতে অবস্থিত টলেডো নগরীর তিনদিকেই আছে টাজু নদী (Tagus River)।

আফ্রিকা-প্রশাসক মুসা বিন নুসাইরের প্রজ্ঞা ও ধীরস্থিরতার গুণ ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি আন্দালুস অভিযানের পূর্বে তারিক বিন যিয়াদকে জাইয়ান ও কর্ডোভা নগরী অতিক্রম করতে এবং রাজধানী টলেডোর পথে বিজয়াভিযানে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কেননা, তার আশঙ্কা ছিল, এর ফলে খৃস্টান বাহিনী মুসলিম বাহিনীকে ঘিরে ফেলার সুযোগ পেতে পারে।[৮২]

কিন্তু তারিক বিন যিয়াদ দেখতে পেলেন, তার সামনে টলেডোর পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। মুসা বিন নুসাইর তাকে যে শঙ্কার কথা বলেছিলেন, তেমন কোন আশঙ্কাও এখন নেই। সর্বদিক বিবেচনায় তার মনে হল রাজধানী টলেডোতে অভিযান পরিচালনার এটিই উপযুক্ত সময়। টলেডোকে তখন সবদিক থেকেই মনে করা হত খৃস্টানদের সবচে' সুরক্ষিত নগরী। কেননা, নগরীটি উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম-তিন দিক থেকে পাহাড়-পর্বত দ্বারা বেষ্টিত ছিল আর উন্মুক্ত দক্ষিণ দিকে ছিল বিশালাকার নগরপ্রাচীরবিশিষ্ট দুর্গ।

তারিক বিন যিয়াদ ভেবে দেখলেন, যদি খৃস্টানদের এই ছত্রভঙ্গ ও দুর্বল অবস্থায় টলেডো আক্রমণ করা যায়, তাহলে তারা কিছুতেই মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না এবং সহজেই নগর-বিজয় সম্পন্ন হবে। এখন যদি অভিযান পরিচালনা করা না হয়, ভবিষ্যতে আর এই সুবিধা পাওয়া যাবে না; তখন অভিযানও হয়ে যাবে সুকঠিন।

বাস্তবেও তারিক বিন যিয়াদের চিন্তা ও সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক প্রমাণিত হল। টলেডোবাসী প্রতিরোধ করার পরিবর্তে দুর্গ-প্রাচীরের প্রধান দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। মুসলিম বাহিনী কোন প্রকার লড়াই ছাড়া এবং বহিঃসাহায্য ব্যতীতই টলেডো নগরীতে প্রবেশ করল।[৮৩]

---

[৮২] ইবনে কাসীর, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৯/১৯, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২২৩ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১১৭।

[৮৩] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমূআ*, পৃ : ২৩-২৪ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৬৪-২৬৫।

Scanned with CamScanner

তারিক বিন যিয়াদ রাজধানী টলেডো জয় করেই ক্ষান্ত হলেন না; বরং উত্তর দিকে অভিযান অব্যাহত রাখলেন। একে একে অতিক্রম করলেন ক্যাস্টোলা (Castile) ও লিওন (Leon) নগরী; গোথদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন আস্তুরিয়াস (Astorga) পর্যন্ত। গোথ জাতির অবশিষ্ট সৈনিকেরা শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিল স্পেনের একেবারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্যালিসিয়া (Galicia) অঞ্চলের সুউচ্চ পর্বতমালায়।

তারিক এরপরও তার অভিযান অব্যাহত রাখলেন এবং আস্তুরিয়াস (Asturias) অঞ্চলের পর্বতমালা অতিক্রম করে আটলান্টিক মহাসাগরের শাখা বিস্কে উপসাগর (Bay of Biscay) পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। বিস্কে সাগরের উপকূলীয় এলাকায় পৌঁছে সমাপ্ত হল তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ঐতিহাসিক আন্দালুস বিজয়াভিযান।[৮৪]

তারিকের শক্তিবৃদ্ধিতে মুসা বিন নুসাইরের আগমন

এদিকে তারিক বিন যিয়াদের দ্রুতগতির অভিযানের সংবাদ মুসা বিন নুসাইরকে বিচলিত করে তুলল। তার দৃষ্টিতে বিজয়াভিযানে অস্থিরতা ও তাড়াহুড়া করা ছিল একটি অপরিণামদর্শী ও অবিবেচনাপ্রসূত কাজ। আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে, উত্তর আফ্রিকার প্রতিটি অভিযানে মুসা বিন নুসাইর স্থিরচিত্ততা, প্রজ্ঞা ও সহিষ্ণুতার অনন্য পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন এবং এভাবেই তার বিজয়াভিযান মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তাই তিনি ঈষৎ কঠোর ভাষা সম্বলিত একটি বার্তা তারিক বিন যিয়াদের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন এবং তিনি না পৌঁছা পর্যন্ত তারিক বিন যিয়াদকে বিজয়াভিযান স্থগিত রেখে অপেক্ষা করতে বললেন। মুসা বিন নুসাইরের আশঙ্কা ছিল খৃস্টান বাহিনী একজোট হয়ে যে কোন মুহূর্তে তারিক-বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

এরপর মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদকে সহায়তা করার জন্য আঠার হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রস্তুত করলেন।[৮৫]

---

[৮৪] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ১/৫১।

[৮৫] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমুআ*, পৃ: ২৪।

Scanned with CamScanner

কোথা থেকে এল এরা?

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন আন্দালুস-ভূমির চলমান বিজয়াভিযানের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, তখন এই পুণ্যকর্মে শরীক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সমকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য– উভয় অংশের বিভিন্ন দেশ থেকে আন্দালুস-ভূমিতে মুসলিম অভিযাত্রীদের ঢল নামল। তারিক বিন যিয়াদের সঙ্গে যারা আন্দালুস বিজয়ে শরীক ছিল, তাদের অধিকাংশ ছিল আমাজিগ (বার্বার) গোত্রীয়। আর এবার যে আঠার হাজার সৈনিক মুসা বিন নুসাইরের নেতৃত্বে আন্দালুস অভিযানের জন্য প্রস্তুত হল, তারা ছিল ইয়ামেন, শাম ও ইরাক থেকে ছুটে আসা আরব যোদ্ধা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষিত 'আজরে আযীম' লাভ করার দুর্নিবার আকর্ষণে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তারা মাগরেবে পৌঁছেছিল। এবার তারা তারিক বিন যিয়াদকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে মুসা বিন নুসাইরের নেতৃত্বে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুস-ভূমিতে পা রাখল।

পথে মুসা বিন নুসাইরের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভিযান

একদল জ্ঞানপাপীর দাবি হল মুসা বিন নুসাইর হিংসার বশবর্তী হয়ে তারিক বিন যিয়াদের বিজয়াভিযান স্থগিত করেছিলেন। তিনি চাননি যে, আন্দালুস বিজয়ের কৃতিত্ব এককভাবে তারিক বিন যিয়াদের হোক।[৮৬] আর এ কারণেই তিনি তারিকের অভিযান স্থগিত রেখে নিজে আন্দালুস-ভূমিতে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হল, মুসা বিন নুসাইর ছিলেন সতর্ক দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সুদক্ষ একজন প্রশাসক ও সেনানায়ক। হিংসা-ঈর্ষার লেশমাত্র তার মধ্যে ছিল না। আন্দালুস অভিযানে নেতৃত্বদানের জন্য তিনিই তো তারিক বিন যিয়াদকে নির্বাচিত করেছিলেন। অধিকন্তু তারিক বিন যিয়াদ ছিলেন আন্দালুসে তারই অধীনস্থ, তারই নির্ধারিত প্রশাসক। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এবং দ্বীনের সংগ্রামমুখর অঙ্গনে তারিক বিন যিয়াদের আগমন তো মুসা বিন নুসাইরের হাত ধরেই। সুতরাং তারিক বিন যিয়াদের যা কিছু অর্জন, নিশ্চিতকরেই তা মুসা বিন নুসাইরের কীর্তিতেও যুক্ত হবে, তার আমলনামাকেও সমৃদ্ধ করবে।

---

[৮৬] কতক বর্ণনায় এরূপ উল্লেখ আছে। দেখুন : লেখক অজ্ঞাত, আখবারুন মাজমুআ', পৃ : ২৪ ও মাক্কারী, নাফহুত তীব, ১/২৬৯।

Scanned with CamScanner

কিন্তু মুসা বিন নুসাইরের চিন্তাজুড়ে ছিল মুসলিম বাহিনীর নিরাপত্তার বিষয়টি। মুসলিম বাহিনী আপন ভূমি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিল। দু' অঞ্চলের মধ্যে রসদ ও সৈন্যসাহায্য সরবরাহব্যবস্থা তখনও চালু হয়নি। অধিকন্তু রাজধানী জয়ের পথে মুসলিম বাহিনী দীর্ঘ পথ এগিয়ে গেছে; অথচ পেছনে রয়ে গেছে আন্দালুসের অবিজিত ও অরক্ষিত অনেক নগরী।[৮৭]

তাই মুসা বিন নুসাইর তার বাহিনী নিয়ে প্রথমে সেসব নগরীকে চিহ্নিত করলেন, যেগুলোতে তারিক বিন যিয়াদ অভিযান পরিচালনা করেননি। প্রথমে তিনি সেভিল (Seville) অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সেভিল যাওয়ার পথে প্রথমে তিনি তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক বিজিত সিডোনিয়া নগরীর অধিবাসীদের পুনঃবশীভূত করলেন এবং তৎকালীন আন্দালুসের অন্যতম দুর্ভেদ্য দুর্গ কারমোনা (Carmona) জয় করলেন। এরপর তিনি সেভিলে পৌঁছে সেভিল অবরোধ করলেন। কয়েক মাসব্যাপী দীর্ঘ অবরোধের পর সেভিলবাসী আনুগত্য স্বীকার করে দুর্গ-দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।

এরপর মুসা বিন নুসাইর সেভিল অতিক্রম করে আরও উত্তরে চললেন। যেসব অঞ্চলে তারিক বিন যিয়াদ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তিনি সেদিকে না গিয়ে উত্তর-পশ্চিমে চলতে লাগলেন। এ দিকটিতে তারিক বিন যিয়াদ অভিযান পরিচালনা করেননি। মুসা বিন নুসাইর রহ.-এর লক্ষ্য ছিল একই সঙ্গে তারিক বিন যিয়াদের সহায়তা ও আন্দালুস বিজয়াভিযানের পরিসমাপ্তি উভয়টি; বিজয়-কৃতিত্ব ছিনিয়ে নেওয়া বা অংশ দাবি করা তার উদ্দেশ্য ছিল না।

মুসা বিন নুসাইর তার পথচলা অব্যাহত রাখলেন। পথে তিনি বড় বড় আরও অনেক অঞ্চল জয় করলেন। একপর্যায়ে তিনি পৌঁছলেন মেরিডা (Mérida) নামক অঞ্চলে।[৮৮] তারিক বিন যিয়াদ তখনও টলেডোতে মুসা বিন নুসাইরের আগমনের অপেক্ষায় আছেন। মেরিডা ছিল সেসব অঞ্চলের একটি, যেখানে বহুসংখ্যক গোথ গোত্রীয় খৃস্টান সমবেত হয়েছিল। মুসা বিন নুসাইর মেরিডা অবরোধ করলেন। এ অবরোধও কয়েক মাস দীর্ঘ হল। অবরোধের শেষ মাস ছিল রমযান মাস। ধৈর্য ও সহনশীলতার দীর্ঘ পরীক্ষার পর ঈদুল ফিতরের দিন মেরিডাবাসী বশ্যতা স্বীকার করল এবং প্রাচীরদ্বার

---

[৮৭] হুসাইন মুনিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ৭৯।

[৮৮] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ২৬ ও ইবনে আ'যারী, *আল-বায়ানুল মুগরিব*, ২/১৪।

Scanned with CamScanner

খুলে দিল। মুসা বিন নুসাইর তাদের সঙ্গে জিযিয়া প্রদানের শর্তে চুক্তি করলেন।[৮৯]

মেরিডা জয় করেই মুসা বিন নুসাইর ক্ষান্ত হলেন না। তিনি তার পুত্র আবদুল আযীযকে পশ্চিমের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করার জন্য প্রেরণ করলেন। পিতা মুসা ও পিতামহ নুসাইরের মতো আবদুল আযীযও প্রতিপালিত হয়েছিলেন ঈমানী চেতনাকে সঙ্গী করে রণপ্রশিক্ষণের পরিবেশে। পশ্চিম দিকে অভিযান পরিচালনা করে তিনি অনেক গভীরে প্রবেশ করলেন এবং অল্প সময়ে আন্দালুসের পুরো পশ্চিম অঞ্চল জয় করলেন। বর্তমানে এ অঞ্চলটি 'পর্তুগাল' নামে পরিচিত। অভিযান পরিচালনা করে তিনি লিসবন (Lisbon) পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং লিসবন জয় করলেন। এরপর তিনি লিসবনের উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলগুলোও জয় করলেন। এ অভিযানের কারণেই আবদুল আযীয বিন মুসা বিন নুসাইরকে 'পর্তুগাল বিজেতা' হিসেবে গণ্য করা হয়।

মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদ দুই মহান বীরের সাক্ষাৎ এবং বিজয়াভিযানের পূর্ণতা

কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী পুনঃসাক্ষাতের সময় মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেছিলেন। বরং কতক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি তাকে বন্দী করেছিলেন এবং চাবুক দ্বারা প্রহার করেছিলেন। কারও কারও ভাষ্যমতে, বন্দী করার পর মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদকে হত্যা করার মনস্থ করেছিলেন।[৯০] কিন্তু আমরা সুনিশ্চিতভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কিছুই ঘটেনি।

বাস্তবে পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদকে এ কারণে ভর্ৎসনা করেছিলেন যে, তিনি কর্ডোভা বা জাইয়ানে অবস্থান না করে টলেডো পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন এবং মুসার নির্দেশ

---

[৮৯] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ'*, পৃ : ২৬, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৪-১৫ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৭১।

[৯০] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ'*, পৃ : ২৬-২৭, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৬ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৭১।

Scanned with CamScanner

অমান্য করেছিলেন । তবে এ ভর্ৎসনা ছিল একান্তই সাময়িক ও তাৎক্ষণিক । অন্যথায় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পূর্ণ দু' বছরের (৯২ হিজরীর রমযান মাস হতে ৯৪ হিজরীর যিলকদ মাস, মোতাবেক ৭১১ খৃস্টাব্দের জুন মাস হতে ৭১৩ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাস) বিচ্ছিন্নতার পর মহান সেনাপতিদ্বয়ের পারস্পরিক এ সাক্ষাৎ ছিল অত্যন্ত উষ্ণ ও আন্তরিকতাপূর্ণ । তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর টলেডো পৌঁছতে সময় লেগেছিল এক বছর আর তারিক বিন যিয়াদের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত মুসা বিন নুসাইরের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানের সময়কালও ছিল পূর্ণ এক বছর । সেনাপতিদ্বয়ের মধ্যকার সুগভীর সম্পর্কের অন্যতম প্রমাণ হিসেবে আমরা 'নাফহুত তীব' গ্রন্থের নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করতে পারি ।

> আন্দালুসের অভ্যন্তরে তারিক বিন যিয়াদের অব্যাহত বিজয়ের সংবাদ পাওয়ার পর মুসা বিন নুসাইর যখন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তখন মুসা বিন নুসাইর তাকে বললেন, তারিক! খলীফাতুল মুসলিমীন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক তোমার এই বীরত্বের সংবাদ পেয়ে তোমাকে পুরস্কার হিসেবে আন্দালুসের প্রশাসন-দায়িত্বের চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারবেন না । সুতরাং প্রফুল্ল ও সন্তুষ্টচিত্তে তুমি তা গ্রহণ করে নাও । উত্তরে তারিক বিন যিয়াদ বললেন, হে মহান আমীর! আল্লাহর শপথ! আমি তো ততক্ষণ পর্যন্ত এ পথ হতে ফিরে আসবো না, যতক্ষণ না আমার অশ্বের পদযুগল আটলান্টিকের জলসীমা স্পর্শ করবে । (তারিক বিন যিয়াদের উদ্দেশ্য ছিল উত্তর আটলান্টিক অর্থাৎ আন্দালুস উপদ্বীপের উত্তর দিকের আটলান্টিক অংশ) ।[১১]

অর্থাৎ তারিকের কর্মদক্ষতা ও সমরকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে মুসা বিন নুসাইর খলীফার নির্বাহী আদেশ আসার পূর্বেই তারিকের জন্য আন্দালুসের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন । চাচ্ছেন বললেও ভুল বলা হবে, বিমুগ্ধ হয়ে তিনি তা ছেড়েই দিয়েছেন আর বলছেন, 'প্রফুল্ল ও সন্তুষ্টচিত্তে তুমি তা গ্রহণ করে নাও' । অপরদিকে তারিকের মধ্যেও ছিল না নেতৃত্ব বা ক্ষমতার সামান্য মোহ; বরং তার হৃদয়জুড়ে ছিল আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করার অদম্য বাসনা । দ্বীনপ্রচারের এ পথ ব্যতীত অন্য কিছুতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না; হোক তা সুবিশাল উপদ্বীপের শাসন-মর্যাদাসমৃদ্ধ জীবন ।

---

[১১] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৪২ ।

Scanned with CamScanner

দীর্ঘ দু' বছরের বিচ্ছেদপরবর্তী সাক্ষাতের পর উভয় মহান বীর একত্র হলেন। উভয়ের সম্মিলিত বাহিনী এবার বিজয়াভিযানের পূর্ণতা সাধনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলল উত্তর অভিমুখে। উভয়ে আরও কিছু অঞ্চল জয় করলেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে বার্সেলোনা (Barcelona)[৯২] নগরীর কথা। বার্সেলোনা জয়ের পর তারা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সর্ববৃহৎ নগরী জারাগোযা (Zaragoza)[৯৩] অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং তাও জয় করলেন।[৯৪]

এরপর উত্তরের এই অভিযানে মুসা বিন নুসাইর আজীবন ঈর্ষা করার মতো একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি পিরেনিজ পর্বতমালার ওপারে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলেন। পূর্বেই বলে এসেছি, পিরেনিজ পর্বতমালা আন্দালুসের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এবং একে ফ্রান্স-স্পেনের সীমান্ত রেখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ক্ষুদ্র বাহিনীটি পর্বতমালা পাড়ি দিয়ে নরবোন (Narbonne) শহরে পৌঁছল। বর্তমান ফ্রান্সের এ নগরীটি ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এ ক্ষুদ্র বাহিনীটি প্রেরণ করার মধ্য দিয়ে মুসা বিন নুসাইর এ অঞ্চলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এমন একটি বীজ রোপণ করলেন, কালের পরিক্রমায় একদিন যা বৃহদাকার ধারণ করেছিল। সামনে এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্স জয় করা এই একমাত্র বাহিনীটি প্রেরণ করার পর মুসা বিন নুসাইর তার বাহিনী নিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলেন এবং একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। মুসলিম বাহিনী একের পর এক শহর জয় করতে করতে পুরো আন্দালুস-ভূমির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল। বাকি রইল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের একেবারে সীমান্তের সাখরাতু বুলাইয়া (Covadonga) নামক একটি জনপদ। এর অবস্থান ঠিক সেখানে, যেখানে বিস্কে উপসাগর আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।[৯৫]

৯২ হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে যে

---

[৯২] পরিতাপের বিষয় হল বর্তমানে আমাদের অনেকেই বার্সেলোনা সম্পর্কে শুধু এতটুকুই জানে যে, বার্সেলোনার আছে একটি বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল দল। অথচ, বার্সেলোনা একসময় ছিল মুসলিম অঞ্চল; বার্সেলোনা ছিল ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত ভূখণ্ড।

[৯৩] আরবী নাম سرقسطة (সারাকুসতা)। (অনুবাদক)

[৯৪] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৭৩।

[৯৫] ইবনুল আছীর, *আলকামিল ফিততারীখ*, ৪/২৭০ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৭৪-২৭৬।

Scanned with CamScanner

বিজয়াভিযান শুরু হয়েছিল, ৯৫ হিজরীর শেষভাগে তা সমাপ্ত হল (৭১১-৭১৪ খৃস্টাব্দ)। মাত্র সাড়ে তিন বছরের এই অভিযানে মুসলিম বাহিনী জয় করতে সক্ষম হল এক সাখরাতু বুলাইরা বাদে পুরো আন্দালুস উপদ্বীপ। মুসা বিন নুসাইর যখন সাখরাতুল বিলাইয়া জয় করে বিজয়াভিযানকে পূর্ণতায় পৌছানোর মনস্থ করলেন, ঠিক তখনই তার কাছে এসে পৌছল অপ্রত্যাশিত এক বার্তা।

মাত্র তিন বছরের এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশাল আন্দালুস-ভূমির বিজয় সম্পর্কে ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে যদি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান না থাকত, তাহলে কেউ হয়তো এ কথা বিশ্বাসই করতে চাইত না। আন্দালুস উপদ্বীপের ন্যায় সুবিশাল ও জটিল একটি ভূখণ্ডকে এভাবে জয় করা কিংবা বশীভূত করা মোটেও সহজ ছিল না। নিঃসন্দেহে মুসলমানদের আন্দালুস বিজয় ইতিহাসের অনন্যসাধারণ ও বিস্ময়কর একটি ঘটনা হিসেবেই বিবেচিত হবে।

এ বিজয়াভিযানের তথ্য-উপাত্ত যিনি পর্যালোচনা করবেন, তিনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না যে, যাদের অপূর্ব শৃঙ্খলা, অসাধারণ রণকুশলতা ও অনন্যসাধারণ দূরদৃষ্টির মাধ্যমে এ অভিযান সম্পাদিত হয়েছে, সেসব মহান সৈনিকগণ ছিলেন বার্বার গোষ্ঠীর, যাদের না ছিল পূর্ব যুদ্ধঅভিজ্ঞতা, না ছিল রণপ্রশিক্ষণ কিংবা সামরিক রীতি-নীতির সঙ্গে পূর্বপরিচয়।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম তার অনুসারীদেরকে মাত্র এক শতাব্দীর মধ্য দিয়ে কয়েক শতাব্দীর পথ সামনে এগিয়ে দিয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশে রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করুন। সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী শাসন করেও তারা আফ্রিকাকে পারেনি সভ্যতার আলোয় ততটা আলোকিত করতে, যতটা পেরেছে দূর আরবভূমির ইসলামের সন্তানেরা মাত্র অর্ধ শতাব্দীকালে।[৯৩]

আমরা যদি পুরো অভিযানটিকে এভাবে বিন্যস্ত করি যে, মুসা বিন নুসাইর রহ. তারিক বিন যিয়াদের অভিযাত্রাকে সমাপ্তি দান করেছেন আর তাদের উভয়ের কর্মপ্রচেষ্টার পর মুসা-পুত্র আবদুল আযীয তুলির শেষ আঁচড় টেনেছেন, তাহলে একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, মুসলিম বাহিনী আন্দালুসের বিজয়াভিযানে এমন এক সুদৃঢ় ও নিখুঁত পরিকল্পনা সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছে, যার চেয়ে নিখুঁত ও চমৎকার কোন সামরিক

---

[৯৩] ড. হুসাইন মুনিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ১০৭।

Scanned with CamScanner

পরিকল্পনা প্রণয়ন করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। প্রথমে প্রতিপক্ষের মূল প্রতিরোধশক্তি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম সুযোগেই রাজধানীর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়েছে। এরপর পশ্চিমের বড় বড় নগরীগুলোকে বশীভূত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। তারপর মুসলিম বাহিনী জারাগোযা অঞ্চল জয় করেছে এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের বিভিন্ন দুর্গে বিদ্যমান অবশিষ্ট শক্তিগুলোকে খুঁজে খুঁজে বের করে ধ্বংস করেছে। এরপর পশ্চিমের সর্বশেষ সীমানা জয় করেছে। আর বিজয়াভিযান সমাপ্ত হয়েছে (ফ্রান্সের) দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল জয়ের মাধ্যমে। দক্ষ ও প্রাজ্ঞ সমরবিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত একটি দল মিলে যদি আন্দালুস বিজয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, তবুও এরচে' শ্রেষ্ঠতর কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবে না। আন্দালুস বিজয়ের ইতিহাস যারা অধ্যয়ন করছেন, তাদের কারও চিন্তা-জগত থেকে এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি যেন হারিয়ে না যায়। প্রকৃতপক্ষে এটি প্রথম যুগের মহান মুসলিম কাফেলার অনন্যসাধারণ সামরিক দক্ষতার এক অকাট্য দলীল।[৯৭]

[৯৭] ড. হুসাইন মু'নিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ১০৬-১০৭।

Scanned with CamScanner

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
খলীফা কর্তৃক বিজয়াভিযান মুলতবীর সিদ্ধান্ত এবং সেনাপতিদ্বয়কে দামেশকে তলব

মুসলিম সাম্রাজ্যের আরেক প্রান্তে অবস্থিত রাজধানী দামেশক থেকে মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদের কাছে আমীরুল মুমিনীন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের এক বার্তা এসে পৌছল। বার্তায় আদেশ করা হল, বিজয়াভিযান অসমাপ্ত রেখেই তারা উভয়ে যেন দামেশকে চলে আসেন। এ বার্তা পেয়ে মুসা বিন নুসাইর অত্যন্ত দুঃখিত ও মনঃক্ষুন্ন হলেন। কিন্তু আদেশ অনুযায়ী প্রত্যাবর্তন করা ছিল অপরিহার্য।

আমরা হয়তো হতবুদ্ধি হয়ে যাব যে, মুসা বিন নুসাইরের সঙ্গে এমন আশ্চর্য ও অদ্ভুত আচরণ কেন করা হল? কেনই-বা তাকে এ সময়েই তলব করা হল? তবে আমাদের এই বিস্ময়বোধ নিমিষেই মুছে যাবে, যখন আমরা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের এই আচরণের নেপথ্য-কারণসমূহ জানতে পারব। কারণগুলো হল,

১. নিজ দেশ থেকে বহু দূরে শত্রুভূমিতে অবস্থানরত এই মুসলিম কাফেলার ক্রমেই শত্রুদেশের গভীরে প্রবেশ খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিককে গভীর দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। মুসলিম সাম্রাজ্যের খলীফা হিসেবে তিনি ছিলেন সুদূর বিস্তৃত ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল মুসলিম নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্বশীল। তিনি দেখতে পেলেন, মুসলিম বাহিনী অতি অল্প সময়ে আন্দালুসের অনেক গভীরে পৌছে গিয়েছে। তাই তিনি আশঙ্কা করলেন, যে কোন মুহূর্তে খৃস্টান বাহিনী নতুন করে জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিম বাহিনীর মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে। কেননা, আন্দালুস-ভূমিতে মুসলিম বাহিনী যত বড় ও শক্তিশালীই হোক না কেন, শত্রুদেশের জনসংখ্যার বিচারে তা নিতান্তই অল্প এবং সবচে' বড় কথা, প্রয়োজনে সাহায্যলাভের উৎস মূল মুসলিম ভূখণ্ড থেকে তারা অনেক দূরে চলে গিয়েছে। তাই খলীফা চাইলেন, মুসলমানরা যেন আরও গভীরে প্রবেশ করে ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি না করে।

২. খলীফা চাইলে মুসা ও তারিককে না ফিরিয়ে এনেও বিজয়াভিযান স্থগিত

Scanned with CamScanner

করতে পারতেন। কিন্তু এভাবে তাদের দু'জনকে দামেশকে ডেকে এনে অভিযান স্থগিত করার পেছনে অন্য আরেকটি বিস্ময়কর কার্যকারণ ভূমিকা রেখেছিল। খলীফা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছিলেন, মুসা বিন নুসাইর আন্দালুস বিজয় সমাপ্ত করার পর ইউরোপের অন্যান্য দেশ জয় করার মনস্থ করেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি পশ্চিম দিক থেকে (তৎকালীন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী) কন্‌স্টানটিনোপলে পৌঁছতে চাচ্ছেন।[**]

পূর্ব দিক থেকে কন্‌স্টানটিনোপল জয় মুসলমানদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম বাহিনী বেশ কয়েকবার এ পথে চেষ্টা করেও কন্‌স্টানটিনোপল জয় করতে পারেনি। তাই মুসা বিন নুসাইর পরিকল্পনা করেছিলেন, একে একে ইউরোপের সব দেশ জয় করবেন। প্রথমে ইতালি, এরপর যুগোশ্লাভিয়া, এরপর রোমানিয়া, এরপর বুলগেরিয়া, এরপর বর্তমান তুরস্ক অঞ্চল। আর এভাবেই তিনি পশ্চিম দিক থেকে কন্‌স্টানটিনোপলে পৌঁছবেন। এর অর্থ হল মুসা বিন নুসাইর মুসলিম সাম্রাজ্যের মূল কেন্দ্র থেকে কোন প্রকার সাহায্য-সহায়তা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মুসলিম বাহিনী নিয়ে ইউরোপের গভীরতম অঞ্চলে প্রবেশ করবেন। মুসা বিন নুসাইরের এই পরিকল্পনা খলীফাকে শঙ্কিত করে তুলেছিল এবং তিনি মুসলিম বাহিনীর সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা করছিলেন। আর এ কারণেই তিনি অনতিবিলম্বে উভয়কে দামেশকে ফিরে আসার আদেশ করেছিলেন।

সুউচ্চ সংকল্প ও উচ্চাভিলাষের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত

প্রসঙ্গক্রমে মুসা বিন নুসাইরের এই সুউচ্চ সংকল্পের বিষয়ে দু'-একটি কথা না বললেই নয়। পাঠক আরও অবাক হবেন যখন জানবেন যে, এমন সময় তিনি এই পর্বতকঠিন পরিকল্পনা করেছিলেন, যখন তিনি তার জীবনসফরের পঁচাত্তরটি বসন্ত পেরিয়ে এসেছেন!

আল্লাহু আকবার! বয়োবৃদ্ধ একজন মানুষ, এখনও আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছেন, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে নগরীর পর নগরী জয় করছেন, কয়েক মাস ধরে অবরোধ করে রেখেছেন সেভিল, কয়েক মাস মেরিডা; একের পর এক জয় করেছেন বার্সেলোনা, জারাগোযা ও উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন নগরী।

[**] ইবনে খালদুন, তারীখে ইবনে খালদুন, ৪/১১৭-১১৮ ও মাক্কারী, নাফহুত তীব, ১/২৩৩-২৩৪।

Scanned with CamScanner

এরপরও থেমে থাকেননি; অগ্রসর হয়েছেন উত্তর-পশ্চিমে, এখন স্বপ্ন দেখছেন জয় করবেন সাখরাতু বুলাইয়া (Covadonga), এরপর একে একে জয় করবেন ফ্রান্স, ইটালি ও অন্যান্য দেশ এবং এভাবে পৌঁছবেন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্টানটিনোপলে!

জীবনসন্ধ্যায় উপনীত পরিশ্রান্ত এক মুসাফির কীভাবে এই সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী হলেন? কোন বলে বলীয়ান হয়ে পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই দুর্গম গিরি কান্তার মরু পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দেখলেন? আজকের মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি তরুণের জন্য এবং সেসব বৃদ্ধদের জন্যও তিনি হতে পারেন এক অনন্য দৃষ্টান্ত, যাদের বয়স এখনও সত্তর ছোঁয়নি; অথচ তারা এই ভাবনায় নিমগ্ন যে, 'আমরা তো জীবিকার সন্ধানে ছুটে ছুটে ক্লান্ত মুসাফির'; যারা ভাবছেন, জীবিকার পেছনে ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়েই তারা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে ফেলেছেন। মুসা বিন নুসাইরের এই সুদৃঢ় ও সমুন্নত মনোবল তাদের জন্য একটি সুস্পষ্ট বার্তা যে, তাদের জীবনের মিশন ও লক্ষ্য এখনও শেষ হয়ে যায়নি। কীভাবেই-বা শেষ হবে? ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কারা শিক্ষার আলো পৌঁছাবে? কারা তাদেরকে অভিজ্ঞতার পাথেয় যোগাবে? এবং কারা তাদের চিন্তা-চেতনার সংস্কার ও পরিশুদ্ধি করবে?

বয়সের কোঠা ষাট পেরোনোর পর মুসা বিন নুসাইর উত্তর আফ্রিকার বিজয়াভিযান শুরু করেছিলেন। অর্থাৎ বর্তমানের হিসেবে তখন তিনি জীবিকার বয়স শেষ করে ফেলেছেন। এরপর সেই তিনিই পঁচাত্তর বছর বয়সে এসে প্রচণ্ড অন্তর-দহনে জ্বলে পুড়ছেন। কিসের জন্য তার মর্ম-যাতনা? কেন এই দহন-যন্ত্রণা? প্রথম কারণ, খলীফাতুল মুসলিমীন তাকে রণাঙ্গনের উত্তপ্ত ময়দান থেকে শান্তির জীবনে আহ্বান জানিয়েছেন; অথচ এই মহান সেনাপতি এখনও খুঁজে পাননি চির আরাধ্য শাহাদাতের সন্ধান! দ্বিতীয় কারণ, সাখরাতুল বিলাইয়া জয় করতে না পারায় তিনি প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছেন। তৃতীয় কারণ, তার সবচে' বড় কষ্ট, তিনি পশ্চিম দিক থেকে কন্‌স্টানটিনোপল বিজয়ের আজীবন লালিত স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি।

ঐতিহাসিক মাক্কারী লিখেছেন,

> আন্দালুস ছেড়ে চলে আসার সময় মুসা বিন নুসাইরের হৃদয় রণাঙ্গন-বিরহে ভারাক্রান্ত ছিল। অস্থিরতায় তিনি সর্বদা ছটফট করতেন। তার আশা ছিল, ফ্রান্সের অন্যান্য শহরও জয় করবেন এবং ইউরোপের বিস্তৃত এলাকা জয় করে এ পথেই শামে পৌঁছবেন। তিনি

Scanned with CamScanner

স্বপ্ন দেখতেন, আন্দালুস থেকে শাম পর্যন্ত সহজ যাতায়াতপথ আবিষ্কৃত হবে; যে পথে আন্দালুসবাসী (জলপথ অতিক্রম করা ব্যতিরেকে) স্থলপথেই মুসলিম প্রাচ্যে আসা যাওয়া করবে।[৯৯]

প্রত্যাবর্তন ও শেষ ইচ্ছা

খলীফার আদেশ শিরোধার্য মনে করে মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদকে নিয়ে দামেশকের পথ ধরলেন। তারা উভয়ে যখন দামেশকে পৌঁছলেন, খলীফা ওয়ালিদ তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ওয়ালিদের মৃত্যুর পর খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন তার ভাই সুলাইমান বিন আবদুল মালিক। তিনি তার প্রয়াত ভাইয়ের সিদ্ধান্তের উপরই অটল থাকলেন এবং মুসা বিন নুসাইর কন্‌স্টানটিনোপলের উদ্দেশে ইউরোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে মুসলিম বাহিনীর ক্ষতি হতে পারে এই আশঙ্কায় মুসা বিন নুসাইরের দামেশকে অবস্থান করাই সমীচীন মনে করলেন।

মুসা বিন নুসাইরের দামেশক প্রত্যাবর্তনের এক বছর পর ৯৭ হিজরী মোতাবেক ৭১৬ খৃস্টাব্দে খলীফা সুলাইমান হজ্বের সফরে রওয়ানা হতে মনস্থ করলেন। ফলে মুসা বিন নুসাইর তার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ পেয়ে গেলেন। একটানা দশ বছরের অধিক সময় তিনি উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুসের রণাঙ্গনে কাটিয়েছেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি একবারও আরবে ফিরে আসেননি। তাই তিনি সে বছরই হজ্বের সফরে খলীফা সুলাইমানের সঙ্গী হলেন।[১০০]

হজ্বের সফরে পথিমধ্যে মুসা বিন নুসাইর আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার তাকদীরে তুমি যদি হায়াত রেখে থাক, তাহলে আমাকে আবার ফিরিয়ে দিও রণাঙ্গনে এবং দান করো শাহাদাতের মৃত্যু। আর 'মউত'-ই যদি হয় তোমার ফয়সালা, তাহলে তোমার হাবীবের শহর 'মদীনাতুর রাসূলে' আমায় মৃত্যু দিও।

কুদরতের কারিশমা দেখুন, তিনি হেজাযে পৌঁছলেন, এরপর হজ্বকর্ম সম্পাদন করলেন, ফেরার পথে নবীর শহরে 'মদীনাতুর রাসূলে'-ই ইন্তেকাল করলেন এবং মদীনাতেই সাহাবায়ে কেরামের পাশে সমাধিস্থ হলেন।[১০১]

---

[৯৯] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৩-২৩৪ ও হিময়ারী, *আরয়াওযুল মি'তার*, পৃ : ৫০।

[১০০] যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৬/৪৮৯।

[১০১] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৪/৫০০ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩২।

Scanned with CamScanner

সত্যের পথের পথিক যারা, 'রাব্বে কারীম'-এর সঙ্গে হৃদয়বন্ধনে আবদ্ধ যারা, এমনই হয় তাদের সংকল্প ও অভিলাষ এবং এমনই হয় তাদের হৃদয়-আবেগের বহিঃপ্রকাশ। যতটুকু জীবন পান, কর্ম ও কর্ম-দক্ষতায় রেখে যান তার কয়েক গুণ অবদান। জীবনসন্ধ্যায়ও আত্মার মালিকের সঙ্গে তাদের এমন সুদৃঢ় আত্মিক বন্ধন যে, চাইলাম; পয়গাম ও আহ্বান একই সঙ্গে উপস্থিত! ডাকও এল, উত্তরও এল! মৃত্যুকে যিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন আন্দালুসের বিক্ষুব্ধ রণপ্রান্তরে তরবারি ও বর্শা-ফলকের উন্মাদনার মাঝে; মৃত্যুর দেখা অবশেষে তিনি পেলেন হজ্বের সফরে, মদীনাতুর রাসূলে। নেতৃত্ব ও আদর্শের এক আদর্শ উদাহরণের জীবনসফর পূর্ণ হল।

অনুপম ধর্ম ইসলামের বিস্তৃতি ও প্রসারের খেদমতে নেতৃত্বদান ও অনন্যসাধারণ অবদান রাখার মাধ্যমে এ মহান বীর সেনাপতি ধন্য করেছেন মুসলিম প্রতীচ্যের (উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুস) উপত্যকা ও মরুপ্রান্তর, পর্বতমালা ও সমতল ভূমিকে। তিনি সত্যের পথের আহ্বায়কদের দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন এ অঞ্চলের মানুষের কাছে সত্যের আহ্বান পৌঁছিয়ে দেওয়ার, তাদেরকে যাবতীয় অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোর পথে বের করে আনার। পঁচাত্তর বছর বয়সে মুসা বিন নুসাইর আন্দালুস উপদ্বীপে সমরক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন, ঘোড়ায় চড়ে কখনো চষে বেড়িয়েছেন সমতল ভূমি, কখনো আরোহণ করেছেন সুউচ্চ পর্বতচূড়ায়, আবার কখনো অবতরণ করেছেন উপত্যকার নিম্নদেশে। মহান আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস তার মাঝে আন্দোলিত হয়েছে; ফলে তার প্রাণশক্তি সমৃদ্ধ হয়েছে, দেহশক্তির নবায়ন হয়েছে; আর উভয় শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন আল্লাহর যমীনে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করতে এবং ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত করতে। জুলফিতে পাকন ধরেছে; কিন্তু প্রাণশক্তিতে ভাটা পড়েনি। উদার বিশ্বাস-প্রদত্ত সংকল্প আর চির তরুণ ঈমানী উদ্যম তাকে পরিচালিত করেছে, কালিমাতুল্লাহ তার সামর্থ্য ও ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করেছে।[১০২]

আর তার রণাঙ্গনের সঙ্গী তারিক বিন যিয়াদ; মুসা বিন নুসাইরের সঙ্গে দামেশকে পৌঁছার পর তিনি যেন ইতিহাসের পাতা থেকে চিরতরে হারিয়ে গেলেন! ইতিহাস এ সম্পর্কে নীরব যে, এরপর তিনি দামেশকেই রয়ে

[১০২] আবদুর রহমান আলহাজ্জী, *আততারীখুল আন্দালুসী*, পৃ : ১২৮।

Scanned with CamScanner

গিয়েছিলেন, নাকি পুনরায় ফিরে এসেছিলেন আন্দালুসে কিংবা উত্তর আফ্রিকায়?।

ঐতিহাসিকগণ তারিক বিন যিয়াদের শানে যত প্রশংসাবাণীই উচ্চারণ করুন না কেন, তার কর্ম-অবদানের জন্য তা যথেষ্ট হবে না। যে কেউ তারিক বিন যিয়াদের জীবন ও কর্ম নিয়ে মুহূর্তকাল ভাববেন, অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করবেন ইসলামের শক্তির এক অনন্য রহস্য-তাৎপর্য ও স্বাতন্ত্র। মাগরেবের অধিবাসী বার্বার গোত্রের একজন অপরিচিত ব্যক্তি; ইসলামের স্পর্শ পাওয়ার পূর্বে যিনি ছিলেন বিশ্বমানচিত্রের এক কোণে পড়ে থাকা বিস্মৃত এক গোত্রের অখ্যাত এক গোত্রপতি; তার জীবনে ইসলামের আগমন হল আর ইসলাম নামক জিয়নকাঠির ক্ষণিক স্পর্শে তিনি পরিণত হলেন এক দিগ্বিজয়ী সেনাপতি ও সুদক্ষ রাজনীতিবিদে; যিনি একদিকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন, দেশের পর দেশ জয় করছেন, অপরদিকে আশ্চর্য দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে স্বাক্ষর করছেন জিযিয়া চুক্তিতে। এ ধরনের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ ও তার জাতি-গোষ্ঠীকে সুমহান ঈমানী চেতনায় জাগিয়ে তোলা ছাড়া ইসলামের যদি আর কোন প্রভাবশক্তি না-ও থাকত, তবে তা-ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যথেষ্ট হত। অথচ ইসলামের প্রভাবশক্তি ও অবদান তো আরও ব্যাপক ও ব্যাপৃত। ইসলাম তো এ প্রাণশক্তি ও চেতনা ছড়িয়ে দিয়েছে তার পতাকাতলে আশ্রয় নেওয়া প্রতিটি ভূখণ্ডে; ইসলাম তো অসংখ্য মহান ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণ ও আদর্শ জাতিসত্তার বিকাশ ঘটিয়েছে স্বল্পতম সময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে।[১০৩]

সাখরা ও একটি কঠিন শিক্ষা

মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদ তাদের বিজয়াভিযান পশ্চিম ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত করে আন্দালুস থেকে দামেশকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। কিন্তু আন্দালুসের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের একেবারে সীমান্তে অতি ক্ষুদ্র একটি জনপদ রয়ে গিয়েছিল, যেখানে তারা অভিযান পরিচালনা করেননি। কোন মুসলমানের সেদিন কল্পনাতেও আসেনি যে, অবিজিত ক্ষুদ্রতম এই জনপদই একদিন বিশাল এক খৃস্টান সাম্রাজ্যের বীজ হিসেবে পরিগণিত হবে আর কয়েক শতাব্দী পর এমন একদিন আসবে, যেদিন এই ক্ষুদ্র বীজই মহীরুহে

---

[১০৩] ড. হুসাইন মুনিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ: ১০৬-১০৭।

Scanned with CamScanner

পরিণত হয়ে আন্দালুস পতনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মুসলিম বাহিনীর অসমাপ্ত বিজয়াভিযানে রয়ে যাওয়া এই সাখরা অঞ্চলে বড় একটি খৃস্টান জনগোষ্ঠী বাস করত। আমাদের প্রবল ধারণা এটাই যে, দারুল খেলাফত হতে আহূত না হলে মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদ এ অঞ্চলটি ছেড়ে যেতেন না; বরং একেও ইসলামী সাম্রাজ্যের অধীন করে নিতেন। অবশ্য এখান থেকে এ শিক্ষাটি আমরা নিশ্চিত করেই নিতে পারি যে, অতি নগণ্য কোন বিষয়েও সামান্য অবহেলা কালের পরিক্রমায় মহা দুর্যোগের কারণ হতে পারে। সুতরাং মুসলমানদের কর্তব্য হল, প্রতিটি কাজে দৃঢ় সংকল্প, প্রত্যয় ও আস্থার সঙ্গে অটল থাকা, পূর্ণতায় পৌছার পূর্ব পর্যন্ত নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত না হওয়া।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

❁

তৃতীয় অধ্যায়

উমাইয়া প্রশাসকযুগ

(৯৫-১৩৮ হিজরী = ৭১৪-৭৫৫ খৃস্টাব্দ)

প্রথম পরিচ্ছেদ
প্রতাপ ও সমৃদ্ধির যুগ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধ
অব্যাহত বিজয়াভিযানে সাময়িক বিরতি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইতিহাস পর্যালোচনা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
(উমাইয়া প্রশাসনের) অবসন্নতার যুগ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বিজয়ের কাল সমাপ্ত হওয়ার পর শুরু হচ্ছে আন্দালুসের ইতিহাসের নতুন এক অধ্যায়, যাকে আমরা প্রশাসক বা গভর্নরদের আমল বলে আখ্যায়িত করতে পারি। ৪২ বছর ব্যাপ্ত এ আমলের সূচনা ৬৫ হিজরীতে (৭১৪ খৃস্টাব্দে) আর সমাপ্তি ১৩৮ হিজরীতে (৭৫৫ খৃস্টাব্দে)।[১০৪] গভর্নরদের আমল দ্বারা আমরা বোঝাতে চেয়েছি যে, এ সময়কালে আন্দালুসের শাসনব্যবস্থা এমন প্রশাসকদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে, যারা সমকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী দামেশকে বিদ্যমান উমাইয়া সালতানাতের খলীফা তথা ইসলামী বিশ্বের প্রধান শাসকের আনুগত্য করতেন এবং আন্দালুস তখন বৃহত্তর ইসলামী সাম্রাজ্যের অংশরূপে বিবেচিত হত।[১০৫]

আন্দালুসের প্রথম গভর্নর বা প্রশাসক ছিলেন মুসা বিন নুসাইরের পুত্র আবদুল আযীয রহ. (মৃত্যুঃ ৯৭ হিজরী/৭১৬ খৃস্টাব্দ)। তাকওয়া ও খোদাভীতি এবং ঈমানী চেতনা ও সমরকুশলতায় তিনি ছিলেন নিজ পিতার আদর্শ নমুনা। আবদুল আযীয সম্পর্কে তার পিতা মুসা বিন নুসাইর মন্তব্য করেছেন, আমি তাকে 'রজনীতে নামাযে দণ্ডায়মান আর দিবসে রোযাদার'-এর নিয়মিত পথিক হিসেবে জানি।[১০৬]

যিরিক্লী আলআ'লাম গ্রন্থে তার সম্বন্ধে লিখেছেন,

তিনি ছিলেন একজন বিজয়ী শাসক। তার পিতা শামে প্রত্যাবর্তনের

---

[১০৪] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৯৮-৩০০।

[১০৫] শাসনব্যবস্থার ধরন বিবেচনায় মুসলিম আন্দালুসের ইতিহাসকালকে মোট আট ভাগে করা যায়।

১. বিজয়ের কাল, যার বিবরণ এই মাত্র শেষ হল।

২. মুসলিম প্রাচ্যের কেন্দ্রীয় খেলাফতের (খেলাফতে বনু উমাইয়ার) অনুগত গভর্নর বা প্রশাসকদের শাসনামল।

৩. মুসলিম প্রাচ্যের কেন্দ্রীয় খেলাফত (খেলাফতে বনু আব্বাস) হতে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন উমাইয়া প্রশাসক নিয়ন্ত্রিত শাসনামল।

৪. প্রাচ্যের খেলাফতে বনু আব্বাস দুর্বল হয়ে পড়ায় আন্দালুসকে দারুল খেলাফত ঘোষণা করে আন্দালুস-কেন্দ্রিক উমাইয়া খলীফাদের শাসনামল।

৫. খেলাফতব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার পর খণ্ডিত আন্দালুসে অঞ্চলকেন্দ্রিক বিভক্ত শাসকবর্গের শাসনামল।

৬. মাগরেবের মুরাবিতী সরকারের অধীনস্থ গভর্নর দ্বারা পরিচালিত শাসনামল।

৭. মাগরেবের মুওয়াহহিদী সরকারের অধীনস্থ গভর্নর দ্বারা পরিচালিত শাসনামল।

৮. পতন-পূর্ব সময়ে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গ্রেনাডা-কেন্দ্রিক প্রশাসন-আমল।

আশা করা যায়, এই সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সামনের পুরো আন্দালুস-ইতিহাস অধ্যয়নে যথেষ্ট সহায়তা করবে। (অনুবাদক)

[১০৬] হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুক্তাবাস ফী যিকরি উলাতিল আন্দালুস*, ৭/২৯০ ও ইবনুল আছীর, *আলকামিল ফিততারীখ*, ৪/৩০০।

Scanned with CamScanner

সময় ৯৫ হিজরীতে তার হাতে আন্দালুসের দায়িত্বভার ন্যস্ত করে যান। তিনি সফলতার সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করেন, দেশের সীমান্তের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন এবং বহু শহর জয় করেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, সাহসী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী।[১০৭]

প্রশাসকদের পুরো আমলকে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এ সময়ে বাইশজন প্রশাসক আন্দালুস শাসন করেছেন; বরং বলা ভালো, বিশজন প্রশাসক শাসন করেছেন, যাদের মধ্যে দু'জন দু'বার শাসনক্ষমতা লাভ করেছেন।[১০৮] অর্থাৎ ৪২ বছরের শাসনামল ২২ টি ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক শাসনকর্তা শাসন করেছেন মাত্র দুই বা তিন বছর।

নিঃসন্দেহে শাসনব্যবস্থায় এই বিরামহীন পরিবর্তন আন্দালুস-পরিস্থিতিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে; কিন্তু এ পরিবর্তনের অনিবার্য কিছু কার্যকারণও ছিল, যে কারণে আমরা শাসকবর্গকে অভিযুক্তও করতে পারি না। যেমন শুরুর দিকের অনেক প্রশাসক ফ্রান্সে পরিচালিত বিজয়াভিযানে শহীদ হয়েছেন। এর পরের ধাপের অনেক প্রশাসক বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ-অভ্যুত্থান ইত্যাদির শিকার হয়ে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপরিচালনার ধরন বিবেচনায় প্রশাসক-আমলকে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম অংশ হচ্ছে অব্যাহত বিজয়াভিযান এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সমৃদ্ধির যুগ, যা প্রশাসক আমলের সূচনা থেকে পরবর্তী ২৭ বছর পর্যন্ত ব্যাপৃত (৯৫-১২৩ হিজরী/৭১৪-৭৪১ খৃস্টাব্দ); আর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে শাসন-দুর্বলতা, রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থা, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ-অভ্যুত্থান ইত্যাদির যুগ, যা ১২৩ হতে ১৩৮ হিজরী (৭৪১-৭৫৫ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫ বছর বিস্তৃত। প্রশাসক আমলের উভয় অংশের পর্যালোচনায় আমরা বিস্তারিত ইতিহাস এবং প্রত্যেক প্রশাসকের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করব না; বরং আন্দালুসের ইতিহাস অধ্যয়নে সবিশেষ গুরুত্বের দাবিদার, এমন কয়েকজন প্রশাসকের আলোচনাতেই আমাদের পর্যালোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

---

[১০৭] যিরিক্লী, *আলআ'লাম*, ৪/২৮-২৯।

[১০৮] হিময়ারী, *আখবারুল মুত্তাবাস ফী যিকরি উলাতিল আন্দালুস*, ১/৩-৮ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৯৮-৩০০।

Scanned with CamScanner

প্রথম পরিচ্ছেদ
প্রতাপ ও সমৃদ্ধির যুগ

সাধারণভাবে প্রশাসক-আমলের প্রথম অংশটি বেশ কয়েকটি দিক থেকে বিশেষ স্বাতন্ত্রের দাবিদার। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল,

১. আন্দালুস-ভূমিতে ইসলামের প্রচার-প্রসার

আন্দালুসে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করার পর মুসলমানগণ এ অঞ্চলের জনসাধারণকে ইসলামের শিক্ষাদানে মনোযোগী হন। যেহেতু ইসলাম স্বভাব ও প্রকৃতির ধর্ম, তাই সরল ও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তিগণ ইসলামের পরিচয় লাভ করামাত্রই ইসলামের প্রতি অগ্রসর হতে থাকে এবং নির্দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করে। কেননা, আন্দালুসবাসী দেখতে পায়, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ ধর্ম, যাতে মানবজীবনের সকল অঙ্গনের বিধি-বিধান সুবিন্যস্ত। তারা দেখতে পায়, ইসলামের আকীদা ও বিশ্বাস স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট, ইবাদত-রীতি সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত। তারা আরও দেখতে পায়, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি, শাসন ও প্রজা-নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, ব্যবসা ও কৃষিনীতি, লেনদেন ও বাণিজ্যনীতি– এককথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের সুনির্দিষ্ট ও সুসংগঠিত বিধান রয়েছে। তারা উপলব্ধি করে, ইসলামে আছে বিজয়ী সেনাপতির বিনম্র আচরণ, ভাই-বোন, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পড়শি-প্রতিবেশী সকলের সঙ্গে আচরণ ও উচ্চারণের এবং সহাবস্থানের সুসংহত নিয়ম-পদ্ধতি। ইসলামের মাঝে তারা খুঁজে পায় শত্রু ও বন্দীর সঙ্গে বরং সকল মানুষের সঙ্গে সুন্দর ও সুসভ্য আচরণ-নীতি।

ইতঃপূর্বে আন্দালুসবাসী তাদের সামাজিক জীবনে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেখে অভ্যস্ত ছিল। ধর্ম তাদের কাছে কখনোই দুর্বোধ্য ও জটিল তত্ত্ব-সম্বলিত ভাব ও বক্তব্যের স্তর থেকে উন্নীত হতে পারেনি। তারা ধর্মীয় আচারসমূহের অনুশীলন করত; কিন্তু বাস্তবজীবনে এর প্রায়োগিক কোন রূপ

Scanned with CamScanner

খুঁজে পেত না। আর রাষ্ট্রযন্ত্রের অবস্থা এই ছিল যে, শাসকবর্গ নিজের খেয়াল-খুশিমতো যে বিধান জারী করত, তা-ই হত রাষ্ট্রীয় আইন। শাসকবর্গ নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে ইচ্ছেমতো আইন ও বিধান প্রণয়ন করত। কিন্তু ইসলামের সঙ্গে পরিচয় ঘটার পর তারা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে, ইসলামে বিষয়টি সম্পূর্ণই বিপরীত। ইসলামে ধর্ম রাষ্ট্রনীতি হতে পৃথক নয়, আর রাষ্ট্রও আইন প্রণয়নে ধর্মীয় গণ্ডির উর্ধ্বে নয়। ইসলামের এই অনুপম সৌন্দর্য এবং সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা অনুধাবন করার পর তারা ইসলামের দুর্নিবার আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারেনি। দলে দলে তারা শামিল হতে শুরু করে ইসলামের সুশীতল পতাকাতলে আর ধন্য হয় ইসলামের সমুন্নত পরিচয় ধারণ করে।

অল্প সময়ের মধ্যেই আন্দালুসের জনসাধারণ (অর্থাৎ আন্দালুসের মূল জনগোষ্ঠী) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তাদের তুলনায় আরব ও আমাজিগ গোত্রের মুসলমানরা হয়ে পড়ে সংখ্যায় স্বল্প। এই নওমুসলিম আন্দালুসবাসীই ইসলামের সৈনিক ও সেবকে পরিণত হয়[১০৯] এবং পরবর্তী সময়ে তারাই শরীক হয় ফ্রান্সে পরিচালিত বিজয়াভিযানের কাফেলায়।

২. মিশ্র প্রজন্মের উৎপত্তি

আন্দালুসের মূল অধিবাসীদের সঙ্গে মুসলিম অভিযাত্রীদের সহাবস্থান ও সংমিশ্রণ এবং দ্রুত গতিতে ইসলামের প্রসারের কারণে নতুন এক প্রজন্ম গড়ে ওঠে, যারা পরিচিত হয় 'মিশ্র প্রজন্ম' নামে। এরা হল সেসব আন্দালুসবাসীর সন্তান, যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। তাদের পিতা ছিল আরবী বা আমাজিগ (বার্বার), আর মা ছিল আন্দালুসী।[১১০]

---

[১০৯] এর প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীযের উদ্দেশে প্রেরিত সামাহ বিন মালিকের সেই বার্তাটিকে, যাতে তিনি লিখেছিলেন, এ অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা প্রচুর এবং তারা পুরো ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সুতরাং আপনি আপনার সিদ্ধান্ত বাতিল করুন। বার্তাটি তিনি পাঠিয়েছিলেন খলীফা যখন আন্দালুস থেকে মুসলিম নাগরিকদের সরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৬ ও ড. হুসাইন মু'নিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ৩৪০-৩৪১।

[১১০] বিস্তারিত জানতে দেখুন : ড. হুসাইন মু'নিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ৩৪৪-৩৫০।

Scanned with CamScanner

৩. শ্রেণিতন্ত্রের বিলোপ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রসার

এ আমলেই মুসলমানগণ এ অঞ্চলে বিরাজমান শ্রেণিতন্ত্রকে বাতিল করতে সক্ষম হন। ইসলামের আগমনে সকল মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসক ও শাসিতের মাঝে কোন শ্রেণি-বিভেদ না থেকে উভয়ে বিচারের কাঠগড়ায় বিচারকের সামনে সমান অবস্থান ও অধিকার লাভ করে।

এ সময় মুসলমানগণ আকীদা ও বিশ্বাসগত স্বাধীনতাকে অবারিত করে দেন। খৃস্টানদের গির্জা তাদেরকেই ছেড়ে দেন। মুসলমানগণ অন্যায় হস্তক্ষেপ করে কখনোই কোন গির্জা ভাঙেননি কিংবা মসজিদে রূপান্তরিত করেননি। তবে খৃস্টানগণ তাদের কোন গির্জা স্বেচ্ছায় বিক্রি করতে রাজী হলে মুসলমানগণ তা অত্যন্ত উচ্চমূল্যে কিনে নিতেন এবং সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতেন। আর তারা বিক্রি-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে মুসলমানগণ তাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতেন না।[১১১]

খৃস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের এই সুমহান নীতি বাস্তবায়ন ও উদার সহাবস্থান তখনকার কথা, যখন মুসলমানগণ নেতৃত্বের আসনে আর খৃস্টান জনগণ মুসলিম-শাসনাধীন। এ তথ্যটি আমাদের ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে এবং এর সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে হবে খৃস্টান শাসকদের সেই চরম গর্হিত ও অমানবিক আচরণকে, যা তারা আন্দালুস-ভূমিতেই ইসলামী সালতানাতের পতনের পর স্প্যানিশ তদন্ত কমিশন (The Tribunal of the Inquisition)-এর নাম দিয়ে করেছিল।

৪. নাগরিক সভ্যতার বিনির্মাণে বিশেষ গুরুত্বারোপ

এ আমলে মুসলিম শাসকবর্গ নাগরিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এ সময় তারা প্রতিষ্ঠা করেছেন বিভিন্ন দফতর ও সচিবালয়, কায়েম করেছেন নতুন নতুন বসতি ও সভ্যতা, নির্মাণ করেছেন রাস্তা-ঘাট, পুল-সেতু। এ সময়ের স্থাপত্য-উৎকর্ষ ও প্রকৌশল-দক্ষতার এক অনন্য উদাহরণ হল 'কর্ডোভা সেতু' নামে খ্যাত সেই বিখ্যাত ও মনোমুগ্ধকর সেতুটি, যা

---

[১১১] মুসলিম আন্দালুসে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের অবস্থা সম্বন্ধে জানতে ড. হুসাইন মু'নিস-এর গবেষণালব্ধ তথ্য পড়ুন : *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ৩৫০-৪০৯।

Scanned with CamScanner

সমকালীন ইউরোপে সবচে' দর্শনীয় ও বিস্ময়কর সেতু হিসেবে পরিগণিত হত।[১১২] এ সময়েই মুসলিম শাসকগণ প্রতিষ্ঠা করেছেন বিভিন্ন সমরাস্ত্র ও জাহাজ-নির্মাণ কারখানা। ফলে এ অঞ্চলের মুসলিম সামরিক বাহিনী একই সঙ্গে রণশক্তি ও জনবলে উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।

৫. সকল ক্ষেত্রে আন্দালুসবাসীর মুসলিম-অনুকরণ

'প্রশাসক-আমল'-এর এই প্রথম অংশের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এটিও যে, এ সময়েই আন্দালুসবাসী সব ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুকরণ শুরু করে। এমনকি বিজয়ী ও শাসনকারী আরবজাতি যে আরবী ভাষায় ভাববিনিময় করে, তারা সে ভাষাও শিখতে শুরু করে। বরং সে যুগের আন্দালুসী খৃস্টান ও ইহুদি জনগণও তাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে আরবী পাঠদানের ব্যবস্থা রাখাকে গৌরব ও আভিজাত্যের প্রতীক মনে করত।

৬. মুসলিম প্রশাসন কর্তৃক কর্ডোভাকে আঞ্চলিক রাজধানী নির্ধারণ

এ আমলের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এটিও যে, মুসলিম প্রশাসকবর্গ কর্ডোভাকে তাদের শাসনকার্যের কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেন।[১১৩] এর পূর্বে উত্তরের টলেডো ছিল আন্দালুসের রাজধানী। কিন্তু মুসলিম শাসকগণের সতর্ক বিবেচনায় ধরা গড়ে যে, টলেডো ফ্রান্স ও সাখরা অঞ্চলের সন্নিকটে। ফলে তা সবসময়ই থাকবে ঝুঁকি ও বিপদের কেন্দ্রবিন্দুতে। তাই তাদের দৃষ্টিতে টলেডোর মতো একটি অরক্ষিত নগরীকে রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করা মোটেই সমীচীন মনে হয়নি। বিপরীতে তারা দেখতে পান, উত্তরেরই আরেক নগরী কর্ডোভা এ ধরনের আশঙ্কা ও ঝুঁকিমুক্ত; অধিকন্তু তা যোগাযোগ ও সামরিকশক্তি সরবরাহের বিবেচনায় আটলান্টিকের ওপারে অবস্থিত মাগরেবী ইসলামী রাষ্ট্রের তুলনামূলক সন্নিকটে। তাই কর্ডোভাকেই তারা এ অঞ্চলের রাজধানী হিসেবে নির্ধারণ করেন।

---

[১১২] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ৩০, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৬ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৫।

[১১৩] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৫ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/১৪।

Scanned with CamScanner

৭. ফ্রান্সে সামরিক অভিযান পরিচালনা

ফ্রান্সে সামরিক অভিযান পরিচালনা 'প্রশাসক-আমল'-এর প্রথম অংশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এ আমলে ফ্রান্সে অভিযান পরিচালনার জন্য বড় বড় অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সামনে আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন কয়েকজন প্রশাসকের কথা আলোচনা করব, ফ্রান্সে সামরিক তৎপরতায় যাদের বিশেষ ভূমিকা ও অগ্রবর্তিতা রয়েছে।

সামাহ বিন মালিক আলখাওলানী রহ.

সামাহ বিন মালিক আলখাওলানী ছিলেন মুসলিম আন্দালুসের চতুর্থ প্রশাসক।[১১৪] আন্দালুসের প্রথম প্রশাসক আবদুল আযীয বিন মুসা বিন নুসাইর ৯৭ হিজরীতে সেভিলে নিহত হলে[১১৫] আন্দালুসবাসী আইয়ুব বিন হাবীব আললাখমীকে তাদের প্রশাসক হিসেবে বরণ করে নেয়। আইয়ুব ছিলেন মুসা বিন নুসাইরের ভাগ্নে। ৯৭ হিজরী মোতাবেক ৭১৬ খৃস্টাব্দে দায়িত্ব গ্রহণ করা আইয়ুবের শাসনামল ছয় মাসের বেশি স্থায়ী হয়নি।[১১৬] এরপর তৎকালীন আফ্রিকার গভর্নর মুহাম্মাদ বিন ইয়াযিদ-এর পক্ষ থেকে ৯৭ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে (৭১৬ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে) হুর বিন আবদুর রহমান আসসাকাফীকে আন্দালুস শাসনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি তিন বছর আন্দালুসের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনিই সেভিল থেকে কর্ডোভায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। অবশ্য কারও কারও মতে তার পূর্ববর্তী প্রশাসক আইয়ুব আললাখমীর আমলেই রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছিল।[১১৭]

৯৯ হিজরীর সফর মাসে (৭১৭ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে) মুসলিম সাম্রাজ্যের

---

[১১৪] প্রশাসকগণের ধারাবাহিকতা জানতে দেখুন : মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৯৯।

[১১৫] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ২৮, হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুকতাবাস ফী যিকরি উলাতিল আন্দালুস*, ৭/২৮৯-২৯০, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৪-২৫ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৮১।

[১১৬] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ২৮, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৫ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৪।

[১১৭] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ২৯, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৫, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/১৪ ও ড. হুসাইন মু'নিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ১২০-১২১।

Scanned with CamScanner

তৎকালীন খলীফা সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের মৃত্যু হলে ওমর বিন আবদুল আযীয রহ. তার স্থলাভিষিক্ত হন।[১১৮] তিনি ১০০ হিজরীর রমযান মাসে সামাহ বিন মালিককে আন্দালুসের গভর্নর নিযুক্ত করেন। এতদিন পর্যন্ত আন্দালুস-প্রশাসন সরাসরি দারুল খেলাফতের অধীন ছিল না; বরং তা দারুল খেলাফতের অধীনস্থ আফ্রিকান প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। কিন্তু ওমর বিন আবদুল আযীয প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক গুরুত্বসহ বিভিন্ন বিবেচনায় আন্দালুস-প্রশাসনকে সরাসরি দারুল খেলাফতের অধীন করে নেন।[১১৯]

এ হিসেবে সামাহ বিন মালিক আলখাওলানী রহ.-এর শাসনামল ও তার যাবতীয় কর্ম-অবদানকে আমরা মহান খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয রহ.-এর অবদান ও সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিতে পারি। খোলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম সদস্য ওমর বিন আবদুল আযীয রহ. (৬১-১০১ হি. = ৬৮১-৭২০ খৃ.) সর্বোচ্চ আড়াই বছর (৯৯-১০১ হিজরী/৭১৮-৭২০ খৃস্টাব্দ) মুসলিম সাম্রাজ্যের খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১২০] কিন্তু এই নাতিদীর্ঘ সময়কালেই পুরো মুসলিম বিশ্ব শান্তি-নিরাপত্তা, সুখ-সমৃদ্ধি এবং ন্যায়-ইনসাফে ছেয়ে গিয়েছিল।

সামাহ বিন মালিক রহ.-এর যুদ্ধ-তৎপরতা

ইসলামী ইতিহাসের সুবিখ্যাত এই মহান প্রশাসক ফ্রান্সে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছেন। পুরো ফ্রান্সে তখন (নরবোন নামক) একটি মাত্র মুসলিম নগরী ছিল, যা মুসা বিন নুসাইর একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠিয়ে জয় করেছিলেন।[১২১] কিন্তু সামাহ বিন মালিক আলখাওলানী ফ্রান্সের পুরো দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল জয় করেন এবং সেখানে সিবতিমানিয়া (Septimania) নামে এক বিশাল ইসলামী প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করেন।[১২২]

---

[১১৮] তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, ৪/৫৭-৫৯, যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৬/৩৮২ ও ইবনে কাসীর, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৯/২০০।

[১১৯] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমূআ*, পৃ : ৩০, হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুক্তাবাস*, ১/৫, ইবনে আ'ষারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৬ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৫।

[১২০] তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, ৪/৫৯ ও ইবনে কাসীর, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৯/২১৭।

[১২১] দেখুন : মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৭৪।

[১২২] বিস্তারিত জানতে দেখুন : আলখাশানী, *কুযাতু কুরতুবা*, পৃ : ৯। সিবতিমানিয়া বর্তমানে রিভিয়েরা (French Riviera) নামে পরিচিত, যা বিশ্বের সুবিখ্যাত সামুদ্রিক পর্যটনকেন্দ্রগুলোর একটি।

Scanned with CamScanner

সামাহ বিন মালিক আলখাওলানী একই সঙ্গে ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেছিলেন, আবার আন্দালুস ও ফ্রান্সের জনসাধারণের মাঝে ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসারেও ভূমিকা রেখেছিলেন। এরই মাঝে ১০২ হিজরীর ৯ যিলহজ্ব আরাফার দিন (৭২১ খৃস্টাব্দের ৯ জুন) এ মহান সেনাপতি তারাজোনা (Tarazona) অঞ্চলে টুলুয (Toulouse)-এর যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদী মৃত্যু লাভ করেন।[১২৩]

আমবাসা বিন সুহাইম রহ.

সামাহ বিন মালিক রহ. শহীদ হওয়ার পর আন্দালুসবাসী আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আলগাফিকী রহ. কে তাদের প্রশাসক হিসেবে নির্বাচন করে। আবদুর রহমান আপন সামরিক যোগ্যতাবলে নেতৃত্বশূন্য বিক্ষিপ্ত মুসলিম বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হন এবং ১০২ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে আন্দালুসে ফিরে আসেন। এটি আবদুর রহমানের প্রথম শাসনকাল, যা দু' মাসের বেশি স্থায়ী হয়নি। ১০৩ হিজরীর সফর মাসে তৎকালীন আফ্রিকান গভর্নর ইয়াযিদ বিন আবু মুসলিম তাকে বরখাস্ত করেন এবং তার পরিবর্তে আমবাসা বিন সুহাইমকে আন্দালুসের প্রশাসক নিযুক্ত করেন।[১২৪]

আমবাসা বিন সুহাইমের যুদ্ধ-তৎপরতা

আমবাসা বিন সুহাইম রহ. ছিলেন একাধারে মুত্তাকী ও খোদাভীরু ব্যক্তিত্ব, সুদক্ষ প্রশাসক ও মহান সেনাপতি। তিনি ১০৩ হিজরী থেকে ১০৭ হিজরী (৭২১-৭২৫ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত আন্দালুস শাসন করেন।[১২৫] ফ্রান্সে পরিচালিত বিজয়াভিযানে তিনি সেন্স (Sens) নগরী পর্যন্ত পৌঁছে যান, যা বর্তমান ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এর অর্থ আমবাসা বিন সুহাইম তার বিজয়াভিযানে ফ্রান্সভূমির প্রায় ৭০%

---

[১২৩] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৬ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/১৫। অপরদিকে হুমাইদী *'জাযওয়াতুল মুক্বতাবাস'* গ্রন্থে (৬/২৩৬-২৩৭) উল্লেখ করেছেন, সামাহ বিন মালিক ১০৩ হিজরীর ৯ যিলহজ্ব শহীদ হন।

[১২৪] বিস্তারিত জানতে দেখুন : আবদী, *তারীখুল উমারা ওয়াল কুযাত ফিলইসলামী বিল আন্দালুস*, ১/৩৮৬, ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৪/৩৭৭, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৭, ৩/১৬ ও যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৭/২০৯।

[১২৫] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৭ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৫।

Scanned with CamScanner

অতিক্রম করেছিলেন; অন্যভাবে বললে, তার আমলে ফ্রান্সের প্রায় ৭০% এলাকা মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমবাসা বিন সুহাইম রহ. অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ইউরোপের গভীরে তার রণতৎপরতা প্রসারিত করেছিলেন।

তৎকালীন বাজা নগরীর[১২৬] বিশপ 'ইজিডর'-এর মতে, আমবাসার এই দ্রুত ও অব্যাহত বিজয় সাফল্যের পেছনে সামরিক শক্তি ও সামর্থ্যের চেয়ে দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ভূমিকা বেশি ছিল। তার এই দ্রুত সাফল্যের বদৌলতেই তার আমলে গল (বর্তমান ফ্রান্স) অঞ্চল থেকে অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তিনি কয়েকদিন অবরোধ করে রাখার পর কারকাসোনা (Carcassonne) নগরী জিযিয়া-চুক্তির মাধ্যমে জয় করেন। এরপর ফ্রান্সের আরও গভীরে প্রবেশ করে রোন (Rhône) নদী অতিক্রম করে পূর্ব দিকে অগ্রসর হন। এসব অভিযানে বিভিন্ন সময় তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন[১২৭] এবং আন্দালুসে ফেরার পথে ১০৭ হিজরীর শাবান মাসে (৭২৫ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে) শাহাদাত বরণ করেন।[১২৮]

আবদুর রহমান আলগাফিকী রহ.

আমবাসা বিন সুহাইম রহ.-এর শহীদী ইন্তেকালের পর আন্দালুস-পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। একের পর এক বেশ কয়েকজন প্রশাসক আন্দালুস শাসন করেন পূর্ববর্তীদের চেয়ে ভিন্নতর পন্থায়। মাত্র পাঁচ বছরে (১০৭-১১২ হিজরী/৭২৫-৭৩০ খৃস্টাব্দ) আন্দালুস প্রশাসনে রদবদল ঘটে ছয় বার। ছয় প্রশাসকের সর্বশেষ ছিলেন হাইসাম বিন ওবায়দ আলকালাবী।

---

[১২৬] 'বাজা' কর্ডোভা থেকে পাঁচ ফরসখ (প্রায় ৫.৫ কি. মি.) দূরে অবস্থিত আন্দালুসের একটি নগরীর নাম। দেখুন : হিময়ারী, *আরদাওযুল মি'তার*, পৃ : ৭৫ ও *সিফাতু জাযীরাতিল আন্দালুস*, পৃ : ৩৬।

[১২৭] দেখুন : যিরকলী, *আলআ'লাম*, ৫/৯১। আমবাসা বিন সুহাইম-এর অভিযানসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন : আমীর শাকিব আরসালান, *গাযাওয়াতুল আরব ফী ফারানসা ওয়া সুওয়াইসরা ওয়া ইতালিয়া ওয়া জাযাইরিল বাহরিল মুতাওয়াসসিত*, পৃ : ৭৩-৮৬ ও ড. হুসাইন মুনিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ২১০-২১৫।

[১২৮] দেখুন : ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৪/৩৭৭, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৭ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৫। অপরদিকে হুমাইদী *'জাযওয়াতুল মুকতাবাস'* (৬/৩১৯)-এ উল্লেখ করেছেন, আমবাসা বিন সুহাইম ১০৬ হিজরীতে খলীফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের শাসনামলে আফ্রিকান গভর্নর বিশ্র বিন সাফওয়ান-এর পক্ষ থেকে আন্দালুসের প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং ১০৭ বা ১০৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

Scanned with CamScanner

কোন কোন বর্ণনামতে তার উপাধি ছিল 'আলকিনানী'। বংশ পরিচয়ে তিনি একজন আরবী ছিলেন এবং কট্টর জাতীয়তাবাদী ছিলেন।[১২৯]

এ সময় থেকেই আন্দালুসে মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ ও মতপার্থক্যের অশুভ বাতাস বইতে শুরু করে। একদিকে আরব মুসলমানগণ, অপরদিকে আমাজিগ মুসলমানগণ; আর বিরোধের ভিত্তি হল জাতি-বংশের ভিন্নতা। মুসলিম বাহিনীর এ অঞ্চল বিজয়ের পর থেকে ইতঃপূর্বে কখনোই আন্দালুসে এ ব্যাধি প্রকাশ পায়নি।

নবসৃষ্ট এ বিরোধ ও সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ স্বাভাবিক ভদ্রতার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং একে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বিবাদ, হানাহানি ও শত্রুতার উৎকট প্রকাশ।[১৩০] অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ করেন; এক মহান ব্যক্তিত্ব আপন সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিরাজমান সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ মনোভাব বিনাশ করে আমাজিগ ও আরব মুসলমানদের নতুন করে একতাবদ্ধ করেন। এই মহান ব্যক্তি আন্দালুসবাসীর মাঝে ইসলামের এই শাশ্বত বাণী ও মর্মকথা ছড়িয়ে দেন যে, আরবী-অনারবী নয়; মানুষের শ্রেণিভেদ নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি হল তাকওয়া ও খোদাভীতি। এ মহান ব্যক্তিত্বই হলেন আবদুর রহমান আলগাফিকী রহ.।

কে এই আবদুর রহমান আলগাফিকী?

তার পুরো নাম আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন বিশ্‌র বিন সারিম আলগাফিকী আলআককী (মৃত্যু: ১১৪ হিজরী/৭৩২ খৃস্টাব্দ)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনের 'আক' গোত্রের শাখা 'গাফিক' বংশোদ্ভূত। তার উপনাম ছিল আবু সাঈদ। তিনি ছিলেন একাধারে একজন সুদক্ষ প্রশাসক, মহান বীর ও বড়মাপের সেনাপতি। সাহাবা-সংস্পর্শে ধন্য হওয়ায় তিনি শামিল ছিলেন তাবেয়ীগণের মর্যাদাবান কাফেলায়।[১৩১]

---

[১২৯] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ৩১, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৮ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৫।

[১৩০] দেখুন : আমীর শাকিব আরসালান, *গাযাওয়াতুল আরব ফী ফারানসা ওয়া সুওয়াইসরা ওয়া ইতালিয়া ওয়া জাযাইরিল বাহরিল মুতাওয়াসসিত*, পৃ : ৮৬-৮৭।

[১৩১] আযদী, *তারীখুল উলামা ওয়ার রুয়াত লিল ইলমী বিল আন্দালুস*, ১/২৯৮ ও যিরিক্লী, *আলআ'লাম*, ৩/২১২।

Scanned with CamScanner

জন্ম ইয়ামেনে হলেও পরবর্তী সময়ে তিনি আফ্রিকায় চলে আসেন। খলীফা সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের কাছে আফ্রিকা হতে আগত প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তিনি দামেশক গমন করেন। এরপর পুনরায় মাগরেবে ফিরে আসেন এবং মুসা বিন নুসাইর ও আবদুল আযীয বিন মুসার আন্দালুসে অবস্থানকালে তাদের সঙ্গে মিলিত হন। তখন থেকে তিনি আন্দালুসের পূর্ব উপকূলের সেনাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।[১৩২]

আবদুর রহমান আলগাফিকীর সামরিক মেধা ও চিন্তাকুশলতা

আবদুর রহমান আলগাফিকীর সামরিক চিন্তাশীলতার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারার সহজাত ক্ষমতা। একজন সেনাপতি যদি চান যে, তার সামরিক কার্যক্রম বিক্ষিপ্ত না হোক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বের কারণে তার লক্ষ্য হাতছাড়া না হোক, তাহলে তার জন্য এটি অপরিহার্য একটি গুণ।

আবদুর রহমান আলগাফিকীর সামরিক নীতির আরেকটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যাকে তার ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তার ফসল বলা চলে, নিজের সামর্থ্য ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য– উভয়টির দূরত্ব ও ব্যবধান সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। অধিকন্তু তিনি 'মোকাবেলার পূর্বেই যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহণ'-এর নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বেই সেনাবাহিনী ও জনগণ উভয়কে সর্বদিক থেকে সর্বাত্মক প্রস্তুত করা, সবধরনের শক্তির পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া; প্রথমে ঈমান ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থার শক্তি, এরপর সেনাদলের সকল সদস্যের মাঝে বরং পুরো জনগোষ্ঠীর মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের শক্তি এবং সবশেষে বস্তুগত শক্তি বা অস্ত্র ও বাহনশক্তি; এবং উল্লিখিত কোন ধরনের শক্তিকেই তুচ্ছজ্ঞান না করা, পর্যাপ্ত পরিমাণের চেয়ে কম গ্রহণ না করা। কেননা, এর কোন একটির ক্ষেত্রে সামান্য শিথিলতার অর্থ হল পুরো বাহিনীর ভাগ্যে পরাজয় ও ধ্বংস টেনে আনা।

---

[১৩২] যিরিক্লী, আলআ'লাম, ৩/২১২।

Scanned with CamScanner

আবদুর রহমান আলগাফিকীর চরিত্র

আবদুর রহমান আলগাফিকী ছিলেন অতি উন্নত চরিত্রের অধিকারী।[১৩৩] সাহাবায়ে কেরামের মোবারক সংস্পর্শে যিনি লাভ করেছেন সঠিক ও বিশুদ্ধ ইসলামী দীক্ষা, তার মাঝে যদি সমাবেশ ঘটে সকল উন্নত মানবিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির, তাতে বিস্ময়েরই-বা কী আছে?! উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম কাফেলার হাতে গড়া যার নীতি-নৈতিকতা, তিনি যদি তার প্রজাদের সঙ্গে সুন্দরতম ব্যবহার করেন, ন্যায়-ইনসাফ, ধার্মিকতা ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ আচরণ করেন তাহলে অবাক হওয়ার কী আছে?! অথচ তিনি ছিলেন নেতা ও শাসক, ভালো আচরণের বিপরীতে প্রজাদের কাছ থেকে তার কিছুই পাওয়ার নেই। তিনি তো প্রত্যাশী ছিলেন কেবল আজরে ইলাহীর ও আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিদানের।

আল্লামা যাহাবী রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন,

> আবদুর রহমান আলগাফিকী ছিলেন আন্দালুসের প্রশাসক; হিশাম বিন আবদুল মালিক কর্তৃক নির্ধারিত গভর্নর। তিনি ইবনে ওমর রাযি. হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার থেকে বর্ণনা করেছেন আবদুল আযীয বিন ওমর বিন আবদুল আযীয, আবদুর রহমান বিন ইয়ায প্রমুখ।[১৩৪]

ইবনে বাশকুওয়াল আন্দালুসে গমনকারী তাবেয়ীদের তালিকায় তার নাম উল্লেখ করেছেন।[১৩৫]

হুমাইদী রহ. উল্লেখ করেছেন,

> তিনি ইবনে ওমর রাযি. হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার থেকে বর্ণনা করেছেন আবদুল আযীয বিন ওমর বিন আবদুল আযীয। তিনি ছিলেন নেককার, আপন প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে সদাচারী, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে বহুবার অভিযান পরিচালনাকারী এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনে ন্যায়পরায়ণ।[১৩৬]

---

[১৩৩] হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুকতাবাস*, ৭/২৭৪-২৭৫ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/১৫।

[১৩৪] যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৭/৪১৪।

[১৩৫] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/১৫।

[১৩৬] হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুকতাবাস*, ৭/২৭৪-২৭৫।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধ
অব্যাহত বিজয়াভিযানে সাময়িক বিরতি

মুসলমানদের একতাবদ্ধ করার পর আবদুর রহমান আলগাফিকী যখন নিশ্চিত হলেন যে, তাদের ঈমানী দৃঢ়তা পূর্ণতা লাভ করেছে, তখন তিনি নতুন করে ইসলামের বিজয়াভিযান পূর্ণতায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে ফ্রান্স অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি এমন সব অঞ্চলেও অভিযান পরিচালনা করলেন, যেখানে তার পূর্ববর্তী প্রশাসকগণ পৌঁছতে পারেননি। অগ্রসর হতে হতে তিনি ফ্রান্সের একেবারে পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছে গেলেন এবং একের পর এক শহর জয় করতে লাগলেন। প্রথমে জয় করলেন আরলেস (Arles) নগরী[১৩৭], এরপর পর্যায়ক্রমে বোডো (Bodo), টুলুয (Toulouse) ও টুর্স (Tours) নগরী। এরপর তিনি পৌঁছলেন পয়টিয়ার্স (Poitiers) নগরীতে। পয়টিয়ার্স বর্তমান ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহরের সরাসরি সামনে অবস্থিত। উভয় শহরের মাঝে দূরত্ব প্রায় এক শ' কিলোমিটার। অপরদিকে মুসলিম আন্দালুসের রাজধানী কর্ডোভা থেকে পয়টিয়ার্স নগরীর দূরত্ব প্রায় এক হাজার কিলোমিটার। এ তথ্য দ্বারাই অনুধাবন করা যায় যে, তিনি উত্তরে ফ্রান্সের কতটা গভীরে প্রবেশ করেছিলেন।[১৩৮]

পয়টিয়ার্স নগরীতে পৌঁছার পর আবদুর রহমান আলগাফিকী বালাত নামক এলাকায় একটি পুরোনো পরিত্যক্ত প্রাসাদের পাশে শিবির স্থাপন করলেন (আন্দালুসী ভাষায় 'বালাত' শব্দের অর্থ প্রাসাদ)। এরপর তিনি খৃস্টান

---

[১৩৭] দক্ষিণ ফ্রান্সের বুঁশিয়া ডা রোন (Bouches-du-Rhône) প্রদেশে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী একটি শহর।

[১৩৮] ফ্রান্সভূমিতে আবদুর রহমান আলগাফিকী রহ.-এর অভিযানসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন : শাকিব আরসালান, *গাযাওয়াতুল আরব ফী ফারানসা ওয়া সুওয়াইসরা ওয়া ইতালিয়া ওয়া জাবাইরিল বাহরিল মুতাওয়াসসিত*, পৃ : ৮৭-৯১, আবদুর রহমান আলহাজ্জী, *আততারীখুল আন্দালুসী*, পৃ : ১৯৩-২০৩ ও ড. হুসাইন মুনিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ২২১-২২৭।

Scanned with CamScanner

বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য মুসলিম বাহিনীকে বিন্যস্ত করতে শুরু করলেন। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা তখন পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছেছিল। এ কারণেই আবদুর রহমান আলগাফিকীর এ অভিযানকে ফ্রান্সে পরিচালিত সবচে' বৃহৎ অভিযান বলে গণ্য করা হয়।[১৩৯]

ইতিহাস ও যুদ্ধইতিহাস-গ্রন্থ নিয়ে একটি পর্যালোচনা

বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধের (the Battle of the Palace of the Martyrs)[১৪০] একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আমরা ইসলামী ইতিহাসের খুব বেশি যুদ্ধের ক্ষেত্রে পাইনি। আর তা হল, ইসলামী ঐতিহাসিক সূত্রগুলো এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নীরব থেকেছে। প্রকৃতপক্ষে এটি এমন এক বিস্ময়কর নীরবতা, যার গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা আমরা আজও খুঁজে পাইনি। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ কোন পরাজয়ের ইতিহাস বর্ণনা করতে কখনোই দ্বিধা বা কার্পণ্য করেননি, সে পরাজয় যত নির্মম ও কঠিনই হোক না কেন; না আন্দালুসের ইতিহাস বর্ণনায়, না অন্যান্য ভূখণ্ডের ইতিহাসের ক্ষেত্রে। ওহুদ, হুনাইন থেকে শুরু করে সুদূর অতীত বা নিকট অতীত, এমনকি গ্রানাডা-পতনের ইতিহাস বা এর পূর্বের বিভিন্ন পরাজয়ের ইতিহাস, উদাহরণস্বরূপ ইকাব যুদ্ধ, কোন ক্ষেত্রেই এর ব্যত্যয় ঘটেনি। আমরা ধারণা করতে পারি যে, হয়তো এ যুদ্ধ সম্পর্কে লিখিত ঐতিহাসিক তথ্যাদি এখনও অমুদ্রিত বিভিন্ন (হস্তলিখিত) পাণ্ডুলিপির পাতায় লুকিয়ে আছে এবং বিজ্ঞজনদের তাহকীক ও সম্পাদনার মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। এরূপ হলেই বিষয়টি যুক্তিযুক্ত হয়। কিন্তু বাস্তবতা যদি এই হয় যে, অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপিসমূহের পাতায়ও কিছুই লুকিয়ে নেই; বরং মুসলিম ঐতিহাসিকগণ কোন না কোন কারণে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে দ্বিধাবোধ করেছেন, তাহলে এর যথার্থ কোন কারণ বর্ণনা করতে আমরা সম্পূর্ণই অক্ষম। এক্ষেত্রে আমরা নিজেরা কোন মন্তব্য না করে মিশরের প্রখ্যাত লেখক-গবেষক-চিন্তাবিদ ও স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ডক্টর হুসাইন মু'নিস এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা-ই উল্লেখ করা শ্রেয় মনে

---

[১৩৯] ড. হুসাইন মু'নিস, ফাজরুল আন্দালুস, পৃ : ২২৭।

[১৪০] ইউরোপীয় ইতিহাস-গ্রন্থগুলোতে এ যুদ্ধকে উল্লিখিত নামের পাশাপাশি The Battle of Tours ও Battle of Poitiers নামেও অভিহিত করা হয়েছে। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

করছি। বালাতুশ শুহাদা যুদ্ধের বিবরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের আশ্চর্য নীরবতায় বিস্মিত হয়ে তিনি এর কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, বাস্তবে এর একটিই কারণ। আর তা হল, এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় এতটা নির্মম ও বেদনাদায়ক ছিল যে, প্রথমদিকের ঐতিহাসিকগণ প্রচণ্ড মর্মবেদনা ও দুঃখবোধের কারণে এমনকি এর সামান্য আলোচনাকেও সযত্নে পরিহার করেছেন। ফলে দিনে দিনে এর তথ্যাদি বিস্মৃতির অতল গর্ভে হারিয়ে গেছে। এরপর কালের পরিক্রমায় পরবর্তী সময়ের ঐতিহাসিকগণ এতটুকু তথ্য ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারেননি যে, ১১৪ ও ১১৫ হিজরীর মাঝে সংঘটিত এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত নির্মমভাবে পরাজিত হয়েছিল।[১৪১]

ইসলামী ইতিহাস-ভাণ্ডার যখন এ বিষয়ে নীরব, তখন আমাদের একমাত্র অবলম্বন হল ইউরোপীয় খৃস্টান ঐতিহাসিকগণের বর্ণণাসমূহ। ইউরোপীয় বর্ণনাসমূহে বিশদভাবে এ যুদ্ধের কথা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এসব বর্ণনা বিভিন্ন কল্পকাহিনীতে ভরপুর এবং যুদ্ধের বিবরণ, ইউরোপীয়দের বিশাল বিজয় ও মুসলিম বাহিনীর নিরঙ্কুশ পরাজয়ের বিবরণ– প্রতিটি ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তির দোষে দুষ্ট। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এ যুদ্ধকে বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান ইসলামের হাতে পতন-পরিস্থিতি থেকে খৃস্টবাদের উদ্ধার বলে অভিহিত করেছেন।

সুতরাং বালাতুশ শুহাদা যুদ্ধের যেসব বিস্তারিত বিবরণ আমরা জানতে পারি, তা সবই একমাত্র ইউরোপীয় উৎস থেকেই নেওয়া। আর আমরা এসব বর্ণনাকে অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত করার পরই কেবল সত্যায়ন করতে পারি, যদিও এ জাতীয় উৎস থেকে গৃহীত তথ্য কখনোই আপত্তিমুক্ত নয়। যুদ্ধের বিবরণের পর আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

সংখ্যাধিক্য ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ-প্রাচুর্য পরাজয়ের অন্যতম কার্যকারণ

যদিও আবদুর রহমান আলগাফিকীর নেতৃত্বাধীন এ বাহিনী সৈন্যসংখ্যায় বিশাল ছিল; কিন্তু আকস্মিকভাবেই মুসলিম বাহিনী এক গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। আর তা হল, মুসলিম বাহিনী অনেকগুলো নগরী জয় করার পর পয়টিয়ার্স-এ শিবির স্থাপন করেছিল। ফলে মুসলিম বাহিনীর

[১৪১] ড. হুসাইন মু'নিস, *মাজমূল আন্দালুস*, পৃ : ২২৮।

Scanned with CamScanner

হাতে জমা হয়েছিল প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। এ কারণে মুসলিম বাহিনীর মূল দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতি। যুদ্ধলব্ধ এ বিশাল সম্পদই তাদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আবদুর রহমান আলগাফিকী যখন পয়টিয়ার্সে পৌঁছেন, তখন পুরোনো একটি সমস্যা নতুন করে জেগে ওঠে। আরব ও আমাজিগ গোত্রের মুসলমানদের মধ্যে নতুন করে জাগ্রত হয় সেই সাম্প্রদায়িক চিন্তা, যা ইতঃপূর্বে একবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও আন্দালুসেই তা দূরীভূত হয়েছিল। আর এ সাম্প্রদায়িক মনোভাব জেগে ওঠার পেছনেও ছিল যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রাচুর্যের বিষয়টি। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টনবিধান অত্যন্ত সুবিদিত ও সর্বসম্মত বিষয় হওয়া সত্ত্বেও তা নিয়ে উভয় গোষ্ঠী বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল। প্রত্যেকের দৃষ্টি ছিল অপরের আয়ত্তে থাকা সম্পদের দিকে। আরবদের দাবি শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তারাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিক হকদার। আমাজিগদের দাবি, এ দেশ তো আমরাই জয় করেছি, সুতরাং ...। সবাই যেন ভুলেই গিয়েছিল যে, প্রথম যুগের বিজেতা অভিযাত্রীগণ নিজেদের মাঝে কখনোই আরবী-আমাজিগের এই পার্থক্য বিবেচনা করেননি, এমনকি তারা আন্দালুসের যেসব অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদেরকেও ভিন্ন করে দেখেননি।

এর সঙ্গে আমরা আরেকটি কারণ যোগ করতে পারি। দল যখন ভারী হয়, তখন এক ধরনের আত্মগর্ব ও প্রবঞ্চনা মানুষকে ঘিরে ধরে। আন্দালুসের ইতিহাসে আর কখনোই মুসলিম বাহিনী এত অধিক সৈন্যসংখ্যার অধিকারী ছিল না। আর তাই পঞ্চাশ হাজারের এই বিরাট সংখ্যা মুসলিম বাহিনীকে আত্মগর্বের জালে আটকে ফেলেছিল। তারা ভেবেছিল, আমরা দক্ষিণ ও মধ্য ফ্রান্স জয় করে এসেছি, কোন প্রতাপশালী শক্তিই আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। সুতরাং এ বিশাল বাহিনী নিয়ে আমরা কিছুতেই পরাজিত হব না।

যুদ্ধের বিবরণে ফিরে আসি। বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল। একদিকে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনী, অপরদিকে চার্লস মার্টিলের (Charles Martel) নেতৃত্বে চার লক্ষ সৈন্যের ইউরোপীয় বাহিনী। চার্লস মার্টিল তার শাসনাধীন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এদের সমবেত করেছেন। ইউরোপীয় বাহিনীতে আছে রাষ্ট্রীয় সৈনিক, ভাড়াটে সৈনিক; আছে ইউরোপ ও উত্তর থেকে আগত অসভ্য বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সৈনিক;

Scanned with CamScanner

আছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজা, রাজপুত্র, জনসাধারণ এমনকি ক্রীতদাসেরাও। একটানা নয়দিন উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর লড়াই চলল; কিন্তু জয়-পরাজয় নির্ধারিত হল না।

ধারাবাহিক যুদ্ধের দশম দিন মুসলিম বাহিনী ইউরোপীয়দের ওপর এমন প্রচণ্ড হামলা চালাল যে, বিজয় প্রায় হাতের মুঠোয় চলে এল। এমন সময় ইউরোপীয় বাহিনীর একটি অশ্বারোহী দল মুসলিম সেনাদলের পেছনে অবস্থিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ছাউনি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে সক্ষম হল। এ অবস্থা দেখে সেখানে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর কিছু সদস্য 'নিয়ে গেল, নিয়ে গেল' রবে চিৎকার করে উঠল। আওয়াজ শুনে মুসলিম বাহিনীর মূল অংশের একটি অশ্বারোহী দল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ রক্ষা করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আকস্মিক পিছু হটল। ফলে মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্র-মূল নড়বড়ে হয়ে গেল এবং এই আকস্মিক ছন্দপতনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে পুরো মুসলিম বাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ল। সেনাপতি আবদুর রহমান আলগাফিকী এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে চিৎকার করে মুসলিম সৈন্যদেরকে নতুন করে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এই অসতর্ক পরিস্থিতির মধ্যেই প্রতিপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি তীর আবদুর রহমান আলগাফিকীর শরীরে বিদ্ধ হল এবং তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ভূপাতিত হয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। মুসলিম বাহিনী একই সঙ্গে দু'টি মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল; একদিকে পুরো বাহিনীর বিশৃঙ্খল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিস্থিতি, অপরদিকে মহান সেনাপতির শাহাদাতে নেতৃত্বশূন্যতা।

দশম দিনের যুদ্ধ শেষে মুসলিম বাহিনী দক্ষিণে পিছু হটল। একাদশ দিন ইউরোপীয় বাহিনী যুদ্ধ করতে এসে দেখল, ময়দান একেবারে শূন্য; একজন মুসলিম সৈন্যও যুদ্ধক্ষেত্রে নেই। ইউরোপীয় বাহিনী অতি সন্তর্পণে মুসলিম শিবিরের দিকে অগ্রসর হল। শিবিরের কাছে এসে তারা দেখতে পেল, পুরো শিবির জনশূন্য, আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ উপচে পড়ে আছে। তারা একে মুসলিম বাহিনীর কোন কৌশল মনে করে শিবিরে আক্রমণ বা লুটপাট করার পরিবর্তে সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল। ইউরোপীয় বাহিনী একবারও মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের চিন্তা করল না। হয়তো তাদের আশঙ্কা ছিল, মুসলিম বাহিনী প্রত্যাবর্তনের পথে তাদের জন্য কোন ফাঁদ পেতে রেখেছে; অথবা তাদের সেনাপতি চার্লস মার্টিল মুসলিম বাহিনী ফিরে যাওয়ায় নিশ্চিন্তে উত্তরে তার দেশে ফিরে যেতে পারবেন বলে মুসলিম বাহিনীর পিছু

Scanned with CamScanner

নেওয়ার চিন্তা করেননি।[১৪২]

যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নিহত সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে ইউরোপীয় বর্ণনাগুলোতে বেশ অতিরঞ্জন রয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরে নিহত মুসলিম সৈন্যসংখ্যা তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অতিরঞ্জিত দাবি। কেননা, মুসলিম বাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যাই পঞ্চাশ হাজার বা সর্বোচ্চ অনুমানে আশি হাজারের বেশি ছিল না।

ডক্টর আবদুর রহমান আলহাজ্জী তার *'আততারীখুল আন্দালুসী'* গ্রন্থে গনীমত সম্পদ সম্পর্কিত এ ঘটনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু যুক্তি তুলে ধরেছেন। নিম্নে আমরা তার বিশ্লেষণ তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন,

> এ বিষয়টি মোটেও প্রমাণিত নয় যে, আরব ও বার্বারদের মধ্যে কোন মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল; না যুদ্ধের পূর্বে, না পরবর্তী সময়ে। ঠিক তেমনই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতি লালসা ও আকর্ষণের যে কল্পকাহিনী প্রচলিত আছে, তা সর্বজনবিদিত ইসলামী বিজয়াভিযানের সুউচ্চ লক্ষ্য-আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর ফ্রান্স অভিযানে অংশগ্রহণকারী কাফেলার ত্যাগ ও সংযমের দাস্তানও সুবিদিত। তাছাড়া এ বিষয়টিও বোধগম্য নয় যে, মুসলিম বাহিনী এ কথা জানা সত্ত্বেও গনীমতের পাহাড়সম সম্পদ সঙ্গে নিয়ে সামনে অগ্রসর হবে যে, তারা শীঘ্রই এক সুকঠিন যুদ্ধে বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। ইউরোপীয় বর্ণনা অনুযায়ী যদি আমরা মেনেও নিই যে, পথিমধ্যে মুসলিম বাহিনী প্রভূত যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী হয়েছিল, তাহলে অবশ্যই মুসলিম বাহিনী তা বিজিত শহরগুলোতে রেখে এসেছিল, কিছুতেই তা সঙ্গে করে নিয়ে আসেনি; বিশেষত আমরা যখন জানি যে, আন্দালুসে অভিযানের প্রকৃতি হল মুসলিম বাহিনী অভিযান চলাকালে ঘোড়া-যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদির প্রতি গুরুত্বারোপ করত, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা অন্যান্য বস্তুর প্রতি নয়। তাছাড়া ইউরোপীয় বর্ণনাসমূহের এ তথ্যটিও অসঙ্গতিপূর্ণ যে, ইউরোপীয় বাহিনী পরবর্তী দিন সকালে যুদ্ধ করতে আসার পূর্বে মুসলিম বাহিনীর কৌশল ও পিছু হটার বিষয়টি বুঝতেই

[১৪২] ড. হুসাইন মুনিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ২২৯।

Scanned with CamScanner

পারেনি। কেননা, এর অর্থ তো এই দাঁড়াচ্ছে যে, পরের দিন সকালের আগ পর্যন্ত নিজেদের প্রাথমিক বিজয় ও মুসলিম বাহিনীর প্রাথমিক পরাজয়ের কোন লক্ষণ তাদের সামনে ফুটে ওঠেনি; চূড়ান্ত ও চরম পরাজয়ের যে চিত্র ইউরোপীয় বর্ণনাসমূহে তুলে ধরা হয়, তা তো দূরের কথা। সুতরাং (আমার মতে) সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও সম্ভাব্য ঘটনা এই যে, মুসলিম বাহিনী (এ যুদ্ধে পরাজিত হয়নি; বরং) তাদের সেনাপতি আলগাফিকীর শাহাদাতের পর স্বাভাবিক রণকৌশল (Tactical think) হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে এসেছে। এটি একটি সামরিক সিদ্ধান্ত, যুদ্ধের যে কোন গুরুতর পরিস্থিতিতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। এ ধরনের পশ্চাদ্‌গমনকে সামরিক বিচারে কোনভাবেই চূড়ান্ত পরাজয় বলা যায় না।[১৪৩]

ডক্টর হাজ্জীর এই পর্যালোচনাকে আমরা পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না, যদিও কিছু কিছু যুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে বাস্তবেই ব্যাপক অধ্যয়ন ও বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন আছে। না মানতে পারার কারণ হচ্ছে,

১. বালাতুশ শুহাদার মহান সৈনিকগণ যত মহানই হোন না কেন, তারাও মানুষ ছিলেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতি আকর্ষণ ও প্রলোভন তাদের মধ্যেও সৃষ্টি হতে পারে। তারা যত মহানই হন, সেসব সাহাবায়ে কেরাম রাযি. থেকে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ নন, যারা ওহুদ যুদ্ধের সময় গনীমত সম্পদ বিষয়ে প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন।

২. বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় যদি নির্মম ও শোচনীয় পর্যায়ের না হয়ে থাকে, তাহলে তো আমরা পরবর্তী ইতিহাস প্রেক্ষাপটে অবশ্যই মুসলমানদের এ অঞ্চলে পুনরায় অভিযান পরিচালনার বিবরণ পেতাম। অথচ বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি। এখান থেকে আমরা একটি শক্তিশালী ঐতিহাসিক ইঙ্গিত লাভ করি যে, বাস্তবেই বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরে মুসলিম বাহিনী হৃদয়বিদারক পরাজয়ের স্বীকার হয়েছিল এবং এ কারণেই উত্তর ফ্রান্সে মুসলিম বাহিনীর অভিযানের ধারা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

৩. ডক্টর হাজ্জী তার বিশ্লেষণে এ বিষয়টি উল্লেখ করেননি যে, কী কঠিনতর

[১৪৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন : আবদুর রহমান আলহাজ্জী, *আততারীখুল আন্দালুসী*, পৃ : ১৯৭।

Scanned with CamScanner

পরিস্থিতির কারণে মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এমনভাবে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল যে, পুনরায় প্রত্যাবর্তন করা সম্ভবই হয়নি। আমরা তো ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে, এমনকি আন্দালুস বিজয়াভিযানের ইতিহাসেও দেখেছি যে, মুসলিম সৈন্যগণ শত্রু বাহিনীর চেয়ে সংখ্যায় ও শক্তিতে অনেক দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও অপরিচিত শত্রু-এলাকায় যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন।

ডক্টর আবদুল হালীম আ'ওয়াইস (Dr. Abdel Halim Ewais) অবশ্য উল্লিখিত 'গনীমত ব্যাখ্যা' কে পরাজয়ের একটি কারণ হিসেবে মানেন বলে মনে হচ্ছে। তিনি লিখেছেন,

> গনীমত সংক্রান্ত ঘটনাবলি আমাদের ইসলামী ইতিহাসের বিস্ময়কর একটি দিক। আর এতে আমাদের জন্য যে অন্তর্নিহিত শিক্ষা রয়েছে, তা আরও বিস্ময়কর। ইসলামের ইতিহাসে আমাদের প্রথম পরাজয়ের কারণ ছিল গনীমত, আবার যে প্রান্তসীমায় গিয়ে আমাদের বিজয়াভিযান থেমে গেল, তার কার্যকারণও গনীমত! আমাদের ইতিহাসে তাই 'গনীমতের গল্প' মানে পরাজয়ের গল্প! প্রথম যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তীরন্দাজ বাহিনী গনীমত সংগ্রহে নিজেদের সুযোগ নষ্ট হবে ভেবে নবীজীর নির্দেশ অমান্য করেছিল আর এতেই ঘটেছিল ওহুদ-ট্রাজেডি! ওহুদ পাহাড় প্রত্যক্ষ করেছিল উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম কাফেলার সত্তরজন সদস্যের শাহাদাতদৃশ্য!
>
> আর এই ক্রান্তিলগ্নে বিজয়াভিযানের এই সর্বশেষ যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন আবদুর রহমান আলগাফিকী রহ.। সর্বশেষ মুসলিম সেনাপতি, যিনি একটি সুবিন্যস্ত ইসলামী বাহিনী নিয়ে পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করেছিলেন প্রথমে ফ্রান্স বিজয়, এরপর ইউরোপের আরও গভীরে প্রবেশের উদ্দেশ্যে। আলগাফিকী পরাজিত হলেন, শহীদ হলেন ইতিহাসের অমর ও চূড়ান্ত রণক্ষেত্র বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরে। ভেঙে গেল মুসলমানদের ইউরোপ বিজয়ের স্বপ্ন। থেমে গেল এ অঞ্চলে মুসলিম বাহিনীর পদচারণা। এ পরাজয়ের পেছনেও সেই একই কারণ, যা দিয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের পরাজয়-পাঠ। অর্থাৎ সেই 'গনীমত-প্রলোভন'।
>
> মাগরেব অঞ্চল ও মুসলিম আন্দালুসে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মুসলমানগণ পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে ওপারের

Scanned with CamScanner

অঞ্চলে ইসলামী অভিযান পরিচালনায় প্রত্যাশী ছিলেন। আন্দালুস বিজয়ী মহান বীর মুসা বিন নুসাইর রহ.-ও এরূপ ইচ্ছা করেছিলেন; কিন্তু অজানা পথে মুসলিম বাহিনী ঝুঁকিতে পড়তে পারে– এই আশঙ্কায় খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক তাকে অনুমতি দেননি। এরপর আন্দালুস-প্রশাসক সামাহ বিন মালিক আলখাওলানী (১০০-১০২ হিজরী) একনিষ্ঠতার সঙ্গে এ বিষয়ে পরিকল্পনা করেন এবং বহু দূর অগ্রসর হন। তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সে অবস্থিত ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল সিবতিমানিয়া জয় করেন। এ অভিযানে সামাহ বিন মালিক পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে ফ্রান্সভূমিতে অবতরণ করেন এবং গ্যারোন (Garonne) নদীর উৎসমুখ পাড়ি দিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন। পথে বিভিন্ন শহর জয় করতে করতে তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সের টুলুয শহরে পৌঁছেন। কিন্তু তিনি সেখানে স্থিতিশীল হতে পারেননি; বরং সেখানেই শহীদ হন। অবশিষ্ট মুসলিম বাহিনী তার অন্যতম সেনাপতি আবদুর রহমান আলগাফিকীর নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ সামাহ বিন মালিক কেবল সিবতিমানিয়া অঞ্চল জয় করতেই সক্ষম হয়েছিলেন।[১৪৪]

বাস্তবতা যাই হোক, গবেষকগণ প্রতীক্ষায় আছেন, কালের পরিক্রমায় হয়তো এখনও অমুদ্রিত বিভিন্ন দুর্লভ ও ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপির পাতা থেকে একসময় উঠে আসবে নতুন কোন তথ্য, যা আমাদেরকে ঐতিহাসিক এই যুদ্ধের ঘটনা-প্রকৃতি বুঝতে সহায়তা করবে, যার কারণে থেমে গিয়েছিল আমাদের ইউরোপ-অভিযান।

বিপর্যয়কর বিজয়!

আমাদের এ শিরোনাম অনেক পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। বিজয় আবার বিপর্যয়কর হয় কী করে! কিন্তু এটিই ইতিহাস-স্বীকৃত বাস্তবতা। নিরপেক্ষ অনেক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকও বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। নোবেল বিজয়ী প্রখ্যাত ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রেন্স (Anatole France) (১৮৪৪-১৯২৪ খৃ.) বলেছেন,

ফরাসী ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল পয়টিয়ার্সের

---

[১৪৪] আবদুল হালীম আ'ওয়াইস, *দিরাসাতুন ফি সুকূতি ইমপারাতুরিয়া দাওলাতিল ইসলামিয়া*, পৃ : ৭-৮।

Scanned with CamScanner

(বালাতুশ শুহাদার) যুদ্ধ। ৭৩২ খৃস্টাব্দে চার্লস মার্টিল যখন পয়টিয়ার্সে আরব (মুসলিম) বাহিনীকে পরাজিত করেন, তখন মূলত আরব (অনুপম) সভ্যতা ইউরোপীয় অসভ্যতা ও বর্বরতার বাধা পেয়ে প্রস্থান করে।[১৪৫]

ইতিহাস ও বাস্তবতা

আল্লাহ তা'আ'লা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾

হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং এই পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে এবং আল্লাহর সম্পর্কেও যেন মহা ধোঁকাবাজ (শয়তান) তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। [সূরা ফাতির : ০৫]

লক্ষণীয় বিষয় হল, মুসলমানগণ যুগে যুগে বিজিত ভূখন্ডের অবারিত সম্পদের ধোঁকায় পড়েছে এবং সম্পদ-দখলের প্রতিযোগিতায় পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছে। আমর বিন আওফ আলআনসারী রাযি. হতে বর্ণিত এক হাদীসেও এরূপ আশঙ্কাবাণী উচ্চারিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ»

আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের জন্য দরিদ্রতার আশঙ্কা করি না; বরং আমি আশঙ্কা করি যে, তোমাদের কাছে দুনিয়ার প্রাচুর্য এসে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে এসেছিল; তখন তোমরা

---

[১৪৫] দেখুন : শাওকী আবু খলীল, *বালাতুশ শুহাদা*, পৃ : ৪৪ ও আবদুর রহমান আলহাজ্জী, *আতলাসুল আন্দালুসী*, পৃ : ১৯৯-২০৩। (লেখক)

উদ্ধৃতির সারকথা হল, ফ্রান্স বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধে জয়লাভ করলেও বঞ্চিত হয়েছিল ইসলামী সভ্যতার চোঁয়ায় আলোকিত ও সুসভ্য সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুযোগ থেকে। আর তাই এ জয় প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য ছিল নৈতিক পরাজয় ও সভ্যতাগত বিপর্যয়। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

তা লাভ করতে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে, যেভাবে তারা লিপ্ত হয়েছিল। এ ধন-সম্পদ তাদেরকে যেভাবে ধ্বংস করেছিল, তোমাদেরকেও তেমনিভাবে ধ্বংস করে দেবে।[১৪৬]

সুতরাং মহান আল্লাহর সুন্নাত ও শাশ্বত নীতি হল পৃথিবী ও পার্থিব সম্পদ যদি নেককার বান্দাদের পদানত হয়, আর তারা যদি সম্পদ-আকর্ষণে প্রবঞ্চিত হয়ে সম্পদের পেছনে ছুটতে থাকেন, তাহলে এ বৈষয়িক সম্পদই তাদের অবশ্যম্ভাবী পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়; যেমনটি ইতিহাসে বারবার ঘটেছে। আর আল কোরআনের এ ঘোষণা তো চির সত্য যে,

﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾

তোমরা আল্লাহর স্থিরীকৃত নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না এবং তোমরা আল্লাহর স্থিরীকৃত নিয়মকে কখনো টলতেও দেখবে না। [সূরা ফাতির : ৪৩]

মুসলিম বাহিনী আরেকটি প্রান্তিকতার শিকার হয়েছিল, যা ছিল এ যুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম নেপথ্য কারণ; তা হল আরব ও আমাজিগ গোত্রের মাঝে জেগে ওঠা জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব। এই জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রভাব ও ক্ষতি যে মুসলমানদের জন্য কতটা ভয়াবহ ছিল, ফ্রান্সবাসী তা শুধু প্রত্যক্ষই করেনি; বরং ইতিহাসগ্রন্থে যেমন সংরক্ষণ করে রেখেছে, তেমনই যুগ যুগ ধরে নিজেদের স্মৃতিপটে ধরে রেখেছে।

এ ঘটনার বহু শতাব্দী পরে ১৮৩০ খৃস্টাব্দে ফ্রান্স আলজেরিয়ায় অনুপ্রবেশ করে এবং ১৯৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আলজেরিয়া দখল করে রাখে। ১৯২০ সালে অধিকৃত আলজেরিয়ায় ফরাসী উপনিবেশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে ফ্রান্স সরকার আন্দোলন দমন করার উপায় খুঁজতে থাকে এবং শেষে একটি কৌশলই খুঁজে পায়; আর তা হল, আলজেরিয়ানদের মধ্যে আরব-আমাজিগ জাতি-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়ে জাতিগত দাঙ্গা বা গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া। তারা আমাজিগদের মাঝে এ কথা প্রচার করতে থাকে যে, নৃ-তত্ত্ব ও জাতিগত শিকড় বিবেচনায় আরবদের তুলনায় আমরা তোমাদের নিকটবর্তী। কারণ, তোমরা আর্য, আমরাও আর্য; আর আরবরা হল

---

[১৪৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪২৫ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৬১।

Scanned with CamScanner

সেমেটিক। অধিকন্তু তোমাদের দৈহিক গড়নও আর্য শ্রেণির মতোই। সুতরাং আমরা-তোমরা একই বংশোদ্ভূত আর আরবরা হল বহিরাগত।

বাহ্যিক দেহ-গড়নে ইউরোপীয়দের সঙ্গে আলজেরিয়ান আমাজিগদের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায় তারা এই অপপ্রচারের সুযোগ পেয়েছিল। অথচ ইসলাম নৃ-তত্ত্ব বা জাতি-তত্ত্বকে স্বীকার করে না; ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পর্কের ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হল তাকওয়া।

আলজেরিয়াতে ফ্রান্স এতটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং সেখানে যেন আরব ও আমাজিগদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিভেদ-বিসংবাদ সৃষ্টি হয়, এ উদ্দেশ্যে তারা আমাজিগ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে ফরাসী ভাষা শিক্ষার ব্যাপক ও জোরদার ব্যবস্থা নেয় এবং এসব অঞ্চলে আরবী ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ করে দেয়। ভাষাগত দিক থেকে তাদের এই কৌশল ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা সফল হলেও আমাজিগদেরকে তারা ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টায় মোটেই সফল হতে পারেনি। আমাজিগদের ভাষা যদিও বদলে গেছে; কিন্তু তাদের ধর্মপরিচয় পুরোপুরি সংরক্ষিত আছে।

আলজেরীয় জনগোষ্ঠীর মাত্র ১৫% আমাজিগ বংশোদ্ভূত। তাদের যদিও একটি স্বতন্ত্র ভাষা-পরিচয় রয়েছে (অর্থাৎ আমাজিগ ভাষা); কিন্তু পবিত্র কোরআনের ভাষা হিসেবে আরবী ভাষাকে তারা নিজেদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল। কিন্তু ফরাসী উপনিবেশ শক্তি তাদের মাঝে জাতীয়তাবাদের আগুন উস্কে দিয়ে নিজস্ব ভাষা-অধিকারের শ্লোগানও জাগিয়ে দেয়। তারা আমাজিগদের আমাজিগ ভাষা শিক্ষাদান শুরু করে; এমনকি ১৯৬৭ সালে ফ্রান্সে আমাজিগ ভাষা শিক্ষাদানের জন্য একটি বিশেষ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাজিগ ভাষা ছিল নিতান্তই একটি কথ্য ভাষা; এর লিখিত কোন রূপ ছিল না। ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠিত একাডেমির কল্যাণে রাতারাতি আমাজিগ ভাষা 'কাণ্ডজে' অস্তিত্ব লাভ করে এবং ল্যাটিন বর্ণে আমাজিগ ভাষা লেখা শুরু হয়। ফ্রান্সেরই উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় আমাজিগ ভাষার প্রচলিত আরবী শব্দগুলোকে ঝেটিয়ে বিদায় করা হয় এবং বিকল্প হিসেবে অন্যান্য মৌলিক ভাষার বিভিন্ন শব্দ আমদানি করা হয়। আমাজিগ তরুণসমাজ যেন স্ব-ভাষায় 'সুশিক্ষিত' হতে পারে, এই 'মহান' লক্ষ্যে ফ্রান্সে আমাজিগ ভাষা শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বৃত্তি ও স্কলারশীপের ব্যবস্থাও করা হয়। এ উদ্দেশ্যেই ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় বার্বার ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি। বর্তমানেও এই একাডেমিতে মরক্কো ও পশ্চিম

Scanned with CamScanner

আফ্রিকা থেকে আমাজিগ তরুণদের সমবেত করে তাদের নিজস্ব ভাষা শেখানো হচ্ছে। এ সবকিছুর উদ্দেশ্য একটাই, আরবদের থেকে আমাজিগ গোত্রকে বিচ্ছিন্ন করা এবং সেই ইসলামী সম্মিলনকে বিনষ্ট করা, যার ভিত্তি হল বিশ্বাস ও ধর্মের একতা। বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরে এবং পরবর্তী সময়ে যুগে যুগে তারা জাতীয়তাবাদী চিন্তার যে ধ্বংসাত্মক প্রভাব দেখেছে, তা তারা ভালো করে মনে রেখেছে এবং সামান্যও তুচ্ছজ্ঞান করেনি।

আশ্চর্যের বিষয় হল, যে ফ্রান্সের একটি আরব মুসলিম দেশে এত ভাষা-দরদ, অন্য একটি ভাষাকে রক্ষার এত প্রাণান্তকর চেষ্টা, সেই ফ্রান্সেই যখন একই সময়কালে ১৯৯৯ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিওনেল জসপিন (Lionel Jospin) প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক (Jacquees Chirac)-এর নিকট ফ্রান্সের বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত কিছু আঞ্চলিক ভাষার সংরক্ষণে একটি প্রকল্পের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তা প্রত্যাখ্যান করে প্রেসিডেন্ট শিরাক বলেছিলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে কি আপনি ফ্রান্সকে বলকান অঞ্চলে পরিণত করতে চান?!

অর্থাৎ এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ফ্রান্সের পরিস্থিতি হবে বলকান অঞ্চলের[১৪৭] মতো, যেখানে পুরো উপদ্বীপটি বংশ ও জাতিগত ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি দেশে পরিণত হয়েছে। বোঝা গেল, এ ধরনের জাতিবিধ্বংসী প্রকল্প তাদের দৃষ্টিতে নিজ ভূমিতে অবৈধ হলেও আলজেরিয়াতে বৈধ![১৪৮]

---

[১৪৭] দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের একটি ঐতিহাসিক উপদ্বীপকে বলকান অঞ্চল বলা হয়। এর পূর্বে কৃষ্ণ সাগর, পশ্চিমে আড্রিয়াটিক সাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর। দানিউব, সাভা ও কুপা নদী অঞ্চলটির উত্তর সীমানা নির্ধারণ করেছে। বুলগেরিয়া থেকে পূর্ব সার্বিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বলকান পর্বতমালার নামে অঞ্চলটির নামকরণ করা হয়েছে। বলকান অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৫,৫০,০০০ বর্গকিলোমিটার। এ অঞ্চলে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি লোকের বাস। বর্তমানে বিভক্ত বলকান অঞ্চলের রাষ্ট্রসংখ্যা মোট ১১টি: ১. আলবেনিয়া ২. বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ৩. বুলগেরিয়া ৪. ক্রোয়েশিয়া ৫. মন্টেনিগ্রো ৬. গ্রিস ৭. ম্যাসিডোনিয়া ৮. সার্বিয়া ৯. মলডোভা ১০. রোমানিয়া ১১. স্লোভেনিয়া।
ইউরোপের এ দেশগুলো একসময় ছিল প্রতাপশালী মুসলিম সালতানাত ওসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। (অনুবাদক)

[১৪৮] ফাহমী হুয়াইদী, 'দারসু ফিতনাতিল আমাযিগ' শীর্ষক প্রবন্ধ, *আলআহরাম পত্রিকা*, ৩/৭/২০০১ খৃস্টাব্দ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইতিহাস পর্যালোচনা

পয়টিয়ার্স অঞ্চলের বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরে আবদুর রহমান আলগাফিকীর শাহাদাত এবং মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের পর মুসলিম বাহিনী ফ্রান্স থেকে আন্দালুসে ফিরে আসে এবং এ অঞ্চলে ইসলামী অভিযানের ধারা স্থগিত হয়ে যায়। বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধপরবর্তী ঘটনাবলির আলোচনায় প্রবেশ এবং চলমান প্রসঙ্গের ইতি টানার পূর্বে এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় রয়েছে; প্রথমে আমরা সেসব বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে চাচ্ছি।

১. প্রাথমিক অবস্থায় আন্দালুসে মুসলিম শক্তি দুর্বল থাকা সত্ত্বেও আন্দালুসবাসী কেন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি?

আন্দালুসে আগমনকারী মুসলিম বাহিনীর সর্বমোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। তারিক বিন যিয়াদের সঙ্গে এসেছিল বার হাজার সৈন্য;[১৪৯] এদের মধ্যে বারবাত প্রান্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তিন হাজার যোদ্ধা আর বারবাত প্রান্তর থেকে টলেডোর পথে বিভিন্ন অভিযানে শহীদ হয়েছিলেন সমসংখ্যক যোদ্ধা। অর্থাৎ তারিক বিন যিয়াদ টলেডো পৌঁছেছিলেন মাত্র ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে। এরপর মুসা বিন নুসাইর আঠার হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুস-ভূমিতে পা রাখেন।[১৫০] ফলে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা চব্বিশ হাজারে পৌঁছয়। পরবর্তী সময়ে আবার এদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে অবিজিত বিভিন্ন অঞ্চল জয় করার উদ্দেশ্যে বিস্তৃত আন্দালুস-ভূমির বিভিন্ন এলাকায় এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের কিছু অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়।

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সুযোগ ও শক্তি থাকা

---

[১৪৯] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমুআ'*, পৃ : ১৭, ইবনে আ'যারী, *আদবারুল মুগরিব*, ২/৬ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৫৪।

[১৫০] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমুআ'*, পৃ : ২৪।

Scanned with CamScanner

সত্ত্বেও আন্দালুসবাসী কেন মুসলিম প্রশাসনের বিরুদ্ধে বা আপন আপন অঞ্চলে বিদ্যমান ক্ষুদ্র সৈন্যদলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি? অথচ প্রতিটি অঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় মুসলিম সৈন্যদলের পরিমাণ এত কম ছিল যে, তুলনা করাও অবান্তর।

আসলে এ প্রশ্নই পুরোপুরি অবান্তর ও বিস্ময়কর! সম্ভাব্য প্রশ্ন তো এই হতে পারে যে, আন্দালুসবাসী বিদ্রোহ করবে কেন? এ প্রশ্ন মোটেই সঙ্গত নয় যে, তারা বিদ্রোহ করেনি কেন?!

মুসলিম বাহিনীর অভিযানের পূর্বে আন্দালুসবাসীর জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল নিপীড়ন-নিষ্পেষণ, অত্যাচার-অবিচার ও প্রচণ্ড দারিদ্র্যের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে। তাদের সম্পদ লুট করা হত, সম্মান-মর্যাদা অহরহ লঙ্ঘিত হত; কিন্তু না এর বিচার ছিল, না ছিল বিচারপ্রার্থনার অধিকার। শাসকশ্রেণি জনগণের সম্পদে রাজকীয় প্রাসাদ গড়ত আর সম্পদের বিলাসিতায় দিন অতিবাহিত করত; অপরদিকে সাধারণ জনগণ জীবন বাঁচাতে দু' মুঠো অন্নের খোঁজে হয়রান হয়ে ঘুরত। রোদে পুড়ে তারা ক্ষেতে-খামারে কাজ করত, ফল ও ফসল জমা হত অন্যের ভাণ্ডারে। শুধু তা-ই নয়, নিজেদের চাষ করা জমি-জমার সঙ্গে তারাও বিক্রি হত, খরিদ হত!

তাহলে আন্দালুসবাসী কেন বিদ্রোহ করবে?! তারা এমন শাসকযন্ত্রের আগমন-প্রত্যাশায় বিদ্রোহ করবে, যা তাদের উপহার দেবে নানা বর্ণের আযাব-যন্ত্রণা?! নাকি তারা বিদ্রোহ করবে নতুন কোন রডারিকের আগমন প্রত্যাশায়?! তারা বিদ্রোহ করবে নিদারুণ ক্ষুৎপিপাসা, লুণ্ঠন ও ছিনতাই, নির্যাতন ও নিপীড়ন এবং প্রশাসনযন্ত্রে পিষ্ট হওয়ার সেই অতীত স্মৃতিকে নতুন করে ফিরিয়ে আনতে?!

এই দুঃসহ জীবনের অবসানের পর আন্দালুসবাসী কী পেয়েছিল? মুসলিম অভিযাত্রীগণ আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে তাদের জন্য নিয়ে এসেছিলেন 'ইসলাম'।

সেই ইসলাম, যা পূর্বের সকল অন্যায় বিধান ও প্রচলনকে নিষিদ্ধ করেছে আর আন্দালুসবাসীকে বলতে এসেছে, এসো, আমি তোমাদেরকে অন্যায়ের পরিবর্তে ন্যায়ের সমাজ উপহার দেব। এটা আমার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কৃপা-দান নয়; বরং তোমাদের, তোমাদের জাতি ও রাষ্ট্রের, তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার। আমি সেই ইসলাম, যাতে শাসক-শাসিতের অধিকারে কোন ব্যবধান নেই। তোমাদের কেউ যদি অন্যায়ের বিচার নিয়ে

Scanned with CamScanner

দাঁড়ায় ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারকের দরবারে, বিচারক বিবেচনা করবেন না কে মুসলমান আর কে বিধর্মী; তিনি দেখবেন না বাদী-বিবাদীর জাতি-বর্ণ বা অবয়ব; তিনি ফয়সালা দেবেন ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে।

আমি সেই ইসলাম, যাতে মানুষের সম্মান ও মূল্যমান তার সম্পদ বা ক্ষমতাবলে নিরূপণ করা হয় না; বরং প্রত্যেকের মর্যাদা নির্ণয় করা হয় তার সৎকর্ম-গুণে। আর ইসলামে তো সৎকর্ম সম্পাদনের অধিকার ও সুযোগ ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিত সকলের জন্য অবারিত। ইসলামের ইবাদতগাহ সবার জন্য উন্মুক্ত।

আমি সেই ইসলাম, যার অনুসারী শাসক তোমাকে বলবে, যদি তুমি মুসলমান হও এবং সম্পদশালী হও, তাহলে তোমার প্রদান করতে হবে মাত্র ২.৫% সম্পদ যাকাত হিসেবে; তাও তোমার সম্পদ নেসাব পরিমাণ হলে এবং নেসাব-সম্পদে এক বছর অতিবাহিত হলে। আর যদি তুমি হও দরিদ্র, তাহলে তোমার কিছুই প্রদান করতে হবে না; বরং নিজে স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে তুমি লাভ করবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা। আর যদি তুমি হও অমুসলিম, সম্পদে ও শক্তিতে সামর্থ্যবান; তাহলে তোমার জিযিয়া প্রদান করতে হবে, যার পরিমাণ মুসলমানদের যাকাতের চেয়ে অনেক কম। এ জিযিয়া তুমি প্রদান করবে মুসলিম সরকার কর্তৃক তোমাকে প্রদত্ত নিরাপত্তার বিনিময়ে। যদি তারা তোমাকে নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হয়, তোমার প্রদেয় সম্পদ তোমাকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি তুমি সম্পদশালী না হও কিংবা না হও যোদ্ধাপুরুষ, তাহলে তোমার কিছুই প্রদান করতে হবে না, বিনা জিযিয়ায় তুমি লাভ করবে মুসলিম সরকারের নিরাপত্তা।

ইসলাম তো আন্দালুসবাসীর কাছে এসেছিল মুক্তি ও শান্তির পয়গাম নিয়ে। আর তাই ইসলামকে তারা আঁকড়ে ধরেছে, জড়িয়ে নিয়েছে এবং আপন করে নিয়েছে। ইসলামের বিপরীতে অন্য কিছুকেই তারা পছন্দ করেনি। তারা পারেনি ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে এবং অন্যায়-নিপীড়ন, লাঞ্ছনা-বঞ্চনার তিক্ততাকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার জন্য দুনিয়া-আখিরাতের চিরস্থায়ী শান্তিকে বিসর্জন দিতে।

Scanned with CamScanner

২. কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, এটা কী করে বোধগম্য হতে পারে যে, পুরো আন্দালুসের প্রতিটি ব্যক্তি ইসলামের সৌন্দর্যগুণে মুগ্ধ হবে? পুরো আন্দালুস-ভূমিতে একজন ব্যক্তিও কি এমন ছিল না, যে ক্ষমতার মোহে বা ব্যক্তিস্বার্থে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা করবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, কেন থাকবে না; নিশ্চয়ই আন্দালুস-ভূমিতে এমন অনেক স্বার্থান্বেষী মানুষের অস্তিত্ব ছিল, যাদের ছিল প্রচুর অনুসারী ও সহযোগী; যারা নিজেদের হারানো প্রতিপত্তি ফিরে পেতে এবং নিজেদের স্বার্থ বাস্তবায়ন করতে ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ইচ্ছাও লালন করত। তারপরও কেন তারা বিদ্রোহ করেনি, সে প্রশ্নের উত্তর রয়েছে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে-

﴿لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ﴾

> (হে মুসলিমগণ!) প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশি। তা এজন্য যে, তারা এমনই এক সম্প্রদায়, যাদের বুঝ-সমঝ নেই। [সূরা হাশর : ১৩]

যে যুগের মুসলমানগণ নিয়মিত বিজয়াভিযান পরিচালনা করত, সে যুগে ইহুদি-নাসারা ও মুশরিকদের অন্তরে মুমিনদের প্রতি এক শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তাআ'লা মুমিনদেরকে এক আশ্চর্য জালাল ও প্রভাবশক্তি দান করে থাকেন। তাই কাছের-দূরের সবাই তাদেরকে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ»

> আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যে, একমাস দূরত্বেও তা প্রতিফলিত হয়।[১৫১]

আর মহান আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

---

[১৫১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৮।

Scanned with CamScanner

﴿فَأَتَىٰهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾

অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছে এমন দিক থেকে এলেন, যা তারা ধারণাও করতে পারেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। [সূরা হাশর : ০২]

অমুসলিমদের অন্তরে মুমিনদের প্রতি এই ভয় ও প্রভাব সৃষ্টির নেপথ্য কারণ এই নয় যে, মুসলমানগণ যুদ্ধক্ষেত্রে কোন ধরনের কদর্য আচরণ করেন, কিংবা তারা নজীরবিহীন নৃশংস কোন অপরাধ করেন। বরং এ ভীতি আল্লাহর সৈনিক ও আল্লাহওয়ালাদের জন্য কুদরতি ইনআ'ম, দয়াময় স্রষ্টার উপহার। মুসলমানদের যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন আচরণ তো মানুষের জন্য ভীতকর নয়ই; বরং সকলের জন্য করুণা ও রহমত। মুসলিম শরীফে যেমন বুরাইদা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী যখন মুসলিম সৈন্যদলকে বিদায় জানাতেন, বিদায়ী হেদায়েতে তাদের সম্বোধন করে বলতেন,

«اُغْزُوْا بِاسْمِ اللهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوْا وَلَا تَغُلُّوْا، وَلَا تَغْدِرُوْا، وَلَا تَمْثُلُوْا، وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا»

তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে। যুদ্ধ করো; তবে সীমালঙ্ঘন করো না, প্রতারণা করো না, নিহত ব্যক্তির অঙ্গ বিকৃত করো না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না।[১৫২]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

«وَلَا تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيْرًا وَلَا امْرَأَةً»

তোমরা কোন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে, শিশু-কিশোরকে বা নারীকে হত্যা করো না।[১৫৩]

অমুসলিমরা যখন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তখন কোথায় থাকে এসব নীতি-আদর্শ? বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও কসোভাতে দুই লক্ষ মুসলিম নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যা করার সময় কোথায় ছিল এই নীতি-আদর্শ?

---

[১৫২] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ১৭৩১।

[১৫৩] *সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ২৬১৪।

Scanned with CamScanner

চেচনিয়ায় রুশ বাহিনীর নিধনযজ্ঞের সময়, কাশ্মীরে ভারতীয়দের হত্যা-উৎসবের সময়, ফিলিস্তিনে ইসরাঈলী ইহুদিদের নির্বিচারে গোলাবর্ষণের সময় এবং আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকার অন্যায় আগ্রাসনের সময় কোথায় থাকে এই যুদ্ধনীতি?[১৫৪]

যদিও শত্রুর অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছে মুমিনের ডর-ভয়, তারপরও মুসলমানদের যুদ্ধ-বিধান পৃথিবীবাসীর জন্য দয়া ও রহমত। বরং ইসলামী শাসনের ছায়ায় বসবাস করাও অমুসলিমদের জন্য পরম সৌভাগ্যের কারণ। কারণ, কোরআনের ভাষায় ইসলামের বিধান হল,

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

> যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। [সূরা মুমতাহিনা : ০৮]

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের উপাসনালয় তাদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের স্বতন্ত্র বিচার-ব্যবস্থার সুযোগ রাখা হয়েছে। অন্যায়ের বিচারপ্রার্থনায় মুসলিম-অমুসলিমের কোন বিভেদ রাখা হয়নি। সুতরাং আন্দালুসবাসী বিদ্রোহ করলেই বরং বিস্ময়ের বিষয় হত। যে ইসলাম তাদের কাছে এসেছে মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে, মহা প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞাত সত্তার পক্ষ থেকে; যিনি জানেন সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগতের কল্যাণ, যিনি জানেন চোখের খেয়ানত ও অন্তরের গোপন চিন্তাও; সে ইসলামের বিরুদ্ধে যদি তারা বিদ্রোহ করত, সে ইসলামকে যদি তারা প্রত্যাখ্যান করত, তাহলেই বরং বিস্ময়ের বিষয় হত।

---

১৫৪ নীতিহীনতা ও বিবেকশূন্যতার সর্বশেষ উদাহরণ তো আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মায়ানমারের আরাকানে চলমান মুসলিম-নিধনের ঘটনা। মায়ানমারে যেভাবে পাশবিক কায়দায় ঠাণ্ডা মাথায় খুন-উৎসব চলছে, আর শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অং সান সূচির পশু-সরকার তা 'উপভোগ' ও 'পৃষ্ঠপোষকতা' করেছে, তা প্রত্যক্ষ করেও নীরব থাকা বিশ্ব মোড়লদের অভিধানে আর যাই থাক 'নীতি' বলে কোন শব্দ থাকতে পারে না। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

৩. বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধে পরাজয়ের কার্যকারণ নিয়ে কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নবী ও সাহাবাযুগের এত নিকট সময়ের মহান তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন-কাফেলার সদস্যদের অন্তরে কীভাবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও পার্থিব সম্পদ-প্রীতি জাগ্রত হল? কীভাবে তাদের মাঝে গোত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল?

এই প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরে আমরা বলব, এ কার্যকারণের বহিঃপ্রকাশ যদি ১১৪ হিজরীতে (৭৩২ খৃস্টাব্দে) হয়ে থাকে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? এর বহিঃপ্রকাশ তো নবীযুগে তৃতীয় হিজরীতে (৬২৫ খৃস্টাব্দে) ওহুদ যুদ্ধে সাহাবীদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। আর এ প্রসঙ্গেই সাহাবীদের সম্বোধন করে আয়াত নাযিল হয়েছে,

﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

তোমাদের মধ্যে কিছু লোক তো এমন, যারা দুনিয়া কামনা করছিল, আর কিছু ছিল এমন, যারা চাচ্ছিল আখিরাত। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তাদের থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন, অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল। [সূরা আলে-ইমরান : ১৫২]

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, ওহুদ যুদ্ধ-বাস্তবতাই নতুন করে বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরে ফিরে এসেছিল।

সাহাবায়ে কেরামের একটি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করায় আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। নবীজী তাদেরকে গিরিপথে অবস্থান করতে বলেছিলেন; কিন্তু বিজয় সুনিশ্চিত ভেবে তীরন্দায দলটি গনীমত সংগ্রহের জন্য গিরিপথ ছেড়ে নীচে নেমে এসেছিল। আর তাদের এই ভুলের পরিণতিতে নিশ্চিত বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। এ কারণেই হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে আমার ধারণাই ছিল না যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দুনিয়া কামনা করে।[১৫৫]

---

[১৫৫] তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন*, ৭/২৯৪ ও ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আ'যীম*, ২/১৩৬।

Scanned with CamScanner

বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরেও যুদ্ধের প্রথমদিকে দু'-তিনদিন মুসলিম বাহিনীর প্রাধান্য ছিল। এরপর খৃস্টান বাহিনী যখন মুসলিম বাহিনীর গনীমত সম্পদ লক্ষ্য করে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে তা কেড়ে নিতে উদ্যত হয়, তখন সম্পদ-প্রীতিতে আক্রান্ত মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং প্রাথমিক বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. তার তাফসীর গ্রন্থে উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ অংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ক্ষমার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ যুদ্ধে আল্লাহ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করেননি; বরং নতুন করে উঠে দাঁড়াবার সুযোগ দিয়েছেন।[১৫৬]

বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরেও মুসলিম বাহিনী সমূলে ধ্বংস হয়নি; বরং নতুন করে উঠে দাঁড়াবার জন্য প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেয়েছে।

আমরা যদি ওহুদ যুদ্ধের চেয়ে আরও পূর্বে ফিরে যাই, দৃষ্টি নিবদ্ধ করি সাহাবায়ে কেরামের প্রথম অভিযাত্রী দল বদরী জামাতের দিকে, তাহলে বদর যুদ্ধেও আমরা দেখতে পাব বালাতুশ শুহাদার ছায়া-দৃশ্য। বদর যুদ্ধের পরও মুসলমানদের মধ্যে গনীমত সম্পদ নিয়ে মতবিরোধ হয়েছিল; আর এ কারণেই বদর যুদ্ধের গৌরবময় বিজয় যে সূরার সিংহভাগ জুড়ে আলোচিত হয়েছে, সেই সূরা আনফাল শুরুই হয়েছে গনীমত প্রসঙ্গে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

(হে নবী!) লোকেরা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দান)-এর এখতিয়ার আল্লাহ ও রাসূলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নাও। আর আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। [সূরা আনফাল : ০১]

এ আয়াতও সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। আর এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা, এটি মানব-স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয়।

---

[১৫৬] ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ২/১৩৩।

Scanned with CamScanner

সুতরাং বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরে যা ঘটেছে, তা নতুন কিছু নয়; মানবিক প্রবৃত্তির এক অনিবার্য দিক এটি। এরূপ ঘটনা পূর্বেও ঘটেছে, ঘটেছে বদরে, ওহুদে। তবে দু' ঘটনার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। ওহুদ যুদ্ধের ঘটনার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রুত এর সংশোধন ও প্রতিকার করেছেন এবং সাহাবীদের অন্তরে আখিরাতের চিন্তা পুনর্জীবিত করে পুনরায় তাদেরকে ঈমানী চেতনায় সমৃদ্ধ করেছেন। ফলে সাহাবায়ে কেরামের এ জামাতই হামরাউল আসাদ-এর যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়ে বিজয় অর্জন করেছেন এবং পূর্বের ঘটনার শিক্ষা কাজে লাগিয়েছেন।[১৫৭] বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরেও জনৈক মুসলিম সেনাপতি উকবা বিন হাজ্জাজ রহ. মুসলিম বাহিনীকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তবে ওহুদ যুদ্ধের পর যেমন হামরাউল আসাদের যুদ্ধ হয়েছিল, বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধের পর তেমন কিছু ঘটেনি আর মুসলমানরাও অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগানোর এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার সুযোগ পায়নি।

এই দুই বাহিনীর মধ্যে আরেকটি পার্থক্য হল, বালাতুশ শুহাদার বাহিনীর বড় অংশই সম্পদপ্রীতি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি, অপরদিকে কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী ওহুদ যুদ্ধের অবস্থা ছিল, একদল পার্থিব মোহের শিকার হলেও আরেকদলের চিন্তা ও চেতনা পরকালীন চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল। এ কারণেই ওহুদ যুদ্ধ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে মুসলিম জামাত খুব দ্রুত সঠিক পথে ফিরে আসতে পারলেও বালাতুশ শুহাদার পর পারেনি।

ওহুদ ও বালাতুশ শুহাদার মধ্যে আরও একটি বড় সাদৃশ্য হল, ওহুদ যুদ্ধে যখন নবীজীর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, তখন মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং পশ্চাদ্ধাবন করে;[১৫৮] তদ্রূপ বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরে যখন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবদুর রহমান আলগাফিকী শহীদ হন, মুসলিম বাহিনী পিছু হটে এবং দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। বস্তুতঃ পরম সাদৃশ্যপূর্ণ এ ধরনের ঘটনা ইসলামী ইতিহাসে বারবার সংঘটিত হয় আর মুসলিম জাতির সামনে রেখে যায় জেগে ওঠার শিক্ষা ও উপদেশ।

---

[১৫৭] ইবনে আবদিল বার কুরতুবী, *আদদুরার ফী ইখতিসারিল মাগাযি ওয়াস সিয়ার*, ১/১৬৭ ও ইবনে কাসীর, *আসসীরাতুন নাবাবিয়্যা*, ৪/৫২।

[১৫৮] ইবনে কাসীর, *আসসীরাতুন নাবাবিয়্যা*, ৪/১৫৮।

Scanned with CamScanner

জাতীয়তাবাদ ও গোত্রবাদের সমস্যা

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর প্রথম অংশের মতোই। কেননা, এ ধরনের সাম্প্রদায়িক চিন্তা নবীযুগের মুসলমানদের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। আর মানবপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এ জাতীয় চিন্তার আনাগোনা একটা পর্যায় পর্যন্ত নিন্দনীয়ও নয়; না নবীযুগে, না বর্তমান যুগে। তবে ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য আছে, যাদের একজন এ ধরনের চিন্তায় আক্রান্ত হওয়ার পরই আত্মসংশোধনের পথে অগ্রসর হন; আর অন্যজন এ ভ্রান্ত চিন্তায় ঘুরপাক খেতে খেতে কলহ সৃষ্টি করেন।

এক্ষেত্রে আমরা দুই মহান সাহাবী আবু যর রাযি. ও বেলাল রাযি.-এর সেই প্রসিদ্ধ ঘটনাটির কথা স্মরণ করতে পারি। কোন একটি বিষয়ে মতবিরোধের একপর্যায়ে আবু যর রাযি. হযরত বেলাল রাযি. কে তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'এই কৃষ্ণ মহিলার ছেলে!' বেলাল রাযি. মনঃক্ষুণ্ন হয়ে নবীজীকে বিষয়টি অবহিত করলেন। নবীজী এ কথা শুনে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং আবু যর রাযি.কে ডেকে বললেন,

«إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»

তোমার মধ্যে তো এখনও জাহেলী যুগের স্বভাব রয়ে গেছে! জেনে রেখো, তোমাদের ক্রীতদাসেরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। তাই যার অধীনে তার ভাই থাকবে, সে যেন নিজে যা খায়, তাকে তা-ই খাওয়ায়; নিজে যা পরিধান করে, তাকে তা-ই পরিধান করায়; তাদের ওপর এমন কোন কাজ চাপিয়ে না দেয়, যা তাদের জন্য খুব কষ্টকর। যদি এমন কষ্টকর কাজের দায়িত্ব চাপাতেই চাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সাহায্য করবে।[১৫৯]

এ ঘটনায় শিক্ষার দিক হল, আবু যর রাযি.-এর পরবর্তী আচরণ, যা তিনি নিজের অন্যায়ের প্রতিবিধান হিসেবে এবং নবীজীর অসন্তুষ্টি প্রশমনে

---

[১৫৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৬১।

Scanned with CamScanner

করেছিলেন ।

আবু যর রাযি. কী করলেন? তিনি হযরত বেলাল রাযি.-এর সামনে মাথা পেতে দিলেন আর বারবার তাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, যেন তিনি তার পা দিয়ে আবু যরের চেহারা মাড়িয়ে দেন এবং এর মাধ্যমে তার অন্যায়ের প্রতিবিধান হয় । বেলাল রাযি. এ কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং আবু যর রাযি.কে ক্ষমা করে দিলেন ।

নবীযুগে এমনই আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে । শাস বিন কায়স নামক জনৈক মুনাফিক উভয় গোত্রের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করলে আওস গোত্রের কিছু লোক চিৎকার করে উঠল, 'আওস গোত্রের লোকেরা কোথায়, সাহায্য কর' । খাযরাজ গোত্রের কিছু লোকও চিৎকার করে উঠল, 'খাযরাজ গোত্রের লোকেরা কোথায়, সাহায্য কর' । এ কথা শুনে নবীজী বললেন, আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তোমরা এই জাহেলী উচ্চারণ মুখে আনছ?! এ ধরনের মনোভাব পরিহার কর; এগুলো তো দুর্গন্ধময় ।

নবীজীর ওফাতের পর বনু হানীফা কর্তৃক বিদ্রোহের যে ঘটনা ঘটেছিল, সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার তারচে বড় দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? এ সময় বনু হানীফা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মিথ্যানবী মুসাইলামাতুল কাযযাবের পক্ষাবলম্বন করে । মুসাইলামাতুল কাযযাবের জনৈক অনুসারীকে তখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তুমি কি জানো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যবাদী আর মুসাইলামা মিথ্যাবাদী? সে উত্তর দিল, আল্লাহ সর্বজ্ঞাত যে, মুহাম্মাদ সত্যবাদী আর মুসাইলামা মিথ্যাবাদী; কিন্তু বনু রবীয়ার মিথ্যাবাদী ব্যক্তি আমার কাছে বনু মুযার-এর সত্যবাদীর চেয়ে প্রিয় ।[১৬০]

লোকটির দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি সাম্প্রদায়িকতায় ভরপুর ছিল । ঈমানের নূর যদি তার হৃদয়কে স্পর্শ করত, তাহলে সে এ ধরনের কথা কিছুতেই বলতে পারত না ।

সুতরাং জাতীয়তাবাদ, গোত্রবাদ এসব চিন্তাধারার অস্তিত্ব নবীযুগেও ছিল । তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জাতীয় সমস্যার দ্রুত প্রতিকার করতেন, মানুষের মাঝে ঈমানী চেতনাকে ফিরিয়ে আনতেন,

---

[১৬০] তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, ২/২৭৭ ও ইবনে কাসীর, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৬/৩৬০ ।

Scanned with CamScanner

তাদের চিন্তাধারাকে আল্লাহমুখী করতে সচেষ্ট হতেন এবং তাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। মহান আল্লাহর নির্দেশও হল,

﴿وَّذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

এবং উপদেশ দিতে থাক। কেননা, উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে। [সূরা যারিয়াত : ৫৫]

নবীজীর প্রতিকার-চেষ্টা সাহাবায়ে কেরামও দ্রুত গ্রহণ করতেন এবং যা ঘটে গেছে তা ত্যাগ করে ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি করতেন না। তাদের হৃদয়জগতে সবসময় জাগরূক থাকত মহান আল্লাহর বাণী,

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ﴾

অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন তাদের মধ্যকার কোন আত্মীয়তা বাকি থাকবে না এবং কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করবে না। তখন যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হয়ে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন, যারা নিজেদের জন্য লোকসানের ব্যবসা করেছিল। তারা সদা-সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। [সূরা মুমিনূন : ১০১-১০৩]

Scanned with CamScanner

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
(উমাইয়া প্রশাসনের) অবসন্নতার যুগ

বালাতুশ শুহাদা যুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ
আবদুল মালিক বিন ক্বাতান আলফিহরী (১১৪-১১৬ হিজরী)

বালাতুল শুহাদা প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর মর্মন্তুদ পরাজয় ও সেনাপতি আবদুর রহমান আলগাফিকী রহ.-এর শাহাদাতের সংবাদ আফ্রিকার গভর্নর ওবায়দা বিন আবদুর রহমান আলকায়সীর কাছে পৌছলে তিনি তৎকালীন উমাইয়া খলীফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের কাছে আন্দালুসের প্রশাসক হিসেবে আবদুল মালিক বিন ক্বাতান আলফিহরীর নাম প্রস্তাব করে পাঠান এবং খলীফা তা অনুমোদন করেন। এটি ১১৪ হিজরীর রমযান বা শাওয়াল মাসের (৭৩২ খৃস্টাব্দের) ঘটনা।[১৬১]

জুলুম ও যুদ্ধ!

দায়িত্বগ্রহণের পর আবদুল মালিক বিন ক্বাতান প্রথমেই ফ্রান্স অঞ্চলে মুসলমানদের অবস্থান পুনরায় সুদৃঢ় করতে মনস্থ করেন। বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধের পর এ অঞ্চলে মুসলমানদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আপন দৃঢ় সংকল্পবলে তিনি এক্ষেত্রে সফলও হন। অবশ্য তার সফলতার পেছনে আরও দু'টি বিষয় সহায়ক ছিল। একদিকে দক্ষিণ ফ্রান্সের জনগণ চার্লস মার্টিলের নিপীড়ন ও জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। চার্লস মার্টিল শাসনের নামে তাদের ওপর শোষণ ও অত্যাচার চালাতেন এবং সেনাবাহিনীকে এ কাজে ব্যবহার করতেন। অপরদিকে আবদুল মালিক বিন ক্বাতান

---

[১৬১] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ৩১, ইবনে আ'ষারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৮ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৬। অপরদিকে হুমাইদী *জাযওয়াতুল মুক্বতাবাস* (৭/২৮৭)-এ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ১১৫ হিজরীতে প্রশাসনদায়িত্ব লাভ করেন।

Scanned with CamScanner

পেয়েছিলেন ইউসুফ আলফিহরী নামের একজন সুদক্ষ সেনাপতিকে, যিনি বেশ কয়েকবার নরবোন শহরে পরিচালিত অভিযানে নেতৃত্ব দেন।[১৬২]
আবদুল মালিক বিন ক্বাত্তান তার শাসনামলে অমুসলিম রাষ্ট্রে বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখলেও আপন সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের সঙ্গে তার আচরণ মোটেই প্রীতিকর ছিল না। তিনি ছিলেন জালিম ও অত্যাচারী প্রকৃতির অদক্ষ একজন প্রশাসক। আন্দালুসবাসীর পক্ষ থেকে আফ্রিকার গর্ভনর ওবায়দুল্লাহ ইবনুল হাবহাব-এর কাছে তার বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ পৌঁছলে বাধ্য হয়ে তিনি তাকে বরখাস্ত করেন। তার এই প্রথমবারের শাসনকাল দু' বছর স্থায়ী ছিল। ১১৬ হিজরীর রমযান মাসে (৭৩৪ খৃস্টাব্দে) তিনি বরখাস্ত হন।[১৬৩]

উকবা ইবনুল হাজ্জাজ (১১৬-১২৩ হি.)

এরপর আফ্রিকার গর্ভনর ওবায়দুল্লাহ ইবনুল হাবহাব আন্দালুসের প্রশাসনিক দায়িত্বের জন্য সুদক্ষ বীর সেনানী উকবা ইবনুল হাজ্জাজ আসসালুলীকে নির্বাচন করেন। উকবা ইবনুল হাজ্জাজ ১১৬ হিজরী থেকে ১২৩ হিজরী পর্যন্ত (৭৩৪-৭৪১ খৃস্টাব্দ) আন্দালুসের প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন।[১৬৪]
উকবাকে পুরো (উত্তর) আফ্রিকার গভর্নর-পদ ও আন্দালুসের প্রশাসকের পদ– এ দু'টির মধ্য হতে কোন একটি বেছে নিতে বলা হয়েছিল। খৃস্টান-অধ্যুষিত অঞ্চলের নিকটবর্তী আন্দালুসের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করলে খৃস্টান অঞ্চলে বিজয়াভিযান পরিচালনার মাধ্যমে অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আমল সম্পাদনের সুযোগ পাওয়া যাবে, এই চিন্তা করে তিনি আন্দালুসের প্রশাসকের পদ-ই বেছে নেন।[১৬৫]
ইবনে আ'যারী রহ. বলেন,

---

[১৬২] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৬। আবদুল মালিক বিন ক্বাত্তান-এর অভিযানসমূহ সম্পর্কে জানতে দেখুন : শাকির আরসালান, *গাযাওয়াতুল আরব ফী ফারানসা ওয়া সুওয়াইসরা ওয়া ইতালিয়া ওয়া জাযাইরিল বাহরিল মুতাওয়াসসিত*, পৃ : ৯২ ও ড. হুসাইন মু'নিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ২৩০-২৩৩।
[১৬৩] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৬।
[১৬৪] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমুআ*, পৃ : ৩৩-৩৪, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৯ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৬।
[১৬৫] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমুআ*, পৃ : ৩৩।

Scanned with CamScanner

উকবা আন্দালুসের দায়িত্ব পালনকালে অত্যন্ত উদার ও চমৎকার আচরণের পরিচয় দিয়েছেন । তিনি ছিলেন মহান ও ন্যায়পরায়ণ ।[১৬৬]

মাক্কারী রহ. বলেন,

উকবা ইবনুল হাজ্জাজ আসসালূলী ওবায়দুল্লাহ্ ইবনুল হাবহাবের পক্ষ থেকে আন্দালুসের প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন । তিনি ছিলেন একজন সফল ও বিজয়ী সেনাপতি ।[১৬৭]

উকবা ইবনুল হাজ্জাজ-এর বিজয়াভিযান

তিনি তার সাত বছরের প্রশাসনিক আমলে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে সাতবারের বেশি অভিযান পরিচালনা করেন । যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি নিজে যুদ্ধবন্দীদের কাছে গিয়ে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরতেন এবং ইসলাম শিক্ষা দিতেন । ফলে তার হাতে প্রায় এক হাজার যুদ্ধবন্দী ইসলাম গ্রহণ করে ।[১৬৮] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ»

আল্লাহ্ যদি তোমার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকেও হিদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল বর্ণের উটের চেয়েও শ্রেয় ।[১৬৯]

তাহলে ভেবে দেখুন, যে মহান সেনাপতির হাতে এক হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার মর্যাদা কত উর্ধ্বে।

দায়িত্বলাভের পরই উকবা ইবনুল হাজ্জাজ ফ্রান্সের মাটিতে ইসলামী ঝাণ্ডার হৃত গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে শুরু করেন । প্রথমে ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের প্রভিন্সে (Provence) মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় করেন এবং এ শহরে মুসলমানদের প্রহরা-ঘাঁটি স্থাপন করেন ।[১৭০] এরপর তিনি লিওনের

---

[১৬৬] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৯ ।

[১৬৭] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৬ ।

[১৬৮] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৯ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/১৯ ।

[১৬৯] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৩৪৯৮ ।

[১৭০] ড. হুসাইন মু'নিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ২৩৩ ।

Scanned with CamScanner

পূর্বদিকে অবস্থিত ডফিন (Dauphine) নগরী দখল করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে সেন্টপল (saint paul)[১৭১], সিবতিমানিয়া প্রদেশের রাজধানী নরবোন নগরী এবং একই প্রদেশের কারকাসোনা (Carcassona) শহর জয় করেন।[১৭২] তার সময়ে মুসলিম বাহিনীর বিজয়াভিযান বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং ইটালির উত্তরাঞ্চলের পেইড্‌মন্ট (Piedmonte) প্রদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।[১৭৩]

উকবা রহ. আন্দালুসের যেসব অঞ্চল তখনও জয় করা হয়নি সেসব অঞ্চল জয় করার জন্য এবং যেসব অঞ্চল বিজিত হয়েছে সেগুলোতে বিজয়-সুফল ধরে রাখার জন্য আন্দালুসেও যুদ্ধ-তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। বিশেষত উত্তর-পশ্চিম আন্দালুসের গ্যালিসিয়া (Galicia) অঞ্চল তখনও মুসলিম প্রশাসনের করতলে আসেনি। অঞ্চলটি পেলাজিউস (Pelagius) নামক জনৈক খৃস্টান রাজার শাসনাধীন ছিল। তিনি এ অঞ্চল জয় করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। কিন্তু সত্য স্বীকার করতেই হবে, এ অঞ্চলে তিনি বিস্ময়কর নির্ভীকতা ও বীরত্বের মুখোমুখি হন।

আখবারুন মাজমুআ' গ্রন্থের লেখক এ বিষয়ে লিখেছেন,

> গ্যালিসিয়া অঞ্চলে একমাত্র সাখরাতুল বিলাইয়া (Covadonga) জনপদ ছাড়া পুরো অঞ্চল জয় করা হয়ে গিয়েছিল। খৃস্টান রাজা পেলাজিউস মাত্র তিন শ' অনুসারী নিয়ে পাহাড়ের সংকীর্ণ উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। মুসলিম বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেল। একে একে তার অনুসারীরা খাবারের অভাবে ক্ষুধার তাড়নায় মারা যেতে লাগল। কমতে কমতে তার অনুসারীর সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র ত্রিশ জনে। কথিত আছে, তাদের কাছে পান করার মতো দশ ঢোক পানিও অবশিষ্ট ছিল না। পাহাড়ের মৌচাক থেকে পাওয়া মধু খেয়ে তারা কোনমতে বেঁচে ছিল। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর মুসলিম বাহিনী অপারগ হয়ে এই মনে করে সেখান থেকে চলে এল যে, ক্ষীণকায় এই ত্রিশজন ব্যক্তি কী-ই আর করতে পারবে? মুসলিম

---

[১৭১] শাকির আরসালান, *গাযাওয়াতুল আরব ফী ফারানসা ওয়া সুওয়াইসরা ওয়া ইতালিয়া ওয়া জাযাইরিল বাহরিল মুতাওয়াসসিত*, পৃ : ১০৫-১০৬ ও ড. হুসাইন মু'নিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ২৩৩।

[১৭২] আবদুর রহমান আলহাজ্জী, *আততারীখুল আন্দালুসী*, পৃ : ২০৪-২০৫।

[১৭৩] ড. হুসাইন মু'নিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ২৩৪।

Scanned with CamScanner

বাহিনী তাদেরকে তুচ্ছজ্ঞান করলেও কালের পরিক্রমায় তারাই একদিন বিশাল বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১৭৪]

উকবা ইবনুল হাজ্জাজ ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ ও সুদক্ষ সেনাপতি। আপন সৈন্যদের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত সদাচরণ করতেন। ইসলামের এই মহান সৈনিক ১২৩ হিজরীতে (৭৪১ খৃস্টাব্দে) শহীদ হন[১৭৫] আর তার শাহাদাতের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে প্রশাসক আমলের প্রথম ধাপের।

প্রশাসক আমলের দ্বিতীয় ধাপ

প্রশাসক আমলের দ্বিতীয় স্তরের সূচনা ১২৩ হিজরীতে আর সমাপ্তি ১৩৮ হিজরীতে (৭৪১-৭৫৫ খৃস্টাব্দে)। এ আমলের আন্দালুস-ইতিহাস পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নিত্যনতুন বিবাদ-বিসংবাদের ঘটনায় ভরপুর। এর মূলে ছিল সেই ঘৃণিত বংশ ও জাতিবিদ্বেষ, যা সে সময়ের আন্দালুস প্রশাসকগণ আরবী-আজমিগ নির্বিশেষে সবার সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে নিজেদের নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে বিভিন্ন বিদ্রোহ-পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এবং আন্দালুসে এমন এমন নতুন চিন্তাধারা ও মতবাদের জন্ম হয়েছিল, যার অস্তিত্ব ইতঃপূর্বে ছিল না।

মাগরেবে খারেজীদের বিদ্রোহ

উকবা ইবনুল হাজ্জাজের মৃত্যুর পর ১২৩ হিজরীতে (৭৪২ খৃস্টাব্দে) আন্দালুসের শাসনক্ষমতা ফিরে আসে তার পূর্ববর্তী প্রশাসক আবদুল মালিক বিন ক্বাতান আলফিহরীর হাতে।[১৭৬] তার এই দ্বিতীয় শাসনামলে এমন কিছু গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হয়, যার কারণে আন্দালুস ভূমি থেকে ইসলামের

---

[১৭৪] *লেখক অজ্ঞাত, আখবারুন মাজমুআ'*, পৃ : ৩৪।

[১৭৫] ইবনে খালদুন, *তারীখে ইবনে খালদুন*, ৩/১৪১ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৬। আরেক মত অনুযায়ী আন্দালুসবাসী ১২৩ হিজরীর সফর মাসে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। ভিন্নমতে, মৃত্যুর পূর্বে উকবা নিজেই আবদুল মালিক বিন ক্বাতান আলফিহরীকে ১২১ হিজরীতে তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। (ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩০)। চতুর্থ আরেকটি মত হল, আবদুল মালিক বিন ক্বাতান আলফিহরী তাকে ১২১ হিজরীতে বরখাস্ত করেছিলেন। (*লেখক অজ্ঞাত, আখবারুন মাজমুআ'*, পৃ : ৩৫)।

[১৭৬] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩০, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৬। আরেক মত হল, তিনি ১২১ হিজরীতে ক্ষমতা লাভ করেন। দেখুন : *লেখক অজ্ঞাত, আখবারুন মাজমুআ'*, পৃ : ৩৫ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ১/৫৩।

Scanned with CamScanner

নাম চিরতরে মুছে যাওয়ার উপক্রম হয়। এর মধ্যে সবচে' ভয়ানক হল আরব ও আমাজিগদের মধ্যে ঘৃণিত জাতি-সংঘাতের পুনঃআগমন এবং খারেজী ফিরকার আত্মপ্রকাশ।

খারেজীরা তখন ইসলামী সালতানাতের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধের ইন্ধন যোগাচ্ছিল এবং বনু উমাইয়ার প্রশাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। প্রশাসকগণ যেহেতু আমাজিগদের সঙ্গে অসদাচরণ করতেন, তাই তাদের আচরণ আমাজিগদেরকে এই দ্বীন বহির্ভূত চিন্তা-চেতনা আঁকড়ে ধরতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এর মাঝেই তারা নিজেদের ভূলুণ্ঠিত অধিকার পুনরুদ্ধারের পথ খুঁজে নিয়েছিল।[১৭৭]

মাগরেবে প্রথমে খারেজীদের হাতেই আমাজিগ কিতনা বৃহৎরূপে আত্মপ্রকাশ করে। খারেজীরা আমাজিগদের কাতারে মিশে গিয়ে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। প্রশাসনিক নিপীড়নের শিকার আমাজিগ সমাজের মাঝে খারেজী চিন্তাধারা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। তারা তাদের নেতা মাইসারা আলমুত্গিরীর নেতৃত্বে তৎকালীন তানজা-প্রশাসক আমর বিন আবদুল্লাহ আলমুরাদীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে হত্যা করে পশ্চিমে সুস (Sous) নগরীর দিকে অগ্রসর হয়। এরপর তারা সুস নগরীর প্রশাসক ইসমাঈল বিন ওবায়দুল্লাহকেও হত্যা করে।[১৭৮] আমাজিগদের এই বিদ্রোহ ও প্রশাসকহত্যার প্রতিটি ঘটনা আফ্রিকা-প্রশাসক ওবায়দুল্লাহ ইবনুল হাবহাব-এর ওপর আঘাত হয়ে আসছিল। তাই তিনি বিদ্রোহীদের শক্তি আরও সুসংহত হওয়ার পূর্বেই প্রতিকারের জন্য সৈন্যসমাবেশ ঘটান। ১২৩ হিজরী মোতাবেক ৭৪২ খৃস্টাব্দে আরব ও আমাজিগ বাহিনী শালিফ প্রান্তরে মুখোমুখি হয় এবং আরব বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। এ যুদ্ধে বহু আরব বীর, যোদ্ধা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিহত হয়েছিল বলে ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'সম্ভ্রান্তদের (পতন) যুদ্ধ' নামে পরিচিত।[১৭৯]

খলীফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। তিনি বলে ওঠেন, আল্লাহর শপথ! তাদের সঙ্গে আমি

---

[১৭৭] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন : ড. হুসাইন মুনিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ১৭০-১৭৩ ও মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ৭৯-৮০।

[১৭৮] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমুআ*, পৃ। ৩৪-৩৫, ইবনে আবদিল হিকাম, *ফুতুহু মিসর ওয়া আখবারুহা*, ১/২৩৭ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ১/৫২।

[১৭৯] ইবনে আবদিল হিকাম, *ফুতুহু মিসর ওয়া আখবারুহা*, ১/২৩৭ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ১/৫৩।

Scanned with CamScanner

প্রদর্শন করব আরবী ক্রোধ। আমি তাদের দমনে এত বড় বাহিনী প্রেরণ করব যে, বাহিনীর অগ্রভাগ থাকবে তাদের সম্মুখে আর শেষ ভাগ আমার এখানে।[১৮০] হিশাম তৎক্ষণাৎ (১২৩ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে) ওবায়দুল্লাহ ইবনুল হাবহাবকে বরখাস্ত করেন এবং তাকে দামেশকে তলব করেন। তিনি কুলসুম বিন ইয়াষ আলকুশাইরীকে আফ্রিকায় গর্ভনর-পদ প্রদান করে চলমান ফিতনা দমনের দায়িত্ব দিয়ে তার নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। খলীফা তার সঙ্গে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র বালজ বিন বিশর আলকুশাইরী ও সা'লাবা বিন সালামা আলআমিলীকেও প্রেরণ করেন।[১৮১]

কুলসুম বিন ইয়াযের নেতৃত্বাধীন আরব বাহিনী এবং খালিদ বিন হুমাইদ আযযানাতীর নেতৃত্বাধীন আমাজিগ বাহিনীর মধ্যে শুরু হয় প্রাণপণ লড়াই। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর যুদ্ধপরিস্থিতি আরবদের প্রতিকূলে চলে যায় এবং তাদের সেনাপতি কুলসুম বিন ইয়াষ নিহত হন। বালজ বিন বিশর কিছু সৈন্য নিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন এবং তাদেরকে নিয়ে সিউটা শহরে আশ্রয় নেন। এরপর আমাজিগরা দীর্ঘ একবছর (১২৩-১২৪ হিজরী) বালজ ও তার সঙ্গীদের অবরোধ করে রাখে। এই পুরো সময় বহুবার তারা আন্দালুস-প্রশাসক আবদুল মালিক বিন ক্বাতানের কাছে সাহায্যের বার্তা পাঠালেও কোন সাড়া পাননি।[১৮২]

খারেজী ফিতনা ও বিদ্রোহ এবার আন্দালুস-ভূমিতে

প্রশাসক ও প্রশাসনবিরোধী এই বিদ্রোহ কিন্তু উত্তর আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ রইল না। এরপর তা ছড়িয়ে পড়ল আন্দালুসেও। আন্দালুসে বসবাসরত আমাজিগ জনগোষ্ঠীও তাদের প্রশাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। আন্দালুসের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গ্যালিসিয়া ও আসতুরকা এলাকায় যেহেতু প্রচুর আমাজিগ জনগোষ্ঠীর নিবাস ছিল, তাই প্রথমে এসব এলাকায়

---

[১৮০] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ১/৫৪।

[১৮১] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ'*, পৃ : ৩৬, ইবনে আবদিল হিকাম, *ফুতূহ মিসর ওয়া আখবারুহা*, ১/২৩৯, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ১/৫৪-৫৫ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/২০।

[১৮২] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ'*, পৃ : ৩৭-৪২, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ১/৫৫-৫৬ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/২০-২১।

Scanned with CamScanner

বিদ্রোহ শুরু হল। এসব এলাকার বিদ্রোহী আমাজিগ জনগোষ্ঠী নির্বিচারে আরবদের হত্যা ও এলাকা-ছাড়া করতে লাগল। অবশ্য জারাগোযা (Zaragoza) অঞ্চলে আরবদের আধিক্য থাকায় সেখানে আমাজিগরা প্রভাব বিস্তার করতে পারল না।[১৮৩]

এ অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর সুচিন্তিত ও মেধাপূর্ণ পরিকল্পনার আলোকে আন্দালুস-প্রশাসনের দুর্বল দিকগুলো নির্ণয় করে সেগুলোকে কাজে লাগাতে আমাজিগরা তিনটি বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং বড় বড় শহরগুলোর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেগুলোর দিকে অগ্রসর হল।

প্রথম বাহিনীটি অগ্রসর হল মধ্য সীমান্ত অঞ্চলের[১৮৪] রাজধানী টলেডোর দিকে; দ্বিতীয় বাহিনী অগ্রসর হল আন্দালুসের রাজধানী কর্ডোভার দিকে আর তৃতীয় বাহিনীটি অগ্রসর হল দেশের দক্ষিণ সীমান্তে জাযিরাতুল খাযরা-এর দিকে।

আমাজিগদের অভিযানের সংবাদ পেয়ে বাধ্য হয়ে আন্দালুস-প্রশাসক আবদুল মালিক বিন ক্বাতান সিউটায় অবরুদ্ধ বালজ ও তার সঙ্গীদের সাহায্য চাইলেন। অথচ ইতঃপূর্বে তিনি তাদের সাহায্যের ডাকে একবারও সাড়া দেননি এবং অবরুদ্ধ অবস্থায় তারা ক্ষুধার তাড়নায় মারা যাওয়ার উপক্রম হলেও তাদেরকে আন্দালুসে আগমনের অনুমতি দেননি। এবার নিরুপায় হয়ে তিনি নিজেই তাদের জন্য নৌযান ও রসদসামগ্রী পাঠালেন এবং তার সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে আবির্ভূত হওয়া আমাজিগ-বিদ্রোহকে দমন করার জন্য তাদেরকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।[১৮৫]

আন্দালুসে পা রাখার পর বালজ বিন বিশরের বাহিনী প্রথমেই দক্ষিণে

---

[১৮৩] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ৪২।

[১৮৪] প্রশাসনিক সুবিধার্থে আন্দালুসের সীমান্তবর্তী অঞ্চলকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছিল : আসসাগরুল আ'লা (উচ্চ সীমান্ত অঞ্চল), আসসাগরুল আওসাত (মধ্য সীমান্ত অঞ্চল) ও আসসাগরুল আদনা (নিম্ন সীমান্ত অঞ্চল)। নাভার, লিওন ও ক্যাস্টোলা ইত্যাদি খৃস্টান রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী উত্তর আন্দালুসের জারাগোযা ও সংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলকে আসসাগরুল আ'লার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। টলেডো ও তার সংলগ্ন অঞ্চলসমূহ ছিল আসসাগরুল আওসাতের অন্তর্ভুক্ত। টাজু (Tagus) নদী ও ডিওর (Duo) নদীর মধ্যবর্তী পশ্চিম আন্দালুসের কুরিয়া, কুলুমরিয়া, সান্তারিন প্রভৃতি এলাকা ছিল আসসাগরুল আদনার অন্তর্ভুক্ত। (অনুবাদক)

[১৮৫] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ৪২-৪৩ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩০-৩১।

Scanned with CamScanner

জাযিরাতুল খাযরা-এর দিকে আগত আমাজিগদের তৃতীয় বাহিনীর মুখোমুখি হল। ১১৩ হিজরীর যিলকদ মাসে সিডোনিয়ার (Sidonia) সন্নিকটে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হল। বালজ বিন বিশরের নেতৃত্বে শামের বাহিনী প্রচণ্ড বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করল। ফলে জয়ের পাল্লা তাদের দিকেই ঝুঁকে পড়ল।

ঠিক একই সময়ে কর্ডোভা আমাজিগদের দ্বিতীয় বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হল। বালজ বিন বিশর তৃতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেই কর্ডোভার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন এবং আবদুল মালিক বিন ক্বাতানের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাজিগদের দ্বিতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। উভয়ে মিলে আমাজিগ বাহিনীকে এমনভাবে পরাজিত করলেন যে, পলাতক কিছু সৈন্য ছাড়া আমাজিগদের কেউ বাকি রইল না। পলাতক সৈন্যরা পালিয়ে টলেডো অবরোধকারী প্রথম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হল। টলেডোতে সালিত প্রান্তরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আমাজিগদের প্রথম বাহিনীও পরাভূত হল এবং তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। এরপর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়ল। পরবর্তী সময়ে তারা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।[১৮৬]

কায়সী-ইয়ামানী সংঘাত

আবদুল মালিক বিন ক্বাতান আমাজিগদের বিদ্রোহকে সফলতার সঙ্গে দমন করলেন। কিন্তু এরপরও তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত নিজ ক্ষমতার সুরক্ষায় নিশ্চিন্ত হলেন না, যতক্ষণ বালজ বিন বিশর ও শামের সৈন্যদল আন্দালুস ত্যাগ না করে। ইবনে ক্বাতানের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। তিনি যখন বালজ বিন বিশরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, আন্দালুসে প্রবেশের পূর্বে বালজ তার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন, ইবনে ক্বাতানের প্রশাসন ও আন্দালুসকে চলমান জটিলতা থেকে উদ্ধারের পর তিনি তার সৈন্যসহ পুনরায় মাগরেবে ফিরে যাবেন; তখন বিশর তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং দাবি করলেন যে, খলীফা

---

[১৮৬] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন : লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমুআ*, পৃ : ৪৩-৪৪, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩১, ড. হুসাইন মুনিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ১৭৪-১৭৬ ও মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ৮৬-৮৭।

Scanned with CamScanner

কর্তৃক নির্ধারিত মাগরেবের গভর্নর তার চাচা কুলসুম বিন ইয়াযের পক্ষ থেকে তিনি আন্দালুসের ওলিয়ে আ'হদ[১৮৭] । সা'লাবা বিন সালামা এ বিষয়ে বালজকে সর্মথন করলেন। এরপরই ইয়ামেনী সৈন্যগণ ইবনে ক্বাতানের অপসারণের এবং বালজের ক্ষমতা গ্রহণের পক্ষে সমবেত হল। আন্দালুসে পূর্ব থেকেই বসবাসরত ইয়ামেনী আরবগণ তাদের পক্ষাবলম্বন করল এবং কর্ডোভার রাজপ্রাসাদে ইবনে ক্বাতানের ওপর হামলা করল। ইবনে ক্বাতানের বয়স তখন নব্বইয়ের কাছাকাছি। তারা ইবনে ক্বাতানকে বন্দী করে শূলে চড়ালো। এ ঘটনা ১২৩ হিজরীর যিলক্বদ (৭৪১ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর) মাসের।[১৮৮]

গভর্নর আবদুল মালিক বিন ক্বাতানকে হত্যার প্রতিক্রিয়া হল অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও সুদূরপ্রসারী। পুরো দেশে বিদ্বেষ ও শত্রুতার আগুন ছড়িয়ে পড়ল। ইয়ামেনী ও কায়সীদের মধ্যে আবহমান কাল ধরে চলে আসা সুপ্রাচীন সংঘাত নতুন করে নতুন ভূমিতে জেগে উঠল। আবদুল মালিকের দুই পুত্র কাতান ও উমাইয়ার সঙ্গে তাদের সমমনা মিত্রদের একটি দল কর্ডোভা অভিমুখে রওয়ানা হল। ১২৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে (৭৪২ খৃস্টাব্দে) 'আকওয়া বারতুনা' প্রান্তরে বালজ বিন বিশরের বাহিনীর সঙ্গে তাদের রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ সংঘটিত হল। শাম-বাহিনীর জন্য এ যুদ্ধ ছিল জীবন-মরণ যুদ্ধ; কারণ, এ যুদ্ধের ওপর তাদের ভবিষ্যৎ-ভাগ্য নির্ভর করছিল। হয়তো এ যুদ্ধের পর তারা এ দেশে থাকতে পারবে; কিংবা পারবে না। তাই তারা তখন 'জীবন নয়; মৃত্যুর সন্ধানে যুদ্ধরত সৈন্যদল'! ফলে বিজয় তাদের পক্ষেই এল। কিন্তু তাদের সেনাপতি বালজ যুদ্ধ চলাকালে তীরবিদ্ধ হলেন এবং পরবর্তীতে এ আঘাতই তার মৃত্যুর কারণ হল। তার মৃত্যুর পর শাম বাহিনী সা'লাবা বিন সালামাকে নিজেদের নেতা হিসেবে নির্বাচন করল।[১৮৯]

---

[১৮৭] শাসনকর্তা কর্তৃক রাজপরিবারের কাউকে ভবিষ্যৎ শাসনকর্তা হিসেবে ঘোষণা করা হলে তাকে ওলিয়ে আ'হদ বলা হয়। শাসনকর্তার মৃত্যু, মারাত্মক অসুস্থতা বা বরখাস্তের ঘটনা ঘটলে ঘোষিত ওলিয়ে আ'হদ তার স্থলাভিষিক্ত হন। (অবাধ কিংবা সাংবিধানিক) রাজতন্ত্রে পরিচালিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানেও ওলিয়ে আ'হদ বা আগী যুবরাজ ঘোষণার রীতি প্রচলিত আছে। (অনুবাদক)

[১৮৮] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ৪৫, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩১-৩২ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/১৯।

[১৮৯] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ৪৫-৪৭, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ১/৫৩ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ২/২২।

Scanned with CamScanner

এরপর মিত্রদল আরও একবার শামের বাহিনীকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কর্ডোভায় সৈন্যসমাবেশ ঘটাল। সা'লাবা তার সৈন্যদের নিয়ে তাদের মোকাবেলায় বেরিয়ে এলেন। কিন্তু তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন এবং মেরিডায় আশ্রয় নিলেন। এ ঘটনা ১২৪ হিজরীর ১০ যিলহজ্ব ঈদুল আযহার দিনের।

মিত্র বাহিনী শাম-বাহিনীকে অবরোধ করে রাখল। নিজেদের শক্তি-আধিক্যের কারণে তারা আসন্ন বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল। সা'লাবাও বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি কর্ডোভায় নিযুক্ত তার প্রশাসকের কাছে সাহায্যের অনুরোধ করে বার্তা পাঠালেন এবং দ্রুত সামরিক সাহায্য পাঠাতে বললেন। কর্ডোভা থেকে ঈদুল আযহার দিন ভোরে সহায়ক বাহিনী এসে পৌঁছল। অবরোধকারীগণ তখন ঈদ উদযাপনে ব্যস্ত ছিল। সা'লাবা তাদের এই অসতর্কতাকে কাজে লাগালেন এবং তাদের ওপর আকস্মিক হামলা চালালেন। মিত্র বাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হল। শাম-বাহিনী নির্বিচারে তাদেরকে হত্যা করতে লাগল এবং নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে দশ হাজারের অধিক মানুষকে বন্দী করে ক্রীতদাস বানাল। এদের সবাইকে হত্যা করার ইচ্ছায় সা'লাবা সবাইকে নিয়ে কর্ডোভা রওয়ানা হলেন।[১৯০] কিন্তু খলীফা ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক কর্তৃক নির্ধারিত আফ্রিকান গভর্নর হানযালা বিন সাফওয়ান এতে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি গোত্রকেন্দ্রিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ধ্বংসপ্রায় আন্দালুসের বিরাজমান পরিস্থিতির সুষ্ঠ সমাধানের জন্য আবুল খাত্তার হিশাম বিন যারার আলকালবীকে প্রেরণ করলেন। এটি ১২৫ হিজরীর রজব মাসের (৭৪৩ খৃস্টাব্দের) কথা। আন্দালুসের স্থানীয় জনগণ ও শাম থেকে আগত বাহিনী উভয় দল বিষয়টি মেনে নিল।[১৯১]

বালজ বিন বিশরের নেতৃত্বে আগমনকারী প্রথম শাম-বাহিনীর পর এবার আবুল খাত্তারের নেতৃত্বে শামের দ্বিতীয় দল আন্দালুস ভূমিতে পা রাখল। আবুল খাত্তার শুরুতেই ইনসাফ ও ন্যায়ের শাসন জারী করলেন, বন্দীদের মুক্তি দিলেন। আন্দালুসে মুসলমানদের মাঝে ঐক্য ফিরে এল এবং কিছু

---

[১৯০] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ'*, পৃ : ৪৭, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩২ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৭, ২/২২।

[১৯১] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ'*, পৃ : ৪৮, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৩ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৭, ৩/২২।

Scanned with CamScanner

সময়ের জন্য হলেও আন্দালুসে তুলনামূলক শান্তি ও স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরে এল।[১৯২]

কিন্তু বাস্তবতা হল, গোত্রবাদ ও সাম্প্রদায়িক ব্যাধি তখন আন্দালুসবাসীর অন্তরে মিশে গিয়েছিল। আর তাই কয়েকদিন না যেতেই আবুল খাত্তারও, যিনি একজন সংকীর্ণমনা ইয়ামেনী ছিলেন, সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন হলেন। একবার তার কাছে জনৈক ইয়ামেনী ও জনৈক কায়সী একটি মোকাদ্দমা নিয়ে এল। যুক্তি-প্রমাণের নিরিখে মামলা কায়সীর পক্ষে ছিল। কিন্তু নিজের সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার কাছে পরাভূত হয়ে আবুল খাত্তার ফয়সালা দিলেন ইয়ামেনী ব্যক্তিটির পক্ষে। কায়সী ব্যক্তিটি নিজের হৃত অধিকার ফিরে পাওয়ার আশায় তাদের কায়সী নেতা সামীল বিন হাতেমের কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করল। প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সামীল আবুল খাত্তারের কাছে গেলে আবুল খাত্তার তাকে অপমান তো করলেনই; মাথায় আঘাত করে তার পাগড়ী স্থানচ্যুত করে ফেললেন। অপমানিত সামীল প্রাসাদ থেকে ফিরে আসার সময় জনৈক প্রাসাদ-দ্বাররক্ষী তাকে বলল, আবুল জাওশান! আপনার পাগড়ী ঠিক করে নিন। উত্তরে তিনি বললেন, আমার পক্ষে যদি আমার কওম থাকে, তবে তারাই আমার পাগড়ী ঠিক করে দেবে।[১৯৩] তার এ কথায় পুনরায় কায়সী-ইয়ামেনী দ্বন্দ্বের আগুন জ্বলে ওঠার ইঙ্গিত ছিল।

অপমানিত সামীল বিন হাতিম তার গোত্রের লোকদের সমবেত করলেন। পাশাপাশি তিনি আবুল খাত্তারের প্রতি ক্রুদ্ধ লাখমী ও জুযামী গোত্রের কিছু ইয়ামেনী ব্যক্তিকেও নিজের দলে টানতে সক্ষম হলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সাওয়াবা বিন সালামা আলজুযামী। সামীল তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, আবুল খাত্তারের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলে তিনি সাওয়াবাকে প্রশাসনক্ষমতা প্রদান করবেন।[১৯৪]

১২৭ হিজরীর রজব মাসে (৭৪৫ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে) লুক্কা উপত্যকায়

---

[১৯২] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ৪৮-৪৯, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/২২, মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ৯১-৯২ ও ড. হুসাইন মুনিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ। ১৮৯-১৯০।

[১৯৩] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ। ৫৭, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৪ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/২৩।

[১৯৪] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ৫৮ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৫।

Scanned with CamScanner

আবুল খাত্তার নিজ বাহিনী নিয়ে সামীল ও তার সহযোগীদের মুখোমুখি হলেন।[১৯৫] কিন্তু লাখমী ও জুযামীদের সামীলের পক্ষে যুদ্ধরত দেখে তাদের পিতৃব্য গোষ্ঠী কালবী গোত্র আবুল খাত্তারের পক্ষ ত্যাগ করল এবং এর ফলে আবুল খাত্তারের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। নিঃসঙ্গ আবুল খাত্তার কর্ডোভায় পালিয়ে যেতে মনস্থ করলেন। কিন্তু সামীল তাকে বন্দী ও পদচ্যুত করলেন এবং সাওয়াবা বিন সালামা আলজুযামীকে তার স্থলাভিষিক্ত করলেন। এটা ১২৮ হিজরীর (৭৪৫ খৃস্টাব্দের) ঘটনা।[১৯৬] তখন আবুল খাত্তারের সহযোগীরা তার সাহায্যে সমবেত হল এবং প্রহরীদের কাছ থেকে আবুল খাত্তারকে ছিনিয়ে নিতে এবং কর্ডোভার জেল থেকে তাকে বের করে আনতে সক্ষম হল। তিনি কালব ও হিমস গোত্রদ্বয়ের কাছে আশ্রয় নিলেন এবং তারা তাকে আন্দালুসের প্রশাসক হিসেবে বরণ করে নিল।

এরপর সামীলের নেতৃত্বাধীন কায়সীদের কাছ থেকে হৃত সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য আবুল খাত্তার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করলেন এবং তার অনুগত বাহিনী নিয়ে কর্ডোভা দখলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সংবাদ পেয়ে সাওয়াবা বিন সালামা তার মোকাবেলায় বেরিয়ে এলেন। প্রতিপক্ষের আগমনের খবর পেয়ে আবুল খাত্তারের সঙ্গীরা তাকে রেখে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে আবুল খাত্তার অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্‌গমন করলেন এবং পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।[১৯৭]

সাওয়াবা বিন সালামা বেশি দিন আন্দালুস শাসন করতে পারেননি। দায়িত্ব নেওয়ার এক বছর পর ১২৯ হিজরীর মুহাররম মাসে (৭৪৬ খৃস্টাব্দে) তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর প্রায় চার মাস আন্দালুস প্রশাসকশূন্য ছিল। সামীল চাইলে এ সময় নিজেকে আন্দালুসের প্রশাসক দাবি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে পর্দার আড়াল থেকে রাজনীতির খেলা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।[১৯৮]

---

[১৯৫] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমুআ*, পৃ : ৫৮, ইবনে আ'বারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৫ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/২৪।

[১৯৬] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমুআ*, পৃ : ৫৮, ইবনে আ'বারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৫, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/২৪ ও ড. হুসাইন মু'নিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ১৯৪-১৯৫।

[১৯৭] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমুআ*, পৃ : ৫৮-৫৯, ইবনে আ'বারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৫ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/২৪।

[১৯৮] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমুআ*, পৃ : ৫৮, ইবনে আ'বারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৫, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/২৫ ও মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ৯৭।

Scanned with CamScanner

প্রশাসক আমলের এ সময়টিতে ক্ষমতাপ্রার্থী নেতা ছিল অনেক; আর প্রত্যেকেরই ছিল আপন আপন অনুসারী। এদিকে আবুল খাত্তার কালবী, ওদিকে ইয়াহইয়া বিন হারিস আলজুযামী। আবার প্রয়াত সাওয়াবার পুত্র আমরও তার পিতার অবর্তমানে নিজেকে ক্ষমতালাভের অধিকারী বলে দাবি করছিল। আর এরা সবাই পরিচালিত হচ্ছিল সামীল বিন হাতিমের মেধা ও পরিকল্পনায়। সে সময়ের পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য সামীলের এই মন্তব্যের চেয়ে অর্থবহ আর কিছু হতে পারে না,

> 'আমরা এমন কাউকে সামনে রাখব, যে হবে নামেমাত্র প্রশাসক; ক্ষমতার নাটাই থাকবে আমাদের হাতেই'।[১৯৯]

সামীল বিন হাতিম ও ইউসুফ আলফিহরী

ধীরে ধীরে প্রশাসক পদ নিয়ে বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে বিরোধ চরমে পৌঁছল। প্রত্যেকেই নিজ জ্ঞাতি অনুসারীদের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের স্বপক্ষে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হল। সাম্প্রদায়িকতায় ভরা এই পরিবেশে, যা পারস্পরিক লড়াই-বিগ্রহের কারণ হতে পারত, সামীল সবাইকে নিয়ে একটি সমাধানে পৌঁছলেন। সিদ্ধান্ত হল, পালাক্রমে এক বছর করে ইয়ামেনী ও কায়সীদের মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল হবে![২০০] উভয় পক্ষ এ সমাধানে সন্তুষ্ট হল। সমস্যা রয়ে গেল প্রথমে কারা ক্ষমতা গ্রহণ করবে তা নির্ণয় করা নিয়ে। সামীলের অনুসারী কায়সীরা তাদের নেতাকে প্রথমে প্রশাসক পদ প্রদানের দাবি জানাল। কিন্তু সামীল নিজে প্রথম প্রশাসক হিসেবে ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আলফিহরীর নাম প্রস্তাব করলেন এবং ইয়াহইয়া বিন হারিসকেও রাজি করাতে সক্ষম হলেন। তিনি আপাতত ইয়াহইয়াকে 'রাইয়া' গ্রামপুঞ্জের জায়গীর প্রদান করে তুষ্ট করলেন। ১২৯ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে (৭৪৭ খৃস্টাব্দে) কায়সী-ইয়ামেনী উভয় পক্ষ বর্তমান প্রশাসক হিসেবে ইউসুফ আলফিহরীকে মেনে নিল এবং এক বছর পর তার পরবর্তী প্রশাসক হিসেবে ইয়ামেনীদের মধ্য হতে কাউকে নির্বাচন করার ব্যাপারে সম্মত হল।[২০১]

---

[১৯৯] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ৫৮, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৫ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/২৫।

[২০০] মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ৯৮।

[২০১] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ৫৮ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৫।

Scanned with CamScanner

কিন্তু আন্দালুসের পরিস্থিতি স্থিতিশীল হতে না হতেই সামীল নতুন এক কৌশল অবলম্বন করলেন। ইয়ামেনীদের মাঝে ইয়াহইয়া বিন হারিসের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অনুসারীদের সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি ইয়াহইয়াকে রাইয়া গ্রামপুঞ্জের দায়িত্ব হতে অপসারণ করলেন। সামীলের এই সিদ্ধান্তে ইয়াহইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। সাম্প্রদায়িক অশুভ আত্মা আবারও জেগে উঠল। ইয়াহইয়া এবার আবুল খাত্তারের সঙ্গে হাত মেলালেন। জুযামী, কালবী এবং আন্দালুসে বসবাসরত অবশিষ্ট ইয়ামেনীরা ইয়াহইয়ার পক্ষে একজোট হল আর ইউসুফ আলফিহরী ও সামীল বিন হাতিমের পক্ষাবলম্বন করল মুযার ও রাবিয়া গোত্র।[২০২]

আবুল খাত্তার ও ইয়াহইয়া বিন হারিস কর্ডোভার দিকে অগ্রসর হলেন এবং কর্ডোভা নদীর (ওয়াদিল কাবীর) নিকটবর্তী শাকুন্দা গ্রামে শিবির স্থাপন করলেন। সামীল ও আলফিহরীও তাদের সৈন্যদের নিয়ে নদী পার হয়ে তাদের মুখোমুখি হলেন। ১৩০ হিজরীতে (৭৪৭ খৃস্টাব্দে) শাকুন্দায় উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল।[২০৩] উভয় পক্ষের মধ্যে চলল প্রাণপণ লড়াই। যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে না পেরে বাধ্য হয়ে সামীল সাধারণ জনগণ ও উচ্ছৃঙ্খল সন্ত্রাসী শ্রেণির লোকদের সাহায্য নিলেন। তাদের মধ্য হতে চার শ' মানুষ সামীলের পক্ষে যুদ্ধ করল, যাদের কাছে পক্ষ-বিপক্ষ ও নীতি-নৈতিকতার কোন বালাই ছিল না; তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষ-হত্যা। প্রতিপক্ষের এই অবস্থা দেখে ইয়ামেনীদের অন্তরে ভয় ঢুকে গেল এবং তাদের যুদ্ধস্পৃহায় ভাটা পড়ল। সুযোগ পেয়ে কায়সীরা তাদের নির্বিচারে হত্যা করতে লাগল। আমর বিন হারিস ও আবুল খাত্তার আলকালবীও বন্দী অবস্থায় নিহত হলেন। সামীল ইয়ামেনীদের প্রতি তার প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহাকে চরিতার্থ করার জন্য ঠাণ্ডা মাথায় বন্দীদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। সত্তরজনকে হত্যা করার পর তার মিত্র আবুল আতা আলজুযামী হস্তক্ষেপ করলেন এবং এভাবে পাইকারী হত্যাযজ্ঞ চালাতে বাধা দিলেন। মিত্রের হস্তক্ষেপে অবশেষে সামীল নিবৃত্ত হলেন।[২০৪] এভাবে

---

[২০২] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ'*, পৃ : ৫৯ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৬।

[২০৩] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ'*, পৃ : ৬০, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৬, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৮, ৩/২৫, মুহাম্মাদ মুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ৯৯ ও ড. হুসাইন মুনিস, *তারীখুল আন্দালুস*, পৃ : ১৯৭-১৯৮।

[২০৪] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ'*, পৃ : ৬০-৬১, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৬-৩৭ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/২৫-২৬।

Scanned with CamScanner

আন্দালুসে ইয়ামেনীদের লড়াই করার শক্তি কার্যত নিঃশেষ হয়ে গেল এবং আলফিহরী ও সামীলের একচ্ছত্র শাসনের পথ পরিষ্কার হল। তাদের সঙ্গে বিবাদ করার মতো কোন শক্তি আন্দালুসে বাকি রইল না।

কিছুদিন পর ইউসুফ আলফিহরী কার্যক্ষেত্রে সামীলের এই অভিভাবকত্বসুলভ আচরণ থেকে নিষ্কৃতি পেতে সামীলকে জারাগোযা অঞ্চলের গভর্নর নির্ধারণ করলেন। সামীলও তা মেনে নিলেন। এটি ১৩২ হিজরী মোতাবেক ৭৫০ খৃস্টাব্দের ঘটনা।

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, অতি কৌশলী সামীল কীভাবে আপাতদৃষ্টিতে তার জন্য বিতাড়নের নামান্তর আলফিহরীর এই প্রস্তাব মেনে নিলেন?

এর উত্তর হচ্ছে, প্রথমে আরব-আমাজিগ ও পরবর্তী সময়ে ইয়ামেনী-কায়সীদের মধ্যে দীর্ঘ কালব্যাপী গৃহযুদ্ধের অনিবার্য ফলরূপে আন্দালুস এ সময় প্রচণ্ড অভাব ও দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল। দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ আন্দালুস-ভূমিতে বিরাজমান ছিল দুর্ভিক্ষের হাহাকার। একমাত্র জারাগোযা অঞ্চল দুর্ভিক্ষমুক্ত ছিল এবং সেখানে কিছুটা হলেও স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্য বিদ্যমান ছিল। তাই চতুর সামীল খুশিমনে এ প্রস্তাব মেনে নেন। তাছাড়া সামীল বুঝতে পেরেছিলেন, তাকে জারাগোযা পাঠিয়ে আলফিহরী মূলত তার মাধ্যমে জারাগোযার সংখ্যাগরিষ্ঠ ইয়ামেনী জনগোষ্ঠীকে দমন ও বশীভূত করতে চান। কিন্তু তিনি জারাগোযা পৌঁছেই সেখানকার সরকারী কোষাগার নিজের দখলে নিয়ে নেন এবং জারাগোযার শত্রু-মিত্র যারাই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল, সবাইকে দান-অনুদানে কৃতার্থ করেন।[২০৫]

সম্ভাব্য সকল শত্রুর প্রয়াণ বা প্রস্থানে আলফিহরী এবার নিজেকে কর্ডোভায় স্বাধীন ও নিরাপদ ভাবতে লাগলেন। এখন আর তার ওপর সামীলের অযাচিত হস্তক্ষেপ ও অভিভাবকত্বসুলভ আচরণের খড়্গও নেই। কিন্তু বাস্তবতা হল, আলফিহরী ছিলেন একজন দুর্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ; প্রশাসনিক দক্ষতা বা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা– কোনটিই তার ছিল না। আর তাই কর্ডোভার অভ্যন্তরেই এবার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হল।

কর্ডোভায় বসবাসরত আমির বিন আমর আলআবদারী নামক জনৈক ইয়ামেনী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।[২০৬] আমির এই আশঙ্কায় বিদ্রোহ করেছিল যে, অত্যাচারী সামীল ইতঃপূর্বে শাকুন্দা যুদ্ধে ও পরবর্তী

---

[২০৫] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ৬২ ও ইবনে আ'ষারী, *আদবাতুল মুখরিব*, ২/৩৭।

[২০৬] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ৬৩।

Scanned with CamScanner

সময়ে ইয়ামেনীদের ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছে, এবার হয়তো জারাগোযায় ইয়ামেনীদের ওপর একই রকম নির্যাতন চালাবে। আলফিহরী চাইলে তার শক্তিবলে কর্ডোভাতেই আমিরকে শায়েস্তা করতে পারতেন; কিন্তু কাপুরুষতা ও স্বভাবধিধার কারণে তা না করে তিনি প্রথমে এ বিষয়ে সামীলের পরামর্শ চাইলেন। সামীল আমিরকে মেরে ফেলার পরামর্শ দিলেন।

এদিকে আলফিহরীর আচরণে আমির বুঝে ফেলল যে, কর্ডোভায় তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তাই সে কর্ডোভায় কিছু করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা করল, যা দ্বারা সামীল ও আলফিহরী উভয়ের প্রভাব ও ক্ষমতা ধ্বংস করা যায়। যেহেতু আমির নিজে ছিল কট্টর ইয়ামেনী, তাই সে জারাগোযায় ইয়ামেনীদের কাছে আশ্রয় নেওয়ার এবং তাদের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তুলে কায়সীদের ধ্বংস করার পরিকল্পনা আঁটল। পরিকল্পনা অনুযায়ী সে জারাগোযায় বসবাসরত ইয়ামেনীদের নেতা হাবাব আযযুহরীর কাছে চিঠি লিখল। ইয়ামেনীরা আবার একজোট হল এবং জারাগোযায় সামীলকে অবরুদ্ধ করার মনস্থ করল। এটি ১৩৬ হিজরীর (৭৫৩ খৃস্টাব্দের) ঘটনা।[২০৭]

অবরুদ্ধ অবস্থায় সামীলের অবস্থা যখন সংকটপূর্ণ, তখন তিনি সাহায্য চেয়ে আলফিহরীর কাছে বার্তা পাঠালেন। কিন্তু আলফিহরী বার্তার উত্তর দিতে গড়িমসি করতে লাগলেন। নিজেকে তিনি তখন একজন সুখী মানুষ হিসেবে কল্পনা করছিলেন আর ভাবছিলেন, অচিরেই তিনি জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা সামীলের অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।

কিন্তু সামীলের কায়স গোত্রীয় অনুসারীরা তাদের নেতাকে সাহায্য করতে সমবেত হয়ে গেল। এক দুর্বোধ্য কারণে, যার রহস্য আমরা সামনে উদ্‌ঘাটন করব, বনু উমাইয়া ও তাদের মাওয়ালীরাও কায়সীদের সঙ্গে যোগ দিল। এদের নেতৃত্বে ছিল আবু উসমান উবায়দুল্লাহ বিন উসমান ও আবদুল্লাহ বিন খালিদ।[২০৮]

বনু উমাইয়া ও তাদের মাওয়ালীদের সমর্থনপুষ্ট কায়সীরা সামীলকে সাহায্য

---

[২০৭] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ৬৩-৬৪, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৭, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৮, মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ১০২-১০৩ ও ড. হুসাইন মু'নিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ২০১।

[২০৮] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ৬৫।

Scanned with CamScanner

করতে অগ্রসর হল। এদিকে এ সংবাদ অবরোধকারীদের কাছে পৌঁছতেই তারা ঘাবড়ে গেল এবং সামীলকে অবরোধ থেকে মুক্ত করে দিল। সামীল তৎক্ষণাৎ কর্ডোভার পথ ধরলেন। সুযোগ পেয়ে আমির আলআবদারী ও হাবাব আযযুহরী প্রশাসকশূন্য জারাগোযা দখল করে নিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই সামীল ও আলফিহরী পুনরায় একজোট হয়ে জারাগোযা আক্রমণ করলেন। এবার আমির আলআবদারী ও হাবাব আযযুহরী সামীলের হাতে বন্দী হল আর সামীল তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।[২০৯]

চলমান সময়কালে মুসলিম প্রাচ্যে খেলাফত-পরিস্থিতি

১২৫ হিজরীতে খলীফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর উমাইয়া সালতানাতের কাঠামোতে দুর্বলতার বিভিন্ন কার্যকারণ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং খেলাফত-ব্যবস্থা দিনে দিনে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। হিশামের মৃত্যুর পর ছড়িয়ে পড়ে গণ্ডগোল, অসন্তোষ, বিশৃঙ্খলা ও নানামুখী ফিতনা। প্রায় সাত বছর ধরে উমাইয়া রাজবংশের গৃহাভ্যন্তরেই চলে নানা ধরনের অরাজকতা।

হিশামের মৃত্যুর পর ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিকের (দ্বিতীয় ওয়ালিদ) বাইআত সম্পন্ন হয়। ওয়ালিদ প্রথমদিকে জনগণের প্রতি সযত্ন আচরণ করেন এবং দক্ষ হাতে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই তিনি বিভিন্ন অন্যায়-অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। এর মধ্যে গুরুতর কয়েকটি হল, আপন চাচা সুলাইমান ও হিশামের সন্তানদের শাস্তিদান, সালতানাতের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তিদের শাস্তিপ্রদান, অশ্লীল ও অনৈতিক বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হওয়া, খেল-তামাশার পেছনে সময়-অর্থ ব্যয় ইত্যাদি। এসব কারণে তার খেলাফত ও রাজত্বের পতন ত্বরান্বিত হয়। কিছুদিন পরই ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের নেতৃত্বে সংঘটিত এক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন। অভ্যুত্থানে উমাইয়া রাজবংশের রাজপুত্রগণ ও ইয়ামেনীরা ইয়াযিদকে সহযোগিতা করেছিল।

দ্বিতীয় ওয়ালিদের মৃত্যুর পর ইয়াযিদ বিন ওয়ালিদের (তৃতীয় ইয়াযিদ)

---

[২০৯] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ৬৫-৬৭, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৭, মাকারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৮, মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ১০২-১০৩ ও ড. হুসাইন মু'নিস, *মাজমুল আন্দালুস*, পৃ : ২০২-২০৩।

Scanned with CamScanner

নামে খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তিনি তার চাচাতো ভাইদের পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। শাম অঞ্চলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। ফলে ইয়াযিদও দীর্ঘ সময় খেলাফতদায়িত্ব উপভোগ করতে পারেননি। তার খেলাফতকাল মাত্র ছয় মাস স্থায়ী ছিল। ১২৬ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে খেলাফতে অধিষ্ঠিত ইয়াযিদ একই বছরের যিলহজ্ব মাসে ইন্তেকাল করেন। উমাইয়া খেলাফতের দুর্ভেদ্য দুর্গ শাম অঞ্চলকে বিদ্রোহের আগুনে ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় রেখেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইয়াযিদের মৃত্যুর পর উমাইয়া রাজগৃহে তার অধস্তন বংশধরদের মধ্যে শুরু হয় অন্তঃকলহ। আসন্ন ভয়াবহ বিভিন্ন বিপদ বিশেষত আব্বাসীদের ক্রমবর্ধমান শক্তির কথা ভুলে উমাইয়া রাজপুত্রগণ এ সময় ব্যস্ত হয়ে পড়েন ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অশুভ প্রতিযোগিতায়।

তৃতীয় ইয়াযিদের মৃত্যুর পর ১২৭ হিজরীতে ইবরাহীম বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের বাইয়াত সম্পন্ন হয়। তিনিও নির্ঝঞ্ঝাটভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে ব্যর্থ হন। মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং আইনুল জার-এ তাকে পরাজিত করে খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। ১২৭ হিজরীর রবিউস সানী মাসে তার পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ ইবরাহীমের খেলাফতকাল মাত্র চার মাস স্থায়ী ছিল।

খেলাফত গ্রহণ করে মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ পূর্বের চেয়ে আরও প্রবল প্রতিরোধ ও বিদ্রোহপ্রবাহের শিকার হন। বস্তুত খেলাফত গ্রহণের মধ্যেই তার জীবনের শেষ পরিণতি লেখা ছিল। তার সামনে তখন এক পিছিয়ে পড়া ভূখণ্ড এবং বহুধাবিভক্ত সালতানাত। কিছুদিন শান্তি ও স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় থাকার পর সালতানাতের সবদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। হিমসে বিদ্রোহ, শামের গুতায় (Ghouta) বিদ্রোহ, ফিলিস্তিনে বিদ্রোহ, ইরাকে খারেজী ও শিয়াদের বিশৃঙ্খলা; আর সবচে' ভয়াবহ বিষয় ছিল গৃহবিদ্রোহ। সুলাইমান বিন হিশাম বিন আবদুল মালিক, আবদুল্লাহ বিন ওমর বিন আযীয রাজবংশের মধ্যেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। আর তাই দ্বিতীয় মারওয়ান এসব বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমনেই ব্যস্ত ছিলেন। এ কারণে তিনি প্রাচ্য-পরিস্থিতির প্রতি মনোযোগী হতে পারেননি। বিশেষত আব্বাসী দাওয়াতের মূলকেন্দ্র খোরাসান-পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ বেখবর ছিলেন। খোরাসানে আব্বাসীদের আন্দোলন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল এবং

Scanned with CamScanner

বনী আব্বাসের প্রভাব-প্রতিপত্তি সুদৃঢ় হচ্ছিল। ফলে আব্বাসী খেলাফতের স্বপ্নদ্রষ্টা ও আহ্বায়কগণ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, তাদের আন্দোলনের প্রকাশ্য প্রচারণার সময় অত্যাসন্ন।

মারওয়ান বিন মুহাম্মাদের এই অসচেতনতার মধ্যেই আব্বাসী পতাকা পুরো মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ফলে উমাইয়া-আব্বাসী সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৩২ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে যায় নদীর সন্নিকটে উভয় বাহিনী রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এগার দিন-ব্যাপী এ যুদ্ধ শেষ হয় মারওয়ান বিন মুহাম্মাদের পরাজিত ও নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে আর এর মাধ্যমেই শুরু হয় ইসলামী ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়; যে অধ্যায়ের নাম আব্বাসী সালতানাত।

প্রশাসক-আমলের দ্বিতীয় ধাপে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ

পূর্বে বর্ণিত বিষয়গুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রশাসক আমলের এই দ্বিতীয় ও শেষ স্তরে আন্দালুসে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহকে আমরা সংক্ষেপে এভাবে বিন্যস্ত করতে পারি।

১. মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চল এ আমলে হাতছাড়া হয়ে যায়।[২১০]

২. উত্তর-পশ্চিম আন্দালুসে সাখরা অঞ্চলে সীমিত পরিসরে একটি খৃস্টান রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর নামকরণ করা হয় 'লিওন রাষ্ট্র'।[২১১]

৩. আন্দালুস অঞ্চল তৎকালীন ইসলামী খেলাফত 'উমাইয়া সালতানাত' হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর এ বিচ্ছিন্নতা ঘটে প্রশাসক ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আলফিহরীর হাতে।[২১২]

৪. গোত্রকেন্দ্রিক হানাহানি ও অনিঃশেষ বিদ্রোহপ্রবাহের শিকার হয়ে আন্দালুস খণ্ড-বিখণ্ড ও বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক গোত্র আপন জাতিগোষ্ঠীর জন্য স্বতন্ত্র-স্বাধীন ভূখণ্ডের মালিকানা অর্জনে আন্দোলন তৎপরতা শুরু করে।

৫. এ আমলের ভয়াবহতম ঘটনা হল খারেজী ফেরকার উদ্ভব। শামে উদ্ভূত খারেজী গোষ্ঠী প্রথমে উত্তর আফ্রিকায়, এরপর আন্দালুসে তাদের ভ্রান্ত

---

[২১০] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে : ড. হুসাইন মুনিস, *ফাজরুল আন্দালুস*, পৃ : ২৩৯-২৫১।

[২১১] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে : প্রাগুক্ত, পৃ : ২৫৫-২৮৬।

[২১২] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ১/৬২।

Scanned with CamScanner

মতবাদ ছড়িয়ে দেয়। আমাজিগ সম্প্রদায় তাদের চিন্তাধারাকে সাদরে বরণ করে নেয়। এর কারণ ছিল আমাজিগ সম্প্রদায় এ আমলে ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আলফিহরীর প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড জুলুম-নির্যাতন ও ঘৃণিত সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়েছিল। এ জুলুম থেকে মুক্তি পেতে 'শত্রুর শত্রু মিত্র'-নীতির অনুসরণে তাদের মন-মস্তিষ্ক সঠিক ইসলামী নীতি-আদর্শ হতে বিচ্যুত এই ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ ও বরণে আকৃষ্ট হয়। কারণ, তৎকালীন প্রশাসন ছিল খারেজী মতবাদের বিরুদ্ধে।[২১৩]

৬. এ আমলেই সংঘটিত হয় মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত বরং বিদীর্ণকারী এক মহাপ্রলয়; যার কারণে পরিস্থিতির ভয়াবহতা আরও বৃদ্ধি পায়। আর তা হল এক রক্তক্ষয়ী-ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের মধ্য দিয়ে উমাইয়া খেলাফতের পতন ও আব্বাসী খেলাফতের উত্থান। সালতানাতের অধিকারী হওয়ায় পর আব্বাসীদের প্রথম ও প্রধান কর্মসূচী হয়ে দাঁড়ায় উমাইয়াদের সমূলে ধ্বংস করা। আর তাই 'আন্দালুস পরিস্থিতি' চলে যায় খলীফা ও খেলাফতের দৃষ্টির আড়ালে এবং পরিণত হয় বিস্মৃতপ্রায় এক ইস্যুতে।

এই সব কার্যকারণের পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ১৩৮ হিজরীর (৭৫৫ খৃস্টাব্দের) এই ক্রান্তিকালীন মুহূর্তে ইসলাম আন্দালুস-ভূমি থেকে পুরোপুরি নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। মুমূর্ষুপ্রায় ইসলাম আন্দালুস-ভূমিতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তখন কোন ইলাহী মোজেযা ও অলৌকিকতার প্রতীক্ষায় ছিল। আর আন্দালুসবাসী মুসলিমসমাজের জন্য দয়াময় আল্লাহর অনুগ্রহে এ সময় সত্যিই এক ইলাহী কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। আর তা হল ১৩৮ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে (৭৫৬ খৃস্টাব্দে) আন্দালুস-ভূমিতে আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া বিন হিশাম বিন আবদুল মালিক নামের এক মহান ব্যক্তিত্বের পদার্পণ।

প্রশাসক-আমলের দ্বিতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্যাবলি

১. সম্পদপ্রীতি

এ আমলের শুরুতে মুসলমানগণ প্রভূত সম্পদ ও গনীমতের অধিকারী হয়েছিল। পাশাপাশি সমৃদ্ধ বিভিন্ন অঞ্চল মুসলমানদের হাতে বিজিত হয়েছিল। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ হল,

---

[২১৩] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমুআ*, পৃ : ৪২, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ১/৫৪।

Scanned with CamScanner

«إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا»

আমার অবর্তমানে তোমাদের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হল সেই পার্থিব চাকচিক্য ও পার্থিব সৌন্দর্য (মোহ) নিয়ে, যা তোমাদের হাতে বিজিত হবে।[২১৪]

নবীজীর এই ভবিষ্যৎ-আশঙ্কাই সত্যি হল। দুনিয়া যখন মুসলমানদের পদানত হল, মুসলমানগণ তাতে নিমগ্ন হল এবং দুনিয়া-সম্পদের মোহে ঈমান-সম্পদ আক্রান্ত হল।

২. গোত্রবাদ ও সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার আত্মপ্রকাশ

ঈমান দুর্বল হওয়ার অনিবার্য ফলরূপে এ আমলে মুসলমানদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল সাম্প্রদায়িকতার রোগ। ফলে আন্দালুসের অভ্যন্তরে মুসলমানদের ঐক্য বহু বিভক্তির শিকার হল। প্রথমে সৃষ্টি হল আরব-আমাজিগ বিচ্ছিন্নতা, যার বীজ রোপিত হয়েছিল সেই বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধকালেই। এরপর আরবদের মধ্যেই বিভিন্ন দল-উপদলের উদ্ভব ঘটল; মুযার গোত্র-হেজাযী গোত্র বিচ্ছিন্নতা, আদনানী (হেজাযের অধিবাসী)-কাহতানী (ইয়ামেনবাসী) বিভেদ ইত্যাদি। গোত্রবাদের এই ব্যাধির সংক্রমণে সংঘটিত হল বহু ইয়ামেনী-হেজাযী যুদ্ধ। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহ যখন আরও চরমে পৌঁছল, তখন হেজাযীদের মধ্যেই শুরু হল উপগোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতা; তৈরি হল ফিহরী-উমাইয়া বিরোধ, বনু কায়স-বনু সাঈদা বিরোধ। এভাবে হেজাযীরাও আত্মকলহে জড়িয়ে পড়েছিল।[২১৫]

৩. প্রশাসনিক নিপীড়ন

সম্পদ-প্রীতি, গোত্রবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার সংক্রামক ব্যাধির ভয়াবহ বিস্তারের পাশাপাশি নতুন বিপদরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল 'প্রশাসনিক নিপীড়ন' নামের আরেক বিপদ। এ আমলে আন্দালুসের মুসলিম প্রশাসন এমন কিছু জালিম ও অত্যাচারী প্রশাসকের হাতে ছিল, যারা জনগণের ওপর

---

[২১৪] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৩৯৬।

[২১৫] বিস্তারিত জানতে : ড. হুসাইন মুনিস, *মাআলিমু তারীখিল আন্দালুস*, পৃ : ৭৯-১২৯ ও ১৮৩-২০৩।

Scanned with CamScanner

অন্যায়-অবিচার করতেন এবং ইসলামী নীতি অনুসরণের পরিবর্তে 'চাবুক-নীতি'র ব্যবহার করে জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন আবদুল মালিক বিন ক্বাতান, যিনি ছিলেন জালিম ও অত্যাচারী প্রশাসক।[২১৬]

আর ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আলফিহরী, যিনি ১৩০ হিজরীতে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন আর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রশাসক আমলের দ্বিতীয় স্তর বরং পুরো প্রশাসক আমলেরই শেষ সময় (১৩৮ হিজরী/৭৫৫ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত; নির্যাতন ও নিপীড়নে তিনি ছিলেন আবদুল মালিক বিন ক্বাতানের সার্থক অনুসারী ও উত্তরসূরি।[২১৭] প্রশাসকদের এই নির্যাতন গোত্রবাদের ব্যাধিতে শতধা বিভক্ত আন্দালুস-ভূমিতে সৃষ্টি করেছিল আরও নতুন নতুন বিদ্রোহ ও ভাঙন।[২১৮]

৪. অমুসলিম রাষ্ট্রে বিজয়াভিযানের ধারা পরিত্যাগ

সামান্য পূর্বেও আমরা যেসব প্রশাসকের আলোচনা করেছি, তাদের শাসনামল ছিল আন্দালুস বিজয়, ফ্রান্স বিজয়ের মতো অসংখ্য ইসলামী অভিযান ও বিজয় অগ্রযাত্রার গৌরবময় ইতিহাসে সমৃদ্ধ। আর এর অব্যবহিত পরেই আমাদের আলোচ্য আমলে যখন মুসলমানদের অন্তরে বদ্ধমূল হল সম্পদপ্রীতি, প্রকাশ পেল সাম্প্রদায়িকতার ব্যাধি; প্রশাসকদের জুলুম-নির্যাতন জনগণের মাঝে উস্কে দিল বিদ্রোহ-চিন্তা, তখন এ সবকিছুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলমানরা অমুসলিম এলাকায় বিজয়াভিযান পরিচালনার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল ছেড়ে দিল। ফলে ফ্রান্সে ইসলামী বিজয়াভিযান থেমে গেল। যুদ্ধ-তৎপরতা থেমে গেল উত্তর-পশ্চিম আন্দালুসের সাখরা অঞ্চলে; আন্দালুস-ভূমির প্রথম বিজয়ের সময় থেকেই যেখানে যুদ্ধে পরাজিত একদল খৃস্টান আশ্রয় নিয়েছিল এবং ধীরে ধীরে সুসংহত হচ্ছিল।

---

[২১৬] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৬ ও ৩/১৯।

[২১৭] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ৫৮, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৫ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৮, ৩/২৫।

[২১৮] বিস্তারিত জানতে : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩৮।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

চতুর্থ অধ্যায়
স্বাধীন উমাইয়া প্রশাসকদের আমল

প্রথম পরিচ্ছেদ
আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া রহ.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আবদুর রহমান আদদাখিলের শাসনামল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
শক্তিশালী যুগে (স্বাধীন) উমাইয়া প্রশাসন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
উমাইয়া প্রশাসক-আমলের দ্বিতীয় স্তর

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রথম পরিচ্ছেদ
আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া রহ.

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার কাহিনী (১১৩-১৭২ হি./৭২১-৭৮৮ খৃ.)

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার আন্দালুসে প্রবেশের ঘটনা সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য আমাদের একটু পেছনে (১৩২ হিজরীতে/৭৫০ খৃস্টাব্দে) ফিরে যেতে হবে। এ সময়কালটি ছিল মুসলিম প্রাচ্যে বনু উমাইয়ার খেলাফতের পতনকাল। আব্বাসীরা এ সময় বনু উমাইয়ার যারাই খেলাফতের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত ছিল, সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল। আমীর, গভর্নর, গভর্নর-পুত্র বা গভর্নর-পৌত্র কাউকে তারা রেহাই দেয়নি। উমাইয়া রাজবংশের একেবারে অল্প কয়েকজন রাজপুত্রই সে সময় আব্বাসীদের খড়্গ-হস্ত থেকে বাঁচতে পেরেছিল।[২১৯]

বনু আব্বাস যে সমস্ত উমাইয়া রাজপুত্রের নাগাল পায়নি, তাদেরই একজন হলেন উমাইয়া খলীফা হিশাম বিন আবদুল মালিক (১০৫-১২৫ হি./৭২৩-৭৪৩ খৃ.)-এর পৌত্র আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া।

শৈশবকাল হতেই আবদুর রহমান প্রতিপালিত হয়েছিলেন উমাইয়া খেলাফতের রাজকীয় পরিবেশে। তার পিতা মুয়াবিয়ার চাচা তথা খলীফা হিশামের ভাই বিখ্যাত বীর যোদ্ধা মাসলামা বিন আবদুল মালিক শৈশবেই আবদুর রহমানের মাঝে দেখতে পেয়েছিলেন মেধা ও আভিজাত্য, প্রশাসনদক্ষতা ও নেতৃত্বগুণের ভবিষ্যৎ-হবি। এ কথা তিনি নাতি আবদুর রহমানকে বলেও ছিলেন। মহান পিতামহের বচন-নিঃসৃত প্রশংসাবাণী শৈশবেই আবদুর রহমানের কচি হৃদয়ে এক ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে এর ফলাফল প্রকাশ পেয়েছিল।[২২০]

তারুণ্যের উচ্ছল বয়সে উপনীত হতেই আবদুর রহমান এক আকস্মিক ও ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন। রক্তাক্ত অভ্যুত্থান ঘটিয়ে আব্বাসীরা

---

[২১৯] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন : ইবনে কাসীর, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১০/৪৮ ও ইবনে খালদুন, *তারীখে ইবনে খালদুন*, ৩/১৩২।

[২২০] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৪১ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩২৮, ৩/৫৩।

Scanned with CamScanner

মুসলিম সাম্রাজ্যের খেলাফত-আসনে অধিষ্ঠিত হল। ভবিষ্যতে বনু উমাইয়ার কেউ যেন খেলাফত পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করতে না পারে, এ লক্ষ্যে শুরু হল 'তরবারি-অভিযান'। উমাইয়া রাজবংশের সাবালক প্রতিটি পুরুষকে খুঁজে খুঁজে আব্বাসীরা হত্যা করতে লাগল। নারী ও শিশুরা যেহেতু আব্বাসী সালতানাতের জন্য হুমকি ছিল না, তাই তারাই কেবল রেহাই পেল এ হত্যাযজ্ঞ থেকে। পূর্বেই বলে এসেছি, এটি ১৩২ হিজরীর ঘটনা।

যুবক আবদুর রহমান তখন শামের কিন্নাসরিন (Qinnasrin) প্রদেশের একটি গ্রামে অবস্থান করছিলেন। আব্বাসীদের হাত থেকে বাঁচতে তিনি আপন অবস্থান থেকে পালিয়ে ফুরাত নদীর নিকটবর্তী ইরাকের একটি গ্রামে আত্মগোপন করলেন। কিন্তু গুপ্তচরদের মাধ্যমে আব্বাসী ঘাতক দল তার সন্ধান পেয়ে গেল। আবদুর রহমান তখন অসুস্থ শরীর নিয়ে ঘরেই অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ তার চার বছর বয়সী শিশুপুত্র ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে প্রবেশ করল। চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত হওয়ায় অসুস্থ আবদুর রহমান তখন ঘরের এক কোণে অন্ধকারে একাকী বসে ছিলেন। সন্তানকে কাঁদতে দেখে তিনি শিশুদের যেভাবে শান্ত করা হয়, সেভাবে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ভীত-আতঙ্কিত শিশুটি কিছুতেই শান্ত হল না। তখন আবদুর রহমান উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাতেই দেখতে পেলেন, পুরো গ্রাম আব্বাসী সালতানাতের প্রতীক কৃষ্ণবর্ণ পতাকায় ছেয়ে গেছে। এতক্ষণে তিনি সন্তানের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ খুঁজে পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, শত্রুপক্ষ তার খোঁজ পেয়ে গেছে এবং তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে। সঙ্গে থাকা যাবতীয় সম্পত্তি এবং মহিলা ও শিশুদের সেখানেই রেখে কেবল নগদ অর্থ সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি তার ভাই হিশামকে সঙ্গে করে পালালেন। তিনি জানতেন, আব্বাসীরা নারী ও শিশুদের কোন ক্ষতি করবে না।

ভাই হিশামকে নিয়ে আবদুর রহমান ফুরাত নদীর দিকে ছুটলেন। ফুরাতের তীরে পৌঁছতেই আব্বাসী অশ্বারোহী বাহিনী তাদের দেখে ফেলল এবং ধাওয়া করল। জীবন বাঁচাতে দু' ভাই খরস্রোতা ফুরাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে লাগলেন। দূর থেকে ধাওয়াকারী আব্বাসী ঘাতকদল তাদেরকে ডেকে বলতে লাগল, তোমরা ফিরে এসো, তোমাদের নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তারা কসম করে বারবার নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে লাগল। কিশোর হিশামের পক্ষে সাঁতরে নদী পাড়ি দেওয়া সম্ভবপর ছিল না।

Scanned with CamScanner

আব্বাসীদের আহ্বান ও নিরাপত্তার আশ্বাসবাণীতে সে প্রভাবিত হল এবং ফিরে যেতে মনস্থ করল। আবদুর রহমান বারবার তাকে ডেকে সাহস যোগাতে লাগলেন এবং সতর্ক করে বললেন, ভাই! খবরদার! ফিরে যেয়ো না; নাগালে পাওয়ামাত্রই ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। হিশাম প্রত্যুত্তরে বলল, তারা তো আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে। এরপর সে ফিরে চলল। বাস্তবিকই নাগাল পাওয়ামাত্র আব্বাসীরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করল। আবদুর রহমান কোনমতে নদী পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌঁছলেন।

এরপর তিনি তার মাতুলকুলের কাছে আশ্রয় পাওয়ার আশায় মাগরেবের পথ ধরলেন। তার মা ছিলেন আমাজিগ বংশোদ্ভূত। ইরাক থেকে মাগরেবে পলায়নের উদ্দেশ্যে তার এই দীর্ঘ সফর-দাস্তানও যেমন হৃদয়বিদারক; তেমনই বিস্ময়কর। সিরিয়া, মিশর, লিবিয়া ও কায়রোয়ান পাড়ি দিয়ে তিনি মাগরেবে পৌঁছলেন।[২২১]

আবদুর রহমান প্রথমে লিবিয়ার বারকা (Cyrenaica) এলাকায় পৌঁছলেন এবং পাঁচ বছর সেখানেই আত্মগোপন করে রইলেন। ইতোমধ্যে আব্বাসীদের ধাওয়া ও গুপ্তহত্যার ধারা অনেকটা স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় এরপর তিনি লিবিয়া থেকে বের হয়ে কায়রোয়ানের পথ ধরেন। কায়রোয়ানে তখন চলছিল আবদুর রহমান বিন হাবীব আলফিহরীর স্বাধীন শাসন।[২২২] তিনি আব্বাসী খেলাফতের বশ্যতা স্বীকারের পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে উত্তর আফ্রিকা শাসন করছিলেন।

আবদুর রহমান বিন হাবীব ছিলেন প্রথম মাগরেব-বিজেতা মহান সাহাবী উকবা বিন নাফে'-এর বংশধর। একই সময় আন্দালুসের প্রশাসন দায়িত্বে ছিলেন তার চাচাতো ভাই ইউসুফ আলফিহরী। আবদুর রহমান বিন হাবীব নিজে মাগরেবের পাশাপাশি আন্দালুস শাসনেরও স্বপ্ন দেখতেন। কেননা, আন্দালুস তখন মাগরেবের অধীন ছিল। কিন্তু আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার হঠাৎ আবির্ভাব আবদুর রহমান বিন হাবীবের এ স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দাঁড়ায়, ইবনে মুয়াবিয়ার আগমনে ইবনে হাবীবের স্বপ্নপূরণের পথ কেন বাধাগ্রস্ত হবে?

এর উত্তরের দু'টি দিক রয়েছে। একটি বাস্তব বিশ্লেষণমূলক দিক, আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীতে দৃশ্যমান বিস্ময়কর এক দিক।

---

[২২১] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/২৮।

[২২২] যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৮/২৫।

Scanned with CamScanner

পূর্বেও আমরা বলেছি, আবদুর রহমান বিন হাবীব ছিলেন কায়রোয়ানের অধিপতি। তিনি ছিলেন উত্তর আফ্রিকার স্বাধীন প্রশাসক, যেখানে নবগঠিত আব্বাসী সালতানাতের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি বা কর্তৃত্ব ছিল না। আবার তিনি তৎকালীন আন্দালুস-প্রশাসক ইউসুফ আলফিহরীর চাচাতো ভাইও ছিলেন। তিনি জানতেন, আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া উমাইয়া রাজপরিবারের সন্তান। আর উমাইয়া খলীফাদের হাতেই এ অঞ্চল বিজিত হয়েছে। এ অঞ্চলের প্রশাসক নির্ধারণ-অপসারণ এবং নিয়োগ-বিয়োগের ক্ষমতাও তাই উমাইয়াদের। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, উমাইয়া রাজবংশের সন্তান আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া মাগরেবে এসে কেবল নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের নিশ্চয়তা লাভ করেই পরিতৃপ্ত হয়ে বসে থাকবেন না; অবশ্যই তিনি তার পূর্বপুরুষের রাজত্বে তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবেন। কারণ, এ ভূমি তার পূর্বপুরুষগণই জয় করেছেন, তারাই এ দেশ শাসন করেছেন এবং এ ভূখণ্ডে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

পরিস্থিতির নিরিখে এটাই ছিল তখনকার বাস্তবতা। প্রসঙ্গত বলতে হয়, আবদুর রহমান বিন হাবীব যে চিন্তা করছিলেন, তৎকালীন ক্ষমতাসীন আব্বাসীদের চিন্তাধারাও সেই একই খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই একই আশঙ্কায় তারা উমাইয়াদের সমূলে ধ্বংস করার রক্তাক্ত অধ্যায় রচনা করেছিল। তারা জানত, যতদিন উমাইয়া বংশধারার একজন ব্যক্তিও জীবিত থাকবে, অবশ্যই সে নিজেদের লুণ্ঠিত রাজত্ব পুনরুদ্ধার করার জন্য জানপ্রাণ চেষ্টা করবে। আর এ 'শঙ্কা-সমস্যা' দূর করার একমাত্র পথ হল উমাইয়া রাজবংশকে সমূলে ধ্বংস করা। শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গিও এক্ষেত্রে আব্বাসীদের প্রতিকূলে ছিল। উমাইয়াগণ যেহেতু এসব অঞ্চল যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করেছিলেন, তাই তাদের শাসনের শরয়ী বৈধতা ছিল সম্পূর্ণই সংশয়মুক্ত। বিপরীতে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আব্বাসীদের বিপ্লব-অভ্যুত্থান কোনভাবেই সমালোচনা ও আপত্তির ঊর্ধ্বে ছিল না।

সুতরাং আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার ন্যায় একজন উমাইয়া রাজপুত্রের মাগরেবের মাটিতে অবস্থান মাগরেবের প্রশাসকের মাঝে শঙ্কা, উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তির এক চোরা স্রোত সৃষ্টি করবে, এটাই স্বাভাবিক। কেননা, একজন উমাইয়া শাহজাদা তার মহান পিতামহদের মীরাস এ অঞ্চলের শাসনক্ষমতা লাভের অধিকার বেশি রাখেন। আর স্বাভাবিকভাবেই এ আশঙ্কা পরবর্তী সময়ে আন্দালুস-প্রশাসকের মনেও সৃষ্টি হবে।

Scanned with CamScanner

আবদুর রহমান বিন হাবীবের মাথায় এসব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। বরং নিশ্চিত করেই বলা যায়, এসব চিন্তা তখন নেতৃত্বের উপযুক্ত প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তির মাথায়ই আলোড়ন তুলছিল।

এই হল আবদুর রহমান বিন হাবীবের 'আন্দালুস-স্বপ্ন' বাধাগ্রস্ত হওয়ার বাস্তব দিক। আর বিস্ময়কর দিকটি হল একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গ। এবার সে আলোচনায় আসছি।

ইতিহাস-গ্রন্থাবলির ঐকমত্য বর্ণনামতে, উমাইয়া বংশের মহান বীর সেনানী, ককেশীয় অঞ্চলসহ উত্তরের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযানের মহানায়ক মাসলামা বিন আবদুল মালিক পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, অচিরেই মুসলিম প্রাচ্যে উমাইয়া সালতানাতের পতন ঘটবে, আর জনৈক উমাইয়া তরুণ প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যের মাগরেব অঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে উমাইয়াদের শাসন-ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। কোন কোন গ্রন্থের বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথাও আছে যে, তিনি অনুমান করেছিলেন, আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়াই হবেন সেই যুবক, যিনি প্রাচ্যে উমাইয়া শাসনব্যবস্থার বিলুপ্তির পর মুসলিম প্রতীচ্যে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন।

মূলত এ ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকেই ঐতিহাসিকদের অনেকে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এ ভবিষ্যদ্বাণীর কারণেই আব্বাসীগণ বিশেষভাবে আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার নাগাল পেতে মরিয়া হয়ে ওঠেছিল এবং এ কারণেই আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া পালিয়ে অন্য কোথাও না গিয়ে মাগরেবের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। এ ভবিষ্যদ্বাণীর কারণেই খলীফা হিশাম বিন আবদুল মালিক তার সন্তান ও অন্যান্য পৌত্রদের তুলনায় পৌত্র আবদুর রহমানকে বেশি স্নেহ ও তত্ত্বাবধান করতেন এবং এ কারণেই আবদুর রহমান বিন হাবীব কায়রোয়ানে আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়াকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন।

ভবিষ্যদ্বাণীতে আরও আছে, সেই 'ভবিষ্যৎ আন্দালুস-শাসক' প্রলম্বিত কেশগুচ্ছের অধিকারী হবেন এবং তিনি আপন কেশগুচ্ছকে দু'টি বিনুনি করে রাখবেন। ভবিষ্যদ্বাণীর অভিনবত্ব ও বিস্ময়ময়তা আরও বৃদ্ধি পায় যখন জানা যায় যে, আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া এমন কেশগুচ্ছেরই অধিকারী ছিলেন। আরও আশ্চর্যের বিষয়, আবদুর রহমান বিন হাবীবের কেশগুচ্ছও ছিল একই ধরনের![২২৩]

---

[২২৩] উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন : লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমূআ*, পৃ : ৫৩-৫৪, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৩৮, ৩/৫৩ ও আলনাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ১/১৭৫।

Scanned with CamScanner

ঐতিহাসিক বাস্তবতায় এই ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা

প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের অনেক ঘটনা সম্পর্কেই নানা ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীর বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু নির্মোহ তাত্ত্বিক বিবেচনায় এসব ঘটনাবলির একটিতেও এমন কোন প্রমাণ নেই, যার ভিত্তিতে আমরা দাবি করতে পারি যে, ভবিষ্যদ্বাণীটি ঘটনা সংঘটনের পূর্বে করা হয়েছে; আর পরবর্তী সময়ে তেমনই ঘটেছে, ভবিষ্যদ্বাণীতে যেমন বিবৃত হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীটিও এর ব্যতিক্রম নয়। কেননা, আমাদের কাছে বিদ্যমান ইতিহাস-গ্রন্থাবলিতে এমন কোনও প্রমাণের বিবরণ নেই, যার ভিত্তিতে আমরা আলোচ্য ঘটনার 'ঘটনা'র পূর্বে 'রটনা'র অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি। বিশেষত আমরা আলোচনা করছি ইসলামী ইতিহাসের প্রারম্ভিককালের হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে, আর আমাদের সামনে বিদ্যমান ভবিষ্যদ্বাণীর বিবরণসম্বলিত ইতিহাস-গ্রন্থসমূহ এর অনেক পরে সংকলিত হয়েছে।

যাই হোক, আবদুর রহমান বিন হাবীবও আন্দালুসের অধিকর্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। কেননা, তিনিও ছিলেন শাহজাদা ও দুই বিনুনির অধিকারী। আর তাই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়নে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন, এমন কারও আবির্ভাব তার কাছে এক মহা সমস্যারূপেই বিবেচিত হল এবং তিনি তা থেকে নিষ্কৃতির পথ ও পন্থা খুঁজতে লাগলেন।

আবদুর রহমান বিন হাবীব এ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তার জনৈক ইহুদি অনুচরের কাছ থেকে শুনেছিলেন। সে ইতঃপূর্বে ভবিষ্যদ্বক্তা মাসলামা বিন আবদুল মালিকের সেবা করত। সে-ই আবদুর রহমান বিন হাবীবকে মাসলামার এই অনুমানের কথা জানিয়েছিল যে, মুসলিম প্রাচ্যে উমাইয়া শাসনব্যবস্থার পতনের পর জনৈক উমাইয়া যুবক মুসলিম বিশ্বের পশ্চিমাঞ্চলে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হবে।[২২৪]

পলাতক উমাইয়াদের অনেকেই যখন মাগরেব ভূমিতে আশ্রয় নিতে লাগল, তখন আবদুর রহমান বিন হাবীবের আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পেল। তিনি আশঙ্কা করলেন, এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই তার দেশে উমাইয়া গোষ্ঠী একটি শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ জোটে পরিণত হবে। এ আশঙ্কায় তিনি আশ্রয় নেওয়া উমাইয়াদের অনেককেই তাড়িয়ে দিলেন, ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদের দুই

---

[২২৪] ইবনে আ'ষারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ১/১৫৬।

Scanned with CamScanner

সন্তানকে হত্যা করলেন, ইসমাঈল বিন আবান বিন আবদুল আযীয বিন মারওয়ানের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তার বোনকে জোরপূর্বক বিয়ে করলেন। এরপর সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার খোঁজে।[২২৫] শত্রুর নাগাল থেকে নিজেকে রক্ষার প্রাণান্ত চেষ্টায় দীর্ঘদিন যাবৎ ছুটে বেড়ানো আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার এ ধরনের তৎপরতার খবর অজানা থাকার কথা নয়। তার বিরুদ্ধে আবদুর রহমান বিন হাবীবের এই অভিযানের সংবাদ পেয়ে তিনি কায়রোয়ান ছেড়ে টাডলায় চলে গেলেন। এরপর সেখান থেকে আশ্রয় নিলেন মাগরেবের উপকূলবর্তী এলাকার নাফযা গোত্র অধ্যুষিত অঞ্চলে। নাফযা গোত্র ছিল তার মাতুল বংশীয়। কেননা, আবদুর রহমানের মা নাফযা গোত্রেরই ছিলেন। অবশ্য এ এলাকাও তার জন্য নিরাপদ ছিল না। কারণ, এ অঞ্চলে খারেজী ফেরকার বহু লোকের অস্তিত্ব ছিল, যারা উমাইয়াদের মনে-প্রাণে ঘৃণা করত। তাই এ অঞ্চলে অবস্থান তার জন্য ছিল পতনোন্মুখ খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আত্মহত্যার নামান্তর।[২২৬]

প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী তখন আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার আন্দালুস ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার সুযোগ ছিল না। আর ভবিষ্যদ্বাণীর দিক বিবেচনা করলে আমরা বলতে পারি, আন্দালুস-ভূমি আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার কেবল একমাত্র নিরাপদ গন্তব্যই ছিল না; শৈশবে যেদিন তিনি তার পিতামহ মাসলামা বিন আবদুল মালিকের মুখ থেকে আন্দালুসের কথা শুনেছিলেন, সেদিন থেকেই আন্দালুস ছিল তার কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত গন্তব্য।

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার মাথা তখন পুরো মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে সবচে' মূল্যবান 'মস্তক'। প্রাচ্যের সীমান্তে পারস্য ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তখন ছিল আব্বাসীদের প্রবল প্রতাপ ও শক্তিশালী দুর্গ। সে সময় পারস্যের শাসনকর্তা ছিলেন প্রতাপশালী ও স্বৈরাচারী শাসক আবু মুসলিম খোরাসানী, নৃশংসতার কারণে যিনি পরিচিত ছিলেন 'বনু আব্বাসের হাজ্জাজ' নামে। ইরাকে ছিল আব্বাসী খেলাফতের রাজধানী। শাম ও মিশরেও ইতোমধ্যে আব্বাসীদের প্রতিপত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল। উত্তর আফ্রিকা ও

---

[২২৫] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/২৯ ও আননাসিরী, *আলইসতিক্সা*, ১/১৭৫।

[২২৬] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৪১ ও যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৮/২৪৪।

Scanned with CamScanner

মাগরেবে আবদুর রহমানকে খুঁজে ফিরছিল খারেজীরা এবং আবদুর রহমান বিন হাবীব।

একজন সাধারণ মানুষকেও যদি এভাবে খুঁজে ফেরা হয়, তবে তার জীবন হয়ে পড়ে কঠিন সংকটাপন্ন; সেখানে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি যদি হন আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার মতো কেউ, তৎকালীন শাসকপরিবার বনু আব্বাসের দৃষ্টিতে যিনি বনু উমাইয়ার সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, নিজ ভূখণ্ডে যার উপস্থিতিকেও প্রত্যেক প্রশাসক অনিরাপদ মনে করেন, তাহলে তার জীবন কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। আর তাই, বাস্তবতার নিরিখে বলতে গেলে আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার সামনের পথ ছিল সুস্পষ্ট, বাঁচতে চাইলে শাসক বা প্রশাসক হয়ে বেঁচে থাকা; আর এভাবে বাঁচতে না পারলে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। সুতরাং বাস্তবতা তার নিয়ম মেনেই অগ্রসর হল।

বিভিন্ন কারণেই আন্দালুস-ভূমি আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার জন্য সবচে' উপযুক্ত ভূমি ছিল। উল্লেখযোগ্য দু'টি কারণ হল,

১. আন্দালুস ছিল আব্বাসী খেলাফত ও খারেজীদের নাগাল থেকে দূরে।

২. আন্দালুসের পরিস্থিতি তখন একেবারেই অশান্ত ছিল; যেমনটি আমরা প্রশাসক আমলের দ্বিতীয় স্তরের একেবারে শেষ সময়ের প্রশাসক ইউসুফ আলফিহরীর আলোচনায় উল্লেখ করে এসেছি। তাই পরিস্থিতি আবদুর রহমানের আন্দালুসে প্রবেশের অনুকূলে ছিল। আন্দালুস যদি তখন আব্বাসী খেলাফতের অধীনে থাকত, আবদুর রহমান কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করতে পারতেন না। ঠিক তেমনই আন্দালুস খারেজী চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত থাকলেও তিনি পারতেন না সেখানে প্রবেশ করতে। এসব বিবেচনার ক্রমাগত বিদ্রোহপ্রবাহে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও দুর্গম আন্দালুসই ছিল তার জন্য সবচে' অনুকূল স্থান।

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার আন্দালুস-প্রবেশ পরিকল্পনা

১৩৬ হিজরীতে (৭৫৩ খৃস্টাব্দে) আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া আন্দালুসে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তা হল,

১. তিনি আন্দালুসের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং সেখানকার প্রশাসনে

Scanned with CamScanner

প্রভাবশালী শক্তিগুলো সম্বন্ধে ধারণা নেওয়ার জন্য তার মুক্ত ক্রীতদাস বদরকে আন্দালুসে প্রেরণ করলেন। আন্দালুসে তখন ইয়ামেনী ও কায়সীদের মধ্যে বিবাদ চলছিল। ইয়ামেনীদের নেতৃত্বে ছিলেন আবুস সবাহ আলইয়াহসাবী, আর কায়সীদের নেতৃত্বে ছিলেন আবু জাওশান সামীল বিন হাতিম। মূলত এ দু' পক্ষই ছিল শাসনকর্তা ইউসুফ আলফিহরীর রাষ্ট্রক্ষমতার মূল চালিকাশক্তি।[২২৭]

২. বদরের মাধ্যমে আন্দালুসে বসবাসরত উমাইয়া রাজবংশের সমর্থকদের পরিচয় জানার পর তিনি তাদের সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করলেন।[২২৮] বাস্তবে তখন অনেকেই উমাইয়া রাজবংশের প্রতি প্রবল অনুরাগী ছিল। খলীফা ওমর রাযি., ওসমান রাযি. ও আলী রাযি.-এর খেলাফতকালে শামের গভর্নর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর সময় থেকেই ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানগণ উমাইয়া বংশকে ভালোবাসতো। এরপর কালের পরিক্রমায় দান ও উদারতা, প্রজ্ঞা ও রাষ্ট্রনীতি, জনমানুষের আস্থা অর্জন, সদাচার ও ইসলামী বিজয়াভিযানে নেতৃত্বদান এবং দ্বীনের প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রাখার কারণে বনু উমাইয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। এ কারণেই আন্দালুসের অভ্যন্তরেও উমাইয়া গোত্র ও অন্যান্য বিভিন্ন গোত্রের জনগোষ্ঠীর মধ্যে উমাইয়া রাজবংশের প্রতি অনুরাগী প্রচুর সমর্থক ছিল।

৩. পত্র-যোগাযোগের মাধ্যমে আন্দালুসে বসবাসরত সকল উমাইয়া বংশোদ্ভূত ব্যক্তির কাছে তিনি নিজের পরিকল্পনা উপস্থাপন করলেন, তার আন্দালুসে আগমনের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করলেন।[২২৯]

৪. তার মুক্ত ক্রীতদাস বদর অত্যন্ত কার্যকর যে পদক্ষেপটি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হলেন তা হল, বদর প্রথমে আন্দালুসে বসবাসরত বনু উমাইয়ার মাওয়ালী (উমাইয়া রাজপরিবার কর্তৃক মুক্ত ক্রীতদাসগণ) ও তাদের নেতা আবু উসমানের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। এরপর তাদের মাধ্যমে কায়সীদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু কায়সীদের

---

[২২৭] দেখুন : যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ১১/২৩৯ ও *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৮/২৪৪ এবং সাফাদী, *আলওয়াফি বিল ওয়াফাইয়াত*, ১৮/১৬৭।

[২২৮] দেখুন : যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ১১/২৩৯ ও ইবনে কাসীর, *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১০/৮০।

[২২৯] দেখুন : ইবনুল আছীর, *আলকামিল ফিত তারীখ*, ৫/১২৩।

Scanned with CamScanner

নেতা সামীল বিন হাতিম, যিনি প্রশাসক আলফিহরীর মূল নিয়ন্ত্রক ছিলেন, আন্দালুসে একজন উমাইয়া রাজপুত্রের উপস্থিতির ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভাষায় শঙ্কা ও আপত্তি প্রকাশ করলেন। কারণ, আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া আগমন করলে প্রশাসনে কায়সীদের সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুতেই থাকবে না, বা বর্তমানে আলফিহরীর প্রশাসনে আছে। এখন তো তারা চাইলেই আলফিহরীকে ক্ষমতায় রাখতে পারে, চাইলেই পারে অপসারণ করতে।

কায়সীদের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে বদর ও উমাইয়া মাওয়ালীরা অপর শক্তিশালী পক্ষ ইয়ামেনীদের কাছে গেলে তারা সাদরে মৈত্রী প্রস্তাব গ্রহণ করল। এভাবে আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিকল্পনা সার্থকভাবে সম্পন্ন হল।

বদর সফলতার সঙ্গে আপন দায়িত্ব সমাপ্ত করলেন। এরপর তিনি একজন বার্তাবাহকের মাধ্যমে আবদুর রহমানের কাছে বার্তা পাঠালেন যে, পরিস্থিতি এখন আপনাকে আন্দালুস-ভূমিতে স্বাগত জানাতে পূর্ণ প্রস্তুত। বার্তা পাওয়ার পর আবদুর রহমান বার্তাবাহককে তার নাম জিজ্ঞেস করলেন। সে জানাল, তার নাম তামাম (পূর্ণতা)। তিনি তার উপনাম জিজ্ঞেস করায় সে জানাল, তার উপনাম আবু গালিব (বিজয়ীর পিতা)। সুলক্ষণে আনন্দিত হয়ে আবদুর রহমান বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার! তাহলে তো আমাদের লক্ষ্য 'পূর্ণ' হয়েই গেছে আর আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে আমরা 'বিজয়' অর্জন করতে যাচ্ছি।[২৩০]

এরপর তিনি সফরের প্রস্তুতি নিলেন এবং সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য একটি নৌযানের ব্যবস্থা করলেন, যা তাকে নিয়ে যাবে অনিশ্চিত আগামীর পথে।

আন্দালুস-ভূমিতে আবদুর রহমান আদদাখিল

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া একাকী আন্দালুসের তীরে অবতরণ করলেন। সৈকতে তার মুক্ত ক্রীতদাস বদর তাকে স্বাগত জানালেন। সে সময় আন্দালুসের শাসনকর্তা ছিলেন ইউসুফ আলফিহরী। স্বভাবতই তিনি তখন দেশের উত্তর অংশে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন।[২৩১]

---

[২৩০] দেখুন : মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৩১।

[২৩১] দেখুন : লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ৭৩, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৩৩ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৪২।

Scanned with CamScanner

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া আন্দালুস-ভূমিতে পা রাখতেই বনু উমাইয়ার সমর্থকগোষ্ঠী, আমাজিগ সম্প্রদায় ও প্রশাসক ইউসুফ আলফিহরীর প্রতিপক্ষ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন তার পাশে সমবেত হতে শুরু করল। তাছাড়া পালিয়ে বেঁচে যাওয়া উমাইয়া রাজবংশের জীবিত ব্যক্তিগণও ততদিনে ইয়ামেনীদের সঙ্গে কৃত মৈত্রী চুক্তির কারণে আন্দালুসে আশ্রয় নিয়েছিল। তারাও আবদুর রহমানের সঙ্গে যোগ দিল।

সে সময় আন্দালুসে ইয়ামেনীদের নেতৃত্বে ছিলেন আবুস সবাহ আলইয়াহসবী আর ইয়ামেনীদের মূল ঘাটি ছিল সেভিলে। সেভিল তৎকালে ইসলামী বিশ্বের অন্যতম প্রধান বৃহৎ নগরী হিসেবে বিবেচিত হত। আবদুর রহমান নিজে সেভিলে গমন করলেন এবং দীর্ঘ সময় আবুস সবাহ আলইয়াহসবীর সঙ্গে বৈঠক করলেন। এরপর আবুস সবাহ তার আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন।[২৩২]

যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পূর্বে আবদুর রহমান বেশ কয়েকবার প্রশাসক ইউসুফ আলফিহরীর সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করলেন এবং তার হৃদ্যতা কামনা করলেন। উমাইয়া খলীফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের পৌত্র-সম্পর্কের দাবিতে তিনি ইউসুফকে তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুরোধ করলেন এবং আশ্বাস নিলেন যে, তাকে তিনি আন্দালুস প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান করবেন।[২৩৩] কিন্তু ইউসুফ আলফিহরী আবদুর রহমানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং আবদুর রহমান ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাহিনী প্রস্তুত করে রওয়ানা হলেন।

মাসারার যুদ্ধ

যুদ্ধক্ষেত্রের উভয় দিকে মুসলিম পক্ষ! এমনই এক মর্মান্তিক বাস্তবতায় উভয় পক্ষ অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় মুখোমুখি হল। কিন্তু এটাও বাস্তব যে, অব্যাহত বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ও বিশৃঙ্খলার শিকার আন্দালুসে তখনকার একমাত্র ও অবশ্যম্ভাবী দাবি ছিল সামরিক কোন সমাধান। ১৩৮ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে (৭৫৬ খৃস্টাব্দের মে মাসে) মাসারা প্রান্তর নামে খ্যাত এক ঐতিহাসিক প্রান্তরে ইউসুফ আলফিহরীর বাহিনী ও আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার

---

[২৩২] ইবনুল আছীর, *আলকামিল ফিত তারীখ*, ৫/১২৩।

[২৩৩] প্রাগুক্ত, ৫/১২৩ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৩৩।

Scanned with CamScanner

বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হল। ইউসুফ আলফিহরীর পক্ষে লড়াই করছিল কায়সীরা, আর আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার মূল শক্তি ছিল ইয়ামেনীরা।[২৩৪]

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে ইয়ামেনীদের নেতা আবুস সবাহ শুনতে পেলেন, ইয়ামেনীরা বলাবলি করছে যে, আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া তো এ দেশে বহিরাগত; অধিকন্তু তার সঙ্গে আছে ধূসর বর্ণের এক তাজাদম ঘোড়া। যুদ্ধে আমরা পরাজিত হলে তিনি তো যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাবেন আর আলফিহরীর বাহিনীর (নির্মমতার শিকার হওয়ার) জন্য আমাদের ফেলে যাবেন।

এ কথা আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার কানেও পৌঁছল। সদ্যই পঁচিশে পা রাখা বিচক্ষণ, তারুণ্যদীপ্ত ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন সেনানায়ক আবদুর রহমান তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিজেই আবুস সবাহর কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাকে বললেন, আমার এই ঘোড়াটি অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন, যুদ্ধ চলাকালে এর পিঠে বসে আমার পক্ষে তরবারি-বর্শা চালনা সম্ভব হবে না। তাই আপনি চাইলে আমার ঘোড়াটি নিয়ে আপনার খচ্চরটি আমাকে দিতে পারেন। এরপর তিনি নিজের দ্রুতগামী ঘোড়াটি আবুস সবাহকে দিয়ে তার খচ্চরটি নিলেন এবং খচ্চরে আরোহণ করেই যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। তখন ইয়ামেনীরা বলাবলি করতে লাগল, 'এ তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে ইচ্ছুক কাপুরুষ কোন সৈনিকের আচরণ নয়; এ যে এমন বীর যোদ্ধার দুর্বিনীত আচরণ, রণাঙ্গনে যিনি মৃত্যুকে খুঁজে ফিরছেন।'[২৩৫]

প্রবল যুদ্ধের পর আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া জয়ী হলেন এবং প্রতিপক্ষের পরাজিত নেতা ইউসুফ আলফিহরী পালিয়ে গেলেন।[২৩৬]

আবদুর রহমান আদদাখিলের মহত্ত্ব, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার নিদর্শন

সে যুগের যুদ্ধ-রীতি ছিল, বিজয়ী বাহিনী পরাজিত বাহিনীর শক্তি পুরোপুরি ধ্বংস করা ও তাদের ভবিষ্যৎ-বিদ্রোহ সম্ভাবনা নস্যাৎ করার লক্ষ্যে বেঁচে থাকা অবশিষ্ট পলাতক সৈন্যদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করত। কিন্তু ইয়ামেনীরা

---

[২৩৪] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমূআ*, পৃ : ৮০ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৪২।

[২৩৫] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমূআ*, পৃ। ৮২।

[২৩৬] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমূআ*, পৃ : ৮৩ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৪৭।

Scanned with CamScanner

যখন ইউসুফ আলফিহরীর সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবনের প্রস্তুতি নিতে লাগল, আবদুর রহমান তাদের নিবৃত্ত করলেন এবং তার সেই ঐতিহাসিক উক্তিটি করলেন, ইতিহাসের সোনালী অঙ্গনে যা বারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে তার প্রজ্ঞা, মেধা ও প্রতিভার এবং পরিস্থিতি উপলব্ধির ক্ষেত্রে তার সঠিক বিবেচনাবোধ ও যথাযথ চিন্তাধারার স্বীকৃতি প্রদান করে। তিনি তাদের বললেন,

> এমন শত্রুর শিকড় উপড়ে ফেলো না, ভবিষ্যতে যার হৃদ্যতা প্রত্যাশা কর। তুলনামূলক কঠিন শত্রুর (মোকাবেলার সময় সহায়তা লাভের) জন্য তাকে টিকিয়ে রাখ।[২৩৭]

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া রহ. বোঝাতে চেয়েছিলেন, আজ যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, আগামীতে তারাই আমাদের সৈন্যদলে পরিণত হবে এবং লিওন, ফ্রান্সসহ অন্যান্য অঞ্চলের খৃস্টান ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সহযোগী হবে।

আবদুর রহমান আদদাখিল ছিলেন এমনই সুবিস্তৃত দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। তার চিন্তাসীমা বর্তমান পরিবেশ ও প্রতিবেশে আবদ্ধ ছিল না; চিন্তাজুড়ে ছিল পুরো আন্দালুস; বরং পুরো ইউরোপ। বরং তার এ চিন্তাধারার আলোকে আমরা মনে করি যে, পরবর্তী সময়ে শাম ভূমিসহ লুণ্ঠিত উমাইয়া সালতানাত পুনরুদ্ধারের সামর্থ্যও তার ছিল। কেননা,

১. অল্প কিছুক্ষণ পূর্বেও যারা তাকে হত্যা করতে উদগ্রীব ছিল, তাদের প্রতিও তার অন্তরে সামান্য প্রতিহিংসা বা বিদ্বেষ ছিল না।

২. প্রকৃত দুশমন উত্তর অঞ্চলের খৃস্টানদের নিয়ে তার গভীর চিন্তা ও উপলব্ধি ছিল।

৩. তখনও তিনি জীবনসফরের পঁচিশটি বসন্তও অতিক্রম করেননি; কিন্তু এ বয়সেই তিনি ছিলেন সতর্ক অনুভূতি ও সঠিক উপলব্ধি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং সুদূর প্রসারিত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পুরো দেশকে এক পতাকাতলে এনে ঐক্যের শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক নীতি অনুসারে যদি এসব পলায়নরত সৈন্যদের হত্যা করা বৈধও হয়; শরয়ী নীতি অনুসারে এদের পশ্চাদ্ধাবন করা, খুঁজে খুঁজে হত্যা করা, আহতদের মেরে ফেলা এবং বন্দীদের হত্যা করা কোনভাবেই

---

[২৩৭] মাক্কারী, নাফহুত তীব, ৩/৪২।

Scanned with CamScanner

বৈধ হতে পারে না। কেননা, শরীয়তের দৃষ্টিতে এদের বিধান মুশরিকদের বিধানভুক্ত নয়; বরং ইসলামী রাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের বিধানভুক্ত। আর বিদ্রোহীদের ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র-সরকারের জন্য শরীয়তের বিধান হল, তাদের পলাতক সদস্যদের ধাওয়া করা যাবে না, বন্দী ও আহতদের হত্যা করা যাবে না; এমনকি তাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদও কব্জা করা যাবে না।[২৩৮]

যাই হোক, যুদ্ধে ইউসুফ আলফিহরীর বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। এমনকি আবদুর রহমান আদদাখিল যুদ্ধক্ষেত্র হতে কর্ডোভার প্রশাসক-প্রাসাদে গমনের পথে প্রতিপক্ষের কারও দেখা পেলেন না। তার সৈন্যরা আলফিহরীর সৈন্যদের অস্ত্র-রসদসামগ্রী ইত্যাদির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু কিছু সৈন্য যখন স্বয়ং ইউসুফ আলফিহরীর রাজপ্রাসাদের ওপর চড়াও হয়ে প্রাসাদ-সম্পদ লুণ্ঠন এবং তার পরিবারের নারী ও শিশুদের বন্দী করতে উদ্যত হল, আবদুর রহমান দ্রুত ছুটে এসে তাদের নিবৃত্ত করলেন। তিনি আলফিহরীর বিবস্ত্র শিশুদের বস্ত্রের ব্যবস্থা করলেন; যতটুকু সম্ভব হল, তাদের লুণ্ঠিত সম্পদ খুঁজে বের করে ফিরিয়ে দিলেন। তার এই আচরণ ইয়ামেনীদের মোটেই পছন্দ হল না। ইউসুফের প্রতিশোধ তার স্ত্রী-সন্তানদের ওপর নিতে না পেরে তারা আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার ওপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হল। তাদের অন্তরে এ অশুভ চিন্তা অনুপ্রবেশ করল যে, আবদুর রহমান তার মুযার বংশকুলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন।[২৩৯]

আলফিহরীর পরিবারকে সবকিছু গুছিয়ে নিরাপত্তা সহকারে বের হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আবদুর রহমান তিনদিন কর্ডোভার বাইরে অবস্থান করলেন। এটি ছিল আন্দালুসে তার সংযম, নিষ্কলুষতা ও সদাচরণের প্রথম পদক্ষেপ।[২৪০]

আবদুর রহমান আদদাখিল ও আবুস সবাহর মধ্যে দ্বন্দ্ব

মাসারা প্রান্তরে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আবদুর রহমান যখন ইউসুফ আলফিহরীর প্রাসাদ লুণ্ঠন এবং তার পরিবারের নারী ও শিশুদের বন্দী করার

---

[২৩৮] দেখুন : কাযী আবু ইয়া'লা আলফাররা, *আলআহকামুস সুলতানিয়া*, পৃ : ৫৫, ড. ইউসুফ কারযাভী, *ফিকহুল জিহাদ*, পৃ : ১০১১ ও সাঈদ বিন আবদুল আলী আলবারদী, *আলমাওসূআ'তুল জিনাইয়াতুল ইসলামিয়া*, পৃ : ১৮৩।

[২৩৯] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ'*, পৃ : ৮৩-৮৪।

[২৪০] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৩৪।

Scanned with CamScanner

তৎপরতায় বাধা দিলেন, তখন ইয়ামেনীদের নেতা আবুস সবাহ আলইয়াহসবী অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং স্বয়ং আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করলেন। তিনি তার অনুসারীদের বললেন, 'হে ইয়ামেনী সম্প্রদায়! তোমাদের কি একদিনে দু'টি যুদ্ধজয়ের ইচ্ছা আছে? আমরা তো ইউসুফ ও সামীলের হিসাব শেষ করেছি; এবার এসো, মুয়াবিয়া-পুত্র এই দুঃসাহসী তরুণকেও হত্যা করি। তাহলে পুরো ক্ষমতা আমাদের হাতে চলে আসবে। আমরা তাকে হত্যা করার জন্য আমাদের কাউকে পাঠাব এবং তার অন্তর থেকে মুযার-প্রীতি বের করে ছাড়ব।' কিন্তু আবুস সবাহর এই আহ্বানে কেউ সাড়া দিল না।[২৪১]

এদিকে আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়াও আবুস সবাহর এই দুরভিসন্ধির খবর পেয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি বিষয়টি চেপে গেলেন এবং কারও কাছে প্রকাশ করলেন না। তিনি ইয়ামেনীদের জানতেই দিলেন না যে, তাদের গোপন পরিকল্পনা তিনি জেনে ফেলেছেন। অবশ্য ভবিষ্যতের জন্য আবুস সবাহর ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি সাবধান হয়ে গেলেন।[২৪২]

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া চাননি, এই ক্রান্তিকালীন সময়ে আন্দালুসের মুসলিম জামাতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হোক। তিনি চাননি, বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত আন্দালুসে উমাইয়া বংশ, উমাইয়া সালতানাতের সমর্থক ও ইয়ামেনীদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া এই নব ঐক্যে ভাঙন তৈরি হোক। তার পুরো মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল মুসলিম সমাজকে একতাবদ্ধ করা এবং পরবর্তী সময়ে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে বিজয়াভিযান পরিচালনা করার দিকে। এ ঘটনার প্রায় এগার বছর পর আবদুর রহমান আবুস সবাহকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং আন্দালুসের সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ ও একচ্ছত্র ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হন।[২৪৩]

---

[২৪১] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ৮৩-৮৪ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৩৪।

[২৪২] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ৮৩-৮৪ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৩৪।

[২৪৩] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫৩।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আবদুর রহমান আদদাখিলের শাসনামল

মাসারা প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে জয়লাভ এবং আন্দালুসের রাজধানী কর্ডোভায় প্রবেশ করার পর আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া 'আবদুর রহমান আদদাখিল' নামে পরিচিতি লাভ করলেন। কেননা, তিনিই বনু উমাইয়ার প্রথম ব্যক্তি, যিনি প্রশাসক হিসেবে কর্ডোভায় প্রবেশ করেছেন (আদদাখিল শব্দের অর্থ প্রবেশকারী)।[২৪৪]

আন্দালুস-ভূমিতে ইসলামের প্রসারে আবদুর রহমান আদদাখিলের অনন্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি কর্ডোভায় প্রবেশ করার পর যে নতুন যুগের সূচনা হয়, আন্দালুসের ইতিহাসে তা 'স্বাধীন উমাইয়া প্রশাসকদের আমল'[২৪৫] নামে পরিচিত। এ আমলের সূচনা ১৩৮ হিজরীতে আর সমাপ্তি ৩১৬ হিজরীতে (৭৫৫-৯২৮ খৃস্টাব্দে)। এ সময়কালকে 'ইমারত' বা প্রশাসন যুগ নামকরণের কারণ হল, এ পুরো সময় আন্দালুস বনু আব্বাসের নিয়ন্ত্রণাধীন মূল খেলাফত ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল। এ সময় থেকে নিয়ে ইসলামী আন্দালুসের শেষ সময় পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব আব্বাসী খেলাফতসহ বিভিন্ন খেলাফতব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হলেও আন্দালুস কখনোই সেই খেলাফতব্যবস্থার অধীনে ছিল না।

শাসনদায়িত্ব গ্রহণের পর আবদুর রহমান আদদাখিল প্রথমেই আন্দালুসের শাসনব্যবস্থা সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত করার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তখন পুরো আন্দালুস জুড়ে স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ চলছিল। একটি বিদ্রোহ দমন হলে নতুন আরেকটি বিদ্রোহ শুরু হত; এভাবে বিস্ময়কর সংযম ও ধৈর্যের সঙ্গে (!) বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা বজায় থাকত। আবদুর রহমান আদদাখিল একটির পর একটি বিদ্রোহ আশ্চর্য দক্ষতাবলে দমন করতে

---

[২৪৪] দেখুন : ইবনে খালদুন, *তারীখে ইবনে খালদুন*, ৪/১২২ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩২৯।

[২৪৫] অর্থাৎ এর পূর্ববর্তী প্রশাসকগণ ছিলেন শামকেন্দ্রিক খেলাফতে ইসলামিয়ার অধীনস্থ প্রশাসক আর আবদুর রহমান আদদাখিল ও তার পরবর্তী প্রশাসকগণ ছিলেন মূল দারুল খেলাফত হতে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন প্রশাসক। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

লাগলেন। বিদ্রোহ ও বিদ্রোহকারীদের গতি-প্রকৃতি বিবেচনায় নিয়ে যে বিদ্রোহ দমনের জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়, তিনি তা-ই গ্রহণ করলেন। যেসব বিদ্রোহীদের আপন করে নেওয়া সম্ভব, আপন করে নিলেন; অন্যদের যুদ্ধের মাধ্যমে দমন করলেন।

৩৪ বছর ব্যাপ্ত তার শাসনামলে (১৩৮-১৭২ হিজরী/৭৫৫-৭৮৮ খৃস্টাব্দ) তার বিরুদ্ধে পঁচিশটির বেশি বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা সংঘটিত হয়েছে[২৪৬] আর তিনি আশ্চর্য সফলতার সঙ্গে একের পর এক সবগুলো দমন করেছেন। এরপর দেশকে রেখে গেছেন সর্বদিক বিবেচনায় আন্দালুস ইতিহাসে সবচে' শক্তিশালী অবস্থানে।

আবদুর রহমান আদদাখিল-এর বিরুদ্ধে সংঘটিত বিদ্রোহসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আবদুর রহমান আদদাখিলের শাসনামলে আন্দালুসের উমাইয়া প্রশাসন অনেকগুলো বিদ্রোহ-প্রচেষ্টার সম্মুখীন হয়েছে; যার সংখ্যা পঁচিশটিরও বেশি। তিনি প্রতিটি প্রচেষ্টাই দক্ষ হাতে সামাল দিয়েছেন এবং বিদ্রোহীদের পরাভূত করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিদ্রোহ হল,

১. কাসিম বিন ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আলফিহরী ও রিযক বিন লোমান আলগাসানীর বিদ্রোহ।

২. ১৪৩ হিজরীতে (৭৬০ খৃস্টাব্দে) ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আলফিহরীর বিদ্রোহ।[২৪৭]

৩. ১৪৪ হিজরীতে (৭৬১ খৃস্টাব্দে) হিশাম বিন উরওয়া আলফিহরীর বিদ্রোহ।[২৪৮]

৪. ১৪৪ হতে ১৪৬ হিজরী পর্যন্ত ধারাবাহিক কয়েকটি বিদ্রোহ।

৫. ১৪৬ হিজরীতে (৭৬৩ খৃস্টাব্দে) আলা বিন মুগীস আলইয়াহসবীর বিদ্রোহ।[২৪৯]

৬. ১৪৯ হিজরীতে (৭৬৬ খৃস্টাব্দে) সাঈদ আলইয়াহসবী আলইয়ামানীর বিদ্রোহ।[২৫০]

৭. ১৪৯ হিজরীতেই আবুস সবাহ হাই বিন ইয়াহইয়া আলইয়াহসবীর বিদ্রোহ।[২৫১]

---

[২৪৬] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৪১ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩৩৩।

[২৪৭] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ৯২ ও ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৫/১৩৬।

[২৪৮] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ৯৫ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫৩।

[২৪৯] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ৯৩ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫১।

[২৫০] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ৯৬, ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৫/১৭৮ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫৩।

[২৫১] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ৯৬ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫৩।

Scanned with CamScanner

৮. ১৫১ হিজরীতে (৭৬৮ খৃস্টাব্দে) শাকিয়া বিন আবদুল ওয়াহিদ আলমিক্‌নাসীর নেতৃত্বে আমাজিগদের বিদ্রোহ।[২৫২]

৯. ১৫৬ হিজরীতে (৭৭৩ খৃস্টাব্দে) আবদুল গাফির আলইয়াহসবী ও হাইওয়া বিন মালামিস আলহাযরামীর নেতৃত্বে সেভিলে ইয়ামেনীদের বিদ্রোহ।[২৫৩]

১০. ১৫৭ হিজরীতে (৭৭৪ খৃস্টাব্দে) বার্সেলোনায় সুলাইমান বিন ইয়াক্‌যানের বিদ্রোহ।[২৫৪]

১১. ১৬১ হিজরীতে (৭৭৭ খৃস্টাব্দে) আবদুর রহমান বিন হাবীব আলফিহরীর বিদ্রোহ।[২৫৫]

১২. ১৬৬ হিজরীতে (৭৮২ খৃস্টাব্দে) হুসাইন বিন ইয়াহইয়া আলআনসারীর বিদ্রোহ।[২৫৬]

১৩. ১৬৮ হিজরীতে (৭৮৪ খৃস্টাব্দে) মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আলফিহরীর বিদ্রোহ ইত্যাদি।[২৫৭]

এছাড়াও তার বিরুদ্ধে ছোট ছোট আরও অনেক বিদ্রোহ হয়েছে; সবগুলোই তিনি দমন করেছেন, ব্যর্থ করে দিয়েছেন প্রজ্ঞাপূর্ণ রাজনৈতিক দক্ষতাবলে।

আব্বাসীদের অভ্যুত্থান চেষ্টা ও 'কুরাইশী ঈগল' উপাধি

এই পঁচিশটি বিদ্রোহ-প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা শুধু একটির কথাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করব। কেননা, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এ অভ্যুত্থানপ্রচেষ্টার আলোচনার মাধ্যমে আমরা অনুধাবন করতে পারব, কেন আন্দালুস এ সময় আব্বাসী খেলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। আবদুর রহমান আদদাখিল আন্দালুসের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করার প্রায় আট বছর পর ১৪৬ হিজরীতে (৭৬৩ খৃস্টাব্দে) এ বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা সংঘটিত হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন আলা বিন মুগীস আলহাযরামী নামক জনৈক ব্যক্তি।[২৫৮]

---

[২৫২] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ৯৭, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫৪, ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৪৮।

[২৫৩] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ৯৮, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫৫ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৪৮।

[২৫৪] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ১০২ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৪৮।

[২৫৫] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ১০০ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫৬।

[২৫৬] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ১০৩, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫৬ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৪৮।

[২৫৭] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ১০৫ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫৭।

[২৫৮] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ : ৯৩ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫১।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা আবু জাফর আলমানসুর (আবুল আব্বাস আস্‌সাফ্‌ফাহ-এর পর দ্বিতীয় খলীফা হলেও প্রকৃত অর্থে তিনিই আব্বাসী খেলাফতের মূল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন) আলা বিন মুগীস আলহায্‌রামীকে আন্দালুসে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল আবদুর রহমান আদদাখিলকে হত্যা করা এবং এর মাধ্যমে আন্দালুসকে আব্বাসী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত করার পথ সুগম করা।[২৫৯]

আবু জাফর আলমানসুরের দিক থেকে বিবেচনা করলে এটি একটি স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত ছিল। কেননা, এর মাধ্যমে তিনি তৎকালীন মূল ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা হতে বিচ্ছিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র আন্দালুসকে আব্বাসী খেলাফতের বিশাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী আলা বিন মুগীস আলহায্‌রামী মাগরেব থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে পৌঁছেন। এরপর তিনি আব্বাসীদের সমর্থনে অভ্যুত্থানের ডাক দেন এবং খলীফা আবু জাফর প্রেরিত আব্বাসী খেলাফতের প্রতীক কৃষ্ণ পতাকা উত্তোলন করেন।[২৬০]

আবদুর রহমান আদদাখিল এ বিদ্রোহ মোকাবেলায় মোটেও বিলম্ব বা অবহেলা করেননি। আলা বিন মুগীস আলহায্‌রামী ও আবদুর রহমান আদদাখিলের বাহিনীর মধ্যে বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অন্যান্য বিদ্রোহ দমনের ন্যায় এ যুদ্ধেও তিনি জয়লাভ করেন। হজ্বের সফরে থাকা খলীফা আবু জাফর আলমানসুরের কাছে সংবাদ পৌঁছয় যে, আবদুর রহমান আদদাখিল আলা বিন মুগীস আলহায্‌রামীর বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছেন এবং আলা বিন মুগীস যুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

এ সংবাদ শুনে খলীফা আবু জাফর আলমানসুর বলে ওঠেন, 'হতভাগাকে তো আমরাই হত্যা করলাম!'। আবু জাফর বোঝাতে চেয়েছেন যে, আবদুর রহমান আদদাখিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে তিনিই আলা-কে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, এই যুবককে (আবদুর রহমান আদদাখিল) ঘিরে আমাদের আর কোন পরিকল্পনা বা প্রত্যাশা নেই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআ'লার, যিনি আমাদের ও তার মাঝে সমুদ্রকে অন্তরায় রেখেছেন।[২৬১]

---

[২৫৯] দেখুন : ইবনে খালদূন, তারীখে ইবনে খালদূন, ৪/১২২ ও মাক্কারী, নাফহুত তীব, ১/৩৩২, ৩/৩৬।

[২৬০] দেখুন : লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমূআ'*, পৃ : ৯৩ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫২।

[২৬১] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫২ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৩৬।

Scanned with CamScanner

মূলত এ সময় থেকেই আবু জাফর আন্দালুস-ভূমি জয়ের পরিকল্পনা পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেন। শুধু তা-ই নয়; আব্বাসী খলীফা আবু জাফর আলমানসুরই সর্বপ্রথম আবদুর রহমান আদদাখিলকে 'কুরাইশী ঈগল' নামে অভিহিত করেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এ সম্পর্কিত ঘটনা এই যে, একদিন আবু জাফর আলমানসুর তার সভাসদদের বললেন, তোমরা আমাকে বলতে পারবে যে, সমকালীন বাদশাহদের মধ্যে কুরাইশী ঈগল কে? উত্তরে তারা বলল, এ উপাধি তো কেবল আমীরুল মুমিনীনকেই মানায়; যিনি সকল শাসক-প্রশাসককে বশীভূত করেছেন, সব ধরনের অস্থিরতা-বিশৃঙ্খলা প্রশমিত করেছেন এবং সকল শত্রুকে নির্মূল করেছেন।

আবু জাফর বললেন, তোমরা কিছুই বলতে পারনি!

-তাহলে কি হযরত মুয়াবিয়া রাযি.?

-না।

-তাহলে আবদুল মালিক বিন মারওয়ান? সভাসদগণ সভয়ে জিজ্ঞেস করল।

-না, তোমাদের উত্তর হয়নি। খলীফা বললেন।

সভাসদগণ এবার একযোগে জিজ্ঞেস করল, আমীরুল মুমিনীন! তাহলে কে তিনি?

-কুরাইশী ঈগল হলেন আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া। বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন খলীফা আবু জাফর। যিনি একাকী পাড়ি দিয়েছেন উত্তাল সমুদ্র, অতিক্রম করেছেন বিজন মরুভূমি, একাকী প্রবেশ করেছেন এক অনারব ভূমিতে, এরপর আবাদ করেছেন শহর-নগর, প্রস্তুত করেছেন সুদক্ষ সেনাবাহিনী, প্রণয়ন করেছেন বিভিন্ন দফতর-বিভাগ এবং কেন্দ্রবিচ্ছিন্ন হয়েও আপন সহজাত নেতৃত্বগুণ, সুদক্ষ পরিকল্পনা ও অবিচল সংকল্পগুণে গড়ে তুলেছেন এক সুবিশাল রাষ্ট্র।

(তোমরা হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর কথা বলেছ,) মুয়াবিয়াকে তো হযরত ওমর রাযি. ও হযরত ওসমান রাযি. একটি বাহনে আরোহণ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং বাহনকে বশীভূত করার কাজও তারা করে দিয়েছিলেন; মুয়াবিয়া রাযি. কেবল বাহন দিয়ে সামনে এগিয়ে গেছেন। আর আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের পক্ষে ছিল তার সুদৃঢ় বাইআত। আর তোমাদের আমীরুল মুমিনীন তো তার পরিজন ও অনুসারীদের আনুকূল্য লাভ করেছেন। বিপরীতে আবদুর রহমান (এর কথা চিন্তা কর)! একাকী সঙ্গীহীন

Scanned with CamScanner

এগিয়ে চলা; তার সঙ্গী কেবল আপন চিন্তা-চেতনা, সংকল্প ও দৃঢ়তা। এর মাধ্যমেই তিনি আন্দালুসে আপন শাসন-ক্ষমতা সুদৃঢ় করেছেন, সীমান্ত জয় করেছেন, বিপথগামীদের দমন করেছেন এবং প্রবল বিদ্রোহীদেরও বশীভূত করেছেন।

উপস্থিত সবাই এবার সমস্বরে বলে উঠল, আল্লাহর শপথ! আমীরুল মুমিনীন সত্য বলেছেন।[২৬২]

আব্বাসী খলীফা আবু জাফর আলমানসুর তার সমকালীন আন্দালুস-প্রশাসক আবদুর রহমান আদদাখিলের এমনই গুণমুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু এ মুগ্ধতাকে আমরা কী বলে আখ্যায়িত করতে পারি? বাধ্যগত মুগ্ধতা, নাকি ফাঁদে পড়ে বিমুগ্ধতা?!

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া ও আব্বাসী খেলাফত

আন্দালুস ও আব্বাসী খেলাফতের মাঝে দীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছিন্নতার এ বিষয়টি প্রতিটি মুসলিম-অন্তরেই নানা প্রশ্ন জাগ্রত করে। প্রশ্ন জাগে, আবদুর রহমান আদদাখিলের মতো একজন মুত্তাকী-আল্লাহওয়ালা প্রশাসক, যিনি আন্দালুসে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি কী করে তৎকালীন মূল ইসলামী শক্তি আব্বাসী সালতানাত থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থাকলেন?

এ বিষয়টির বিশ্লেষণ ও রহস্য উদ্‌ঘাটনে নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান অবলম্বনপূর্বক আমরা এ কথাই বলতে পারি যে, আব্বাসী খেলাফত সূচনাতেই 'বনু উমাইয়া' বিষয়ে এক মারাত্মক ভুল করেছে। আর তা হল, উমাইয়াদের খুঁজে খুঁজে বের করে হিংস্র ও অমানবিক পন্থায় নির্বিচারে হত্যা করা। যদিও উমাইয়া শাসনামলের শেষদিকে শাসনব্যবস্থায় অনেক খুঁত তৈরি হয়েছিল এবং পরিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু উচিত ছিল মানহাজে নববী ও সুন্নাহসম্মত নীতিতে পরিবর্তনের চেষ্টার করা, রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড যথাসম্ভব পরিহার করা।

উমাইয়া শাসনব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে ওঠা আব্বাসী খেলাফতের কর্তাব্যক্তিদের কর্তব্য ছিল উমাইয়া জনশক্তিকে কাছে টেনে নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নয়নে কাজে লাগানো। তাদেরকে এমন কোণঠাসা করা

---

[২৬২] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুল মাজমুআ*, পৃ : ১০৭ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫৯।

Scanned with CamScanner

মোটেই উচিত হয়নি যে, তারা মূল ইসলামী ভূখণ্ড হতে বহু দূরে ছোট্ট একটি ছিটমহলের মতো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সেখানে আশ্রয় নেবে; সেটা আন্দালুস-ভূমিই হোক, হোক অন্য কোথাও।

যে আবদুর রহমান আদদাখিলের কথা আমরা বলছি, এ জাতীয় পরিস্থিতিতে তার আদর্শ কী ছিল, লক্ষ করুন। মাসারা প্রাঙ্গণের যুদ্ধের পর ইয়ামেনী সৈন্যরা যখন ইউসুফ আলফিহরীর পলায়নরত সৈন্যদের পিছু নিতে চেয়েছিল, তখন তিনি তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন, এমন শত্রুর শিকড় উপড়ে ফেলো না, ভবিষ্যতে যাদের হৃদ্যতা প্রত্যাশা কর।[২৬৩] তিনি চেয়েছিলেন আজকের এই শত্রুপক্ষকেই ভবিষ্যতে নিজের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করতে। আব্বাসীদেরও কর্তব্য ছিল এ ধরনের আচরণ করা এবং বনু উমাইয়াকে আপন করে নেওয়া, যেন ভবিষ্যতে তারা সহায়ক শক্তি ও জান-কোরবান বাহিনীতে পরিণত হয়; বিরোধী ও প্রতিপক্ষ নয়। উভয়ের কর্মপন্থার যে পার্থক্য, তার ফলাফল তো ইতিহাস আমাদের সামনে সুস্পষ্টই তুলে ধরেছে।

সর্বোত্তম আদর্শ ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ-নীতি দেখুন। যে মক্কাবাসী তাকে ও তার সাহাবীদেরকে সীমাহীন কষ্ট দিয়েছিল, মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিল, মক্কা বিজয়ের দিন নবীজী তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছিলেন? আবু সুফিয়ান সম্পর্কে তিনি কী বলেছিলেন? আর কে এই আবু সুফিয়ান? ইতঃপূর্বে ইসলাম ও ইসলামের নবীর সঙ্গে কেমন ছিল তার আচরণ?

নবীজী মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন বিনয়ে অবনত মস্তকে; তিনি ঘোষণা করেছিলেন, আবু সুফিয়ানের ঘরে যে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপত্তা পাবে। এই আবু সুফিয়ানই কি ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে কাফির-মুশরিক শক্তির প্রধান ছিলেন না? তার সম্পর্কে নবীজী এমন উদার উচ্চারণ কীভাবে করলেন? প্রকৃতপক্ষে নবীজী চেয়েছিলেন তার হৃদ্যতা অর্জন করতে, তাকে ইসলামের ছায়াতলে টেনে আনতে।

আরও উদাহরণ নিন। মক্কা বিজয়ের পর নবীজী যখন মক্কার কাফির সর্দারদের বললেন, আমি তোমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করব বলে তোমরা মনে কর? উত্তরে তারা বলল, আমরা আপনার কাছে উত্তম আচরণ প্রত্যাশা

---

[২৬৩] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৪২।

Scanned with CamScanner

করি। কেননা, আপনি স্নেহশীল ভাই, স্নেহশীল ভাইয়ের সন্তান। নবীজী প্রত্যুত্তরে যা বলেছিলেন, ইতিহাসের সোনালি পাতায় আজও তা সংরক্ষিত আছে, 'যাও, তোমরা তো মুক্ত'।

এ শুধু সদাচরণ বা সমুন্নত আচরণই নয়; বরং এটি শত্রুর সঙ্গে আচরণ-নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, রাজনীতি ও কুটনীতির যথার্থ ব্যবহার। আমরা একটু কল্পনা করি, যারা আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর লড়াই করেছে, নবীজী যদি তাদের ওপর হদ আরোপ করতেন এবং তাদের হত্যা করতেন, তাহলে পরিস্থিতি কী হত? নিঃসন্দেহে কিছুদিনের মধ্যেই মক্কার অভ্যন্তরে তৈরি হত ক্ষুদ্র একটি ছিটমহল, আর মক্কাবাসী একের পর এক সুযোগ খুঁজত নবীজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইসলামী রাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার।

নবীজীর এ আচরণকে আপনি যদি বিস্ময়কর ভেবে থাকেন, তাহলে নবীজীর ইন্তেকালের পর তার এই আচরণের যে ফলাফল প্রকাশ পেয়েছিল, তা তো আরও বিস্ময়কর! নবীজীর ওয়াফাতের পর পুরো আরব উপদ্বীপে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। মক্কা, মদীনা, তায়েফ ও 'হাজার' নামের ক্ষুদ্র একটি গ্রাম ছাড়া আর কোথাও ইসলামের অস্তিত্ব বাকি ছিল না। মাত্র তিনটি শহর আর একটি গ্রাম! আশ্চর্যের বিষয় হল, যে মক্কা এই ক'দিন পূর্বেও ছিল ইসলামের নেয়ামত হতে বঞ্চিত, নবীজীর ইন্তেকালের মাত্র তিন বছর পূর্বে যে মক্কা নগরী ইসলামী ভূমির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সেই মক্কাই সীমিত সেসব ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা ইসলামের ওপর অটল ছিল এবং ইরতেদাদ ও ধর্মত্যাগের ফিতনামুক্ত ছিল। নিঃসন্দেহে এটি ছিল নবীজীর সেই অনুপম আচরণের ফল, যা তারা ভুলে যায়নি; বরং বলা ভালো, ভুলতে পারেনি। আর তাই তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে থাকাকেই পছন্দ করেছে এবং বিচ্যুতির মহা প্লাবনের সময়ও স্রোতে ভেসে না গিয়ে অটল-অবিচল থেকেছে।

আব্বাসীরাও যদি এ ধরনের আচরণ করত এবং উমাইয়াদেরকে আব্বাসী সালতানাতের অভ্যন্তরে স্থান দিত, তাহলে পূর্ব-ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটত। কিন্তু তারা যখন এ ধরনের আচরণ উপহার দিতে ব্যর্থ হল, তখন বেঁচে যাওয়া উমাইয়া বংশধরগণ বাধ্য হল আন্দালুসে আশ্রয় নিতে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের খেলাফতে ইসলামিয়া হতে বিচ্ছিন্ন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে।

Scanned with CamScanner

বাস্তবতা তো এ কথাই বলে, আবদুর রহমান আদদাখিল যদি এ নিশ্চয়তা লাভ করতেন যে, তিনি যদি আলা বিন মুগীস আলহাযরামীর কাছে আন্দালুসের শাসনভার সোপর্দ করেন, আলা তার সঙ্গে মার্জনাসুলভ আচরণ করবেন এবং তাকে আন্দালুস বা আব্বাসী সালতানাতের অন্য কোন অংশের প্রশাসন-ক্ষমতা প্রদান করবেন, তাহলে সম্ভবত তিনি তা-ই করতেন। কিন্তু তিনি জানতেন, আলা বিন মুগীস যদি তার নাগাল পান, তাহলে কালবিলম্ব না করে নির্দ্বিধায় তাকে ও তার সেসব উমাইয়া সঙ্গীদেরকে হত্যা করবেন, যারা খেলাফত-দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত।

স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়টি আবদুর রহমান আদদাখিলকে তার শাসনামলে আব্বাসী খেলাফতের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখতে বাধ্য করেছিল। ইসলামী ইতিহাসের এটি একটি জটিল চক্র ও মর্মন্তুদ অধ্যায়; আব্বাসী খেলাফতের সূচনাকালে প্রচণ্ড হিংস্র আচরণের পরিণতিতে মুসলিম জাতি যাতে আটকে গিয়েছিল। অবশ্য এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, আব্বাসী শাসকগণ পরবর্তী সময়ে তাদের এই প্রাথমিক নীতি থেকে অনেকটা সরে এসেছিলেন। পরবর্তী কালে এমন অনেক আব্বাসী খলীফা ইতিহাসে গত হয়েছেন, যারা ইসলামী রাষ্ট্রনীতির প্রতি যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। এমনকি দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা স্বয়ং আবু জাফর আলমানসুরও তার শাসনামলের শেষদিকে নিজের প্রথম সময়ের ভুল নীতি হতে পুরোপুরি সরে এসেছিলেন। কিন্তু নিজেদের ক্ষমতাকে সুসংহত ও নিরাপদ করার অভিপ্রায়ে ভুল বা করার, তা তো তারা শুরুতেই করে ফেলেছিলেন। এখান থেকে আমরা এ শিক্ষা নিতে পারি যে, যারা-ই নববী নীতি-আদর্শ বহির্ভূত পথ অবলম্বনে সচেষ্ট হবে, সর্বদাই তাদের পরিণতি হবে ক্ষতি ও বিনাশ।

এ কারণেই কেন্দ্রীয় মুসলিম ভূখণ্ড বঞ্চিত হয়েছিল পবিত্র অনেক আত্মা, মূল্যবান অনেক প্রাণ এবং প্রভূত শক্তি হতে; বরং হারিয়েছিল আন্দালুসের মতো সম্ভাবনাময় একটি অঞ্চল, পরবর্তী দীর্ঘ ইতিহাসে কখনোই যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম শক্তির সহায়তায় আসেনি। সুতরাং, মনে রাখতে হবে,

> অপ্রয়োজনে অপাত্রে সহিংসতা কেবল নতুন সহিংসতার পথই উন্মোচন করে, রক্তের পথ নতুন রক্তের পথই সৃষ্টি করে। পথ তো অনেক; কিন্তু অনুসরণ ও অবলম্বনের পথ একটিই; সীরাতে মুসতাকীম বা আল্লাহর পথ।

Scanned with CamScanner

﴿وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

(হে নবী! তাদেরকে আরও বল,) এটা আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং এর অনুসরণ কর, অন্য কোন পথের অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে গুরুত্বের সঙ্গে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। [সূরা আনআ'ম : ১৫৩]

বিদ্রোহ দমনে আবদুর রহমান আদদাখিলের নীতি পর্যালোচনা

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আবদুর রহমান আদদাখিলের চৌত্রিশ বছরের শাসনামলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আন্দালুসের প্রতিটি প্রান্তে পঁচিশটিরও অধিক বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা সংঘটিত হয়েছে। তিনি যে আশ্চর্য দক্ষতায় একের পর এক এসব বিদ্রোহকে দমন করেছেন কিংবা বিদ্রোহীদের বশীভূত করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা পূর্বে দিয়েছি। এ কথাও উল্লেখ করেছি যে, এসব বিদ্রোহের মধ্যে সবচে' উল্লেখযোগ্য ছিল আলা বিন মুগীস আলহাযরামীর নেতৃত্বে পরিচালিত আব্বাসীদের বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা; এ বিদ্রোহ চেষ্টা তিনি কীভাবে প্রতিহত করেছেন, তার বিবরণও ইতঃপূর্বে গত হয়েছে। এসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে এ প্রশ্ন জাগতেই পারে যে, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এসব মুসলিম বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি আবদুর রহমান আদদাখিলের জন্য বৈধ ছিল?

বাস্তবতা হল, আন্দালুস-ভূমির অভ্যন্তরে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তার এই যুদ্ধনীতি অবলম্বনের বিষয়টি নিয়ে আপত্তি-অভিযোগের কোন অবকাশই নেই। কেননা, আন্দালুসের আপামর জনসাধারণ তাকে নিজেদের প্রশাসক হিসেবে মেনে নিয়েছিল। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষণা হল,

«مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ»

Scanned with CamScanner

> যখন তোমরা কোন এক ব্যক্তির (নেতৃত্বে) একমত হও, (এরপর) তোমাদের কেউ যদি তোমাদের ঐক্যে ভাঙন ধরাতে চায় এবং তোমাদের 'জামাআহ'তে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়; তাহলে তাকে হত্যা করো।[২৬৪]

সুতরাং বিদ্রোহ দমনে আবদুর রহমান আদদাখিলের নীতি ছিল পুরোপুরি যথার্থ। এর মাধ্যমে একদিকে ধারাবাহিক বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা দমিত হয়েছে; অপরদিকে রাষ্ট্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ইনসাফের দাবি হিসেবে এ কথাও বলতে হবে যে, আবদুর রহমান আদদাখিল রহ. সর্বদাই প্রথমে বিদ্রোহীদেরকে কাছে টানার এবং শান্তি ও সন্ধি-প্রস্তাবের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন; একান্ত বাধ্য না হলে সংঘাত ও যুদ্ধের পথে যাওয়াকে পছন্দ করতেন না।

নিঃসন্দেহে এসব বিদ্রোহের দমনে তাকে অনেক মূল্যও চুকাতে হয়েছে। আবদুর রহমান আদদাখিলের আন্দালুসে প্রবেশের চার বছরের মধ্যে (১৩৮-১৪২ হি./৭৫৫-৭৫৯ খৃ.) ফ্রান্সে মুসলমানদের জয় করা সকল অঞ্চলের পতন ঘটে। অথচ এসব অঞ্চল সেই মুসা বিন নুসাইরের যুগ থেকে একটানা দীর্ঘ ৪৭ বছর ইসলামী শাসনব্যবস্থার অধীনে ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শাশ্বত সুন্নাত তো এভাবেই কার্যকর হয়। যখনই মুসলিম জাতি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, শক্তিক্ষয় ও পরাজয়ই হয় তাদের নিয়তি।

আবদুর রহমান আদদাখিলের নতুন এক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিনির্মাণ

আন্দালুসে যখন আবদুর রহমান আদদাখিলের অবস্থান সুসংহত হল এবং বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা তুলনামূলক হ্রাস পেল, তখন তিনি রাষ্ট্রের পুনঃগঠন পরিকল্পনায় মনোযোগী হলেন। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোর প্রতি তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন এবং নিম্নোক্ত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়ন করলেন।

এক. সুদৃঢ় সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠা

দক্ষ ও শক্তিশালী সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে তিনি যে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলেন, তা হল,

---

[২৬৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৫২।

Scanned with CamScanner

১. সেনাবাহিনীর সদস্য নির্বাচনে তিনি নিম্নবর্ণিত বংশগুলোর ওপর নির্ভর করলেন,

ক. মৌলিকভাবে তিনি নির্ভর করলেন মিশ্র প্রজন্মের উপর। আন্দালুসের মূল অধিবাসীদের সঙ্গে মুসলিম অভিযাত্রীদের সহাবস্থান ও সংমিশ্রণ এবং দ্রুত গতিতে ইসলামের বিস্তারের কারণে নতুন এক প্রজন্ম গড়ে ওঠেছিল, যাদের পিতা ছিল আরবী বা আমাজিগ (বার্বার), আর মা ছিল আন্দালুসী। এদেরকেই 'মিশ্র প্রজন্ম' বলা হত।

খ. তদ্রূপ আন্দালুসে বসবাসরত প্রতিটি গোত্র ও উপগোত্র থেকে তিনি সেনাসদস্য বাছাই ও নির্বাচন করলেন। যেমন মুযার গোত্রের প্রতিটি শাখা থেকে, চাই তা বনু উমাইয়ার হোক বা অন্য কোন উপগোত্রের, সেনাবাহিনীতে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হল। তবে আবুস সবাহ আলইয়াহসবীকে হত্যা করার কারণে ইয়ামেনীদের কৃত বিদ্রোহের পর তিনি আরবদের প্রতি আস্থা রাখতে পারেননি।[২৬৫] এ কারণে এরপর থেকে সেনাবাহিনীতে তিনি বিশেষত আমাজিগদেরসহ মামলুকদের বেশি করে অন্তর্ভুক্ত করতে লাগলেন। ফলে সেনাবাহিনীতে আমাজিগদের সংখ্যাই দাঁড়াল চল্লিশ হাজারে। এদের মাধ্যমে দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হল।[২৬৬]

গ. তদ্রূপ সেনাবাহিনী গঠনে তিনি সাকলাবী সম্প্রদায়ের উপরও নির্ভর করেছিলেন।[২৬৭] সাকলাবী হল সেসব খৃস্টান সন্তান, যাদেরকে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন ক্রীতদাস-বাজার থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং সুদক্ষ প্রশিক্ষণ ও সুনিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বিশুদ্ধ ইসলামী সামরিক চিন্তাধারায় গড়ে তুলেছিলেন।

আবদুর রহমান আদদাখিল যদিও একাকী আন্দালুসে পা রেখেছিলেন; কিন্তু সুদক্ষ পরিকল্পনা ও নেতৃত্বগুণের কারণে তার শাসনামলে আন্দালুসে ইসলামী সেনাবাহিনীর সদস্য-সংখ্যা এক লক্ষে পৌঁছেছিল।[২৬৮] এই সংখ্যা কেবল অশ্বারোহী সৈনিকদের; পদাতিক সৈন্যদের সংখ্যা হিসেবের বাইরে।

---

[২৬৫] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫৩।

[২৬৬] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৩৬।

[২৬৭] প্রাগুক্ত, ৩/৩৬।

[২৬৮] প্রাগুক্ত, ৩/৪৯।

Scanned with CamScanner

আর এ বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিল পূর্বোল্লিখিত পন্থায় সকল জাতি-গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীর সমন্বয়ে। পরবর্তী সময়ে আন্দালুসে যেসব বনু উমাইয়া প্রশাসক ও খলীফা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাদের ইসলামী বাহিনীর মূল ভিত্তিই ছিল আবদুর রহমান আদদাখিলের প্রস্তুত করা এই সেনাবাহিনী।

২. তিনি বিভিন্ন অস্ত্র কারখানা গড়ে তুললেন; তরবারি প্রস্তুতের জন্য কয়েকটি কারখানা, মিনজানিক[২৬৯] তৈরি করার জন্য কয়েকটি কারখানা। টলেডো ও বারডিলের[২৭০] সমরাস্ত্র-কারখানাগুলো এক্ষেত্রে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

৩. তিনি বেশ কয়েকটি নৌবন্দর প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি শক্তিশালী নৌবহরও গড়ে তুললেন। উল্লেখযোগ্য নৌবন্দরগুলোর মধ্যে ছিল তুরতুশা (Tortosa), আলমারিয়া (Almeria), সেভিল (Seville), বার্সেলোনা (Barcelona) ও অন্যান্য নৌবন্দর।

৪. দেশের বার্ষিক বাজেটের ক্ষেত্রে তিনি ত্রি-বণ্টন নীতি গ্রহণ করলেন। পূর্ণ এক ভাগ সেনাবাহিনীর জন্য; দ্বিতীয় ভাগ দেশের জনসেবামূলক বিভিন্ন কাজ যেমন রসদসামগ্রী, নির্মাণ, বেতন-ভাতা, সেবামূলক প্রকল্প ইত্যাদির পেছনে ব্যয় করার জন্য; আর তৃতীয় ভাগ অনাকাঙ্ক্ষিত আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সংরক্ষণ।

দুই. জ্ঞানচর্চা ও ধর্মীয় বিষয়াদিতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান

আবদুর রহমান আদদাখিল জ্ঞানচর্চা ও ধর্মীয় বিষয়াদিকেও যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করলেন। এক্ষেত্রে তিনি যেসব পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করলেন, তা হল:

১. ইলমচর্চার প্রসার ও আলিমগণের অত্যুচ্চ মর্যাদা-সম্মান নিশ্চিতকরণ।

---

[২৬৯] প্রাচীনকালে যুদ্ধে ব্যবহৃত এক ধরনের যন্ত্র। এর মাধ্যমে পাথর, তীর বা নিক্ষেপযোগ্য বিভিন্ন বস্তুকে বহু দূরে নিক্ষেপ করা হত। প্রাচীনকালে দুর্গ অবরোধ করা ও অবরুদ্ধ দুর্গের প্রাচীরের ওপর আঘাত হেনে দুর্বল করার ক্ষেত্রে মিনজানিকের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বারুদের তৈরি গোলা আবিষ্কারের পর মিনজানিকের মাধ্যমে গোলা নিক্ষেপ করে প্রাচীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত। মিনজানিককে প্রাচীন যুগের ক্ষেপণাস্ত্র বলা যেতে পারে। (অনুবাদক)

[২৭০] বর্তমান ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে Garonne নদীর তীরে অবস্থিত একটি নগরী; যার ইংরেজি নাম Bordeaux। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

২. বিচার-ব্যবস্থা ও হিসাব-ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ গুরুত্বদান।

৩. আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার (সরকারীভাবে সৎ কর্মের নির্দেশনা ও অসৎ কর্মের নিষেধাজ্ঞা)-এর প্রতি মনোযোগ প্রদান।

৪. ধর্মীয় বিষয়ে তার সুমহান একটি খেদমত হল কর্ডোভার সুবিশাল মসজিদ নির্মাণ। এ মসজিদ নির্মাণে তিনি আশি হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেন। তার পরবর্তী প্রশাসকগণ মসজিদটির আয়তন বৃদ্ধিতে প্রতিযোগিতামূলক অবদান রেখেছেন এবং এর সর্বশেষ অবয়বে পৌঁছাতে ধারাবাহিকভাবে আটজন উমাইয়া প্রশাসক কাজ করেছেন।[২৭১]

আবদুর রহমান আদদাখিলের আমলের সুবিখ্যাত একজন আন্দালুসী আলিম হলেন মুয়াবিয়া বিন সালেহ বিন হুদাইর বিন সাঈদ আলহাযরামী। তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম ও বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনে উ'য়াইনা ও লাইস বিন সা'দ-এর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত অনেক ইমাম ও মুহাদ্দিস তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। বর্ণিত আছে, ইমাম মালিক বিন আনাস রহ.-ও তার সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান আদদাখিল এই মহান আলিমকে আন্দালুসের সম্মানিত বিচারকের পদ প্রদান করেছিলেন।[২৭২]

তার শাসনামলে আন্দালুসের আরেকজন বিখ্যাত আলিম হলেন সাঈদ বিন আবু হিন্দ; বিরল মেধা ও বিস্ময়কর প্রতিভার কারণে ইমাম মালিক রহ. যাকে 'হাকীম' উপাধি প্রদান করেছেন। তিনি আবদুর রহমান আদদাখিলের শাসনামলেই ইন্তেকাল করেন।[২৭৩]

তিন. নাগরিক সুবিধাদির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ

এক্ষেত্রে তার বিশেষ মনোযোগের বিষয়টি নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে প্রতিভাত হয়।

১. নির্মাণ ও স্থাপনা-শিল্পে বিশেষ গুরুত্বপ্রদান; বিভিন্ন দুর্গ, নগরপ্রাচীর ও সেতু নির্মাণ এবং পুরো আন্দালুসের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

---

[২৭১] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৮ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/২৫৪।

[২৭২] আবুল হাসান নুবাহী, *তারীখু কুযাতিল আন্দালুস*, ১/৪৩।

[২৭৩] আবুল ওয়ালিদ আযদী, *তারীখুল উলামা বিল আন্দালুস*, ১/১৯১।

Scanned with CamScanner

২. রুসাফা (অবকাশযাপন কেন্দ্র/উদ্ভিদ-উদ্যান) প্রতিষ্ঠা। তার প্রতিষ্ঠিত উদ্ভিদ-উদ্যানটি ছিল ইসলামী বিশ্বের বৃহত্তম উদ্যানগুলোর একটি। তিনি এ উদ্যানটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার পিতামহ খলীফা হিশাম বিন আবদুল মালিক কর্তৃক শামে প্রতিষ্ঠিত রুসাফাতুল হিশাম-এর আদলে। আবদুর রহমান আদদাখিল এ উদ্যানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দুষ্প্রাপ্য ও বিরল গাছের চারা সংগ্রহ করতেন। উদ্যানে চারাগাছটির উৎপাদন-চেষ্টা সফল হলে পুরো আন্দালুসে তার চাষ শুরু হত।[২৭৪]

চার. শত্রুদের শ্যেন দৃষ্টি ও লালসা থেকে (নিরাপত্তার জন্য) সীমান্ত-অঞ্চলের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ

একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার পাশাপাশি নবগঠিত এই স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আবদুর রহমান আদদাখিল দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

১. আবদুর রহমান আদদাখিল জানতেন যে, তার দেশের জন্য মূল হুমকি ও দুশ্চিন্তার বিষয় হল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের লিওন রাষ্ট্র ও আন্দালুসের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ফ্রান্স রাষ্ট্র। এ কারণে তিনি দেশের উত্তর সীমান্তে বিভিন্ন সীমান্তশহর প্রতিষ্ঠা করলেন এবং খৃস্টান রাষ্ট্রদু'টির মুখোমুখি এসব সীমান্তশহরগুলোর নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিয়োগ করলেন। তৎকালীন মুসলিম আন্দালুসের সীমান্ত অঞ্চল তিন ভাগে বিভক্ত ছিল।

ক. উচ্চ সীমান্ত অঞ্চল অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ফ্রান্স সীমান্তের সংলগ্ন এলাকায় জারাগোযা সীমান্ত অঞ্চল।

খ. মধ্য সীমান্ত অঞ্চল। এটি সালিম নগরী থেকে টলেডো নগরী পর্যন্ত বিস্তৃত।

গ. নিম্ন সীমান্ত অঞ্চল। এটি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খৃস্টরাষ্ট্র লিওনের নিকটবর্তী।

২. আবদুর রহমান আদদাখিল রহ. তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বংশানুক্রমে একটি মহান রীতি লাভ করেছিলেন; আর তা হল, সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে প্রতিবছর অব্যাহত সামরিক অভিযান পরিচালনার রীতি। তার শাসনামলেই 'গ্রীষ্মকালীন অভিযান' সামরিক পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করে। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে যখন শীতের জমাট বাঁধা তুষার গলে যেত, মুসলিম

---

[২৭৪] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৫/২৮০ ও মাকারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪৬৭।

Scanned with CamScanner

বাহিনী শত্রুদেরকে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত রাখতে সুশৃঙ্খলভাবে অভিযানে বের হত। সেনাবাহিনীর বড় বড় সেনাপতিগণ পালাক্রমে এসব অভিযানে নেতৃত্ব দিতেন। বর্তমান সামরিক পরিভাষায় একে 'প্রাক অগ্রবর্তী অভিযান' (Pre-emptive attac) বলা হয়।

আবদুর রহমান আদদাখিল ... একজন সুদক্ষ প্রশাসক

> 'আবদুর রহমান আদদাখিলের আবির্ভাব না হলে আন্দালুস থেকে ইসলামের নাম-নিশানই সম্পূর্ণ মুছে যেত।'

ঐতিহাসিকগণ আবদুর রহমান আদদাখিল সম্পর্কে এমন মন্তব্যই করেছেন। উল্লেখ্য, আবদুর রহমান আদদাখিল যখন শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তার বয়স পঁচিশও পেরোয়নি। অর্থাৎ আমাদের বর্তমান সময়ের সদ্য স্নাতক পাশ করা একজন যুবকের বয়সেই তিনি এ কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়ার মতো তথ্য! তিনি কি আসমান থেকে নেমে আসা ফিরেশতা ছিলেন, নাকি ...!

ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়ান আন্দালুসী আবদুর রহমান আদদাখিলের গুণ-বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

> আবদুর রহমান ছিলেন পরমতসহিষ্ণু, সুপণ্ডিত, প্রদীপ্ত চিন্তাশক্তির অধিকারী, স্থির সংকল্পবিশিষ্ট, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ত্বরিত উদ্যোগী, অবিরাম কর্মতৎপরতার অধিকারী। তিনি আরাম-আয়েশ বা ভোগ-বিলাসে মত্ত হতেন না, বিলাসিতায় প্রশান্তি খুঁজে পেতেন না, দায়-দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন না। তিনি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজ মতের ওপর নির্ভর করতেন না। তিনি ছিলেন একাধারে রণাঙ্গনের দুঃসাহসী রণসেনানী, তেজোদীপ্ত, সদা চিন্তানিমগ্ন; বাগ্মী, কবি, উদার-মহানুভব, সুভাষী, সাবলীল বক্তা। তিনি শুভ্র পোশাক পরিধান করতেন, মাথায় সাদা পাগড়ী বাঁধতেন এবং সাদা পরিচ্ছদ পছন্দ করতেন। বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে সবার অন্তরে বিরাজমান ছিল তার প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রভাব-ভীতি। প্রজাদের কারও অসুস্থতার সংবাদ পেলে তাকে দেখতে যেতেন, কেউ ইন্তেকাল করলে তার জানাযায় শরীক হতেন; রাজধানীতে উপস্থিত

Scanned with CamScanner

থাকলে নিজে জুমা ও ঈদের নামায পড়াতেন, মিম্বরে খোতবা দিতেন।[২৭৫]

আবদুর রহমান আদদাখিল এমন সমুন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে, তার ব্যক্তিত্বের বিশালতার সামনে দৃষ্টি অবনত হয়ে যায়, ব্যক্তিত্বের বিশালতা নির্ণয়ে বোধশক্তি হার মানে। মেধার পরিপক্কতা ও জ্ঞানের প্রসারতা সত্ত্বেও তিনি কোন বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত নিতেন না; বরং পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করতেন। যখন পরামর্শসভায় সবাই কোন বিষয়ে একমত হত, তিনি তখন তা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতেন। তেজোদীপ্ত মেজাজ, অটলতা-অবিচলতা, সার্বক্ষণিক সামরিক ব্যস্ততা এবং প্রবল শক্তি ও প্রতাপের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন কোমল হৃদয় ও সংবেদনশীল অনুভূতিসম্পন্ন একজন ভাবুক কবি।

কাছের-দূরের সবার অন্তরে তার ভয় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রজাবর্গের সঙ্গে সহজ-সরল আচরণ করতেন, আন্তরিকভাবে মিশতেন। অসুস্থদের খোঁজ-খবর নিতেন, দেখতে যেতেন, জানাযায় উপস্থিত হতেন, প্রজাদের কাতারে নামায পড়তেন, কখনও ইমামত করতেন। স্বভাব-সতর্কতা ও আহার স্বল্পতা সত্ত্বেও নিরাপত্তারক্ষী ছাড়া জনগণের সঙ্গে ওঠাবসা ও মেলামেশা করতেন। জনগণের সঙ্গে তার এই অতিস্বাভাবিক মেলামেশায় তার নিকটজনেরা আপত্তি করত এবং তাকে এভাবে নিরাপত্তাপ্রহরী ছাড়া জনসমাগমের মাঝে উপস্থিত না হতে পরামর্শ দিত, যেন মানুষ তার সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ না পায়।[২৭৬]

আমরা তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারব, যখন জনগণের সঙ্গে তার আচরণ সম্পর্কে জানতে পারব। একবার জনৈক ব্যক্তি সবার উপস্থিতিতে তার কাছে নিজের কোন অভাবের কথা বলল। তিনি প্রথমে লোকটির প্রয়োজন পূরণ করলেন; এরপর তাকে বললেন, কোন বিপদে পড়লে বা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে প্রথমে তোমার-আমার সকলের মালিক আল্লাহ তাআ'লার কাছে ইখলাস ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে নিজের হাজত উল্লেখ করে দোয়া করবে। এরপর একটি চিরকুটে লিখে

---

[২৭৫] আল মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৩৭।

[২৭৬] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৩৭।

Scanned with CamScanner

আমাদেরকে (একান্ত গোপনে) জানাবে, যেন আমরা গোপনে তোমার প্রয়োজন পূরণ করতে পারি।[২৭৭]

আল্লাহু আকবার! আপন প্রজাদেরকে রাব্বানী তারবিয়াত ও খোদায়ী দীক্ষা প্রদানের এক প্রোজ্জ্বল নমুনা! তিনি চাইতেন, জনগণ যেন তাদের স্রষ্টা ও মালিকের সঙ্গে সম্পর্ক জোড়ে, নিজেদের প্রয়োজনের কথা প্রথমে রাতের নির্জনে রাব্বে কারীমের দরবারে উচ্চারণ করার গুণ অর্জন করে। তিনি তাদের হাতে-কলমে শেখাতে চাচ্ছিলেন, রাজা ও প্রজা সকলের মালিক একমাত্র আল্লাহ, তিনিই সকলের দাতা। এরপর তিনি জনগণের আত্মিক আবেগ-অনুভূতি ও কিছু প্রার্থনার সময় তাদের মনোতুষ্টির দিক বিবেচনা করে উক্ত ব্যক্তিকে বলেছেন, তোমার প্রয়োজনের কথা আমাকে গোপনে চিরকুটে লিখে জানিও, যেন আমি গোপনে তোমার প্রয়োজন পূরণ করতে পারি এবং তোমার বিপদে কেউ যেন আনন্দিত হতে না পারে।

আবদুর রহমান আদদাখিল যখন জারাগোযার বিদ্রোহী হুসাইন আনসারীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করলেন, বাহিনীর বিশেষ ব্যক্তিগণ তাকে অভিনন্দন জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একজন সাধারণ সৈন্য দৌড়ে এস এবং উচ্চ আওয়াজে তাকে অভিবাদন জানাল। তার এই অসংযত আচরণ ও উচ্চারণে বিরক্ত না হয়ে আবদুর রহমান আদদাখিল তাকে সংশোধনের সুরে বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আজকের এই দিনটি যদি এমন দিন না হত আর আমার সবকিছু যার ক্ষমতাধীন; সেই মহা শক্তিধর আল্লাহ আমার প্রতি বিজয়ের অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে হয়তো আমি (তোমার এই অসংযত আচরণের পর নিজেকে সংযত রাখতে পারতাম না এবং) তোমার এই অবাধ্য আচরণের কারণে তোমাকে আগুনে নিক্ষেপ করতাম। কিন্তু মহান আল্লাহর এই অনুগ্রহ-দানের দাবি তো এই যে, আজ আমি আমার অধীনস্থদের প্রতি সদয় আচরণ করব। তুমি কীভাবে আমীরের পদের প্রতি এমন নির্ভীক ও বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করলে?! কীভাবে পদ ও পদমর্যাদা ভুলে গিয়ে এভাবে উচ্চ স্বরে অভিবাদন জানাতে অগ্রসর হলে?! তোমার আচরণে মনে হচ্ছিল, তুমি যেন তোমার পিতা বা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছ! তোমার এই অজ্ঞতা ও মূর্খতা তো তোমাকে আবারও এ ধরনের আচরণে প্ররোচিত করবে; কিন্তু সেদিন হয়তো আজকের দিনের মতো অপরাধ মার্জনার কোন উপলক্ষ থাকবে না।

---

[২৭৭] প্রাগুক্ত, ৩/৩৯।

Scanned with CamScanner

সৈন্যটি উত্তরে বলল, (আশা করি, আজকের মতো ভবিষ্যতেও) আমার মূর্খতা ও অন্যায় আচরণ যেন মহামান্য আমীরের বিজয়ের হাত ধরে আগমন করে। তাহলে আমি এ ধরনের অন্যায় করলেও বিজয়ের উপলক্ষ মার্জনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ বারবার আমাদের এ ধরনের বিজয় দান করুন, বিজয়-উপলক্ষ হতে বঞ্চিত না করুন।

তার এই বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর শুনে আবদুর রহমান আদদাখিলের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তিনি বললেন, এ তো কোন নির্বোধ ও শিষ্টাচারশূন্য ব্যক্তির ত্রুটি স্বীকারের ভাষা হতে পারে না! এরপর তিনি বললেন, তোমাদের বিষয়ে যদি আমাকে অবগত করার কাউকে না পাও; তাহলে তোমরাই আমাকে অবহিত করবে। এরপর তিনি সৈন্যটির পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিলেন এবং তার প্রাপ্তি বৃদ্ধি করে দিলেন।[২৭৮]

এ ঘটনায় আমরা দেখতে পেলাম, প্রশাসক হিসেবে অসন্তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি অধীনস্থের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন, তাকে কোন শাস্তি দেননি; বরং তার প্রজ্ঞা ও বচনসৌন্দর্যের পরিচয় পেয়ে তার ভাতা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

ব্যক্তি আবদুর রহমান আদদাখিল

দীর্ঘকাল শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন, দীর্ঘকাল মানুষের সঙ্গে কাটিয়েছেন, যখন যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন; এ সবকিছু সত্ত্বেও কখনোই এমনকি উত্তেজনাবশতও তার আচরণে নিন্দিত, সমালোচিত বা নোংরা কোন কিছু প্রকাশ পায়নি। বরং ওলামায়ে কেরাম অকুণ্ঠচিত্তে তার জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও উত্তম আচরণের প্রশংসা করেছেন, যা তার উন্নত ও উৎকৃষ্ট মানবিক গুণাবলির অধিকারী হওয়ার প্রমাণ বহন করে। মানবচরিত্রের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায় বিভিন্ন কঠিন মুহূর্তে আর আবদুর রহমান আদদাখিলের পুরো জীবনই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জীবন-সংগ্রামের কঠিন ঘটনাপ্রবাহে ভরপুর। তাই ইতিহাসের যে কোন গবেষক-পাঠকের সামনেই তার চরিত্রের প্রতিটি দিক একেবারে সুস্পষ্ট এবং যাবতীয় ভালো-মন্দ বিষয় পুরোপুরি প্রকাশ্য।

আবদুর রহমান আদদাখিল একজন বাগ্মী ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি মিম্বরে

---

[২৭৮] প্রাগুক্ত, ৩/৪১-৪৩।

Scanned with CamScanner

আরোহণ করে জনসাধারণের উদ্দেশে নসীহত করতেন। কেননা, তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন উমাইয়া রাজগৃহে আর সে যুগের আমীরগণ এমনই হতেন।

তিনি সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন একজন কবিও ছিলেন। ৪০০ হিজরীতে মৃত্যুবরণকারী বিখ্যাত ভাষাবিদ সাঈদ বিন উসমান বলেন, কর্ডোভায় একটি উদ্যান ছিল, যা আবদুর রহমান আদদাখিলের হাতে গড়া। এ বাগানে আমি এমন একটি খেজুরগাছ দেখেছি, যার আঁটি থেকে আন্দালুসের সকল খেজুরগাছ উৎপন্ন হয়েছে। এ খেজুরগাছটিকে সম্বোধন করে আবদুর রহমান আদদাখিল স্বরচিত এই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন,

يَا نَخْلُ أَنْتِ غَرِيبَةٌ مِثْلِي ... فِي الْغَرْبِ نَائِيَةٌ عَنِ الْأَصْلِ
فَابْكِي وَهَلْ تَبْكِي مُكَيْسَةٌ ... عَجْمَاءُ لَمْ تُطْبَعْ عَلَى خَيْلِ

হে খেজুর-বৃক্ষ! এ দূর প্রতীচ্যে তুমিও আমার ন্যায় বহিরাগত, আমার মতো শিকড়চ্যুত!

সুতরাং কাঁদ, ক্রন্দন কর মনের দুঃখে; অবশ্য উন্মাদনা যার স্বভাবে নেই, সেই নির্বাক দলিত সত্তা কি কাঁদতে পারে?

لَوْ أَنَّهَا تَبْكِي إِذًا لَبَكَتْ ... مَاءَ الْفُرَاتِ وَمَنْبِتَ النَّخْلِ
لَكِنَّهَا ذَهَلَتْ وَأَذْهَلَنِي ... بُغْضِي بَنِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَهْلِي

সে যদি কান্না করত, কাঁদার উপলক্ষ কত কিছুই তো আছে! ফুরাত-জলের জন্য কান্না, কান্না আপন শিকড়-ভূমির জন্য!

কিন্তু খেজুর-বৃক্ষ কাঁদবে কি। সে যে আপন স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছে। আর আমি? বনু আব্বাসের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা আমায় বিস্মৃত করেছে আপনজনের স্মৃতি।[২৭৯]

তার আরেকটি কবিতা হল,

أَيُّهَا الرَّاكِبُ الْمُيَمِّمُ أَرْضِي ... أَقْرِئِ مِنْ بَعْضِي السَّلَامَ لِبَعْضِي
إِنَّ جِسْمِي كَمَا عَلِمْتَ بِأَرْضٍ ... وَفُؤَادِي وَمَالِكِيهِ بِأَرْضِ

---

[২৭৯] যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ১১/২৪১। আরও দেখুন : ইবনুল আবার, আলহুল্লাতুস সাইরাহ, ১/৬৭।

Scanned with CamScanner

قُدِّرَ الْبَيْنُ بَيْنَنَا فَاعْتَرِفْنَا فَعَسَى بِاجْتِمَاعِنَا اللهُ يَقْضِي

ওহে মুসাফির! তুমি তো পথ ধরেছো আমার মাতৃভূমির। আমার এক অংশের সালাম পৌঁছিয়ে দিও অন্য অংশের কাছে।
আমার দেহ তো দেখছ এক ভূমিতে; কিন্তু হৃদয় ও হৃদয়মালিকের নিবাস অন্য ভূমিতে।
বিচ্ছেদই যদিও আমাদের তাকদীর-ফয়সালা, তবে জেনো, শীঘ্রই মহান আল্লাহর ফয়সালা হবে আমাদের পুনর্মিলনের।[৯৮০]

আবদুর রহমান আদদাখিলের সামরিক চিন্তা-কুশলতা

আবদুর রহমান আদদাখিল ছিলেন আশ্চর্য সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর সামরিক চিন্তাশক্তির অধিকারী। বলতে গেলে উমাইয়া খেলাফতের পতনের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার প্রায় পুরো জীবনই কেটেছে যুদ্ধ ও সংঘাতের মধ্যে। এ জীবনের সূচনা পলাতক অবস্থায় অসংখ্য ভূমি, মরুভূমি, জনশূন্য প্রান্তর ও সাগর পাড়ি দিয়ে আর সমাপ্তি একের পর এক বিদ্রোহ দমনে। আন্দালুস ভূমিতে আপন শাসনক্ষমতা সুদৃঢ় ও প্রতিবন্ধকতামুক্ত করতে প্রতিটি বিদ্রোহ তিনি সফলভাবে দমন করেছেন।
তিনি যদি অসামান্য সামরিক মেধা ও প্রতিভার অধিকারী না হতেন, তাহলে এভাবে ব্যতিক্রমহীনভাবে সবগুলো বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা সফলতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারতেন না। অথচ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, বিবেক হতবুদ্ধি হয়ে যায়; এতগুলো বিদ্রোহের সবক'টি তিনি কীভাবে সফলতার সঙ্গে দমন করলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদর্শন করেছেন, তার আলোকে আমরা সামনে তার সামরিক চিন্তাকুশলতার কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছি।

---

[৯৮০] যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ১১/২৪১-২৪২। আরও দেখুন : ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইরা*, ১/৩৬।

Scanned with CamScanner

১. অতর্কিতে হামলার নীতি ও শত্রুর পূর্বে পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা

প্রথমে তিনি লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অত্যন্ত নিপুণ ও নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতেন। এরপর প্রতিপক্ষের জন্য সামান্য সুযোগও রাখতেন না; বরং প্রতিপক্ষ যখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রাথমিক প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, তখনই তিনি অতর্কিতে তাদের ওপর হামলা করতেন। ইতিহাসে এ বিষয়টি সুপ্রমাণিত যে, কোন বিদ্রোহ-প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল একেবারে প্রথম ধাপেই তা দমন করা, তাকে উন্নতি ও প্রস্তুতির সুযোগ না দেওয়া। আবদুর রহমান আদদাখিলের এই নীতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে মাসারার যুদ্ধে। যুদ্ধের আগের রাতে তিনি রাত জেগে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন; আর তার প্রতিপক্ষ যুদ্ধ মুলতবীর ওযর দেখিয়ে তার সঙ্গে প্রতারণার কসরত করছিল। এর ফলে তিনি অতর্কিতে হামলা করার পুরো সুযোগ পেয়ে যান; আর প্রতিপক্ষ শুরুতে বীরত্বের নানা দিক প্রদর্শন করা সত্ত্বেও আসল যুদ্ধে সামান্য প্রতিরোধও গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়।[২৮১]

আবদুর রহমান আদদাখিলের অন্যান্য যুদ্ধেও তুলনামূলক বিষয়টি এমনই ছিল এবং তার এই অতর্কিত হামলার নীতি প্রতিটি যুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

আকস্মিক হামলার নীতি সংরক্ষণে আবদুর রহমান আদদাখিলের যে পরিমাণ উদ্দীপনা ছিল, তারচে মোটেও কম আগ্রহ ছিল না প্রথমে হামলা করার প্রচেষ্টা সংরক্ষণে। সবসময় তিনি প্রতিপক্ষকে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি রাখতে চাইতেন, যেন তাদের অবাধ কর্মক্ষমতা ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং তারা সরাসরি যুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। জীবনের প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি অত্যুচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন সেনাপতিদের মুখোমুখি হয়েছেন। তাই বাধ্য হয়েই তাকে এমন উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে, যাতে প্রতিপক্ষ সেনাপতি তার পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহারের সুযোগ না পায়।

২. শক্তির মিতব্যয়িতা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অটলতা

তার জীবনী পাঠের সময় এ দু'টি নীতির গুরুত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। কেননা, তার জীবন ছিল যুদ্ধ ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকের এক চলমান ধারা। আর

---

[২৮১] মাক্কারী, নাফহুত তীব, ৩/৩৩।

Scanned with CamScanner

তাই তিনি যুদ্ধের ধারাবাহিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং যুদ্ধ পরিচালনার অপরিহার্য শক্তি ও মাধ্যম– এ দু'য়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি একই সময়ে একাধিক লক্ষ্যের দাবি সামনে আসলে তুলনামূলক অধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিতে বাধ্য ছিলেন। এটি তার জীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটেছে। আর সামগ্রিক পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে তার কর্তব্য ছিল শক্তির ক্ষেত্রসমূহের ব্যবহারে সূক্ষ্ম সমন্বয় সাধন করা, যেন সর্বোত্তম ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। আবদুর রহমান আদদাখিলের সমস্ত সামরিক কর্মকাণ্ডে এই নীতির বাস্তবায়ন দেখা যায়।

কয়েক ছত্রে কুরাইশী ঈগলের পুরো জীবন

মহান নেতা আবদুর রহমান আদদাখিলের জীবন রণাঙ্গনে অসামান্য তৎপরতা, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল সুদৃঢ়করণ, দেশের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধকারীদের সমূলে দমন– এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের জন্য ওয়াক্‌ফ ছিল। নিশ্চিন্তে ও আরামে কাটিয়েছেন এমন দিনের সংখ্যা তার জীবনে খুব বেশি ছিল না। তার জীবন ছিল সেনাবাহিনীর বিন্যাস, ঐক্যের বিনির্মাণ, শত্রুর মোকাবেলা, সীমান্তশহরগুলোর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ফিতনা ও বিদ্রোহ দমন এবং নাগরিক অবকাঠামোর ভিত্তি স্থাপনের সার্বক্ষণিক সাধনায় নিমগ্ন।

ইন্তেকাল

আবদুর রহমান আদদাখিল ৫৯ বছর হায়াত পেয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৯ বছর কেটেছে উমাইয়া খেলাফতের পতনের পূর্বে দামেশক ও ইরাকে, ৬ বছর বনু আব্বাসের হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পেতে পলায়ন ও আন্দালুসে প্রবেশের পরিকল্পনায় এবং ৩৪ বছর আন্দালুসের শাসনকার্যে। তিনি ১৭২ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে (৭৮৮ খৃস্টাব্দের অক্টোবরে) কর্ডোভায় ইন্তেকাল করেন এবং কর্ডোভাতেই সমাহিত হন।[২৮২]

---

[২৮২] দেখুন : লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমূআ*, পৃ : ১০৫, ইবনে আ'ষারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৫৮ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৪৮।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
শক্তিশালী যুগে (স্বাধীন) উমাইয়া প্রশাসন

স্বাধীন উমাইয়া প্রশাসনের তিনটি স্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আবদুর রহমান আদদাখিল ১৩৮ হিজরী হতে ১৭২ হিজরী (৭৫৫-৭৮৮ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত প্রায় ৪৩ বছর আন্দালুস শাসন করেছেন। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি, তার শাসনের মাধ্যমেই আন্দালুসে স্বাধীন উমাইয়া প্রশাসনপর্বের সূচনা হয়েছিল, যার ব্যাপ্তি ১৩৮ হিজরী হতে ৩১৬ হিজরী (৭৫৫-৯২৮ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত। শাসকবর্গের শাসন-ধরনের ভিত্তিতে আমরা এ সময়কালকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করতে পারি।

প্রথম স্তর: এর ব্যাপ্তি পূর্ণ এক শ' বছর; ১৩৮ হিজরী হতে ২৩৮ হিজরী (৭৫৫-৮৫২ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত। এ সময়কালকে প্রতাপ, গৌরব ও সভ্যতা বিনির্মাণের যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সময় আশেপাশের অঞ্চলের ওপর ইসলামী রাষ্ট্র আন্দালুসের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

দ্বিতীয় স্তর: ২৩৮ হিজরী হতে ৩০০ হিজরী (৮৫২-৯১৩ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়কালকে দুর্বলতা ও অবসন্নতার যুগ বলে গণ্য করা হয়।

তৃতীয় ও সর্বশেষ স্তর: এর পরবর্তী বাকি সময়কালকে (৩০০-৩১৬ হিজরী/৯১৩-৯২৮ খৃস্টাব্দ) উমাইয়া প্রশাসনের পরিবর্তে উমাইয়া খেলাফতের যুগ বলে গণ্য করা হয়।

(স্বাধীন) উমাইয়া প্রশাসনের প্রথম যুগ

এটি স্বাধীন উমাইয়া প্রশাসনের প্রতাপপূর্ণ ও সমৃদ্ধতর অংশ। এর সূচনা আবদুর রহমান আদদাখিলের আমলে। তার পরে আরও তিনজন প্রশাসক এ আমলে প্রশাসন দায়িত্ব পালন করেছেন; যাদের প্রথম জন হলেন হিশাম বিন আবদুর রহমান। তিনি ১৭২ হিজরী হতে ১৮০ হিজরী (৭৮৮-৭৯৬ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[২৮৩]

---

[২৮৩] দেখুন : মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩৩৪।

Scanned with CamScanner

হিশাম বিন আবদুর রহমান আদদাখিল রহ.

আবদুর রহমান আদদাখিল তার পুত্র হিশামের মধ্যে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার উপযুক্ততা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তিনি বড় পুত্র সুলাইমানের পরিবর্তে ছোট পুত্র হিশামকেই যুবরাজ হিসেবে নির্বাচন করেন।

হিশাম সর্বদিক থেকেই বড় ভাই সুলাইমানের চেয়ে দক্ষ ও উপযুক্ত ছিলেন। আবদুর রহমান আদদাখিলের এই নির্বাচন যে ভুল ছিল না; বরং তার ধারণা ছিল পুরোপুরি সঠিক, তার প্রমাণ হল, জনগণ হিশামকে ইলম, আমল ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে মহান খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয রহ.-এর সঙ্গে তুলনা করত।

পিতার মৃত্যুর সময় হিশাম মেরিডায় অবস্থান করছিলেন। পিতার মৃত্যুর ছয় দিন পর তিনি কর্ডোভায় পৌঁছেন। তখন প্রশাসনের দায়িত্বশীলগণ এবং জনসাধারণ তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। এটি ১৭২ হিজরীর (৭৮৮ খৃস্টাব্দের) ঘটনা।

বড় ভাই সুলাইমান তখন টলেডোয় অবস্থান করছিলেন। হিশামের ক্ষমতাপ্রাপ্তির সংবাদে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৎক্ষণাৎ তিনি বাহিনী প্রস্তুত করে কর্ডোভার উদ্দেশে রওয়ানা হন। সংবাদ জানতে পেরে হিশাম রাজধানী থেকে সসৈন্যে বের হয়ে আসেন। জাইয়ানে উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সুলাইমান পরাজিত হন এবং পালিয়ে টলেডোয় ফিরে যান।[২৮৪]

হিশামের আরেক ভাই ছিলেন আবদুল্লাহ। হিশাম আবদুল্লাহর সঙ্গে যথেষ্ট সদাচরণ করতেন; কিন্তু আবদুল্লাহ হয়তো ভাইয়ের স্নেহের চেয়ে আরও বেশি কিছু প্রত্যাশা করছিলেন। তাই তিনি পালিয়ে টলেডোতে বড় ভাই সুলাইমানের কাছে চলে যান। জানতে পেরে হিশাম আবদুল্লাহর প্রতি স্নেহবশত তাকে সন্তুষ্টিপূর্বক ফিরিয়ে আনতে দূত পাঠান; কিন্তু দূত তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ব্যর্থ হন।[২৮৫]

এ অবস্থায় হিশামের জন্য ভাই সুলাইমানের উদ্দেশে অভিযান প্রেরণ করা

---

[২৮৪] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৬১ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১২৪।
[২৮৫] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ২/২৮৪, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৬২ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১২৪।

Scanned with CamScanner

ব্যতীত ভিন্ন কোন পথ খোলা রইল না। পিতার সমরনীতির অনুসরণে তিনিও সুলাইমান কর্ডোভায় হামলা করার পূর্বে নিজেই টলেডোর উদ্দেশে অগ্রসর হন। টলেডোয় পৌঁছে তিনি শহর অবরোধ করেন। সুযোগসন্ধানী সুলাইমান সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং হিশামের অনুপস্থিতিতে রাজধানী কর্ডোভা দখলের উদ্দেশ্যে কর্ডোভার উদ্দেশে রওয়ানা হন। কিন্তু কর্ডোভাবাসী তাকে প্রতিরোধ করে। এরপর তিনি কর্ডোভার নিকটবর্তী শহর মেরিডা দখল করার চেষ্টা করেন; যেন ভবিষ্যতে কর্ডোভার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু মেরিডার গভর্নরও তাকে মেরিডা থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। তিনি সেখান থেকে মুরসিয়া, মুরসিয়া থেকে ভ্যালেন্সিয়া পালিয়ে যান আর হিশাম তাকে তাড়া করে ফেরেন। একপর্যায়ে সুলাইমানের অন্তর যখন নিরাশায় ছেয়ে গেল, তখন তিনি হিশামের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। হিশাম তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। ইতঃপূর্বে তিনি আবদুল্লাহকেও নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন। এবার তিনি তাদের উভয়কে উত্তর আফ্রিকায় চলে যাওয়ার সুযোগ দেন।[২৮৬]

হিশাম বিন আবদুর রহমান আদদাখিল অত্যন্ত জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। তিনি আলিমসমাজকে ভালোবাসতেন এবং তাদের সাহচর্য দ্বারা উপকৃত হতেন। আন্দালুসে আরবী ভাষার প্রসার ও বিস্তারে তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তার অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে আরবী ভাষার অবস্থান এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, আন্দালুসের অভ্যন্তরে অবস্থিত ইহুদি-খৃস্টানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও আরবী ভাষা পাঠদান করা হত।[২৮৭]

হিশামের যুগে আন্দালুসে যেসব মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল আন্দালুসে মালেকী মাযহাবের প্রসার। ইতঃপূর্বে আন্দালুসে ইমাম আওযায়ী রহ.-এর মাযহাবের প্রচলন ছিল।[২৮৮]

হিশাম তার শাসনামলে বহুবার উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোতে অভিযান পরিচালনা করেছেন।[২৮৯]

তার আমলের বিখ্যাত একজন আলিম হলেন সা'সাআ' বিন সালামা আশশামী। তিনি আবদুর রহমান আদদাখিলের যুগে এবং হিশামের

---

[২৮৬] ইবনে খালদুন, *তারীখে ইবনে খালদুন*, ৪/১২৪।

[২৮৭] ড. হুসাইন মু'নিস, *মা'আলিমু তারীখিল মাগরিব ওয়াল আন্দালুস*, পৃ : ৩১০।

[২৮৮] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ২/৪৬।

[২৮৯] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৬৪ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩৩৭।

Scanned with CamScanner

শাসনামলের প্রথমদিকে আন্দালুসের প্রধান মুফতী এবং কর্ডোভা মসজিদের ইমাম ছিলেন। আবদুল মালিক বিন হাবীব, ওসমান বিন আইয়ুব প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৯০] হিশাম-যুগের আরেকজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস হলেন আবুদর রহমান বিন মুসা, যার সূত্রে আসবাগ বিন খলীলসহ বিভিন্ন মুহাদ্দিস হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। আবদুর রহমান ও সা'সাআ' উভয়ের ইন্তেকাল হিশামের আমলে হয়েছিল।[২৯১]

হিশাম বিন আবদুর রহমান আদদাখিলের ৭ বছর ৯ মাস স্থায়ী সফল শাসনব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮০ হিজরীর সফর মাসে (৭৯৬ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে)। ৩৯ বছর ৪ মাস ৪ দিন বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। রাজপ্রাসাদেই তাকে দাফন করা হয়। পুত্র হাকাম বিন হিশাম তার জানাযার নামাযে ইমামতি করেন।[২৯২]

হাকাম বিন হিশাম বিন আবদুর রহমান আদদাখিল রহ.

হিশামের মৃত্যুর পর তার পুত্র হাকাম তার স্থলাভিষিক্ত হন। তার শাসনামল ১৮০ হিজরী হতে ২০৬ হিজরী (৭৯৬-৮২১ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।[২৯৩] কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনায় হাকাম না তার পিতার আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন, না তার পিতামহের।

হাকাম অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। জনগণের ওপর উচ্চ হারে কর আরোপ করতেন, নিজে কবিতার আসর ও শিকারের নেশায় ডুবে থাকতেন। তিনি তার বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন বিদ্রোহ-প্রচেষ্টাকে এমন নির্দয়ভাবে দমন করেন, যার নজীর আন্দালুসের ইতিহাসে ছিল না। তার শেষজীবনে নিষ্ঠুরতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, বিদ্রোহীদের ঘর-বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হত এবং তাদেরকে দেশ হতে বিতাড়িত করা হত।[২৯৪]

হাকাম বিন হিশাম তার শাসনামলে যেসব বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা দমন করেছেন,

---

[২৯০] ইবনুল ফারাযী, *তারীখু উলামাইল আন্দালুস*, পৃ : ৭৫।

[২৯১] আবুল ওয়ালিদ আযদী, *তারীখুল উলামা বিল আন্দালুস*, ১/৩০০।

[২৯২] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৬৫ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩৩৮।

[২৯৩] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৬৮ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩৩৯।

[২৯৪] দেখুন : ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৫/৪১৩ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩৩৯।

Scanned with CamScanner

তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ২০২ হিজরীতে (৮০৮ খৃস্টাব্দে) রাবায গোষ্ঠীর বিদ্রোহ। রাবায গোত্র কর্ডোভার নিকটবর্তী একটি শহরতলিতে বাস করত। হাকামের মাদকাসক্তি, অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও শিকারের নেশার বিষয়টি সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লে রাবায গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এর পরপরই হাকাম কর্ডোভার কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে হত্যা করলে জনগণের অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পায়। তারা হাকাম ও তার সেনাবাহিনীকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রাম শুরু করে। নিজের নিরাপত্তা চিন্তায় উদ্বিগ্ন হাকাম কর্ডোভাকে সুরক্ষিত করার প্রয়াসে নগরীর চারপাশে নগররক্ষা-প্রাচীর নির্মাণ করেন, পরিখা খনন করেন এবং সেনাবাহিনীকে সবসময় নিজের কাছে রাখার ব্যবস্থা করেন।

তার এসব পদক্ষেপে কর্ডোভাবাসীর ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায়। কিছুদিন পর তার জনৈক ক্রীতদাস ঝগড়া করতে গিয়ে একজন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করলে রাবাযবাসী পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। তিনি তার সৈন্যদের নিয়ে অবরোধকারীদের ওপর হামলা করেন এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তাদের পরাজিত করেন।[২৯৫]

কিন্তু অবরোধকারীদের পরাভূত করেই হাকাম শান্ত হননি; তিনি তাদের ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন, সহায়-সম্পদ ধ্বংস করেন, নগরীর তিন শ' বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করেন এবং বিদ্রোহীদের দেশের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[২৯৬] বাধ্য হয়ে রাবাযবাসী বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ে। তাদেরই একটি দল চলে যায় মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায়। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর তারা ক্রেট (Crete) দ্বীপে[২৯৭] আশ্রয় নেয় এবং ২১২ হিজরীতে (৭২৮ খৃস্টাব্দে) সেখানে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। শতাব্দীকাল পর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এই ইসলামী রাষ্ট্রটি দখল করে নেয়।[২৯৮]

---

[২৯৫] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৫/৪১৩-৪১৪।

[২৯৬] প্রাগুক্ত, ৫/৪১৪।

[২৯৭] বর্তমান গ্রিসের অন্তর্গত গ্রিসের সর্ববৃহৎ দ্বীপ। (অনুবাদক)

[২৯৮] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৫/৪৮০ ও *তারীখে ইবনে খালদুন*, ৩/২৫৩।

Scanned with CamScanner

শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে এসব মন্দ ও গর্হিত আচরণ করলেও হাকাম অবশ্য ইসলামী বিজয়াভিযানের ধারা স্থগিত রাখেননি।[২৯৯] বস্তুত এটি ছিল শামকেন্দ্রিক উমাইয়া খেলাফত ও আন্দালুস-কেন্দ্রিক উমাইয়া ইমারত– এককথায় উমাইয়া শাসক-প্রশাসকগণের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এসব অভিযানে তিনি জয়-পরাজয় উভয় ধরনের ফলাফলেরই সম্মুখীন হয়েছিলেন।

হাকামের স্বভাব কঠোরতা ও শাসক-শাসিতের সম্পর্কের তিক্ততার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে তার শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের বেশ কিছু নগরী খৃস্টানদের দখলে চলে যায়। বার্সেলোনা নগরীর পতন ঘটে এবং বার্সেলোনাকে কেন্দ্র করে উত্তর-পূর্ব আন্দালুসে একটি ক্ষুদ্র খৃস্টরাষ্ট্র ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়ায়, ইতিহাসে যা অ্যারাগোন রাষ্ট্র (The Kingdom of Aragon) নামে পরিচিত। এ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি আন্দালুসের উত্তর-পূর্ব অংশে পিরেনিজ পর্বতমালার কাছে ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিল।[৩০০]

অবশ্য হাকাম মহান আল্লাহ তাআ'লার করুণা ও অনুগ্রহে তার শাসনামলের শেষদিকে আপন কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং তাওবা করে জুলুম-অত্যাচার ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে জনগণের কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলেন। এরপর তিনি নিজের সবচে' উপযুক্ত সন্তানকে পরবর্তী শাসক (ওলিয়ে আ'হদ) হিসেবে মনোনীত করেন, যদিও বয়সে সে সবার বড় ছিল না। প্রচণ্ড প্রতাপ ও প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর দু' বছর পূর্বে তার এই তাওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা তার সুপরিণতির-ই নিদর্শন।[৩০১]

আবদুর রহমান আলআওসাত (দ্বিতীয় আবদুর রহমান) রহ.

হাকাম বিন হিশামের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় আবদুর রহমান শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ইতিহাসে তিনি আবদুর রহমান আলআওসাত (মেঝো আবদুর রহমান) নামে খ্যাত। কেননা, আন্দালুসের (স্বাধীন প্রশাসন) ইতিহাসে যে তিনজন খ্যাতনামা প্রশাসক আবদুর রহমান নামে গত হয়েছেন, তিনি তাদের মাঝের জন। (প্রথমজন আবদুর রহমান

---

[২৯৯] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৭২।

[৩০০] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৫/৩২২-৩২৩।

[৩০১] আবু সাঈদ মাগরিবী, *আলমুগরিব ফী হুলাল মাগরিব*, ১/৪৩।

Scanned with CamScanner

আদদাখিল; আর তৃতীয় জন আবদুর রহমান আননাসির, যার আলোচনা সামনে আসবে)। দ্বিতীয় আবদুর রহমান ২০৬ হিজরী থেকে ২৩৮ হিজরী (৮২১-৮৫২ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত অর্থাৎ উমাইয়া (স্বাধীন) প্রশাসক আমলের প্রথম স্তরের (প্রতাপের যুগ) শেষ পর্যন্ত আন্দালুসের প্রশাসক ছিলেন। তার শাসনামলকে আন্দালুস ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম যুগ বলে গণ্য করা হয়। তিনি নতুন করে উত্তরে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং বেশ কয়েকবার তাদেরকে পরাজিত করেন।[৩০২] দ্বিতীয় আবদুর রহমান সচ্চরিত্রবান, মহানুভব, শান্ত-প্রকৃতি, জ্ঞানানুরাগী ও জনগণের প্রতি সদাচারী ছিলেন।[৩০৩] তার সম্পর্কে সাফাদী রহ. বলেছেন,

> তিনি তার পিতার বিপরীত জনগণের প্রতি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ছিলেন উদার, মহানুভব। যুক্তিবিদ্যাসংক্রান্ত শাস্ত্রসমূহের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। আন্দালুসে তিনিই প্রথম তৈরি মুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি সেভিলে নগরপ্রাচীর নির্মাণ করেন। তার তত্ত্বাবধানে কর্ডোভা মসজিদের সম্প্রসারণ করা হয়। তাকে খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের সঙ্গে তুলনা করা হত। আবদুর রহমান আলিমদের ভালোবাসতেন এবং তাদেরকে কাছে রাখতেন। সাধারণত নিজেই নামাযে ইমামতি করতেন। প্রাচীন গ্রন্থাদি তিনিই প্রথম আন্দালুসে আনার ব্যবস্থা করেন এবং আন্দালুসের আলিমসমাজকে এসব গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত করেন। তিনি সুদর্শন ও প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করতেন, হাদীস মুখস্থ করতেন। তার শাসনামলকে 'বরের যুগ' বলা হত। তিনি ন্যায়ের বিকাশের মাধ্যমে দেশের মানুষের মন জয় করেছিলেন। জনগণ তার শাসনামল উপভোগ করত এবং তার দীর্ঘায়ু কামনা করত। তিনি ইনসাফের সঙ্গে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। রাষ্ট্রের বিনির্মাণে তিনি সবিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এমনকি তার শাসনামলে দেশের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ দশ লক্ষ দীনারে পৌঁছেছিল।[৩০৪]

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনামলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

[৩০২] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৮১।

[৩০৩] লেখক অজ্ঞাত, *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ: ১২২।

[৩০৪] সাফাদী, *আলওয়াফী বিল ওয়াফাইয়াত*, ১৮/৮৪।

Scanned with CamScanner

১. বুদ্ধিবৃত্তিক সভ্যতার সমৃদ্ধি

তার আমলের বিখ্যাত একজন আলিম হলেন আব্বাস বিন ফিরনাস রহ. (মৃত্যু : ২৭৪ হিজরী/৮৮৭ খৃস্টাব্দ)। তার উপনাম আবুল কাসিম। তিনি কর্ডোভার অধিবাসী ও বনু উমাইয়ার মাওয়ালী ছিলেন। তার বাড়ি ছিল বারাবির (তাকিরনা) এলাকায়। তিনি দ্বিতীয় আবদুর রহমানের সমসাময়িক ছিলেন। খলীফাপুত্র মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমানের (মৃত্যু : ২৭৩ হিজরী) প্রশংসায় তার রচিত কিছু পঙ্‌ক্তি রয়েছে। দর্শন ও কাব্যশাস্ত্রে তার বিশেষ দখল ছিল। এছাড়া জ্যোতির্বিদ্যায়ও তার বুৎপত্তি ছিল।[৩০৫]

আন্দালুসে ইবনে ফিরনাসই সর্বপ্রথম পাথর থেকে কাঁচ উৎপাদন শিল্প আবিষ্কার করেন। সময় নিরুপণ-যন্ত্রও (জলঘড়ি) তার আবিষ্কার। গবেষণার সুবিধার্থে নিজ বাড়িতে তিনি একটি কৃত্রিম সৌরজগত তৈরি করেছিলেন, যাতে আকাশ, তারকারাজি, মেঘ, বিজলী, বজ্র ইত্যাদির প্রতিকৃতি ছিল। মানুষের শূন্যে ওড়ার স্বপ্ন তিনিই সর্বপ্রথম বাস্তবায়ন করেন। নিজের শরীরে পাখির পালক লাগিয়ে এবং দু'টি ডানায় ভর করে তিনি বাতাসে বেশ কিছুদূর ভেসে বেড়ান। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই তিনি ভূপাতিত হন এবং পিঠে আঘাত পান। এর কারণ ছিল তিনি পেছনে কোন ডানা রাখেননি এবং তার জানা ছিল না যে, পাখির আকাশে ওড়ার পেছনে (দু' পাশের ডানার পাশাপাশি) লেজেরও ভূমিকা থাকে।[৩০৬]

তার এই উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা তখন ব্যর্থ হলেও এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তিনি একজন ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভা ছিলেন এবং আজ বিজ্ঞান আকাশপথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছে, তার অগ্রদূত ও পথিকৃৎ তিনিই ছিলেন। ঐতিহাসিক সাফাদী তার আলোচনা করতে গিয়ে অনেক প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করার পর শেষে মন্তব্য করেছেন,

> তিনি মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন; কিন্তু অশরীরী মেধার অধিকারী ছিলেন।[৩০৭]

---

[৩০৫] প্রাগুক্ত, ১৬/৩৮০।

[৩০৬] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৩৭৪।

[৩০৭] সাফাদী, *আলওয়াফী বিল ওয়াফাইয়াত*, ১৬/৩৮০।

Scanned with CamScanner

২. নাগরিক সভ্যতার উন্নতি

দ্বিতীয় আবদুর রহমান নাগরিক সভ্যতার উন্নয়নেও (নির্মাণশিল্প, অর্থনীতি ইত্যাদি) যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন।[৩০৮] তার আমলে আন্দালুসের বাণিজ্যব্যবস্থা যথেষ্ট গতিশীল ছিল। এ কারণে রাষ্ট্রের সম্পদও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৩০৯] সমকালীন বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে ভিক্ষাবৃত্তির প্রচলন থাকলেও তার আমলে আন্দালুসবাসীর এর সঙ্গে কোন পরিচয় ছিল না।

তার শাসনামলে কৃষি সেচ-ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ইতিহাসের সেই অতি প্রাচীন আমলেই সড়ক পাকা করা এবং রাতের বেলা সড়কে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটা সে সময়ের কথা, ইউরোপ যখন মূর্খতা ও অসভ্যতার নিকষকালো অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি বিভিন্ন প্রাসাদ ও পল্লবিত উদ্যানও প্রতিষ্ঠা করেন। নির্মাণ ক্ষেত্রে তার উদার ব্যয়ের অন্যতম প্রমাণ এই যে, তার আমলে আন্দালুসে নির্মিত ভবনসমূহকে স্থাপত্যশিল্পের অনন্য নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৩১০]

৩. নরম্যান জলদস্যুদের দমন

(উত্তর ইউরোপের উপদ্বীপ) স্ক্যান্ডিনেভিয়া (Scandinavia) অঞ্চলের অধিবাসীদের নরম্যান (The Normans) বলা হয়। এ অঞ্চলটি ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড ও সুইডেন মিলে গঠিত। নরম্যান জাতিগোষ্ঠী অত্যন্ত বর্বর ও অসভ্য জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে তারা দস্যুবৃত্তি চালাত। ইতিহাসে তারা ভাইকিং (Viking) জলদস্যু নামে সুপরিচিত। দস্যুবৃত্তির অর্থ হচ্ছে দেশ জয় বা এ জাতীয় কোন উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল সম্পদ লুণ্ঠন ও জনপদ ধ্বংসের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা করা।

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনামলে ২৩০ হিজরীতে (৮৪৫ খৃস্টাব্দে) ভাইকিং দস্যুগোষ্ঠী চুয়ান্নটি জাহাজযোগে সাগরপথে এসে সেভিলে হামলা করে। তারা শহরে ঢুকে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, পুরো শহরকে ধ্বংসস্তূপে

---

[৩০৮] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩৪৭।

[৩০৯] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৯১।

[৩১০] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৯১ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩৪৭।

Scanned with CamScanner

পরিণত করে, সম্পদ লুটপাট করে, নারীদের সম্মানহানি করে। এরপর তারা সেভিল ছেড়ে সিডোনিয়া (Medina-Sidonia), আলমারিয়া (Almería), মুরসিয়া (Murcia)-সহ অন্যান্য শহরের দিকে অগ্রসর হয় এবং এসব অঞ্চলে ব্যাপক ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে।[৩১১] প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত যুদ্ধের প্রকৃতিই এমন। মুসলমানদের দেশজয় ও অন্যান্য জাতির যুদ্ধজয়ের মাঝে এটি একটি মোটা দাগের পার্থক্য।

নরম্যানদের এই ধ্বংসযজ্ঞের সংবাদ জানতে পেরে দ্বিতীয় আবদুর রহমান তাৎক্ষণিক প্রস্তুতির মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং তাদের মোকাবেলায় রওয়ানা হন। এক শ' দিনেরও বেশি সময় ধরে উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। মুসলিম বাহিনী একে একে ভাইকিং দস্যুদের পয়ত্রিশটি জাহাজ জ্বালিয়ে দেয়। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম বাহিনীকে বিজয়ের নেয়ামত দান করেন; নরম্যান গোষ্ঠী ব্যর্থ ও পরাজিত হয়ে দেশে ফিরে যায়।[৩১২]

নরম্যান জলদস্যুদের তাড়িয়ে দিয়েই দ্বিতীয় আবদুর রহমান শিথিলতা ও প্রশান্তিতে গা ভাসিয়ে দেননি; বরং নিরাপত্তার যেসব ত্রুটির কারণে ভাইকিং জলদস্যুরা আন্দালুসে অনুপ্রবেশের সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোকে দূর করতে সচেষ্ট হন। এ উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেন।

১. সেভিল নগরী ছিল ওয়াদিল কাবীর নদীর (The Guadalquivir) তীরে অবস্থিত আর এ নদীটি আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এ কারণে ভাইকিং জলদস্যু বা অন্য যে কোন শত্রুবাহিনীর জাহাজ অতি সহজে বরং বলতে গেলে বিনা বাধায় আটলান্টিক মহাসাগর থেকে নদীপথে সেভিলে প্রবেশ করতে পারত। বিষয়টি উপলব্ধি করে এর সমাধানকল্পে তিনি সেভিলের চারপাশে মজবুত ও বিশাল প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং শহরটিকে পুরোপুরি সুরক্ষিত করেন। ফলে এতদিনের অরক্ষিত সেভিল নগরী পুরো আন্দালুসের অন্যতম দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত হয়।[৩১৩]

২. কেবল নগররক্ষা-প্রাচীর নির্মাণ করেই তিনি সন্তুষ্ট হননি; বরং দেশের পুরো উপকূলীয় সীমান্তের নিরাপত্তার লক্ষ্যে শক্তিশালী দু'টি নৌবহর প্রতিষ্ঠা

---

[৩১১] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৭৮।

[৩১২] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৮৭-৮৮।

[৩১৩] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৮/২৬১, মাকারী, *আলওয়াফী বিল ওয়াফাইয়াত*, ১৮/৮৪ ও হিময়ারী, *সিফাতু জাযীরাতিল আন্দালুস*, পৃ : ২০।

Scanned with CamScanner

করেন; একটি আটলান্টিক মহাসাগরে টহল দেওয়ার জন্য, অপরটি ভূমধ্যসাগরে। নৌবহরদু'টি সাগরে টহল দিতে দিতে উত্তরে আন্দালুসের সর্বশেষ সীমানায় লিওন সাম্রাজ্যের কাছে পৌঁছে যেত এবং ভূমধ্যসাগরে টহল দিতে দিতে ইটালি পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

সমুদ্রপথে মুসলিম বাহিনীর এই গতিশীল ও সদর্প পদচারণার ফলেই দ্বিতীয় আবদুর রহমান মুসলিম আন্দালুসের হাতছাড়া হওয়া ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জ (Balearic Islands) পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।[৩১৪] এছাড়াও যুদ্ধে ভাইকিং জলদস্যুদের পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে কিছুদিন পরই প্রচুর হাদিয়া-তোহফা ও উপঢৌকন নিয়ে ডেনমার্ক থেকে একটি প্রতিনিধিদল তার দরবারে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয় এবং মুসলিম আন্দালুস সরকারের মিত্রতা প্রার্থনা করে।

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনামলে আন্দালুস রাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি এমন উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিল যে, তৎকালীন খৃস্টান (বাইজান্টাইন) সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্টানটিনোপল থেকেও তার দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করা হত।[৩১৫]

---

[৩১৪] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৮৯। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জ প্রথমবার জয় করেছিলেন মহান বিজেতা মুসা বিন নুসাইর রহ.। আন্দালুস বিজয়ের পূর্বেই ৯১ হিজরীতে (৭১০ খৃস্টাব্দে) এ অঞ্চল বিজিত হয়েছিল। এরপর প্রশাসক আমলের দ্বিতীয় ধাপে আন্দালুসে মুসলমানদের অবস্থা নাজুক হয়ে পড়লে খৃস্টানদের হাতে ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জের পতন ঘটে। পরবর্তী সময়ে ভাইকিং জলদস্যুরা এর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অবশেষে ২৩৪ হিজরীতে (৮৪৯ খৃস্টাব্দে) এসে দ্বিতীয় আবদুর রহমান ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জ পুনরায় জয় করেন।

[৩১৫] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩৪৬।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
উমাইয়া প্রশাসক-আমলের দ্বিতীয় স্তর
(দুর্বলতার যুগ)

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আন্দালুসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। একে (স্বাধীন) উমাইয়া প্রশাসক স্তরের দুর্বলতার যুগ বলে অভিহিত করা যায়। এর ব্যাপ্তি ২৩৮ হিজরী হতে ৩০০ হিজরী (৮৫২-৯১৩ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ৬২ বছর।

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের পর তার পুত্র মুহাম্মাদ এবং এরপর পর্যায়ক্রমে মুহাম্মাদের দুই পুত্র মুনযির ও আবদুল্লাহ আন্দালুস শাসন করেন। বাস্তবতা হল, ইতিহাস-পাঠক মাত্রই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবেন যে, দ্বিতীয় আবদুর রহমান যে ধরনের প্রবল প্রতাপ, বিশাল শক্তি এবং আন্দালুস ও আশেপাশের অঞ্চলে কর্তৃত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা রেখে গিয়েছিলেন, তার অব্যবহিত পরেই কী করে এ ধরনের নিম্নগামিতা ও পতনের ঘটনা ঘটল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের চিরায়ত নীতি তো হল কোন জাতি হঠাৎ পতনের শিকার হয় না; বরং জাতির পতন আসে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে, পর্যায়ক্রমে ও দীর্ঘ সময় নিয়ে। উদাহরণস্বরূপ আমরা ইতঃপূর্বে প্রশাসন আমলের আলোচনায় দেখেছি, প্রশাসন আমলের দ্বিতীয় স্তরে দুর্বলতার বেশ কিছু কার্যকারণ প্রকাশ পেয়েছিল। যেমন: ১. সম্পদের অবারিত আগমন ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতি আকর্ষণ ২. গোত্রবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ৩. প্রশাসকদের নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ ৪. অমুসলিম অঞ্চলে বিজয়াভিযান পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে উদাসীনতা। আর এ কার্যকারণগুলোর একটিও হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি; বরং প্রশাসক আমলের প্রথম স্তরের (অর্থাৎ প্রতাপ-যুগের) শেষ দিকে বালাতুশ শুহাদা প্রান্তরের যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী সময়েই সৃষ্টি হয়েছে; এরপর ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে প্রশাসক আমলের শেষ স্তরে এসে আপন প্রভাব প্রকাশ করেছে।

সুতরাং আমাদের আলোচ্য প্রেক্ষাপটেও স্বাধীন উমাইয়া প্রশাসন আমলের

Scanned with CamScanner

এই দ্বিতীয় স্তরের দুর্বলতার কারণ খুঁজতে হলে কিছুটা পেছনে ফিরে যেতে হবে, অধ্যয়ন করতে হবে প্রতাপ-যুগের শেষ সময়ের বিবরণ এবং সেখান থেকেই দুর্বলতা ও ব্যাধির সেই বীজ খুঁজে বের করতে হবে, যার কারণে উমাইয়া প্রশাসন এই দ্বিতীয় স্তরে এসে নিম্নগামিতা, অবসন্নতা ও দুর্বলতার শিকার হয়েছিল।

উমাইয়া প্রশাসনের দুর্বলতার কারণ ও কার্যকারণ

এ আমলের দুর্বলতার গুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যকারণ হল,

১. সম্পদের অবাধ আগমন এবং অবারিত প্রাচুর্যের দ্বার উন্মোচন

এ সময় বিভিন্ন বিজয়াভিযানের বদৌলতে নতুন করে মুসলমানদের সামনে বিশাল পৃথিবী উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল এবং প্রভূত সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। বিশেষত স্বাধীন উমাইয়া প্রশাসন আমলের প্রতাপ-যুগের শেষদিকে এ ধারা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র ও পরিসর বহুগুণ প্রসারিত হয়েছিল। পুরো দেশে কোন দরিদ্র নাগরিক খুঁজে পাওয়া যেত না। ফলে মুসলিম জনগণ সম্পদ মোহে প্রলুব্ধ হল আর আন্দালুসের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো বাস্তবায়িত হল নববী আশঙ্কা,

«فَوَاللهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ»

আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের জন্য দরিদ্রতার আশঙ্কা করি না; বরং আমি আশঙ্কা করি যে, তোমাদের কাছে দুনিয়ার প্রাচুর্য এসে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে এসেছিল; তখন তোমরা তা লাভ করতে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে, যেভাবে তারা লিপ্ত হয়েছিল। এ ধন-সম্পদ তাদেরকে যেভাবে ধ্বংস করেছিল, তোমাদেরকেও তেমনিভাবে ধ্বংস করে দেবে।[৩১৬]

নবীজী আরও ইরশাদ করেছেন,

---

[৩১৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪২৫ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৬১।

Scanned with CamScanner

«إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ»

নিশ্চয়ই প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি পরীক্ষার বস্তু আছে; আমার উম্মতের পরীক্ষার বস্তু হল সম্পদ।[৩১৭]

নবীজী বহুবার বহুভাবে উম্মতকে পার্থিব সম্পদের বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং একে তুচ্ছরূপে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন,

«وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هٰذِهِ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ»

আল্লাহর শপথ! পরকালের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত তো এরূপ যে, তোমাদের কেউ যদি দরিয়ায় এই আঙুল[৩১৮] রাখে, এরপর তা উঠিয়ে নেয়, তাহলে তার আঙুলে কতটুকু পানি উঠে আসবে? (পরকালের তুলনায় দুনিয়ার মান ও পরিমাণ এরূপ)।[৩১৯]

২. যিরইয়াব (Ziryab)

ইতিহাসপাঠকের কাছে এ নামটি হয়তো অপরিচিত নয়; কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, আন্দালুসের ইতিহাসে যিরইয়াবের ভূমিকা ছিল সেই ঘুণ পোকার মতো, যা নবী সুলাইমান আ.-এর যষ্টি ধীরে ধীরে খেয়ে ফেলেছিল আর তার নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

যিরইয়াব ছিলেন বাগদাদের একজন সঙ্গীতশিল্পী। তিনি বাগদাদেই আমীর ও খলীফাদের শাহী পরিবেশে বড় হন। তার সঙ্গীতের ওস্তাদ ছিলেন তৎকালীন বাগদাদের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ইবরাহীম মুসিলী। যিরইয়াব রাজদরবারেই থাকতেন এবং গান গেয়ে প্রাসাদবাসীদের আনন্দ দিতেন।[৩২০]

কালের পরিক্রমায় কয়েক বছরের মধ্যেই বাগদাদের সাধারণ-বিশেষ সর্বমহলে যিরইয়াবের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। সাগরিদের অত্যধিক জনপ্রিয়তায় ওস্তাদ ইবরাহীম মুসিলী ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন এবং তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বোনেন। ফলে যিরইয়াব বাগদাদ থেকে বিতাড়িত হন।

---

[৩১৭] *জামে' তিরমিযী*, হাদীস নং ২৩৩৬।

[৩১৮] হাদীসটির জনৈক রাবী এর দ্বারা তর্জনী উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন।

[৩১৯] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৮৫৮।

[৩২০] দেখুন : মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/১২৩।

Scanned with CamScanner

অবশ্য কোন কোন বর্ণনামতে, ইবরাহীম কোন ষড়যন্ত্র করেননি; বরং তার হুমকি-ধমকিতে ভীত হয়ে যিরইয়াব নিজেই বাগদাদ ত্যাগ করেছিলেন।

তৎকালে ইসলামী বিশ্ব পূর্ব-পশ্চিমে বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। হয়রান ও পেরেশান অবস্থায় দীর্ঘদিন বিক্ষিপ্ত ছোটাছুটি করার পর যিরইয়াব আন্দালুসকে তার কাঙ্ক্ষিত স্থান হিসেবে নির্বাচন করেন। কারণ, তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে সম্পদের প্রাচুর্য; রাজপ্রাসাদ ও উদ্যান-বাগানের আধিক্যের কারণে এ ধরনের বিনোদনপ্রিয় মানুষের জন্য আন্দালুস যেমন সবচে' আকর্ষণের জায়গা ছিল, তেমনই আন্দালুস ছিল তার মতো মানুষকে স্বাগত জানাতে ও আশ্রয় দিতে উপযুক্ত ক্ষেত্র।[৩২১]

প্রবল ধারণা এটাই যে, আন্দালুস সে সময় সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। কিন্তু যিরইয়াব যখন আন্দালুসে পা রাখলেন, আন্দালুসবাসী তাকে স্বাগত জানাল, সম্মান করল এবং তার উপস্থিতিকে সাদরে বরণ করে নিল। এমনকি তিনি শাসক-প্রশাসকদের দরবারেও গৃহীত হলেন। যিরইয়াব জনসাধারণের ঘর-বাড়ি, সভা-সমিতিতে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে গান শোনাতে লাগলেন। তিনি বাগদাদে অর্জন করা সঙ্গীতজ্ঞান আন্দালুসে বিতরণ করতে লাগলেন। আন্দালুসবাসীকে আনন্দ দিতে তিনি রচনা করতে লাগলেন 'আন্দালুসী গীতি' নামের বিশেষ এক ধরনের সঙ্গীত।

যিরইয়াব শুধু সঙ্গীতচর্চা, সঙ্গীত শিক্ষাদান ও আন্দালুসী সঙ্গীত রচনার কাজেই সীমাবদ্ধ রইলেন না; বরং তিনি আন্দালুসবাসীকে চালচলনের স্টাইল ও ফ্যাশনও শিক্ষা দিতে লাগলেন। আন্দালুসে তার মাধ্যমে শীতের পোশাক, গ্রীষ্মের পোশাক, বসন্তের পোশাক, শারদীয় পোশাক, সাধারণ ও বিশেষ উপলক্ষ-উৎসবের দিনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচের পোশাক– এভাবে পোশাকের নিত্য-নতুন ধারার প্রচলন ঘটল। তিনি তাদেরকে শেখাতে লাগলেন আহারের আধুনিক রীতি-নীতি, চামচ-কাঁটা চামচের ব্যবহার, বিভিন্ন উপলক্ষে নিত্য-নতুন ধরনের খাবার তৈরি করা ইত্যাদি।[৩২২]

আন্দালুসবাসী এর পূর্বে এ জাতীয় বিষয়ের সঙ্গে মোটেই পরিচিত ছিল না। যিরইয়াবের কাছ থেকে তারা এসব বিষয় শিখতে লাগল। যিরইয়াব তাদেরকে শোনাতে লাগলেন রাজা-বাদশাহ, খলীফা-আমীরদের রসালো গালগল্প, রূপকথা-পৌরাণিক কাহিনী। মানুষ তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল

---

[৩২১] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/১২৩।

[৩২২] বিস্তারিত জানতে : মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/১৩৩।

Scanned with CamScanner

এবং আসক্ত হল গানের প্রতিও। আন্দালুসে গায়ক, সঙ্গীতশিল্পীর সংখ্যা বেড়ে গেল। এরই ধারাবাহিকতায় কিছুদিন পর আন্দালুসে নৃত্যের প্রচলন শুরু হল। প্রথমে পুরুষদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেও একসময় তা অন্দরমহলেও স্থান করে নিল।

আশ্চর্যের বিষয় হল, আন্দালুসে যিরইয়াবের আগমন ঘটেছিল দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনামলে; যিনি আপন শাসনামলে জ্ঞান ও ইলম চর্চা, নাগরিক সভ্যতার উন্নতি ও অর্থনীতির সমৃদ্ধি আনয়নে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। বড় আশ্চর্য লাগে, তিনি কী করে যিরইয়াবকে আন্দালুসের বিশেষ মহল, সাধারণ মহল নির্বিশেষে সব জায়গায় অবাধ বিচরণের এবং এসব তৎপরতা চালানোর অনুমতি দিলেন?! তিনি কী করে তাকে সুযোগ দিলেন সবার অগোচরে জাতির দেহে ঘুণ পোকার মতো বাসা বাঁধার?!

যে সময় আন্দালুসে ইলম চর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের প্রাণশক্তি নবরূপে সঞ্জীবিত হয়েছিল, আলিম ও ইলমকেন্দ্রের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং মানুষের ইলমমুখী হওয়ার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল; ঠিক সে সময়েই যিরইয়াবের সুললিত কণ্ঠের অনুরণিত ও অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যমালা মানুষকে আলিমদের মজলিস থেকে বিমুখ করে তার সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল, মানুষকে নবীজীর পবিত্র হাদীস ও সালফে সালেহীনের শিক্ষণীয় ঘটনাবলি হতে বিমুখ করে বিস্ময়কর গল্প-কাহিনী ও বিরল রূপকথা শুনতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আন্দালুসবাসী কোরআনে কারীমের পঠন-শ্রবণ বাদ দিয়ে তার সঙ্গীতে ডুবে থাকতে এবং তার অশ্লীল রঙ-তামাশায় নিমগ্ন থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

অবশ্য এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এ ধরনের আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডে ডুবে থাকার ঘটনা ইসলামী ইতিহাসে এটিই প্রথম নয়।

নবীজী যখন মক্কায় তার দাওয়াতী তৎপরতা শুরু করেছিলেন, সে সময়ের কথা। মক্কার অন্যতম কাফির-সর্দার নযর বিন হারিস যখন দেখতে পেল, নবীজী মানুষকে কোরআনের ঐশী বাণী শোনাচ্ছেন আর মানুষ কোরআনের অলৌকিকতায় মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হচ্ছে; তখন সে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পারস্যে পৌঁছল এবং লম্বা সময় সেখানে অবস্থান করে রুস্তম-ইসফানদিয়ারদের গল্প-কাহিনী ও পারসিক রূপকথা শিক্ষা করল। এরপর সে পারস্যের বাজার থেকে দু'জন গায়িকা বাঁদী খরিদ করে মক্কায় ফিরে এল।

Scanned with CamScanner

মক্কায় ফিরে নযর বিন হারিস নবীজীর দাওয়াতী মিশনের বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধে লিপ্ত হল। যখনই সে দেখত, নবীজীর কোরআনী দাওয়াতে কোন ব্যক্তির হৃদয় ইসলামের প্রতি ধাবিত হয়েছে, তখনই তার কাছে গায়িকা বাঁদীদেরকে পাঠিয়ে দিত আর তারা তাকে পারস্যে প্রচলিত রুস্তম-ইসফান্দিয়ারদের কল্পকাহিনী গানের সুরে শুনিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে ইসলাম থেকে বিমুখ করে তুলত। নযর বিন হারিসের এই অশুভ কর্মকাণ্ডের বিবরণ কোরআনের ভাষায় এভাবে বিবৃত হয়েছে, যা তেলাওয়াত হতে থাকবে কেয়ামত অবধি:

﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ﴾

কতক মানুষ এমন, যারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য খরিদ করে এমন সব কথা, যা আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন করে দেয় এবং তারা আল্লাহর পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। [সূরা লুকমান : ০৬]

বিশিষ্ট ফকীহ সাহাবী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. শপথ করে বলেছেন যে, এ আয়াত গান সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।[৩২৩]

যুগে যুগে এমনই হয়েছে। শয়তান কখনোই নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেয়নি; ইলমী জৌলুস ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের সময়ও শয়তান নিরাশ বদনে নিদ্রামগ্ন থাকেনি। বরং চিরসত্য কোরআনের বিবরণ মতে,

﴿ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ﴾

তারপর আমি (চারও দিক থেকে) তাদের ওপর হামলা করব; তাদের সম্মুখ থেকে, তাদের পেছন থেকে, তাদের ডানদিক থেকে এবং তাদের বামদিক থেকেও। আর তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না। [সূরা আ'রাফ : ১৭]

---

[৩২৩] দেখুন : তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন*, ২০/১২৭, বাগাবী, *মাআ'লিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, ৬/২৮৪, কুরতুবী, *আলজামি' লি আহকামিল কুরআন*, ১৪/৫৩ ও ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ৬/৩৩২।

Scanned with CamScanner

যখনই ধর্মীয় বিষয়ে মনোযোগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, মানুষের ঈমানী চেতনায় জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাদের অন্তরজগতের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে মসজিদ ও রাব্বুল মসজিদের সঙ্গে; তখনই শয়তান তৎপর হয়েছে এবং যিরইয়াব বা যিরইয়াব-শ্রেণির মানুষের মাধ্যমে আপন অপচেষ্টা জোরদার করেছে।

যিরইয়াবের মৃত্যু হয়েছে আজ থেকে বার শ' বছরেরও অধিক সময় পূর্বে, অথচ আজও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে যিরইয়াবের ব্যাপক খ্যাতি রয়েছে। সেসব দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনেকেই সামাহ বিন মালিক আলখাওলানী, আমবাসা বিন সুহাইম-এর নাম শোনেনি, নাম শোনেনি উকবা ইবনুল হাজ্জাজ, আবদুর রহমান আদদাখিল বা আবদুর রহমান আলআওসাত-এর, তারা জানে না রোম-পারস্য, উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুসে অভিযান পরিচালনাকারী মহান অনেক মুসলিম সেনাপতির নাম; কিন্তু তারা যিরইয়াবের নাম শুনেছে, তারা যিরইয়াবের জীবন সম্পর্কে জানে, জানে তার জীবনের বিভিন্ন দিকের কথা। এমনকি এখনও তিউনিসিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশে তার রচিত আন্দালুসী লোকসঙ্গীতের চর্চা হয়, তার জীবনী পাঠদান করা হয়, তরুণ প্রজন্মের সামনে তাকে একজন মহান ব্যক্তি, আলোকিত ও জাগরিত সমাজের পথিকৃৎ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং সামাজিক স্থবিরতা দূরীকরণ ও সঙ্গীতশাস্ত্রের বিকাশে তার সংগ্রাম ও লড়াইয়ের কথা গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করা হয়। আজকের প্রজন্ম জানেই না যে, এই যিরইয়াব ও তার পদাঙ্ক অনুসরণকারী আন্দালুসী সঙ্গীত সাধকগণই মুসলিম আন্দালুসের পতনের অন্যতম কারণ।

৩. উমাইয়া প্রশাসনের দুর্বলতার আরেক কারণ ওমর বিন হাফছুন

ওমর বিন হাফছুন (২৪০-৩০৬ হি./৮৫৫-৯১৯ খৃ.) বংশগত দিক থেকে মিশ্র প্রজন্মের মুসলমান ছিল অর্থাৎ মায়ের দিক থেকে সে ছিল মূল আন্দালুসী বংশোদ্ভূত। পেশায় সে ছিল একজন দস্যু। তার নেতৃত্বে চল্লিশজনের একটি দস্যুদল ছিল। আন্দালুসের মুসলিম সমাজ যখন ঈমানী চেতনা পরিত্যাগ করে সম্পদমুখী হল, তখন ওমর বিন হাফছুনের দল ভারী হল এবং তার দলের সন্ত্রাসী তৎপরতা বেড়ে গেল। সে তার দলবল নিয়ে আন্দালুসের দক্ষিণ অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করল, মানুষের মাঝে লুটতরাজ চালাল এবং ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করল। দুষ্ট প্রকৃতির মানুষেরা তার দলে

Scanned with CamScanner

যোগ দিয়ে তার অনুসারী হতে লাগল এবং তার প্রভাব দিনে দিনে বৃদ্ধি পেল। এভাবে একপর্যায়ে ওমর বিন হাফছুন পুরো দক্ষিণ আন্দালুসে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল।

২৮৬ হিজরীতে (৮৯৯ খৃস্টাব্দে) ওমর বিন হাফছুন এমন এক ঘৃণিত কাজ করল, যার দৃষ্টান্ত মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে বিশেষত আন্দালুসের ইতিহাসে খুব বেশি নেই। বিদ্রোহ ঘোষণার ২২ বছর পর নিজ আমলের শেষ দিকে উমাইয়া খেলাফতের ওপর মরণ কামড় বসানোর উন্মাদনায় ওমর বিন হাফছুন নিজের ধর্মপরিচয় পাল্টে মুরতাদ হয়ে গেল এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হল। ইসলামী নাম বদলে সে তার নতুন নাম রাখল স্যামুয়েল। তার লক্ষ্য ছিল এর মাধ্যমে উত্তরের খৃস্টরাষ্ট্র লিওন সাম্রাজ্যের সমর্থন লাভ করা। ধর্মত্যাগের পর তার মুসলমান অনুসারীদের অনেকে তার দল ত্যাগ করলেও বাস্তবেই সে লিওন সাম্রাজ্যের সমর্থন লাভ করল। ঘটনাক্রমে তখন খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোতে মুসলমানদের সামরিক অভিযানও স্থগিত ছিল।[৩২৪]

এ সুযোগে লিওন সাম্রাজ্য ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় লোলুপ দৃষ্টি দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখাতে শুরু করল। উত্তর দিক থেকে খৃস্টান সাম্রাজ্যের আক্রমণ আর দক্ষিণ দিক থেকে ওমর বিন হাফছুন বা স্যামুয়েলের আক্রমণ, মুসলিম আন্দালুস তখন হঠাৎ করেই শিকার হল দ্বিমুখী আক্রমণের।

দুর্বলতার যুগের শেষসময়ে আন্দালুস পরিস্থিতির ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি

প্রচণ্ড দুর্বল ও অবসন্ন অবস্থায় মুসলিম আন্দালুস বাষট্টিটি বছর অতিবাহিত করার পর এবং পতনের কার্যকারণগুলোর পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার পর আমরা এখন উমাইয়া স্বাধীন প্রশাসন আমলের দুর্বল যুগের শেষ সময়ে অর্থাৎ ৩০০ হিজরীতে (৯১৩ খৃস্টাব্দে) আন্দালুস পরিস্থিতির ওপর সাধারণভাবে দৃষ্টিপাত করব, এ সময় বিরাজমান গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্যাবলির কথা তুলে ধরব এবং দুর্বলতার উল্লিখিত কার্যকারণসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব।

---

[৩২৪] ইবনে আ'মারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৩৯।

Scanned with CamScanner

১. আন্দালুসের অভ্যন্তরে ক্রমাগত বিদ্রোহের ঘটনা

এ সময় আন্দালুসের অভ্যন্তরে অসংখ্য বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে; বরং অনেক অঞ্চলে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্যামুয়েলের স্বাধীনতা ঘোষণা। সে দক্ষিণ আন্দালুসে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং একটি উপরাষ্ট্র গঠন করে। গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো দুর্গ সে নিজ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ইসিজা (Ecija) ও জাইয়ানের সকল দুর্গ তার দখলে এসে যায়, যেগুলো আন্দালুস বিজয়ের সময় পুরো আন্দালুসের দুর্ভেদ্যতম দুর্গ হিসেবে বিবেচিত হত। গ্রানাডা নগরীও তার দখলে ছিল। সে তার রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে নির্বাচন করেছিল আন্দালুসের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে আলমারিয়া শহরের পাশের একটি এলাকাকে এবং এর নাম রেখেছিল 'বাবিস্টার'।[৩২৫]

এ ধরনের আরেকটি বড় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল সেভিলে ইবনুল হাজ্জাজের নেতৃত্বে। সেভিলের বিদ্রোহই স্যামুয়েলকে রাজধানী কর্ডোভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[৩২৬]

তৃতীয় আরেকটি বড় বিদ্রোহ হয়েছিল পূর্ব আন্দালুসে ভ্যালেন্সিয়া এলাকায়। চতুর্থ বড় বিদ্রোহটি হয়েছিল উত্তর-পূর্বে জারাগোযা অঞ্চলে। জারাগোযায়ও কর্ডোভার উমাইয়া প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। আন্দালুসের পশ্চিমাঞ্চলে পঞ্চম আরেকটি বিদ্রোহ হয়েছিল আবদুর রহমান আলজিল্লীকীর নেতৃত্বে। টলেডোতে সংঘটিত বিদ্রোহকে গণ্য করা যেতে পারে ষষ্ঠ বড় বিদ্রোহরূপে।

এককথায়, উমাইয়া প্রশাসনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অসংখ্য বিদ্রোহ পুরো আন্দালুস জুড়ে সংঘটিত হয় এবং শেষে পরিস্থিতি এই দাঁড়ায় যে, কর্ডোভা-কেন্দ্রিক মূল উমাইয়া প্রশাসনের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ কেবল কর্ডোভা ও তার আশেপাশের কয়েকটি গ্রামেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে আর পুরো দেশ চলে যায় বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে।[৩২৭]

এভাবে মুসা বিন নুসাইর ও তারেক বিন যিয়াদের বিজিত আন্দালুস ও আবদুর রহমান আদদাখিলের হাতে গড়া উমাইয়া সালতানাত ৩০০

---

[৩২৫] বিস্তারিত জানতে : ইবনুল খতীব, *আলইহাতা ফী আখবারি গারনাতা*, ২৪/৩৮।

[৩২৬] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১২৫।

[৩২৭] বিস্তারিত জানতে : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৩৩।

Scanned with CamScanner

হিজরীতে (৯১৩ খৃস্টাব্দে) এসে সুতা-ছেঁড়া মালার দানার মতো খসে পড়ে, এক নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দালুসের শাসনব্যবস্থা বিভক্ত হয়ে যায় শতধা নেতৃত্বে। প্রত্যেক নেতা-ই অপর নেতার সঙ্গে যুদ্ধ-সংঘাতে ব্যতিব্যস্ত; প্রত্যেকেরই চাওয়া 'এক টুকরো' মাটি আর 'এক-পৃথিবী' সম্পদ!

২. তৃতীয় খৃস্টান রাষ্ট্রের উদ্ভব

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইতঃপূর্বে আন্দালুসের অভ্যন্তরেই ক্ষুদ্র দু'টি খৃস্টরাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করেছিল। একটি হল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে লিওন রাষ্ট্র, অপরটি উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অ্যারাগোন রাষ্ট্র; যার রাজধানী বার্সেলোনা। দু'টি রাষ্ট্রই সৃষ্টি হয়েছিল প্রশাসক আমলের দ্বিতীয় স্তরে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। এবার স্বাধীন উমাইয়া প্রশাসন আমলের এই দ্বিতীয় স্তরে এসে দেশের উত্তর অঞ্চলে (লিওন সাম্রাজ্য ছাড়াই) তৃতীয় আরেকটি খৃস্টরাজ্য গজিয়ে ওঠে। এর নাম নাফার সাম্রাজ্য। বর্তমান স্পেনে এ অঞ্চলটি বাস্কিউ প্রদেশ (The Basque Country) নামে পরিচিত, যা দীর্ঘদিন যাবৎ স্পেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য আন্দোলন করে আসছে।

খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো উমাইয়া প্রশাসন আমলের প্রথম স্তরেও মুসলিম সাম্রাজ্যকে ভয় করত, সমীহের নজরে দেখত। দ্বিতীয় স্তরে এসে তারাই ইসলামী সালতানাতের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। তারা মুসলিম সাম্রাজ্যের উত্তর অঞ্চলে একাধিকবার হামলা ও অভিযান চালায় এবং উত্তর আন্দালুসের শহরগুলোতে মুসলিম নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করে।

৩. যুবরাজকে হত্যা

এ সময় আরও একটি গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হয়, যা দ্বারা তখনকার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির নাজুকতা কিছুটা হলেও নিরূপণ করা যাবে। তৎকালীন আমীর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আলআওসাত কর্তৃক নির্বাচিত ওলিয়ে আ'হদ (যুবরাজ) মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহকে তার ভাই মাতরাফ বিন আবদুল্লাহ হত্যা করে। ফলে বিদ্যমান সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির নাজুকতা আরও বৃদ্ধি পায়।[৩২৮]

---

[৩২৮] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৫০।

Scanned with CamScanner

এ পরিস্থিতি তখনই সৃষ্টি হয়েছিল, যখন মুসলমানগণ বিরোধ-বিসংবাদে জড়িয়ে পড়েছিল এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছিল; যখন তারা ঈমানী দায়িত্ব পরিহার করে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সম্পদ ও বিলাসিতার পেছনে, যিরইয়াবদের পেছনে এবং আত্মনিমগ্নতায়। একদিকে উত্তর অঞ্চলে কয়েকটি খৃস্টান রাষ্ট্রের লাগাতার আক্রমণ, অপরদিকে দক্ষিণ অঞ্চলে স্বঘোষিত মুরতাদ স্যামুয়েলের আস্ফালন, দেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য ক্ষমতালোভী ব্যক্তির বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা আন্দোলন– সবদিক থেকে যখন উমাইয়া প্রশাসন বিপর্যস্ত, তখন নতুন বিপদরূপে আবির্ভূত হয়েছিল ভবিষ্যৎ আমীরের হত্যার ঘটনা। এই জটিল ও নাজুক পরিস্থিতিতে বিস্তৃত-বিশাল ইসলামী রাষ্ট্র আন্দালুস হয়ে পড়ে যুবরাজহীন।

৪. মাগরেবে শিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব

মাগরেবে এক নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার আত্মপ্রকাশে আন্দালুস-পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। এ নবগঠিত রাষ্ট্র ছিল আন্দালুসের জন্য সবচে' বড় হুমকি। এ রাষ্ট্রের নাম ফাতেমী সাম্রাজ্য; যদিও এর সঠিক নাম হওয়া উচিত 'উবাইদিয়া সাম্রাজ্য'।

মাগরেব অঞ্চলে উবাইদিয়া সাম্রাজ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে ২৯৬ হিজরী মোতাবেক ৯০৯ খৃস্টাব্দে[৩২৯], অর্থাৎ আন্দালুসের স্বাধীন উমাইয়া প্রশাসক আমলের দ্বিতীয় স্তর শেষ হওয়ার মাত্র চার বছর পূর্বে। উবাইদিয়া সাম্রাজ্য ছিল একটি ধূর্ত ও দুষ্ট শিয়া রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রের সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল মাগরেবে সঠিক আকীদার ধারক আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'র আলিমদের হত্যা করা এবং এ অঞ্চলে শিয়া-আকীদা বিস্তারের চেষ্টা করা। উবাইদিয়া সালতানাতের পৃষ্ঠপোষকতা ও কার্যকরী ভূমিকায় অতি দ্রুত গতিতে মরক্কো থেকে আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া এবং পরবর্তী সময়ে মিশর, শাম, হেজায ও অন্যান্য অঞ্চলে এ মতবাদ বিস্তার লাভ করে।

উবাইদিয়া সাম্রাজ্যের আত্মপ্রকাশের পরপরই ওমর বিন হাফছুন (স্যামুয়েল)

---

[৩২৯] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৬/৪৪৬।

Scanned with CamScanner

উবাইদিয়া সালতানাতের প্রধান উবাইদুল্লাহ আলমাহদীর আনুগত্যের ঘোষণা করে।[৩৩৩] নিঃসন্দেহে ধূর্ত স্যামুয়েলের এ আনুগত্য ঘোষণা উবাইদিয়া সাম্রাজ্যের প্রতি আকর্ষণ বা হৃদ্যতার কারণে ছিল না; বরং তার উদ্দেশ্য ছিল উবাইদিয়া সাম্রাজ্যের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য ও সমর-সহায়তা লাভ করা।

৫. ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য ভূখণ্ডের পরিস্থিতির অধঃপতন

আমরা যদি কিছুক্ষণের জন্য আমাদের দৃষ্টি আন্দালুস থেকে ফিরিয়ে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের পূর্ব-পশ্চিমের অন্যান্য ভূখণ্ডে নিবদ্ধ করি, তাহলে সামগ্রিকভাবে আমরা দেখতে পাব, মিশর ও শামে চলছে ইখশীদী রাজবংশের শাসন, মুসিলের ক্ষমতা ইবনে হামদানের হাতে, বাহরাইন ও ইয়ামামার কর্তৃত্ব কারামাতী সম্প্রদায়ের দখলে, ইস্পাহানে বনু বুইয়ার রাজত্ব, খোরাসান শাসন করছেন নাসর আস্‌সামানী, তাবারিস্তানের নিয়ন্ত্রণ দাইলামের কাছে, আহবাযে যুরীদীদের ক্ষমতা, কিরমানের শাসনব্যবস্থা মুহাম্মাদ বিন ইলয়াসের হাতে। আর আব্বাসী খেলাফতের অতীত প্রতাপ কেবল বাগদাদেই সীমাবদ্ধ; এমনকি ইরাকের আশেপাশের বিভিন্ন এলাকাতেও তাদের কোন ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ নেই।

এই ছিল তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সামগ্রিক পরিস্থিতি। কোন মুসলিম ভূখণ্ড থেকে সামান্য সহায়তা পাওয়ার আশা আন্দালুসের মুসলিম প্রশাসনের ছিল না। পুরো মুসলিম বিশ্ব তখন শতধা বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন।

তৎকালীন আন্দালুস পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ভাবতে বাধ্য হবেন যে, আন্দালুসে ইসলামের পতন সুনিশ্চিত ও অত্যাসন্ন। কয়েক মাস কিংবা অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই খৃস্টানশক্তি মুসলিম আন্দালুসে প্রবেশ করবে এবং নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। আবদুর রহমান আদদাখিলের ন্যায় নতুন কোন কুদরতি মুজিযার প্রকাশ না ঘটলে কিছুতেই মুসলিম আন্দালুস আসন্ন ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ পাবে না।

ঘোরতর সংকটে নিমজ্জিত আন্দালুসবাসী আন্দালুস-ইতিহাসের এই

---

[৩৩৩] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৩৫।

Scanned with CamScanner

যুগসন্ধিক্ষণে সত্যিই দয়াময় আল্লাহর কুদরতি করুণার প্রত্যাশায় প্রহর গুনছিল। তারা প্রতীক্ষায় ছিল, উমাইয়া রাজদিগন্তে নতুন কোন আবদুর রহমানের উদয় হবে।

আর সত্যিই আন্দালুসের ভাগ্যাকাশে উদিত হল নতুন এক ভাগ্যতারা; তাদের প্রত্যাশাকে বাস্তব করে আবারও আগমন হল এক আবদুর রহমানের।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপন দয়া ও অনুগ্রহে আবারও আন্দালুসের মুসলমানদের সিক্ত করলেন আসমানী অনুগ্রহে, তাদের প্রদান করলেন এক নতুন প্রশাসক, যার জিয়নস্পর্শে সকল মুসলমান একতাবদ্ধ হল, রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হল, আন্দালুসের প্রভাব-প্রতিপত্তি সমুন্নত হল, আবারও আন্দালুস পরিণত হল সার্বিক বিবেচনায় মুসলিম বিশ্বের সবচে' শক্তিশালী রাষ্ট্রে এবং তৎকালীন ইউরোপের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্ববৃহৎ শক্তিতে। আর কুদরতি সেই বিস্ময়ের নামও আবদুর রহমান, আবদুর রহমান আননাসির রহ.।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

❁

পঞ্চম অধ্যায়

উমাইয়া খেলাফতের যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবদুর রহমান আননাসির রহ.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবদুর রহমান আননাসির-এর রাজনৈতিক
ও সামরিক সংগ্রাম

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলে
আন্দালুসের নাগরিক সভ্যতার উন্নয়ন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাকাম আলমুসতানসির রহ.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিশাম আলমুআইয়াদ ইবনুল হাকাম ও আমিরিয়া সাম্রাজ্যের সূচনা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হাজিব ইবনে আবু আমির আলমানসুরের
রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রাম

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আন্দালুস-ইতিহাসের সমৃদ্ধতম যুগ
(হাজিব মুযাফফার বিন আলমানসুর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমিরিয়া সালতানাতের পতন

নবম পরিচ্ছেদ

অব্যাহত অরাজকতা
ও উমাইয়া খেলাফতের পতন

দশম পরিচ্ছেদ

পতনের কারণ অনুসন্ধান

একাদশ পরিচ্ছেদ

পৃথিবীর রত্নখণ্ড কর্ডোভা নগরী

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রথম পরিচ্ছেদ
আবদুর রহমান আননাসির রহ.
(২৭৭-৩৫০ হিজরী/৮৯১-৯৬১ খৃস্টাব্দ)

আবদুর রহমান আননাসির-এর শাসনভার গ্রহণ

উমাইয়া প্রশাসন আমলের দুর্বল স্তরের শেষদিকে আন্দালুসের পরিস্থিতি কেমন নাজুক ছিল, আমরা ইতঃপূর্বে তা জেনেছি। নিঃসন্দেহে তখন পরিস্থিতি এত নাজুক ছিল যে, তৎকালীন আন্দালুস পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধকারী ব্যক্তি ভাবতে বাধ্য হবেন, আন্দালুসে ইসলামের পতন সুনিশ্চিত ও অত্যাসন্ন। পরিস্থিতি এমন যে, কয়েক মাস বা অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই খৃস্টানশক্তি আন্দালুসে প্রবেশ করবে এবং নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

কে এই আবদুর রহমান আননাসির?

তার পূর্ণ নাম আমীরুল মুমিনীন আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ আবুল মাতরাফ আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আলমারওয়ানী। তার মাতা ছিলেন মারিয়া নাম্নী জনৈকা উম্মে ওয়ালাদ (দাসী)। তার ষষ্ঠ উর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন কুরাইশী ঈগল খ্যাত আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া। তিনি কর্ডোভাতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং কর্ডোভাতেই লালিত পালিত হন।

আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ জন্মের পরপরই পিতৃহারা হন। তার বয়স যখন মাত্র বিশ দিন, তখন তার চাচা তার পিতাকে হত্যা করে। কারণ, তার পিতা-ই তৎকালীন প্রশাসক আবদুল্লাহর (সপ্তম উমাইয়া প্রশাসক) পর পরবর্তী আমীর হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হচ্ছিলেন।

ফলে শিশু আবদুর রহমান পৃথিবীর আলোতে চোখ মেলেই মুখোমুখি হলেন এক সুকঠিন বাস্তবতার। অভ্যন্তরীণ গৃহসংঘাত ও বহিঃশত্রুর লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে ব্যতিব্যস্ত উমাইয়া রাজপ্রাসাদের তখন এই অনাথ-এতিম শিশুটির প্রতি নজর দেওয়ার সময় কোথায়?

Scanned with CamScanner

তবে তার পিতামহ আবদুল্লাহ; যিনি তাকওয়া ও খোদাভীতি, বিলাসিতামুক্ত কৃচ্ছতাপূর্ণ জীবনযাপন ও পরার্থপরতার গুণে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন এবং অত্যুচ্চ ধার্মিকতাসম্পন্ন ছিলেন, তিনিই তার এতিম পৌত্রের তারবিয়াত, শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রতিপালনের দায়িত্ব নিলেন। শিশু আবদুর রহমান শৈশবেই লাভ করলেন দরদী পিতামহের সযত্ন তত্ত্বাবধান। তার চাচাকে শাস্তিস্বরূপ কিসাস দণ্ডে দণ্ডিত করা হল। স্বয়ং আমীর আবদুল্লাহ যখন অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিশ্চিন্ত হলেন যে, আবদুর রহমানের পিতা মুহাম্মাদকে যে অভিযোগে তার ভাই হত্যা করেছে, তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তখন তিনি নিজে পুত্রকে কিসাসে দণ্ডিত করলেন।[৩৩১]

এরপর তিনি এতিম পৌত্র আবদুর রহমানের প্রতি বিশেষ যত্নবান হলেন এবং তার বিশেষ পরিচর্যা করলেন। হয়তো পিতৃহারা হওয়ার কারণেই আবদুর রহমানের প্রতি দাদার অন্তরে আলাদা স্নেহ ও সহানুভূতি তৈরি হয়েছিল। আবদুর রহমান এসব ধারাবাহিক ঘটনাচক্রের মাঝেই দিনে দিনে বড় হতে লাগলেন।

আবদুর রহমান ছিলেন আভিজাত্য, মহত্ত্ব এবং বিরল মেধা ও প্রতিভাসম্পন্ন এক যুবক। অল্প বয়সেই তিনি বয়সের তুলনায় উন্নত স্তরের জ্ঞানপ্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হলেন। বয়স দশ পেরোবার পূর্বেই তিনি কোরআন-সুন্নাহর মৌলিক পাঠ সমাপ্ত করলেন; ব্যাকরণ, কাব্যশাস্ত্র ও ইতিহাসে বুৎপত্তি অর্জন করলেন এবং বিশেষত সমরনীতি ও অশ্বারোহণ বিদ্যায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করলেন।

এ কারণে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সদ্য কৈশোর পেরোনো আবদুর রহমানকে পিতামহ আমীর আবদুল্লাহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য মনোনীত করতে লাগলেন এবং বিশেষ দিনগুলোতে সৈন্যবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণের জন্য নিজের স্থলে প্রতিনিধিরূপে তাকে পাঠাতে লাগলেন। ফলে আন্দালুসবাসী তখন থেকেই এই মেধাবী যুবককে ঘিরে আশার জাল বুনতে শুরু করল এবং আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পূর্বেই তার যুবরাজ পদে মনোনয়নের বিষয়টি একটি সুস্পষ্ট ও মীমাংসিত বিষয়ে পরিণত হল। বরং কোন কোন বর্ণনামতে দাদা আবদুল্লাহ ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসেবে তার নাম সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিলেন। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন

---

[৩৩১] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৬/৪৬৭, ইবনে আ'ষারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৫৬ ও যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৮/২৬৫।

Scanned with CamScanner

আবদুর রহমানকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন প্রদানের ইঙ্গিত হিসেবে নিজের আংটি আবদুর রহমানকে প্রদান করেছিলেন।[৩৩২]

নিঃসন্দেহে আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ তার ঊর্ধ্বতন পুরুষ আবদুর রহমান (বিন মুয়াবিয়া) আদদাখিলের জীবনেতিহাস দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম, সংগ্রাম ও লড়াই এবং ইস্পাতকঠিন সংকল্পের মাধ্যমে আবদুর রহমান আদদাখিলের উমাইয়া সালতানাত প্রতিষ্ঠার দাস্তান তার মানসপটে অঙ্কিত ছিল। আর তাই আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এমন এক লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে, আমরা যার নামকরণ করতে পারি 'দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রযাত্রা'।

আবদুর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণের সময় ইতিহাসের এই বিরল ও দুর্লভ ঘটনাও ঘটল যে, তার চাচাদের কেউ বা তার পিতামহদের (পিতার চাচাদের) কেউ তার পদপ্রাপ্তি নিয়ে আপত্তি করার বা আমীরী পদের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার চেষ্টা তো করলেনই না;[৩৩৩] বরং সর্বপ্রথম তার চাচা আহমদ বিন আবদুল্লাহ তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং সবার পক্ষ হতেই যেন স্বগতোক্তি করলেন,

> আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তোমাকে আমাদের সাধারণ ও বিশেষ নির্বিশেষে সকলের জ্ঞাতসারে নির্বাচন করেছেন। আমি আমাদের ওপর আল্লাহ তাআ'লার এই নেয়ামতের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত ছিলাম। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা; তিনি যেন আমাদের দান করেন শোকর, নেয়ামতের পূর্ণতা ও হামদের ঐশী চেতনা।[৩৩৪]

আবদুর রহমান আননাসির সম্পর্কে কিছু তথ্য

প্রাথমিক জীবন, উন্নতির পথে অব্যাহত সাধনা

আবদুর রহমান আননাসিরের কর্মময় ও বর্ণাঢ্য জীবনের সর্বদিক অধ্যয়নের জন্য ধৈর্যশীল অক্লান্ত অধ্যয়ন ও বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন, বা আমাদের এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তাই আমার এখানে তার জীবনের বিশেষ কিছু দিক আলোচনা করেই ক্ষান্ত হব।

---

[৩৩২] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/৩৭৩।

[৩৩৩] *রাসাইলু ইবনি হাযম*, ২/১৯৪।

[৩৩৪] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/৩৭৪।

Scanned with CamScanner

আবদুর রহমান আননাসির যখন শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন তার বয়স ছিল হিজরী বছর হিসেবে মাত্র বাইশ বছর; অর্থাৎ খৃস্টাব্দের হিসেবে একুশ বছর।[৩০৫] অন্যভাবে বললে, তিনি তখন আমাদের বর্তমান সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বা চতুর্থ সেমিস্টারে পড়ুয়া ছাত্রদের বয়সী ছিলেন। এটি প্রথম লক্ষণীয় বিষয়।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল, কেউ যদি মনে করে থাকেন যে, আবদুর রহমান আননাসিরের ইতিহাস তার শাসনভার গ্রহণের সময় থেকে শুরু, তাহলে তিনি ভুল করবেন। কেননা, আবদুর রহমানের শৈশব ও কৈশোরের ইতিহাসও যথেষ্ট শিক্ষায় পরিপূর্ণ। শৈশব থেকেই তিনি যে বিশেষ তারবিয়াত ও দীক্ষা লাভ করেছেন, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই।

পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখতে না দেখতেই আবদুর রহমান তার পিতাকে হারান; তখনও তার বয়স তিন সপ্তাহও হয়নি। তখন থেকেই তার প্রতিপালনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন পিতামহ আমীর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ। আমীর আবদুল্লাহ আবদুর রহমানকে এমনভাবে প্রতিপালন করেন, যেন তিনি নিজে যে খেদমত আঞ্জাম দিতে পারেননি, পৌত্র তা আঞ্জাম দিতে পারেন। তিনি তাকে গড়ে তোলেন ইলমের প্রসারতা, নেতৃত্বের দক্ষতা, সমরকুশলতা ও সুদক্ষ পরিচালন যোগ্যতায়; তাকে গড়ে তোলেন তাকওয়া ও খোদাভীতি, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, মহত্ত্ব ও আভিজাত্যের চেতনায়। তিনি আবদুর রহমানকে প্রদান করেন কাছের-দূরের সবার সঙ্গে ন্যায় আচরণের শিক্ষা, নিপীড়িত-মযলুমের পাশে দাঁড়ানোর দীক্ষা। তিনি আবদুর রহমানকে এমন আদর্শে গড়ে তোলেন, যেন আবদুর রহমান হতে পারেন 'আবদুর রহমান আননাসির'।

আজকের মুসলিম সমাজের পিতাদের জন্য, মুসলিম সমাজের কর্ণধারদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা যে,

> আমরা নিজেরা যদি আবদুর রহমান আননাসির না হয়ে থাকি, (চেষ্টা করি,) আমাদের সন্তানেরা যেন হতে পারে এক একজন আবদুর রহমান আননাসির।

যদিও অনেক ভারী দায়িত্ব; কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষণা তো হল,

---

[৩০৫] ইবনুল আছীর, *আলকামিল*, ৬/৪৬৭, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৫৬ ও যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৮/২৬৫।

Scanned with CamScanner

«كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

তোমরা প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক; প্রত্যেকেই আপন আপন অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৩৩৬]

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল, আবদুর রহমান যখন শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন তিনি যেমন মহান আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন; একই সঙ্গে তার মধ্যে ছিল প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। নিজের প্রতি তার এই বিশ্বাস ছিল যে, আমি পারব পরিবর্তন করতে। অন্তস্তলে তিনি ধারণ করেছিলেন এই কোরআনী প্রতিশ্রুতির প্রতি অন্তহীন বিশ্বাস,

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউ তোমাদেরকে পরাস্ত করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদেরকে অসহায় ছেড়ে দেন, তবে তিনি ছাড়া কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহরই ওপর ভরসা করা। [সূরা আলে-ইমরান : ১৬০]

ঈমানী চেতনা ও আত্মবিশ্বাসের বলে বলীয়ান আবদুর রহমান আননাসিরের প্রশান্ত অন্তরে একদিনের জন্যও সংশয় বা হতাশা দানা বাঁধতে পারেনি। কখনো তার মনে চিন্তা আসেনি যে, পরিবর্তনের স্বপ্ন অত্যন্ত সুকঠিন বা অসম্ভব; সংস্কারের কোন আশা নেই। আর তাই মাত্র বাইশ বছর বয়সেই তিনি পেরেছেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আন্দালুসের শাসনভার গ্রহণ করতে; নিজের কাঁধে এমন পর্বতকঠিন দায়িত্ব তুলে নিতে, আসমান-যমীন-পর্বতমালাও যার ভারে নুয়ে পড়বে; এমন দুর্লঙ্ঘ্য মিশনে অগ্রসর হতে, হাজার বছরের ইসলামের ইতিহাসেই বা কঠিনতম মিশন হিসেবে বিবেচিত হবে।

[৩৩৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪১৬।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আবদুর রহমান আননাসির-এর রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রাম

ইতিহাসের পট পরিবর্তন

এক চরম সংকটময় মুহূর্তে আবদুর রহমান আননাসির আন্দালুসের শাসনভার গ্রহণ করলেন। আর সুবহানাল্লাহ! মুহূর্তের মধ্যে যেন জিয়নকাঠির জাদুর স্পর্শে দুর্বলতা শক্তিতে পরিণত হল; লাঞ্ছনা মর্যাদায় এবং বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা একতায় রূপান্তরিত হল। তার স্বভাব আভিজাত্য, নেতৃত্বগুণ আর নিয়ন্ত্রণ দক্ষতাবলে অন্ধকার ছিন্ন করে উদিত হল এক উজ্জ্বল আলোকধারা, যার আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হল পুরো আন্দালুসের দশ-দিগন্ত।

শাসনভার গ্রহণ করার পরই আবদুর রহমান আননাসির কুদরতপ্রদত্ত ব্যক্তিযোগ্যতা, ইসলামী ব্যক্তিত্বের যাবতীয় সুগঠিত উপাদানে সমৃদ্ধ দীক্ষাজ্ঞান ও আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাসের শক্তিকে সঙ্গী করে ইতিহাস বদলে দেওয়ার মিশনে অগ্রসর হলেন। এ লক্ষ্যে তিনি নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলেন।

১. গুরুত্বপূর্ণ পদ ও দায়িত্ব পুনঃবণ্টন (কর্ডোভা প্রশাসনে পরিশুদ্ধি অভিযান)

আবদুর রহমান আননাসির যখন আন্দালুসের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন উমাইয়া প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে কর্ডোভা ও আশেপাশের কিছু গ্রাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না।[৩৩৭] যদিও কর্ডোভাকে আন্দালুসের সবচে' বড় নগরী হিসেবে গণ্য করা হত এবং রাজধানী-শহর হওয়ায় কর্ডোভা পুরো আন্দালুসের

---

[৩৩৭] মাক্কারী, *নিফহুত আ'তীব নুবাল্লা*, ৮/২৫৬।

Scanned with CamScanner

কেন্দ্রবিন্দু বলে বিবেচিত হত; কিন্তু আয়তনে তা পুরো আন্দালুসের এক-দশমাংশের বেশি ছিল না। আবদুর রহমান আননাসির এই ক্ষুদ্র এলাকা থেকেই তার ইতিহাস পরিবর্তনের মিশন শুরু করলেন।

প্রথমেই তিনি নিজের চারপাশে অর্থাৎ রাজদরবারের সভাসদ তালিকায় (আমাদের বর্তমানের পরিভাষায় রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী পরিষদে) পরিবর্তন আনলেন। পূর্ব থেকে বিভিন্ন পদে আসীন যাদেরকে তিনি উক্ত পদের জন্য অনুপযুক্ত বিবেচনা করলেন, তাদেরকে অপসারণ করে যাদেরকে দায়িত্ব পালনে দক্ষ ও উপযুক্ত মনে করলেন, তাদেরকে সেসব পদে আসীন করলেন।[৩৩৮]

এরপর তিনি আলিমদেরকে যথাযথ পদমর্যাদা প্রদান করলেন। তাদের সম্মান ও মর্যাদা নিজের চেয়েও উন্নত করলেন। তাদের আদেশ-নিষেধ ও পরামর্শ অবনত মস্তকে মেনে নিলেন। আলিমদের যে কোন নির্দেশ জনগণের মাঝে বাস্তবায়নের পূর্বে প্রথমে নিজের ওপর বাস্তবায়ন করলেন। ব্যক্তিজীবন ও সমাজে শরীয়তের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন।

বর্ণিত আছে, তিনি নিয়মিত জুমার খোতবায় উপস্থিত থাকতেন। তখন কর্ডোভা কেন্দ্রীয় মসজিদের খতীব ছিলেন তৎকালীন কর্ডোভার অন্যতম নেতৃস্থানীয় ও শ্রদ্ধাভাজন আলিম মুনযির বিন সাঈদ রহ.। মুনযির বিন সাঈদ অত্যন্ত কঠিন ও জোরদার ভাষায় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের আলোচনা করতেন; এমনকি স্বয়ং আমীর আবদুর রহমানের উপস্থিতিরও পরোয়া করতেন না; বরং তার কর্মকাণ্ডের ত্রুটিসমূহের কঠোর সমালোচনা করতেন।

আবদুর রহমান আননাসির নিজের বসবাসের জন্য একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। মুনযির বিন সাঈদ রহ. একদিন জুমার খোতবায় এর কঠোর ও মাত্রাতিরিক্ত সমালোচনা করলেন এবং প্রাসাদ নির্মাণের কারণে আবদুর রহমান আননাসিরকে তিরস্কার করলেন।

নামায শেষে বাড়িতে ফিরে আবদুর রহমান আননাসির মন্তব্য করলেন, আল্লাহর শপথ! আজকের খোতবায় মুনযির তো মূলত আমাকেই উদ্দেশ্য করেছেন। তার আলোচনার লক্ষ্যবস্তু আমি ছাড়া অন্য কেউ নয়। তিনি আজ

---

[৩৩৮] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৫৮।

Scanned with CamScanner

আমার মাত্রাতিরিক্ত সমালোচনা করেছেন এবং তিরস্কারের সীমা লঙ্ঘন করেছেন। আমাকে সংশোধনের ক্ষেত্রে তিনি ভারসাম্যপূর্ণ নীতির ওপর অটল থাকতে পারেননি। তিনি তো আমার হৃদয় ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছেন। ভয় হচ্ছিল, হয়তো তিনি হাতের ছড়ি দিয়ে আমাকে প্রহার করবেন।

আবদুর রহমানের মন্তব্য শুনে পাশে উপবিষ্ট নিকটভাজন কেউ মুনযিরকে জুমার খতীবের দায়িত্ব থেকে অপসারণের পরামর্শ দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন যে, ইলম, আমল ও উৎকৃষ্টতায় অনন্য মুনযির বিন সাঈদের মতো ব্যক্তিকে অপসারণ করা হবে?! তাকে বরখাস্ত করা হবে সুপথ হতে বিচ্যুত, বক্রপথের পথিক এক ব্যক্তির মনোতুষ্টির জন্য?! আল্লাহর কসম! কস্মিনকালেও তা হতে পারে না। আমি তো জুমার নামাযে আমার ও আমার আল্লাহর মাঝে মুনযির বিন সাঈদের ন্যায় তাকওয়া ও ধার্মিকতা এবং ন্যায় ও সততাসম্পন্ন মধ্যস্থতাকারীকে না রাখতে আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধ করি। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুনযির বিন সাঈদ এ পদে বহাল ছিলেন।[৩৩৯]

এ ধরনের উন্নত আদর্শ ও সমুন্নত নীতিকে সামনে রেখে আবদুর রহমান আননাসির কর্ডোভাবাসীর তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। সমাজের সকল শ্রেণির সব মানুষের আদর্শ ও নমুনা হওয়ার যোগ্যতা তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

২. বিদ্রোহ দমন ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা

কর্ডোভার অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সুবিন্যস্তকরণ সঠিকভাবে সমাপ্ত হওয়ার পর আবদুর রহমান আননাসির বাইরের বিভিন্ন ইস্যুতে পদক্ষেপ নিতে শুরু করলেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সমগ্র আন্দালুস-ভূমিতে তখন অনেকগুলো বিদ্রোহ চলছিল, বিভিন্ন অঞ্চল বিদ্রোহ ঘোষণা করে উমাইয়া প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে তিনি তার অন্যতম সেনাপতি আব্বাস বিন আবদুল আযীয আলকুরাশীর নেতৃত্বে রাবাহ দুর্গে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। সেখানে জনৈক বার্বার নেতা ফাত্হ বিন মুসা বিন যুননূন বিদ্রোহ করেছিল; তার সঙ্গে ছিল তার শক্তিশালী মিত্র আরযাব্লিশ। কয়েক বারের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ফাত্হ বিন মুসা পরাজিত হল আর তার মিত্র আরযাব্লিশ

---

[৩৩৯] আবুল হাসান নুবাহী, *তারীখু কুযাতিল আন্দালুস*, পৃ : ৭০, ইবনে খাক্বান, *মাতমাহুল আনফুস*, পৃ : ১০০ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৫৭১।

Scanned with CamScanner

নিহত হল। সেনাপতি আব্বাস তার কর্তিত মস্তক কর্ডোভায় পাঠিয়ে দিলে আবদুর রহমান আননাসির দেশের সকল বিদ্রোহীদের সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে কর্তিত মাথাটি নগরপ্রাচীরের প্রধান দ্বারের সামনে ঝুলিয়ে দিলেন। এ অভিযানের মাধ্যমে ৩০০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রাবাহ দুর্গ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা বিদ্রোহমুক্ত হল। অর্থাৎ আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনভার গ্রহণের মাত্র এক মাস পরের ঘটনা এটি।

এরপর তিনি জুমাদাল উলা মাসে পশ্চিম আন্দালুসে অন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এ অভিযানে ইবনে হাফছূনের অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ইসেজা নগরী পুনরুদ্ধার হল এবং সেখানকার বিদ্রোহীদের ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। নগরপ্রাচীর ও শানীল (The Genil) নদের[৩৪০] ওপর স্থাপিত সেতুটি ভেঙে ফেলা হল, যেন বাইরের সঙ্গে শহরটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং নগরবাসীর পক্ষে পুনরায় বিদ্রোহ করা সম্ভব না হয়।

এরপর স্বয়ং আবদুর রহমান আননাসির সেনাপতি হিসেবে একটি সামরিক অভিযানে বের হলেন। মূলত সৈন্যদের অন্তরে উদ্দীপনা, বীরত্ব ও দৃঢ় সংকল্পবোধ জাগিয়ে তুলতেই তিনি নিজে সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বাহিনী নিয়ে তিনি ওমর (স্যামুয়েল) বিন হাফছূনের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।[৩৪১] প্রথমেই স্যামুয়েলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার এবং এ অভিযানে তিনি নিজেই নেতৃত্ব দেওয়ার পেছনে তিনটি কার্যকারণ নিহিত ছিল।

১. এ বিষয়ে কেউ-ই দ্বিমত করবেন না যে, আপন অপরাধের কারণে স্যামুয়েল মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত ছিল। কেননা, সে ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মুসলমানদের একটি দলকে জড়িয়ে তাদেরকে বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল। ফলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য (ফরয) হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

---

[৩৪০] এই শানীল নদ সম্পর্কেই ইবনুল খতীব রহ. তার ঐতিহাসিক কাব্য-মন্তব্যটি করেছিলেন,

وَمَا لِيصْرَ تَفْخَرُ بِنِيلِهَا وَأَلْفٌ مِنْهُ فِي شَنِيلِهَا

মিসর কী করে তার নীল নদ নিয়ে গর্ব করে?! গ্রানাডার এক শানীল নদেই তো আছে হাজার নীল নদ! মুসলিম প্রতীচ্যে আরবী 'শীন' অক্ষরের বর্ণমান এক হাজার। আর নীল শব্দের শুরুতে শীন যুক্ত করলে হয় 'শানীল' বা হাজার নীল! (দেখুন : ইবনুল খতীব, *আলইহাতা ফী আখবারি গারনাতা*, ১/১৭২) (অনুবাদক)

[৩৪১] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৫৯।

Scanned with CamScanner

২. ইবনে হাফছুন ছিল আন্দালুসে অবস্থানরত বিদ্রোহীদের মধ্যে সবচে' শক্তিশালী এবং ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সবচে' বড় হুমকি। তাকে রেখে অন্যান্য বিদ্রোহীদের দমনে অগ্রসর হওয়ার অর্থ প্রকারান্তরে তার কেন্দ্রকেই শক্তিশালী করা; বরং অন্যান্য বিদ্রোহীদের মনোবল বাড়িয়ে দেওয়া। সবাই যখন দেখবে, কর্ডোভা-প্রশাসন ইবনে হাফছুনের মুখোমুখি হতে বিলম্ব করছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই কর্ডোভার শাসনব্যবস্থা সকলের কাছে তুচ্ছতা ও অবহেলার শিকার হবে।

৩. এর মাধ্যমে তিনি কর্ডোভার সেসব নাগরিককেও তার সামরিক অভিযানে জড়িত করতে সক্ষম হন, যারা এ সময় বিদ্রোহী চেতনা লালন করছিল। কেননা, এ লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট একেবারেই সুস্পষ্ট, এটি ধর্মত্যাগীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ।

স্যামুয়েলের বিদ্রোহ দমনের পথে

স্যামুয়েলের বিরুদ্ধে এ অভিযান ৩০০ হিজরীর শাবান, রমযান ও শাওয়াল পূর্ণ তিন মাস স্থায়ী হল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তিনি ৩০০ হিজরীতেই শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। এ অভিযানে তিনি আন্দালুসের অন্যতম সুরক্ষিত নগরী জাইয়ান পুনরুদ্ধার করলেন। পুনরুদ্ধার করলেন মূল বিদ্রোহী দুর্গগুলোর মধ্য হতে প্রায় সত্তরটি দুর্গ। এসব দুর্গে অবস্থানরত ইবনে হাফছুনের বাহিনীকে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হলেন।[৩৪২] কিন্তু এরপরও স্যামুয়েল বিন হাফছুনের প্রভাব ও শক্তিতে একটুও ভাটা পড়ল না। কারণ, সে উত্তর অঞ্চল থেকে খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর এবং দক্ষিণ দিক থেকে মাগরেবের উবাইদী (ফাতেমী) রাষ্ট্রের সহায়তা লাভ করছিল। পাশাপাশি সেভিল নগরীর সামরিক সহায়তা তো ছিলই। সেভিল তখন বনু হাজ্জাজের জনৈক মুসলিম শাসনকর্তার অধীনে থাকলেও সে কর্ডোভার কেন্দ্রীয় সরকারের অবাধ্য ছিল আর তার অধীনে ছিল বিশাল এক বাহিনী। আবদুর রহমান আননাসির স্যামুয়েলের এসব সহায়তার পথ রুদ্ধ করার পদ্ধতি নিয়ে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করলেন। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রথমে কর্ডোভার পর দক্ষিণের সবচে' বড় নগরী সেভিলে অভিযান

---

[৩৪২] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৬০-১৬৩ ও মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/৩৭৬।

Scanned with CamScanner

পরিচালনা করবেন। তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তার হৃদয়ে বদ্ধমূল ইসলামী চেতনাবোধের যুক্তিতে। তিনি আশান্বিত ছিলেন, তিনি নিজে যদি সেভিলে যান এবং সেভিলের প্রশাসককে তার দলে যোগ দিতে বাধ্য করতে পারেন কিংবা সে বশ্যতা স্বীকার করে সেভিলের বিশাল মুসলিম বাহিনী নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে উমাইয়া প্রশাসন আরও শক্তিশালী হবে এবং তার প্রভাব আরও সুদৃঢ় হবে।

আল্লাহ তাআ'লার অনুগ্রহে তিনি যেমন প্রত্যাশা করলেন, বাস্তবেও তেমনই ঘটল। শাসনভার গ্রহণের এক বছরেরও কম সময় পূর্বেই তিনি সেভিল সফর করলেন এবং পুনরায় সেভিলকে উমাইয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার অধিভুক্ত করতে সক্ষম হলেন। এর ফলে তার প্রভাব-প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পেল এবং শক্তির পাল্লাও ভারী হল। সেভিলের দিক থেকে আসা পশ্চিমা সহায়তার পথ রুদ্ধ করে তিনি পুনরায় স্যামুয়েলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলেন এবং তার কাছ থেকে পর্যায়ক্রমে দক্ষিণ আন্দালুসের পার্বত্য নগরী রুন্দা (Ronda), সিডোনিয়া ও কারামোনা নগরী পুনরুদ্ধার করলেন।

এরপর আবদুর রহমান আননাসির দক্ষিণে আরও গভীরে অগ্রসর হয়ে জাবালে তারিক প্রণালী পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং প্রণালীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। এর ফলে দক্ষিণ দিক থেকে জাবালে তারিক প্রণালী হয়ে আসা উবাইদী (ফাতেমী) রাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতার পথও রুদ্ধ হয়ে গেল।

আবদুর রহমান আননাসির তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে জাবালে তারিক প্রণালী পাড়ি দিয়ে ভূমধ্যসাগরের পথে আসা উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর সহায়তার পথও বন্ধ করে দিলেন। এ সময় তিনি সমুদ্রে ইবনে হাফছুন বাহিনীর কিছু নৌযানের সন্ধান পেলেন, যেগুলো মাগরেব অঞ্চল থেকে তার জন্য সামরিক সাহায্য সরবরাহে ব্যবহৃত হত। তিনি সেগুলো জ্বালিয়ে দিলেন। এভাবে আবদুর রহমান আননাসির স্যামুয়েলের সাহায্যপ্রাপ্তির সকল পথ বন্ধ করে দিলেন।[৩৪৩]

ফাঁদে আটকা পড়া স্যামুয়েল বাধ্য হয়ে আবদুর রহমান আননাসিরের কাছে এই মর্মে সন্ধি ও মৈত্রী প্রস্তাব পাঠাল যে, চুক্তির বিনিময়ে সে আবদুর রহমান আননাসিরকে তার দখলে থাকা ১৬২টি দুর্গ প্রদান করবে। আবদুর

---

[৩৪৩] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৬৪-১৬৫ ও তারীখে ইবনে খালদুন, ৪/১৩৯।

Scanned with CamScanner

রহমান ভেবে দেখলেন, দেশ এখন বিদ্রোহ ও বিচ্ছিন্নতায় শতধা বিভক্ত; এ প্রস্তাব মেনে নিলে তিনি অন্যান্য বিদ্রোহ দমনে পূর্ণ শক্তি নিয়ে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। উপরন্তু ১৬২টি দুর্গ তার অধিকারে আসবে এবং 'স্যামুয়েল সমস্যার'ও আপাতত সমাধান হবে। তাই তিনি স্যামুয়েলের সন্ধি প্রস্তাব মেনে নিলেন।[৩৫৪]

সবাইকে অবাক করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আকস্মিক অভিযান

স্যামুয়েলকে দমনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অভিযানের ফলে দক্ষিণ আন্দালুসের বিশাল অঞ্চলে আবদুর রহমানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল। দক্ষিণের শহর কর্ডোভা, সেভিল, জাইয়ান ও ইসেজা এখন তার নিয়ন্ত্রণে। পাশাপাশি অনেকগুলো দুর্গও এখন তার বশীভূত। তৎকালীন মুসলিম আন্দালুসের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ ইতোমধ্যে তার নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এটি বিবেচনাযোগ্য প্রথম বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয় হল স্যামুয়েল তখনও অনেকগুলো দুর্গের মালিক ছিল। আন্দালুসের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের ওপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। অবশ্য খৃস্টান রাষ্ট্রসমূহ, উমাইদী রাষ্ট্র ও সেভিল থেকে বহিঃসাহায্যের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং পূর্বের তুলনায় তার পদচারণা ও অনিষ্ট-আশঙ্কা অনেকটা সীমিত হয়ে পড়েছিল।

তৃতীয়ত কর্ডোভার উত্তরে অবস্থিত টলেডোতে তখনও বিদ্রোহ চলছিল। চতুর্থত উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে জারাগোযায়ও বিদ্রোহ চলছিল। পঞ্চমত আন্দালুসের পূর্বাঞ্চলে ভ্যালেন্সিয়ায় বিদ্রোহ চলছিল। ষষ্ঠত আন্দালুসের পশ্চিমাঞ্চলে আবদুর রহমান আলজিল্লীকীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ চলছিল।

অর্থাৎ সে সময় (৩০২ হিজরীতে/৯১৫ খৃস্টাব্দে) পুরো মুসলিম আন্দালুস ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল, যার একটি মাত্র অংশের নিয়ন্ত্রণ ছিল আবদুর রহমান আননাসিরের হাতে। কর্ডোভা, সেভিল ও তৎপার্শ্ববর্তী কিছু এলাকা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আয়তনে তা ছিল পুরো আন্দালুসের এক-ষষ্ঠাংশের কাছাকাছি। আর বাকি পাঁচ অংশ ছিল পাঁচজন বিদ্রোহী নেতার দখলে। সুতরাং সকলের ধারণা এটাই ছিল যে, আবদুর রহমান আননাসির এখন এই পাঁচটি বিদ্রোহী কেন্দ্রের কোন একটি, বিশেষত যেটি কর্ডোভার সবচে'

---

[৩৫৪] তারীখে ইবনে খালদূন, ৪/১৩৯।

Scanned with CamScanner

কাছে, তার ওপর নতুন করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু যে কেউ জানলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে যে, আবদুর রহমান আননাসির এসব বিদ্রোহের একটিও দমনে অগ্রসর না হয়ে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন উত্তর-পশ্চিম দিকে, সরাসরি খৃস্টান রাষ্ট্র লিওন-এর প্রতি। তিনি সেখানে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। তারা সে যুদ্ধে জয়লাভ করল এবং প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী নিয়ে সে বছরই ফিরে এল। কিন্তু লিওনের সরকার নিজেদের এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মনস্থ করল এবং মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় হামলা করল। আবদুর রহমান আননাসির পরবর্তী বছর আরেকটি গ্রীষ্মকালীন বাহিনী প্রেরণ করলেন; কিন্তু এবার মুসলিম বাহিনী পরাজিত হল। এতে খৃস্টানশক্তির দুঃসাহস বেড়ে গেল এবং তারা মুসলিম রাষ্ট্রের সীমান্তশহরগুলোতে হামলা করতে শুরু করল। আবদুর রহমান আননাসির পরের বছর তাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করলেন। এবার খৃস্টানশক্তি তিক্ত পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করল।[৩৪৫]

ঘরের সকল শত্রুকে বাদ দিয়ে খৃস্টান রাষ্ট্রে অভিযান পরিচালনা করে আবদুর রহমান আননাসির আন্দালুসের আপামর মুসলিম জনসাধারণকে একটি বিষয় শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটি বার্তা পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যা তাদের কাছে অস্পষ্ট ছিল। বার্তাটির সারমর্ম হল,

আমাদের প্রকৃত শত্রু দেশের অভ্যন্তরের বিদ্রোহী মুসলমানগণ নয়;

প্রকৃত শত্রু হচ্ছে উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্র লিওন, নাফার ইত্যাদি।

এই অভিনব ও অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত ও অভিযানের মাধ্যমে আবদুর রহমান আননাসির একদিকে যেমন বিদ্রোহী নেতাদেরকে তাদের জনগণের সামনে যথেষ্ট বিব্রত করতে সক্ষম হলেন, অপরদিকে সক্ষম হলেন তার পক্ষে জনগণের হৃদয় অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে। এটি যুগ-যুগান্তের শাশ্বত নীতি; যে শাসক তার মাতৃভূমিকে বহিঃশত্রুর আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রকৃত শত্রু চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, জনগণের হৃদয়-আবেগ তার জন্যই আন্দোলিত হয়।

সুতরাং মুসলিম জাতির স্বার্থরক্ষার দায়িত্বশীল যারা, তাদের জন্য এটি একটি উপদেশ যে, তারা যেন কখনোই আপন আপন জনগণের হৃদয়ের ভাষাকে অবহেলা না করেন; তারা যেন জনসাধারণের আবেগ-অনুভূতিকে অবজ্ঞা না করেন।

---

[৩৪৫] ইবনে আ'যারী, আলবায়ানুল মুগরিব, ২/১৬৯।

Scanned with CamScanner

এই অভাবনীয় ও জাতীয় মর্যাদাবোধসম্পন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পর দু' বছর অতিবাহিত না হতেই আবদুর রহমান আননাসিরের কাছে 'আসমানী সাহায্য' রূপে নেমে এল এক পয়গাম, রাব্বে কারীমের করুণা-দান। ৩০৬ হিজরীতে (৯১৯ খৃস্টাব্দে) স্যামুয়েল বিন হাফছুন নামের সঘোষিত মুরতাদ খৃস্টান অবস্থায় ইহধাম ত্যাগ করল। কোন প্রকার অভিযান ব্যতিরেকে বিনা প্রচেষ্টায় নিপাত গেল বিজয়ের পর থেকে আন্দালুসের ইতিহাসের সবচে' ধূর্ত ও বিপজ্জনক বিদ্রোহী; যার বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা দীর্ঘ ত্রিশ বছর আন্দালুস রাজপ্রাসাদকে বিনিদ্র রেখেছিল।

স্যামুয়েলের মৃত্যুর মাধ্যমে তার দখলে থাকা দুর্গগুলোর পতনের সূচনা হল। তার সন্তানেরা এগুলোর কর্তৃত্ব নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, কেউ কেউ আবদুর রহমান আননাসিরের পক্ষ নিল। ফলে পরবর্তী সময়ে কয়েকটি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ৩১৬ হিজরীতেই আবদুর রহমান আননাসিরের পক্ষে ইবনে হাফছুনের দখলে থাকা সবগুলো দুর্গ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হল।[৩৪৬]

আননাসিরের নেতৃত্বে একক আন্দালুস রাষ্ট্রের পথে পুনঃযাত্রা

আবদুর রহমান আননাসির নামের ইতিহাসের এই অবিস্মরণীয় বীরপুরুষ এসব বিজয়ে তুষ্ট হয়ে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম বা নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নিলেন না। ৩০৮ হিজরীতেই (৯২১ খৃস্টাব্দে) তিনি বিশাল এক বাহিনী নিয়ে উত্তরের খৃস্টানশক্তির বিরুদ্ধে অভিযানে বের হলেন। তার উত্তরের অভিযানের সংবাদ পেয়ে টলেডোর বিদ্রোহী প্রশাসক এই ভেবে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, আবদুর রহমান আননাসির হয়তো পথিমধ্যে তার বিষয়টিও দফা-রফা করে যাবেন। তাই সে আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ নিজ বাহিনী নিয়ে আবদুর রহমান আননাসিরের উত্তরের অভিযানের সঙ্গী হল।[৩৪৭]

---

[৩৪৬] বিস্তারিত জানতে : মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/৩৮৩।

[৩৪৭] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৭৭। ইবনে আ'যারী উল্লেখ করেছেন যে, টলেডো-প্রশাসকের এই আনুগত্যের আড়ালে অবাধ্যতা লুকিয়ে ছিল। কিছুদিন পরই সে তার আনুগত্য প্রত্যাহার করে। এ কারণে আবদুর রহমান আননাসির ৩১৮ হিজরীতে পুনরায় তাকে দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং হুমকি-ধমকি প্রদানের মাধ্যমে তাকে আনুগত্য বজায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু সে আনুগত্য প্রদর্শনে অস্বীকৃতি জানায়। বাধ্য হয়ে সরকারী বাহিনী দু' বছর টলেডো অবরোধ করে রাখে। এ সময় টলেডো-প্রশাসক পার্শ্ববর্তী লিওন সাম্রাজ্যের খৃস্টান শাসকের কাছে

Scanned with CamScanner

উভয় বাহিনী একসঙ্গে উত্তরের উদ্দেশে রওয়ানা হল। এর ফলে আবদুর রহমান আননাসিরের বাহিনীর জন্য উত্তরের পথ পুরোপুরি আশঙ্কামুক্ত হয়ে গেল। কেননা, উত্তর-পূর্বের জারাগোযা শহর ও উত্তরের পথের মাঝে অবস্থিত টলেডো শহর উভয়টিই এখন তার দখলে। এ সময় আবদুর রহমান আননাসিরের বয়স ছিল মাত্র ত্রিশ বছর।

সে বছরই (৩০৮ হিজরী/৯২১ খৃস্টাব্দ) তিনি উত্তরের খৃস্টানশক্তির বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক অভিযানে নেতৃত্ব দিলেন। মুবিশে এক বিশাল ও ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হল। এক দিকে আবদুর রহমান আননাসির, অপর দিকে লিওন ও নাফার রাষ্ট্রের সম্মিলিত খৃস্টানশক্তি। দীর্ঘ তিন মাস ধরে এ যুদ্ধ চলল। আবদুর রহমান আননাসির প্রতিটি মোকাবেলায় বিজয় অর্জন করলেন এবং প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করলেন। এ অভিযানের মাধ্যমেই এত দিন খৃস্টানদের দখলে থাকা সালিম নগরী ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হল।[৩৪৮]

মুবিশ যুদ্ধের চার বছর পর ৩১২ হিজরীতে (৯২৪ খৃস্টাব্দে) আবদুর রহমান আননাসির নাফার রাষ্ট্রের উদ্দেশে পরিচালিত আরেকটি বড় অভিযানে নেতৃত্ব দিলেন এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নাফার রাষ্ট্রকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হলেন। এবারের অভিযানের মাধ্যমে প্রথমেই নাফার রাষ্ট্রের রাজধানী প্যাম্পলোনা (Pamplona) মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। এরপর তিনি উমাইয়া প্রশাসক আমলের দুর্বলতার যুগে যেসব অঞ্চল খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো দখল করে নিয়েছিল, সেগুলো একে একে পুনরুদ্ধার করতে লাগলেন।

৩১৬ হিজরীতে (৯২৮ খৃস্টাব্দে) আবদুর রহমান আননাসির আন্দালুসের পূর্বাঞ্চলে বিরাজমান বিদ্রোহ দমন করার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এ অভিযান সফল হওয়ায় পূর্বাঞ্চলও পুনরায় উমাইয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। একই বছর আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করলেন আন্দালুসের পশ্চিমাঞ্চলে। এই বাহিনীটি সেখানকার বিদ্রোহী নেতা আবদুর রহমান আলজিল্লীকীকে পরাজিত করল। ফলে আন্দালুসের পশ্চিমাঞ্চলও নতুন করে তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।[৩৪৯]

সহায়তা প্রার্থনা করলেও তিনি কোন সহায়তা করতে পারেননি। অবশেষে বাধ্য হয়ে ৩২০ হিজরীতে টলেডোবাসী আবদুর রহমান আননাসিরের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।

[৩৪৮] বিস্তারিত জানতে : ইবনে আ'যারী, আলবায়ানুল মুগরিব, ২/১৭৫।

[৩৪৯] ইবনে আ'যারী, আলবায়ানুল মুগরিব, ২/১৯৭-১৯৮।

Scanned with CamScanner

এভাবে একটানা ষোল বছরের অব্যাহত সংগ্রামের পর পুরো আন্দালুস পুনরায় এক পতাকাতলে একতাবদ্ধ হল। আবদুর রহমান আননাসির তার অতুলনীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে যখন পুরো মুসলিম আন্দালুসকে পুনরায় একক রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হলেন; তখনও তার বয়স আটত্রিশ পেরোয়নি।

নতুন যুগের সূচনা ... উমাইয়া খেলাফতের যুগ

পুরো মুসলিম আন্দালুসে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ তার চারপাশে ইসলামী বিশ্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তিনি দেখতে পেলেন, আব্বাসী খেলাফত দুর্বল ও ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়েছে। আব্বাসী খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ কিছুদিন পূর্বে মুনিস আলমুযাফ্ফার তুর্কীর হাতে নিহত হয়েছেন। যদিও আব্বাসী খলীফা কাদির বিল্লাহকে নদীর পুতুল হিসেবে সিংহাসনে বসানো হয়েছে; কিন্তু ক্ষমতা কার্যত তুর্কীদের হাতে।
দক্ষিণে তাকিয়ে আবদুর রহমান দেখতে পেলেন, উবাইদীরা (ফাতেমী) সেখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। তারা নিজেদের রাষ্ট্রকে খেলাফতে ইসলামী বলে দাবি করেছে এবং নিজেদেরকে আমীরুল মুমিনীন পরিচয়ে পরিচিত করছে। আবদুর রহমান আননাসির ভেবে দেখলেন, বিশাল আন্দালুস অঞ্চলকে একক রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে তিনি যে শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করেছেন, বস্তুত তা-ই 'খেলাফতে ইসলামী'র দাবিদার হওয়ার অধিক উপযুক্ত এবং এই প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি তার জন্যই যথার্থ। তাই এ সময় তিনি আমীরুল মুমিনীন উপাধি গ্রহণ করলেন এবং আন্দালুস শাসনব্যবস্থার নামকরণ করলেন 'ইমারতে উমাইয়া'র পরিবর্তে 'খেলাফতে উমাইয়া'।[৩৫০]
এখান থেকে আন্দালুসের ইতিহাসের এক নব অধ্যায়ের সূচনা হল, যার নাম উমাইয়া খেলাফতের যুগ। এ আমলের ব্যাপ্তি ৩১৬ হিজরী থেকে ৪০০ হিজরী (৯২৮-১০১০ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত একটানা প্রায় চুরাশি বছর। যদিও সরকারকাঠামো, কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি এবং জনকল্যাণে প্রভাব রাখাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীন উমাইয়া ইমারত ও উমাইয়া খেলাফতের মধ্যে বেশ পার্থক্য ছিল, তথাপি ঐতিহাসিক বিবেচনায় উমাইয়া খেলাফতকালকে স্বাধীন উমাইয়া ইমারতের পরিশিষ্ট বা পূর্ণতা বিধায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

---

[৩৫০] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৯৮ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩৫৩।

Scanned with CamScanner

আবদুর রহমান আননাসিরের অব্যাহত সম্প্রসারণমূলক সমরনীতি

উমাইয়া খেলাফত ঘোষণার তিন বছর পর ৩১৯ হিজরীতে (৯৩১ খৃস্টাব্দে) আবদুর রহমান আননাসির দক্ষিণে জাবালে তারিক প্রণালীর উদ্দেশে রওয়ানা হলেন এবং মাগরেবে অভিযান পরিচালনা করে উবাইদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে সিউটা ও তানজা নগরী মুসলিম আন্দালুস সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল এবং জাবালে তারিক প্রণালীর ওপর উমাইয়া খেলাফতের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

এরপর তিনি মাগরেব অঞ্চলে উবাইদী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'র অনুসারীদের অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সহায়তা করতে লাগলেন। অবশ্য উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকায় সতর্কতা হিসেবে তিনি তাদেরকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে চাননি।

৩২৩ হিজরীতে (৯৩৫ খৃস্টাব্দে) উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জারাগোযা এলাকার গভর্নর মুহাম্মাদ বিন হিশাম আততুজীবীর পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা ঘটল। সে আবদুর রহমান আননাসিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য খৃস্টরাষ্ট্র লিওনের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করল। এ সংবাদ জানতে পেরে আবদুর রহমান আননাসির পূর্ণ প্রত্যয় ও স্থির সংকল্পের সঙ্গে বিশাল এক বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং এই বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে জারাগোযায় হামলা করলেন। শহরের প্রান্তসীমায় জারাগোযা বাহিনী তার মুখোমুখি হল। আবদুর রহমান আননাসির একটি সুরক্ষিত দুর্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন এবং প্রতিপক্ষের সেনাপতিদের বন্দী করে ফেললেন। এরপর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে কালবিলম্ব না করে তিনি সবার চোখের সামনে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

যুদ্ধের এ পর্যায়ে জারাগোযার গভর্নর মুহাম্মাদ বিন হিশাম আততুজীবী অনুতপ্ত হয়ে আবদুর রহমান আননাসিরের আনুগত্যে ফিরে আসার ঘোষণা করল। একজন কুশলী বীর ও প্রাজ্ঞ রাজনৈতিকের রীতি অনুযায়ী আবদুর রহমান আননাসিরও তার ত্রুটি স্বীকারকে মার্জনার দৃষ্টিতে দেখলেন এবং তাকে জারাগোযার গভর্নর পদে পুনর্বহাল করলেন। এভাবে তিনি বনু তুজীবের ভূখণ্ড জয় করার পাশাপাশি তাদের হৃদয়-রাজ্যও জয় করে নিলেন। এ যেন নবীজীর সেই অনুপম আদর্শের অনুসরণ; নবীজী বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করার পর যে মক্কাবাসী তাকে ও তার

Scanned with CamScanner

সাহাবীদেরকে নির্দয়ভাবে নির্যাতন করেছিল, তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাদেরকে তিনি বলেছিলেন, 'যাও; তোমরা তো মুক্ত' ।[৩৫১]

দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দৃঢ় ও কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সামর্থ্যের সময় উদারতা প্রদর্শন ও ক্ষমাকরণ-এই ছিল আবদুর রহমান আননাসিরের কর্মপদ্ধতি। তাই জারাগোযার গভর্নর যখন নিজের ভুল স্বীকার করে বশ্যতা স্বীকার করে নিল, তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন এবং প্রশাসনক্ষমতা বনু তুজীবের হাতেই সমর্পণ করলেন। ৩২৬ হিজরীতে (৯৩৭ খৃস্টাব্দে) আবদুর রহমান আননাসির জারাগোযা থেকে নাজদা বিন হুসাইন আসসাকলাবীর নেতৃত্বে উত্তরের শত্রুভূমিতে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং গভর্নর মুহাম্মাদ বিন হিশাম আততুজীবী তার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কতটুকু আন্তরিক, তা পরীক্ষা করার জন্য তাকেও উক্ত বাহিনীর সঙ্গে অভিযানে বের হতে বললেন। মুহাম্মাদ বিন হিশাম তার আদেশ মেনে নিয়ে অভিযান-কাফেলার সঙ্গী হল। এ অভিযানও সফল হল এবং বেশ কয়েকটি শহর ও দুর্গ বিজিত হল। যুদ্ধে খৃস্টানশক্তি আবারও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। মুসলিম বাহিনী প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে জারাগোযায় ফিরে এল ।[৩৫২]

একটি মানবিক বিচ্যুতি ...
'সুন্নাতে ইলাহী' দেখে না বংশ-পরিচিতি

সবসময় এভাবেই চলবে এবং প্রতিটি অভিযানেই আসবে সফলতা, এমনটি ভাবা সহজ হলেও নিঃসন্দেহে বাস্তবতা বড় কঠিন। কারণ, মানুষমাত্রই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়; কোন সম্রাট ও মহান ব্যক্তির জীবনই ব্যর্থতামুক্ত নয়। অবশ্য ভবিষ্যতের জন্য একে অজুহাতরূপে গ্রহণ করাও কোন যুক্তিসম্মত কথা নয়; বরং 'ভুল করা একটি মানবিক বৈশিষ্ট্য'– এই নীতি বাক্যকে মনে রেখেই আমাদের কর্তব্য হল, প্রতিটি ভুল ও ব্যর্থতার কারণ ও কার্যকারণ অনুসন্ধান করা, যেন ভবিষ্যতে এ জাতীয় ভুল পরিহার করা যায় এবং ব্যর্থতাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়।

---

[৩৫১] ইবনে হিশাম, *আসসীরাতুন নাবাবিয়্যা*, ২/৪১১, সুহাইলী, *আররাওযুল আনীফ*, ৪/১৭০, ইবনুল কায়্যিম, *যাদুল মাআ'দ*, ৩/৩৫৬, ইবনে কাসীর, *আসসীরাতুন নাবাবিয়্যা*, ৩/৫৭০ ও ইবনে হাজার, *ফাতহুল বারী*, ৮/১৮।

[৩৫২] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/৪০৫।

Scanned with CamScanner

৩২৭ হিজরীর (৯৩৯ খৃস্টাব্দের) ঘটনা। ইতোমধ্যে আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনভার গ্রহণের পর সাতাশ বছর পেরিয়ে গেছে। এতদিনে আন্দালুসের মুসলিম বাহিনী অস্ত্রবল ও জনবল বিবেচনায় সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছে। সৈন্যসংখ্যা পৌঁছেছে এক লক্ষের কাছাকাছি। পুরো আন্দালুস এখন উমাইয়া পতাকাতলে একতাবদ্ধ। আবদুর রহমান আননাসির তার সুবিশাল সুসজ্জিত সেনাবাহিনী নিয়ে খৃস্টান রাষ্ট্র লিওনের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।[৩৫৩]

ঐতিহাসিক এ যুদ্ধ ইতিহাসে 'পরিখার যুদ্ধ' নামে পরিচিত। মুসলিম বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রাণহানির সংখ্যার আধিক্যের কারণে এ যুদ্ধকে তুলনা করা হয় নবীযুগের হুনাইন যুদ্ধের সঙ্গে। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল মুসলিম বাহিনীর প্রায় অর্ধেক (পঞ্চাশ হাজার) সৈন্য হয় শহীদ হয়েছে কিংবা শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হয়েছে। আবদুর রহমান আননাসির বাকি অর্ধেক সৈন্য নিয়ে বিশাল পরাজয় ও অপূরণীয় ক্ষতির বোঝা সঙ্গে করে দেশে ফিরে এলেন। ঐতিহাসিকগণ এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, মুসলিম সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ কোন কারণে আবদুর রহমান আননাসিরের প্রতি মনঃক্ষুণ্ন হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকেও যুদ্ধ করা হতে বিরত থেকেছিল এবং দ্রুত পলায়ন করেছিল। মূলত তারাই মুসলিম বাহিনীর পরাজয় ত্বরান্বিত করেছিল এবং অনিবার্য ধ্বংস টেনে এনেছিল।[৩৫৪]

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এত বিশাল ও করুণ পরাজয়ের কারণ এতটা সাদামাটা ও সরল হতে পারে না। আমাদের ধারণা, আন্দালুস রাষ্ট্রের এই শীর্ষ চূড়ার শক্তি-সামর্থ্য, এই সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে অভিযান, পূর্বে একের পর এক ধারাবাহিক বিজয় আবদুর রহমান আননাসিরের অন্তরে সেই আত্মগৌরব জাগ্রত করেছিল, যা তার পূর্বে তার চেয়েও মহান বরং উম্মাহর সবচে' মহান জামাতের অন্তরে উদিত হয়েছিল আর তারা স্বগতোক্তি করেছিল, আজ আমরা সংখ্যায় কম নই বিধায় কিছুতেই পরাজিত হব না। আর তাই তিনিও সেই কঠিন কুদরতি শিক্ষাই লাভ করেছিলেন, যা ইতঃপূর্বে লাভ করেছিল হুনাইনের সেই মহান কাফেলা।

---

[৩৫৩] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩৫৫।

[৩৫৪] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ৩৭ ও মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/৪১৫।

Scanned with CamScanner

আপনদায়িত্ব পালনে অটল-অবিচল আবদুর রহমান আননাসির

পরিখার যুদ্ধে পরাজয়ের পর আবদুর রহমান আননাসির মোটেই হতোদ্যম হলেন না। তিনি তো প্রতিপালিত হয়েছেন আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের চেতনায়, আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও লড়াইয়ের প্রেরণায়। তাই হতাশ না হয়ে তিনি তার পরাজয়ের কারণসমূহ, নিজেদের ত্রুটিসমূহ ও দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলো খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি নতুন করে সব ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকার চেষ্টায় নিমগ্ন হলেন এবং সমাজের রাহনুমা আলিমসমাজকে সঙ্গে নিয়ে জনসাধারণকে ঈমানী প্রেরণায় উজ্জীবিত করতে শুরু করলেন।

আবদুর রহমান আননাসির নতুন করে প্রস্তুতি গ্রহণ করে ৩২৯ হিজরীতে (৯৪১ খৃস্টাব্দে) খৃস্টানশক্তির বিরুদ্ধে আরও একটি বড় যুদ্ধের সূচনা করলেন। এবার তিনি একের পর এক জোরদার ও প্রবল হামলা চালালেন এবং প্রতিটি হামলায় বিজয় ছিনিয়ে আনলেন। ৩২৯ হিজরী থেকে ৩৩৫ হিজরী (৯৪১-৯৪৭ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত চলমান এই উপর্যুপরি হামলায় খৃস্টানশক্তি এমনভাবে পর্যুদস্ত হল যে, তারা নিজেদের সামনে সমূহ নিপাত ছাড়া আর কোন পরিণতি দেখতে পেল না। বাধ্য হয়ে লিওন রাষ্ট্রের নৃপতি অবনত মস্তকে জিযিয়া প্রদান করার প্রতিশ্রুতিতে আবদুর রহমান আননাসিরের কাছে নিরাপত্তা চুক্তির আবেদন করলেন।[৩৫৫] নাফার রাষ্ট্রের শাসকও নিরাপত্তা ভিক্ষা চেয়ে জিযিয়া চুক্তির দরখাস্ত করলেন। এ সময় থেকে নিয়ে (৩৩৫ হি./৯৪৭ খৃ.) আবদুর রহমান আননাসির রহ.-এর মৃত্যু অবধি (৩৫০ হি./৯৬১ খৃ.) উভয় খৃস্টান রাষ্ট্র মুসলিম সরকারকে জিযিয়া প্রদান করেছিল; যদিও এ সময়কালের মধ্যে বেশ কয়েকবারই তারা চুক্তিভঙ্গ করেছে এবং যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে।

উত্তর আফ্রিকার ক্ষেত্রে আবদুর রহমান আননাসিরের অবস্থান

আন্দালুসের ইসলামী সালতানাতের সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ধ্বংস করার জন্য একদিকে সচেষ্ট ছিল দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠী; অপরদিকে মুসলিম আন্দালুসকে ঘায়েল করার সুযোগের

---

[৩৫৫] দেখুন : ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ৩৭।

Scanned with CamScanner

অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে বসে ছিল আন্দালুসী খৃস্টানশক্তি। অবশ্য খৃস্টানশক্তির তৎপরতা কেবল মুসলিম আন্দালুসকে ঘিরে নয়; বরং সম্ভব হলে পৃথিবীর সকল মুসলিম জনসাধারণকে নিশ্চিহ্ন করা তাদের অভিলাষ ও সার্বক্ষণিক পরিকল্পনা।

কিন্তু আন্দালুসের ইসলামী সালতানাতের দুশ্চিন্তা ও শঙ্কা এই দু'টিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তৃতীয় আরেকটি আশঙ্কা সবসময় আন্দালুস প্রশাসনকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রেখেছিল। আর তা হল উত্তর আফ্রিকার উবাইদী রাষ্ট্রের আন্দালুসে হামলা ও আন্দালুস দখলের অভিলাষ। উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় দক্ষিণের উবাইদী সাম্রাজ্যের দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা ও ভয়াবহতা বরং বেশি ছিল। উবাইদী সরকারও আন্দালুস ভূখণ্ড ও আন্দালুসের সামরিক-অর্থনৈতিক সম্পদভাণ্ডারের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজছিল। আর তারা ভালো করেই জানত যে, আন্দালুসবাসী যদি তাদের মতাদর্শকে আপন করে না নেয় এবং স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনভাবেই নিজেদের লালিত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'র মতাদর্শকে পরিত্যাগ না করে, তাহলে কোনদিনই উবাইদী সরকারের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না এবং কিছুতেই আন্দালুসবাসী তাদের বশ্যতা পুরোপুরি স্বীকার করবে না। সুতরাং বিপদ ও ঝুঁকি কেবল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দিক থেকে ছিল না, ছিল জাতিসত্তা ও ধর্মীয় স্বকীয়তা রক্ষার দিক থেকেও। এ বিপদের নাম শিয়া ইসমাঈলী ফিতনা, যার পুরোধাগণ তখন মাগরেবে উবাইদী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করছিল এবং নিজেদের পরিচিত করেছিল 'ফাতেমী' নামের অবৈধ ও মিথ্যা পরিচয়ে।

মাগরেবে শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার জন্য প্রথমে আবু আবদুল্লাহ আশশিয়ীকে পাঠানো হয়। সে মাগরেবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনায় সফল হয় এবং শিয়া মতবাদের পক্ষে প্রচুর অনুসারী, সহযোগী ও সমর্থক যোগাড় করতে সক্ষম হয়। শিয়া মতবাদের সমর্থকগণ তার হাতে শিয়া নেতা উবাইদুল্লাহ আলমাহদীর নামে খেলাফতের বাইআত গ্রহণ করে। এটা সে সময়ের কথা, যখন আন্দালুসের উমাইয়া প্রশাসন ছিল একদিকে প্রবল অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ সামলাতে ব্যস্ত; অপরদিকে উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর আক্রমণের জবাব দিতে ব্যতিব্যস্ত। সামরিক শক্তির বিবেচনায় যেহেতু তৎকালীন উমাইয়া প্রশাসনের একই সঙ্গে এই দু'টি যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তারের সামর্থ্য ছিল না; সুতরাং তৃতীয় আরেকটি যুদ্ধক্ষেত্র উন্মুক্ত করার

Scanned with CamScanner

ঝুঁকি তারা কীভাবে নেবে? আর তৃতীয় ফ্রন্টে যুদ্ধ শুরু করলে তা তারা সামালই-বা দেবে কীভাবে? অধিকন্তু উত্তর আফ্রিকা বহুবার আন্দালুসের প্রথম প্রতিরক্ষা রেখা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সবসময়ই আটলান্টিকের ওপারের অঞ্চল ছিল আন্দালুসে যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।

আবদুর রহমান আননাসির শৈশব থেকেই পিতামহ আমীর আবদুল্লাহর সাহচর্যে থাকায় এ সব বিপদ ও ঝুঁকি সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলেন। অভ্যন্তরীণ ও বাইরের দিক থেকে আন্দালুসের অবস্থান যে দুর্বল অবস্থান পৌঁছেছে এবং শত্রুদের শক্তি ও সক্ষমতা যে দিনে দিনে অনেক বেড়ে গেছে, তাও তার জানা ছিল। কিন্তু এ সবকিছু জানার পর তিনি তার পিতৃব্য বা পিতামহদের (পূর্ববর্তী আমীরগণের) মতো কোন পদক্ষেপ না নিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকেননি আর এর দায়িত্বভার পরবর্তীদের কাঁধে চাপিয়ে রেখে যাননি। বরং তিনি নিজেই এর সমাধানে অগ্রসর হয়েছেন এবং দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছেন।

শাসনভার গ্রহণ করার পরপরই বিদ্রোহ পরিস্থিতি সামলে দেশকে নিরাপদ ও স্বর্নির্ভররূপে গড়ে তোলার যে গুরুদায়িত্ব আবদুর রহমান আননাসিরের ওপর ছিল, তিনি তা অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গেই পালন করছিলেন; কিন্তু এ ব্যস্ততা সত্ত্বেও একেবারে শুরু থেকেই তিনি উত্তর আফ্রিকার চলমান ঘটনাপ্রবাহ আগ্রহী ও সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সে সময় পরিস্থিতির দাবিতেই তিনি এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি; বরং উবাইদী সাম্রাজ্যকে সুযোগ দিয়েছেন, তারা যেন মাগরেবে নিজেদের ভিত্তি সুদৃঢ় করার কাজে ব্যস্ত থাকতে পারে। কেননা, প্রথমে মাগরেবে থিতু হওয়ার পূর্বে উবাইদী সাম্রাজ্যের পক্ষে আন্দালুস বা মিশরের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, মাগরেবে এ দুই শক্তির স্থিতিশীল হওয়ার অর্থ এরপরেই আন্দালুসের হিসাব সামনে চলে আসা। এ কারণে আবদুর রহমান আননাসির আন্দালুসের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ পুরোপুরি দমন এবং উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস করা পর্যন্ত বিলম্ব করলেন না। তেমনই তিনি এ চিন্তাও করলেন না যে, উবাইদী গোষ্ঠী মাগরেব-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে আন্দালুসের দিক অগ্রসর হোক, তারপর তাদের বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে। বরং তিনি নিজেই অগ্রসর হয়ে মাগরেবকে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জড়িয়ে দিলেন, যেন উবাইদী গোষ্ঠী সাগর পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের গৃহ সামলাতেই ব্যস্ত হয়ে

Scanned with CamScanner

পড়ে এবং মাগরেবে উমাইয়া সালতানাতের শক্তি ও প্রভাব সুদৃঢ় হয়; আর এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে তিনি মাগরেবেই উবাইদী সালতানাতের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হন।

নিঃসন্দেহে আবদুর রহমান আননাসিরের এই কৌশল তার অত্যুচ্চ সামরিক কুশলতা ও দক্ষতার পরিচয় বহন করে। এর মাধ্যমে তিনি উবাইদী সরকারের সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রচেষ্টাকে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাদের দৃষ্টি আন্দালুস থেকে সরিয়ে মাগরেবেই নিবদ্ধ রাখতে পেরেছিলেন। অধিকন্তু তিনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের উবাইদী সরকার কর্তৃক সাহায্য-সহায়তা, সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিশোধ হিসেবে মাগরেবে যারা উবাইদী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সচেষ্ট ছিল, তাদের সকলকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে লাগলেন এবং তাদেরকে নিজের দলে অন্তর্ভুক্ত করলেন। বিপরীতে উবাইদীদের জন্য চাইলেও এ সময় এ ধরনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কেননা, একদিকে তারা গৃহবিবাদ সামলাতে ব্যস্ত ছিল, অপরদিকে তখন আন্দালুস পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণই আবদুর রহমান আননাসিরের নিয়ন্ত্রণে।

৩১৯ হিজরীতে আবদুর রহমান আননাসির যথাসম্ভব সর্বোচ্চ সৈন্যসমাবেশ ও সামরিক প্রস্তুতি সহকারে একটি নৌবহরকে মাগরেবের সিউটার উদ্দেশে প্রেরণ করলেন। নৌবহরটি সিউটার প্রশাসক উবাইদী শাসকদের মিত্র বনু ইসাম গোত্রের কাছ থেকে সিউটা দখল করে নিল। এর পরপরই আবদুর রহমান আননাসির সিউটায় নিজেদের অবস্থান-ঘাঁটির প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সুরক্ষিত করার জন্য সেখানে সৈন্য, দক্ষ সেনাপতি ও অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহে মনোযোগী হলেন। তিনি ভালো করেই জানতেন যে, এ সংবাদ পাওয়ার পর উবাইদীরা নিশ্চিন্তে বসে থাকবে না এবং এত সহজে সিউটা বন্দরের অধিকার ছেড়ে দেবে না। এর কারণ শুধু এই নয় যে, সিউটা আন্দালুসের চাবিকাঠি; বরং সিউটা যদি আবদুর রহমান আননাসিরের দখলে থাকে, তাহলে তা উবাইদীদের নবগঠিত সাম্রাজ্যের জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়াবে; যা তখনও স্থিতিশীলতা লাভ করতে পারেনি।

ইতঃপূর্বে আমরা জেনেছি যে, আন্দালুসের নিরাপত্তা বিবেচনায় সিউটা বন্দর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মুসা বিন নুসাইর রহ. সিউটা বন্দরের ঝুঁকি থেকে নিরাপদ হওয়ার পরেই কেবল আন্দালুসের পথে সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। এখানে আমরা জানতে পারলাম, মাগরেবের প্রতিরক্ষা বিবেচনায়ও সিউটা

Scanned with CamScanner

বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং আজকের আধুনিক স্পেন যে সিউটা (Ceuta) ও ম্যালিলা (Mellila) বন্দর-নগরীদু'টিকে নিজেদের দখলে রাখার জন্য এখনও কুটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা জেনে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই।

নিঃসন্দেহে আবদুর রহমান আননাসিরের এ পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত সাহসী ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ। তিনি চেয়েছিলেন, উবাইদী ও তাদের মিত্ররা যেন আন্দালুসের দিগন্তে উদিত এই নতুন শক্তির আবির্ভাব সম্পর্কে ভয় ও সমীহের সঙ্গে অবহিত হয়। নিজ দেশে যিনি সর্বগ্রাসী বিদ্রোহের ঝড় সামলাতে ব্যতিব্যস্ত, যার রাষ্ট্রের ওপর সর্বদা লোলুপ দৃষ্টি মেলে আছে উত্তরের খৃস্টানশক্তি, তার কাছে প্রত্যাশিত এটাই ছিল যে, তিনি এসব বিপদ সামলাতে এবং অসংখ্য দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্য পেতে মাগরেবে আত্মপ্রকাশ করা উবাইদী সাম্রাজ্যের কাছে দ্রুত সহায়তা কামনা করবেন। কিন্তু এই বর্ণচোরা শত্রুর কাছে সাহায্যপ্রার্থনা দূরে থাক, উল্টো তিনি পূর্ণ প্রত্যয়ে মাগরেবে তৃতীয় আরেকটি যুদ্ধক্ষেত্র নিজের জন্য উন্মুক্ত করে নিলেন। সুতরাং আবদুর রহমান আননাসিরের এই পদক্ষেপকে একদিকে যেমন তার জীবনের সবচে' বীরত্বপূর্ণ ও বিচক্ষণতাপূর্ণ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করা যায়; অপরদিকে একে তার কুশলী রাজনীতি ও পরিস্থিতি অনুধাবনে অপূর্ব উপলব্ধিবোধের সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। আবদুর রহমান আননাসির চাইলে তার নৌবহরের এই অগ্রসরতা ও গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ে তুষ্ট হয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। কেননা, এর ফলে তিনি মাগরেবী প্রতিপক্ষকে আন্দালুসের কথা ভুলে সিউটা নিয়ে কৌশল নির্ধারণে ব্যস্ত রাখতে পেরেছেন। কিন্তু এ মহান ব্যক্তিটি যেন সংকল্প করেছিলেন যে, তিনি এ পথের শেষ দেখে ছাড়বেন এবং আপন কর্মতৎপরতা ও উদ্যোগকে দুর্বল বা নিস্তেজ হতে দেবেন না। আর তাই শত্রুদেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশের ওপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এরপর তিনি মাগরেবের তানজা নগরীর গভর্নর হাসান বিন আবুল আইশ বিন ইদরীস আলআ'লাবীকে বার্তা পাঠিয়ে তানজা নগরীর কর্তৃত্ব তার হাতে ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানালেন। ইবনে আবুল আইশ এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে আন্দালুসের নৌবহর তানজা অবরোধ করল এবং বাইরের সঙ্গে তানজার যোগাযোগব্যবস্থা সম্পূর্ণ সংকুচিত করে দিল। বাধ্য হয়ে তানজা-প্রশাসক নতি স্বীকার করলেন এবং তানজার ক্ষমতা আন্দালুসের কাছে হস্তান্তর করলেন।[৩৫৬]

---

[৩৫৬] আবুল আব্বাস আহমাদ আননাসিরী, *আলইসতিক্সা লি আখবারি দুয়ালিল মাগরিবিল আকসা*, ১/২৫৩।

Scanned with CamScanner

৩১৯ হিজরীতেই মাগরেবের মিক্‌নাসা (Mkansa) অঞ্চলের প্রশাসক মুসা বিন আবুল আফিয়া আবদুর রহমান আননাসিরের প্রতি নিজের আনুগত্য প্রকাশ, তার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার আবেদন, মাগরেবে আমীরুল মুমিনীনের পক্ষে জনমত গঠনের প্রতিশ্রুতি এবং মাগরেবের সাধারণ ও নেতৃস্থানীয় জনগণকে খেলাফতে উমাইয়ার সমর্থক হিসেবে তৈরি করার প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে আবদুর রহমান আননাসিরের কাছে দূত পাঠালেন। আবদুর রহমান আননাসির তার এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করে নিলেন এবং মাগরেবের অভ্যন্তরে যুদ্ধ ও বিদ্রোহ চালানোর জন্য তাকে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য পাঠাতে লাগলেন, যেন মাগরেবে তার ঘাঁটি মজবুত হয়।[৩৫৭] এর অব্যবহিত পরেই ইদরিসী রাজবংশ ও যিনানা গোত্রীয় বার্বার নেতৃবৃন্দও আবদুর রহমান আননাসিরের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করল এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে মিম্বরে মিম্বরে (ইসলামী উম্মাহর আমীরুল মুমিনীন হিসেবে) তার জন্য দোয়া করা শুরু হল। এর ফলে মাগরেবের অভ্যন্তরে তিয়ারিত (Tiaret) ও ফেয এলাকা পর্যন্ত আবদুর রহমান আননাসিরের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

৩২৩ হিজরীতে তৎকালীন উবাইদী শাসক তার এক সেনাপতি মাইসুর সাকলাবীর নেতৃত্বে মিক্‌নাসা-প্রশাসক ইবনে আবুল আফিয়ার বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। বেশ কয়েকবারের যুদ্ধের পর মুসা বিন আবুল আফিয়া পরাজিত হয়ে সাহারা মরুভূমির দিকে পলায়ন করলেন। তিনি আবদুর রহমান আননাসিরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে আবদুর রহমান সামরিক সাহায্য পাঠালেন। এবার উবাইদীরা পরাজিত হল এবং মুসা বিন আবুল আফিয়া তার প্রশাসন ক্ষমতা ফিরে পেলেন। এর ফলে একদিকে যেমন মিক্‌নাসায় মুসা বিন আবুল আফিয়ার ক্ষমতা সুদৃঢ় হল, অপরদিকে মাগরেবে আবদুর রহমান আননাসিরের প্রভাব আরও শক্তিশালী হল।[৩৫৮] অবস্থা এমন হল যে, এরপর মাগরেবে যারাই উবাইদী সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত, সবাই আবদুর রহমান আননাসিরের কাছে দূত পাঠিয়ে এ স্বীকৃতি প্রদান করত যে, মুসলিম বিশ্বের আমীরুল মুমিনীন হিসেবে আবদুর রহমান আননাসিরই মাগরেবের শাসন-ক্ষমতা লাভের অধিক উপযুক্ত।

---

[৩৫৭] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২০৪।

[৩৫৮] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ১/১৩৬।

Scanned with CamScanner

আবদুর রহমান আননাসিরও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতেন এবং সদাচরণ করতেন।[৩৫৯]

এভাবেই দিন অতিবাহিত হচ্ছিল আর মাগরেব ভূমিতে চলছিল উবাইদীদের ক্ষমতা সুদৃঢ়করণের প্রচেষ্টা। একসময় যখন মাগরেবে উবাইদীদের প্রভাব মজবুত হল এবং তারা তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিদ্রোহসমূহ দমন করতে সক্ষম হল, তখন উবাইদী শাসক আলমুইয্য লি দ্বীনিল্লাহ এমন একটি পদক্ষেপ নিলেন, যাকে তুলনা করা যেতে পারে আবদুর রহমান আননাসিরের শিরা স্পর্শ করে ক্ষমতা পরীক্ষা করার সঙ্গে। তিনি তার নৌবহরকে আন্দালুসের উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানার নির্দেশ দিলেন। ৩৪৪ হিজরীতে উবাইদী নৌবহর আন্দালুসের সীমান্তশহর আলমারিয়ায় হামলা চালাল, সেখানে বিদ্যমান আন্দালুসী নৌবাহিনীর জাহাজগুলো জ্বালিয়ে দিল এবং শহরটিতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাল। সংবাদ পাওয়ার পর আবদুর রহমান আননাসিরের প্রতিক্রিয়া হল তীব্রতর। তার নির্দেশে আন্দালুসের সামরিক নৌবহর উবাইদী সাম্রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চলে হামলা চালাল এবং ইটের জবাব পাটকেল দিয়ে প্রদান করল। ৩৪৫ হিজরীতে আন্দালুস নৌবহর প্রতিশোধ মিশন সমাপ্ত করে ফিরে এল।[৩৬০] উবাইদীরা বুঝে গেল, আন্দালুসে তাদের শক্তি চলবে না। এরপর তারা দ্বিতীয়বার আর আন্দালুসের দিকে পা বাড়ায়নি।

৩৪৭ হিজরীতে উবাইদী সেনাবাহিনী জাওহার সিকিল্লীর নেতৃত্বে আলমাগরিবুল আকসায় (বর্তমান মরক্কো অঞ্চলে) আগ্রাসন চালাল। তারা ফেষ শহরে প্রবেশ করে আবদুর রহমান আননাসির কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নরকে হত্যা করল। সংবাদ পেয়ে আবদুর রহমান আননাসির ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন এবং আক্রান্ত এলাকায় দ্রুত ডিটেচমেন্ট (Detachment) বাহিনী[৩৬১] প্রেরণ করলেন। তাদের আক্রমণে উবাইদী বাহিনী লেজ গুটিয়ে পালালো।[৩৬২]

এর কিছুদিন পরই ৩৪৯ হিজরীতে আবদুর রহমান আননাসির অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৩৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

---

[৩৫৯] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২১৩।

[৩৬০] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২২১ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/৪৬।

[৩৬১] সামরিক পরিভাষায় বিশেষ মিশন বাস্তবায়নের জন্য প্রেরিত স্বদেশ ভূমি হতে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন বাহিনীকে 'ডিটেচমেন্ট বাহিনী' বলে। (অনুবাদক)

[৩৬২] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২২২।

Scanned with CamScanner

আবদুর রহমান আননাসিরের সামরিক চিন্তা-কুশলতা

আবদুর রহমান আননাসির তার প্রপিতামহ ও আন্দালুসে স্বাধীন উমাইয়া প্রশাসনের প্রতিষ্ঠাতা আবদুর রহমান আদদাখিলের জীবন ও কর্ম থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যুদ্ধ ও সামরিক অভিযানের মৌলিক কিছু নীতি ও কৌশল লাভ করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,

১. শত্রুপক্ষকে চমকে দেওয়ার কৌশল

খলীফা আবদুর রহমান আননাসিরের সামরিক কর্মপন্থায় এ নীতিটি বেশ জটিল ও দুর্বোধ্য শৈলীতে প্রকাশিত হয়েছে, যা দ্বারা তার সময়ের সামরিক তৎপরতা যে যথেষ্ট জটিল ও দুর্বোধ্যতার স্তরে পৌঁছেছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি কখনো শত্রুকে অপ্রত্যাশিত চমকের মুখোমুখি করতেন সময়গত দিক থেকে; যেমন গ্রীষ্মকালের সামরিক অভিযানের নির্ধারিত মৌসুমের বেশ পূর্বেই হয়তো কর্ডোভার বাইরে সৈন্যসমাবেশ ঘটাতেন। আবার কখনো স্থানগত বিবেচনায় চমকের আশ্রয় নিতেন; শত্রুপক্ষের ধারণার বাইরে অপ্রত্যাশিত কোন স্থানে সদলবলে অগ্রসর হয়ে শত্রুবাহিনীকে বিভ্রান্ত করতেন, যেন উত্তরের খৃস্টানশক্তি বুঝতেই না পারে যে, আননাসিরের গন্তব্য কোনদিকে? এবং কোনদিকে তিনি তার সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করবেন? কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি যুদ্ধের পদ্ধতি ও ধরন নির্ণয়েও প্রতিপক্ষকে বিস্ময়াভিভূত করে দিতেন, আবার কখনো চমক উপহার দিতেন কৌশলগত দিক থেকে। উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর (লিওন ও নাফার রাষ্ট্র) রাজধানী অভিমুখে সৈন্যপ্রেরণ মূলত কৌশলগত চমকেরই অংশ ছিল। তেমনই সৈন্যপ্রেরণ পদ্ধতি ও বাহিনীর আয়তনেও থাকত পদ্ধতিগত চমক। যেহেতু তার শাসনামলে সামরিক অভিযান একটি চলমান ও অব্যাহত বিষয় ছিল, তাই অনেক সময়ই পদ্ধতিগত ও কৌশলগত চমক পরস্পর মিশ্রিত হয়ে জটিল ও দুর্বোধ্য রূপ ধারণ করত। তদ্রূপ সেনাবাহিনী প্রেরণের পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণে অনেক সময় স্থানগত ও কালগত বিস্ময় একীভূত হয়ে যেত।

Scanned with CamScanner

২. স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও রাষ্ট্রের সামরিক তত্ত্বাবধান-

দুই দায়িত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন

খলীফা আবদুর রহমান আননাসির তার শাসনামলের প্রারম্ভে রণাঙ্গনে লড়াইয়ের একটি আদর্শ নমুনা জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে স্বশরীরে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতেন এবং তরুণদের মাঝে ঈমানী চেতনা, সমর-উদ্দীপনা এবং সরাসরি যুদ্ধের চর্চা ও অনুশীলনের অভ্যাস জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসমাবেশ, পরিচালনা ও উদ্দীপনা জাগ্রত করার জন্য কাজ করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি উজ্জ্বল ও দৃষ্টান্তমূলক সফলতা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর যখন রাষ্ট্র ও প্রশাসন-পরিস্থিতি স্থিতিশীল পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন থেকে আর এমন কোন অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, যা দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশি হবে; যেমনটি পরিখার যুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে। আর তাই তখনকার পরিস্থিতির দাবি হিসেবে খলীফা আবদুর রহমান আননাসিরের স্বশরীরে সমরক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের চেয়ে রাষ্ট্রের সামরিক অঙ্গনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বয় ও বিন্যাস ইত্যাদি কাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা, এর মাধ্যমে তার পক্ষে বিভিন্ন ফ্রন্টে চলমান অব্যাহত সামরিক কর্মকাণ্ডের সার্বিক ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান, প্রয়োজনে পরিকল্পনার পুনঃসমন্বয়, সেনাবাহিনীকে সঠিক স্থানে প্রেরণ, সেনাবাহিনীর করণীয় নির্ণয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং তাদের অনিবার্য বিভিন্ন চাহিদা তথা অস্ত্র-শস্ত্র ও রেশনের যোগানদান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দেওয়ার অবকাশ তৈরি হত।

আবদুর রহমান আননাসিরের দীর্ঘ শাসনামলে আন্দালুস সবসময়ই এক বা একাধিক যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধে জড়িয়ে ছিল। এসব যুদ্ধে সফলতা লাভ করার জন্য প্রচুর অর্থ, অস্ত্র ও জনবলের যোগান নিশ্চিত করা ছিল পরিস্থিতির অনিবার্য দাবি। তার শাসনামলের যুদ্ধাভিযানগুলোর বিবরণে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম বাহিনী সবসময়ই আকারে বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে কোন প্রকার ত্রুটি ছিল না। একটি বারের জন্যও এমন কোন ঘটনা ঘটেনি, যার কারণে সামরিক প্রশাসনব্যবস্থায় বা যোদ্ধাদের রসদ সরবরাহে কোন ধরনের সমস্যা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

এটি আবদুর রহমান আননাসিরের অত্যুচ্চ প্রশাসনিক দক্ষতার অন্যতম সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তার শাসনামলে সেনাবাহিনীর অপরিহার্য জিনিসপত্র সরবরাহের পূর্ণ নিশ্চয়তা ছিল। অতীতে কিংবা বর্তমানে সবসময়ই এ বিষয়টিকে যে কোন রাষ্ট্রের সামরিক প্রশাসন-দক্ষতার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়। বস্তুত এভাবেই সরাসরি যুদ্ধের নেতৃত্বে খলীফা আবদুর রহমান আননাসিরের অনুপস্থিতি তারচেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ এক দায়িত্ব পালনে সহায়ক হয়েছিল।

আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলে আন্দালুসের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিস্থিতি

১. লিওন রাষ্ট্র

হিজরী তৃতীয় শতকের শেষ অর্ধেকে (খৃস্টীয় নবম শতাব্দী) আন্দালুসে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা একেবারে চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়েছিল। এসব ফিতনা ও বিভেদ সামরিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই মুসলিম আন্দালুসের প্রচুর ক্ষতিসাধন করেছিল। আন্দালুসের শাসনব্যবস্থা এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, নিজ ভূখণ্ডের অধিকাংশ অঞ্চলের ওপর মুসলিম সরকারের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। এর ফলে খৃস্টান আন্দালুসের সামনে মহা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল একদিকে নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার এবং নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলোতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সুসংহত করার, অপরদিকে নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি মজবুত ও উন্নত করার। এরই ধারাবাহিকতায় খৃস্টীয় দশম শতাব্দীর গোড়াতেই লিওন রাষ্ট্র শক্তি ও প্রতাপের দিক থেকে এমন উচ্চতায় উন্নীত হল যে, তারা মুসলিম আন্দালুসের সঙ্গে তীব্র সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার দুঃসাহস দেখাতে লাগল। উল্লেখ্য, লিওন সাম্রাজ্য ছিল গ্যালিসিয়া (Galicia) সাম্রাজ্যের স্থলবর্তী সাম্রাজ্য। পরবর্তী সময়ে শক্তিশালী খৃস্টান রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা ক্যাস্টোলা এ সময় একটি প্রদেশ হিসেবে লিওন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলে এ সংঘাত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। এমনকি ৯১৭ খৃস্টাব্দে সেন্ট স্টিভেন-এর যুদ্ধে লিওনের খৃস্টান বাহিনী আবদুর রহমান আননাসিরের বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। অথচ ততদিনে আবদুর রহমান আননাসির রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যাদি সফলতার

Scanned with CamScanner

সঙ্গে দূর করেছিলেন এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি স্তিমিত করে আন্দালুসের বাহিনীকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেন্ট স্টিভেনের যুদ্ধের পর থেকে ৯২৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত লিওনের বাহিনী ধারাবাহিকভাবে মুসলিম ভূখণ্ডে হামলা চালাতে থাকে।

৯২৫ খৃস্টাব্দে লিওন রাষ্ট্রের তৎকালীন নৃপতি দ্বিতীয় আরডোনিয়ো (Ordoño II) মৃত্যুবরণ করলে লিওন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। মৃত রাজার সহোদর পরবর্তী রাজা ফ্রুয়েলা (Fruela) মাত্র এক বছর রাজত্ব করার পরই মৃত্যুবরণ করেন এবং তার মৃত্যুর পর আরডোনিয়োর দু' পুত্র স্যাঞ্চো (Sancho) ও চতুর্থ আলফোন্সোর (Alfonso IV) মধ্যে শুরু হয়ে যায় ক্ষমতা দখলের প্রচণ্ড সংঘাত। এ সংঘাতে প্রথমে আলফোন্সো তৎকালীন নাফার রাষ্ট্রের শাসকের সহায়তায় জয়লাভ করেন। কিন্তু তার ভাই স্যাঞ্চোও হতোদ্যম না হয়ে নিজেকে (গ্যালিসিয়া সীমান্তে অবস্থিত) সেন্ট ইয়াকুবের নৃপতি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং সৈন্য সমবেত করতে শুরু করেন। কিছুদিন পর তিনি লিওনে হামলা চালান এবং কয়েকদিনের অবরোধের পর লিওন-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন।

ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য পদচ্যুত শাসক আলফোন্সো আবারও নাফার সম্রাটের সাহায্য কামনা করেন এবং তার সহায়তায় ভাইকে পরাজিত করে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। স্যাঞ্চো এবারও গ্যালিসিয়ায় ফিরে যান এবং নিজের ক্ষমতার দাবিতে অটল থাকেন। ৯২৯ খৃস্টাব্দে স্যাঞ্চোর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

স্যাঞ্চোর মৃত্যুতে চতুর্থ আলফোন্সোর ক্ষমতা বাহ্যত সুসংহত হয়। কিন্তু এ স্থিতিও বেশি দিন টিকেনি। কিছুদিন পরই স্ত্রীর বিয়োগবেদনায় আলফোন্সো ক্ষমতা ও পার্থিব বিষয়াদির প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন এবং তার ভাই দ্বিতীয় রামেরোর (Ramiro II) হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে সাহাজোনের একটি আশ্রমে চলে গিয়ে বৈরাগ্যের জীবন শুরু করেন।

কিন্তু একবার ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া আলফোন্সোর ঘোর কাটতে সময় লাগেনি। কিছুদিন না যেতেই সন্ন্যাসী জীবন তার কাছে একঘেয়ে মনে হল। এবার তিনি নিজেকে সিমানচেজ (Simancas) দুর্গের নৃপতি ঘোষণা করলেন। তার এই কর্মকাণ্ড সেখানকার সন্ন্যাসীদের দৃষ্টিতে নিজেদের 'পদ' ও 'পেশা'র জন্য অত্যন্ত অপমানজনক মনে হওয়ায় তারা উত্তেজিত হয়ে আলফোন্সোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করল। বাধ্য হয়ে আলফোন্সো আবারও

Scanned with CamScanner

সন্ন্যাস জীবনে ফিরে এলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই যখন তিনি সংবাদ পেলেন যে, তার ভাই রামেরো টলেডোতে বিদ্রোহীদের দমনের উদ্দেশ্যে রাজধানী ছেড়ে অভিযানে বের হয়েছেন, তখন তার মাথায় আবারও ক্ষমতার ভূত চেপে বসল এবং তিনি এ সুযোগ লুফে নিয়ে আশ্রম ছেড়ে নিজের কিছু অনুসারীকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানী লিওন নগরীতে পৌঁছে তা দখল করে নিলেন। সংবাদ পেয়ে রামেরো দ্রুত তার বাহিনী নিয়ে ছুটে এলেন এবং লিওন পুনঃদখল করলেন। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের বিদ্রোহ চেষ্টার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, এ উদ্দেশ্যে তিনি তার ভাই আলফোন্সো এবং ভাইয়ের সহযোগী তিন চাচাতো ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন।

এভাবে রামেরোর ক্ষমতা সুসংহত হল। রামেরো ছিলেন চরমপন্থী খৃস্টান উগ্রবাদী। মুসলিম আন্দালুসের ক্ষতি করার যত ধরনের উপায় ছিল, কোনটাই তিনি হাতছাড়া করেননি। সুযোগ পেলেই তিনি ইসলামী ভূখণ্ডে ঝটিকা হামলা চালাতেন; আবদুর রহমান আননাসিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের প্ররোচিত করতেন, তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহায়তা করতেন। এছাড়া তিনি সরাসরিও বহুবার মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছেন। পূর্বেই আমরা এ যুগের সেসব তীব্রতর সংঘাতের আলোচনা পৃথকভাবে উল্লেখ করেছি, যা রামেরো ও আবদুর রহমান আননাসিরের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল এবং যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল পরিখার যুদ্ধ; ৩২৭ হিজরীতে (৯৩৯ খৃস্টাব্দে) সংঘটিত যে যুদ্ধে সামুরা নগরীর নগরপ্রাচীরের পাদদেশে মুসলিম বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড দুর্যোগ নেমে এসেছিল।

ক্যাস্টোলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টা

লিওন রাষ্ট্রের ঘটনাপ্রবাহের ক্রমধারা ও বিবর্তনের ধারা ভালোভাবে অনুধাবন করতে হলে আমাদের আরও একটি ইতিহাস জানতে হবে; আর তা হল লিওন রাষ্ট্র-কাঠামো থেকে ক্যাস্টোলার বিচ্ছিন্নতা প্রচেষ্টার ইতিহাস।

ক্যাস্টোলা ছিল লিওন রাষ্ট্রের পূর্ব অংশে অবস্থিত একটি প্রদেশ। এ অঞ্চলের অধিবাসীগণ মূলত বাসকিউ (The Basque Country) ও অ্যালিব্বা অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। প্রাক্তন গ্যালিসিয়ার নৃপতিগণ এ অঞ্চলটি জয় করে নিজেদের রাষ্ট্রসীমার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। অবশ্য সেসময় তারা স্বাধীনতা রক্ষায় সংগ্রামরত ক্যাস্টোলার নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এরপর ক্যাস্টোলাবাসী লিওন-

Scanned with CamScanner

শাসক দ্বিতীয় আরডোনিয়োর শাসনামলে বিদ্রোহ করলে তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে বশে আনেন এবং কিছু নেতৃবৃন্দকে হত্যা করলে অন্যরা তার আনুগত্য গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হয়। কেন্ট ফারনান গঞ্জালেস (Fernán González)-এর আত্মপ্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত পরিস্থিতি এমনই ছিল।

ক্যাস্টোলা অঞ্চলে নিজের প্রতিপত্তি সুসংহত করার পর কেন্ট তার অনুসারী ও সৈন্যদেরকে সমবেত করে লিওন নৃপতি দ্বিতীয় রামেরোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দেন। কিন্তু লিওন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। তার বন্দিত্বের পরও ক্যাস্টোলাবাসী বিদ্রোহ ও যুদ্ধ অব্যাহত রাখে এবং ক্যাস্টোলার সৈন্যদল লিওনের দিকে অগ্রসর হয়। বাধ্য হয়ে রামেরো ফারনান গঞ্জালেসকে এই শর্তে ছেড়ে দিতে রাজী হন যে, তিনি লিওন রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নেবেন, তার দখলে থাকা অঞ্চলসমূহের কর্তৃত্ব ছেড়ে দেবেন এবং নিজ কন্যা ইরোকাকে রামেরো-পুত্র আরডোনিয়োর সঙ্গে বিয়ে দেবেন। ফারনান গঞ্জালেস সবগুলো শর্ত মেনে নিলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এরপরও তার স্বাধীনতার স্বপ্ন মোটেই দুর্বল হয়নি।

এটা সে সময়ের কথা যখন মুসলমানগণ নব উদ্যমে বলীয়ান হয়ে পুনরায় লিওন রাষ্ট্রে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ৯৪৬ খৃস্টাব্দে আবদুর রহমান আননাসির ইসলামী রাষ্ট্র ও ক্যাস্টোলার সীমান্তবর্তী শহর সালিম নগরীতে ডিটেচমেন্ট বাহিনী প্রেরণ করেন। প্রবল আক্রমণের মুখে লিওন-শাসক রামেরো পরাভূত হন এবং আত্মরক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ফারনান গঞ্জালেস নিজের ঘাঁটি মজবুত করতে সচেষ্ট হন এবং ক্যাস্টোলার সকল যোদ্ধা নেতাদের নিজ পতাকাতলে টানতে সক্ষম হন, যেন পরবর্তীতে স্বাধীন ক্যাস্টোলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

লিওন রাষ্ট্র সম্পর্কে বাকি কথা

৯৫০ খৃস্টাব্দে লিওন নৃপতি দ্বিতীয় রামেরো মৃত্যুবরণ করেন এবং তার দু' পুত্র আরডোনিয়ো ও স্যাঞ্চোকে রেখে যান। বড় পুত্র আরডোনিয়ো ছিল তার প্রথম স্ত্রী তারাসিয়ার গর্ভের আর ছোট পুত্র স্যাঞ্চো তার দ্বিতীয় স্ত্রী ইরোকার গর্ভের। ইরোকা ছিল নাফার রাষ্ট্রের নৃপতি গার্সিয়ার বোন। তৎকালীন ইউরোপীয় প্রথা অনুযায়ী বয়সে বড় হিসেবে আরডোনিয়োই ছিলেন ক্ষমতার প্রকৃত দাবিদার। কিন্তু তার ভাই স্যাঞ্চো সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার

Scanned with CamScanner

প্রত্যাশায় নাফারে তার মামাদের কাছে এবং তার মাতামহ নাফার-সম্রাজ্ঞী তুতার কাছে সাহায্য চান। পাশাপাশি তিনি 'শত্রুর শত্রু বন্ধু' এই নীতিতে ক্যাস্টোলার স্বাধীনতাপ্রত্যাশী নেতা ফারনান গঞ্জালেসের সঙ্গেও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন। লিওন রাষ্ট্রের বর্তমান রাজা আরডোনিয়ো যদিও ফারনান গঞ্জালেসের জামাতা ছিলেন; কিন্তু গঞ্জালেসের লক্ষ্য ছিল যে কোনভাবে লিওন রাষ্ট্রকে দুর্বল করা। অবশ্য প্রতিপক্ষের ঐক্যবদ্ধতার পরও আরডোনিয়ো স্যাঞ্চো ও তার মিত্র বাহিনীকে পরাজিত করে ক্ষমতা সুসংহত করতে সক্ষম হন।

এ সময় লিওন রাষ্ট্রে মুসলিম বাহিনীর উপর্যুপরি হামলা অব্যাহত ছিল। ৯৫৫ খৃস্টাব্দের শুরুর দিকে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে বিপর্যস্ত আরডোনিয়ো খলীফা আবদুর রহমান আননাসিরের কাছে সন্ধি চুক্তির আবেদন জানাতে বাধ্য হন। খলীফা আবদুর রহমান আননাসির এই শর্তে চুক্তি করতে রাজী হন যে, আরডোনিয়ো সীমান্তের কিছু দুর্গ সংস্কার করে দেবেন এবং কিছু দুর্গ ভেঙে ফেলবেন।

কিন্তু এর অল্প ক'দিন পরেই আরডোনিয়ো মারা যান এবং তার ভাই স্যাঞ্চো তার স্থলাভিষিক্ত হন। ক্ষমতায় আরোহণের পর স্যাঞ্চো খলীফা আবদুর রহমান আননাসিরের সঙ্গে তার ভাইয়ের কৃত চুক্তির শর্ত বাস্তবায়ন করতে অস্বীকৃতি জানালে আবদুর রহমান আননাসির লিওন অভিমুখে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। বাধ্য হয়ে স্যাঞ্চো সন্ধি করেন এবং তার ভাইয়ের কৃত চুক্তির শর্ত পূরণ করতে রাজী হন। এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের মাঝে কিছু সময়ের জন্য হলেও শান্তভাব বিরাজ করে।

পরিস্থিতির দাবি ছিল ক্যাস্টোলার ফারনান গঞ্জালেস ও লিওনের স্যাঞ্চোর মধ্যেও এ সময় শান্তি বিরাজ করবে। কেননা, দুই ভাইয়ের সর্বশেষ সংঘাতের সময় ফারনান স্যাঞ্চোর দলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে বা ঘটল, তা ছিল প্রত্যাশার বিপরীত। কিছুদিন না যেতেই গঞ্জালেস স্যাঞ্চোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে চলতে লাগল শত্রুতা ও বিরোধ।

লিওন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে যখন রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্যাঞ্চোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং এই যুক্তিতে তাকে সিংহাসন থেকে অপসারণ করে যে, তিনি মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অতি স্থূলতার কারণে নিজে ঘোড়ায় আরোহণ করতে ও সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে স্যাঞ্চো

Scanned with CamScanner

পালিয়ে নাফার রাষ্ট্রের রাজধানী বানাবলুনায় তার নানী তুতার কাছে চলে যান। লিওন ও ক্যাস্টোলার নেতৃবৃন্দ মিলে চতুর্থ আরডোনিয়োকে নতুন রাজা হিসেবে নির্বাচন করে। চতুর্থ আরডোনিয়ো ইতঃপূর্বে তৃতীয় আরডোনিয়োর পরিত্যক্ত স্ত্রী গঞ্জালেস-কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন।

লিওন রাষ্ট্রের এই নতুন রাজা ছিলেন কুঁজো, কদাকার ও দুশ্চরিত্রসম্পন্ন। তার গড়ন ও আচরণে ত্যক্ত-বিরক্ত জনগণ তার উপাধি দিয়েছিল বদমাশ ও ইতর! এ সময় অপসারিত নৃপতি স্যাঞ্চো ক্ষমতা ফিরে পেতে মুসলিম খলীফা আবদুর রহমান আননাসিরের সহায়তা প্রার্থনা করেন। খলীফা আবদুর রহমান আননাসির ও স্যাঞ্চো উভয়ে একমত হন যে, আবদুর রহমান আননাসির স্যাঞ্চোর মেদরোগের চিকিৎসা করার জন্য কর্ডোভা থেকে একজন ইহুদি চিকিৎসককে স্যাঞ্চোর কাছে পাঠাবেন।

৩৪৭ হিজরীতে (৯৫৮ খৃস্টাব্দে) নাফার-সম্রাজ্ঞী তুতা তার পুত্র ও নাফার রাষ্ট্রের শাসক গার্সিয়া সানচেজকে সঙ্গে নিয়ে কর্ডোভায় আসেন; তাদের সঙ্গে আরও আসেন লিওনের অপসারিত নৃপতি স্যাঞ্চো। খলীফা আবদুর রহমান আননাসির খৃস্টান নেতৃবৃন্দের এই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদলকে রাজকীয় সংবর্ধনা প্রদান করেন। তিনি তুতার সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করেন, তার পুত্রকে নাফার রাষ্ট্রের ক্ষমতায় বহাল রাখেন এবং স্যাঞ্চোকে তার ক্ষমতা-পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায় সহায়তার আশ্বাস দেন। বিনিময়ে স্যাঞ্চো ক্ষমতা লাভের পর সীমান্তবর্তী কিছু দুর্গ মুসলমানদের কাছে সমর্পণ করার এবং অন্য কিছু দুর্গ ধ্বংস করে ফেলার প্রতিজ্ঞা করেন। এরপর খলীফা আবদুর রহমান আননাসির স্যাঞ্চোকে সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। স্যাঞ্চো লিওন আক্রমণ করেন আর একই সময় নাফারীরা পূর্ব দিক থেকে ক্যাস্টোলায় আক্রমণ করে। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে স্যাঞ্চোর বিজয় ও পুনরায় ক্ষমতায় আরোহণের মধ্য দিয়ে। ক্যাস্টোলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান ফারনান গঞ্জালেস এ সময় পালিয়ে বারগোসে (Burgos) আশ্রয় নেন।

এর কিছুদিন পরই খলীফা আবদুর রহমান আননাসির ইন্তেকাল করেন। সুযোগ পেয়ে আবারও স্যাঞ্চো চুক্তি ভঙ্গ করেন এবং খলীফা আবদুর রহমান আননাসিরের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণে অস্বীকৃতি জানান।

২. নাফার রাষ্ট্র

নাফার রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল খৃস্টীয় নবম শতকে। ৯০৫ খৃস্টাব্দে তৎকালীন নৃপতি ফারতুনকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার সহোদর প্রথম স্যাঞ্চো গার্সিয়া

Scanned with CamScanner

নাফার রাষ্ট্রের অধিপতি হন। আমীর আবদুল্লাহর শাসনামলে এবং খলীফা আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলের শুরুতে স্যাঞ্চো বেশ কয়েকবার মুসলিম আন্দালুসের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় স্যাঞ্চো তার কিশোর পুত্র গার্সিয়া সানচেজকে তার স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করে যান। বয়স অল্প হওয়ায় প্রথমে তার চাচা ক্যামেনো গার্সিস তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন; এরপর তার মা সম্রাজ্ঞী তুতা তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এমনকি গার্সিয়া সানচেজ পরিণত বয়সে উপনীত হওয়ার পরও রাষ্ট্র যদিও গার্সিয়ার নামে পরিচালিত হত; কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা তুতার হাতেই ছিল।

এ সময় নাফার রাষ্ট্র পার্শ্ববর্তী অন্য দুই খৃস্টান রাষ্ট্রের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলে। লিওনের অধিপতি তৃতীয় আরডোনিয়ো সম্রাজ্ঞী তুতার কন্যা ও গার্সিয়ার বোন ইরোকাকে বিয়ে করেন আর ক্যাস্টোলার কেন্ট ফারনান গঞ্জালেস তুতার আরেক কন্যাকে বিয়ে করেন। এ কারণে সম্রাজ্ঞী তুতা তিন খৃস্টান রাষ্ট্রেই দৃশ্যমান ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আগেই বলেছি, দ্বিতীয় রামেরোর মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র আরডোনিয়ো ও স্যাঞ্চোর মধ্যে ক্ষমতা দখলের সংঘাত শুরু হলে নাফার রাষ্ট্র স্যাঞ্চোর পাশে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তীতে স্যাঞ্চোকে লিওনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অপসারণ করলে দ্বিতীয়বারও নাফার রাষ্ট্রের সমর্থন ছিল স্যাঞ্চোর পক্ষে।

এরপর নাফার ও ক্যাস্টোলার মধ্যকার সম্পর্কে বিভক্তি দেখা দেয় এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফারনান গঞ্জালেস দীর্ঘকাল নাফারে বন্দী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে নাফার রাষ্ট্রের প্রতিপত্তি স্তিমিত হতে থাকে।[৩৮৩]

[৩৮৩] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/৫৮০।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলে আন্দালুসের নাগরিক সভ্যতার উন্নয়ন

এতক্ষণ আমরা খলীফা আবদুর রহমান আননাসিরের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস আলোচনা করেছি এবং এ দু' ক্ষেত্রে তিনি যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা উল্লেখ করেছি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শাসনামলের পুরো সময়কাল তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতি। বরং প্রকৃত বাস্তবতা এই যে, এই মহান খলীফা সালতানাতের সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার শাসনামলে আন্দালুসের নাগরিক সভ্যতার উন্নয়নে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়েছিল এবং সমকালীন বিশ্বে সমকক্ষ অন্য যে কোন রাষ্ট্রের তুলনায় উৎকৃষ্টতর নাগরিক জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত হয়েছিল। খলীফা আবদুর রহমান আননাসির তার নগর-সভ্যতা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সূচনা করেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের ও বৃহৎ পরিসরের প্রশাসনিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। প্রথমেই তিনি অনেকগুলো মন্ত্রণালয় ও দাফতরিক সংস্থা (কর্পোরেশন) পত্তন করেন, রাষ্ট্রের প্রতিটি দায়িত্ব ও কাজের জন্য উযীর পদমর্যাদার ভিন্ন ভিন্ন কর্মকর্তা নির্ধারণ করেন এবং প্রত্যেক কর্মকর্তার অধীনে বহুসংখ্যক প্রশাসনিক কর্মচারী ও কেরানী নিয়োগ দেন।
খলীফা আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলে নাগরিক জীবনব্যবস্থার মান উন্নয়নে আরও যেসব খাতে কাজ করা হয়েছে তার মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির কথা সামনে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

স্থাপত্য ও নির্মাণখাত

খলীফা আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলে স্থাপত্য খাতে যেসব কাজ হয়েছে, তার মধ্যে সবচে' বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং সবচে' আলোচিত নিঃসন্দেহে তার নির্মিত আযযাহরা নগরী। আযযাহরা নগরী সে যুগের বিচারে সর্বাধুনিক নকশা ও পরিকল্পনাকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছিল। এ নগরীর নির্মাণকাজের জন্য বিভিন্ন কাঁচামাল তিনি সুদূর কনস্টানটিনোপল, বাগদাদ,

Scanned with CamScanner

তিউনিসিয়া ও ইউরোপ থেকে আমদানি করেছিলেন। পুরো শহরটির নকশা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন স্তর বিন্যাস করে। শহরের একটি অংশ ছিল দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকদের জন্য। এ অংশটি সরকারী প্রহরী, কেরানী ও কর্মচারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এরপর প্রথম শ্রেণির অংশ, যা মন্ত্রিবর্গ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনরত নাগরিকদের জন্য নির্ধারিত ছিল। আর শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে ছিল অভিজাততম অংশটি, যেখানে খলীফার মূল প্রাসাদও ছিল।[৩৬৪]

মদীনাতুয যাহরাতেই খলীফা আবদুর রহমান আননাসির নির্মাণ করেছিলেন আযযাহরা প্রাসাদ। 'কাসরুয যাহরা' বা আযযাহরা প্রাসাদ সেই মনোমুগ্ধকর রাজপ্রাসাদের নাম, যার সঙ্গে তুল্য কোন প্রাসাদ সমকালীন বিশ্বে ছিল না। আবদুর রহমান আননাসিরের যথার্থ তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত আযযাহরা রাজপ্রাসাদ তৎকালীন বিশ্বের স্থাপত্যশিল্পের বিস্ময়ে পরিণত হয়েছিল। ইউরোপ ও ইসলামী বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল থেকে দলে দলে মানুষ আযযাহরা প্রাসাদ পরিদর্শন করতে আসত। ঐতিহাসিক মাক্কারী *'নাফহুত তীব'* গ্রন্থে লিখেছেন,

> খলীফা আবদুর রহমান আননাসির যখন আড়ম্বরতা ও মর্যাদায় স্থাপত্যশিল্পের চূড়ান্ত বিস্ময় আযযাহরা প্রাসাদ নির্মাণ করলেন, সকলে একবাক্যে স্বীকৃতি দিল যে, নিঃসন্দেহে এরূপ জাকজমকপূর্ণ প্রাসাদ ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নির্মিত হয়নি। দূর-দূরান্তের নানা দেশের বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের যে কেউ এ প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারত, বিশেষ করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নৃপতি, প্রতিনিধিদল, ঝানু ব্যবসায়ীদের দল, (আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, এ শ্রেণির লোকদের অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা অন্যদের তুলনায় অধিক ও প্রখর থাকে), প্রত্যেকেই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করত যে, তারা তাদের সুদীর্ঘ জীবনে আযযাহরার সঙ্গে তুল্য কোন স্থাপনা দেখেনি, শোনেওনি; এমনকি এমন হৃদয়কাড়া সৌন্দর্যের প্রতীক কোন স্থাপনা তাদের কল্পনাজগতেও ছিল না। সে যুগে আন্দালুস ভ্রমণকারী প্রতিটি পর্যটকের হৃদয়ের সবচে' বড় আকাঙ্ক্ষা থাকত আযযাহরা প্রাসাদ দর্শন এবং দর্শন গৌরবের স্মৃতি রোমাঞ্চন। এ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক বিবরণ পরিমাণে অনেক বিস্তৃত এবং এর প্রমাণও অনেক। পুরো

---

[৩৬৪] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৩১, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ৩৮ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৪৪।

Scanned with CamScanner

> প্রাসাদের বিবরণ আর কী দেব, কেবল এর উদ্যানের ওপর প্রলম্বিত আস্তরিত ছাদটির কথাই বলি । এতে ছিল স্বর্ণের আসন আর সুউচ্চ খিলান, সাথে যুক্ত হয়েছিল নির্মাণকুশলতা, সংকল্পের দৃঢ়তা আর তত্ত্বাবধায়কের রুচি-সৌন্দর্য। ছিল খাঁজ-কাটা শ্বেতমর্মর, আর স্বর্ণখচিত আচ্ছাদনের উৎকর্ষ । এত নিখুঁত সব স্তম্ভ, যেন ছাঁচে ঢেলে নির্ভুল মাপে তৈরি করা হয়েছে । স্তম্ভগুলোতে কারুকার্য ও আল্পনা অঙ্কন করে বাগানের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । বিশালাকৃতির জলাশয়, পানির ফোয়ারা (অথচ আকারে বড় হওয়া সত্ত্বেও দেখতে মোটেও বেখাপ্পা বা অসুন্দর লাগতো না) এবং আশ্চর্য ডিজাইনের নানারকম ভাস্কর্য । আযযাহরা প্রাসাদ পরিদর্শন করার পর দর্শক-মস্তিষ্ক অভিব্যক্তি প্রকাশের ভাব ও ভাষাই হারিয়ে ফেলে । কত পবিত্র সেই মহান সত্তা, এই দুর্বল সৃষ্টিকে যিনি ক্ষমতাসম্পন্ন করেছেন।[৩৬৫]

খলীফা আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলে কর্ডোভা শহরের আয়তনও ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হয়েছিল । নগরীর অধিবাসী মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ লক্ষে পৌঁছেছিল ।[৩৬৬] এর ফলে জনসংখ্যার বিচারে কর্ডোভা পরিণত হয়েছিল বাগদাদের পর তৎকালীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ জনবহুল শহরে । উল্লেখ্য, তৎকালীন বাগদাদ নগরীর জনসংখ্যা ছিল বিশ লক্ষ ।[৩৬৭]

ইবনে আ'যারী রহ. আবদুর রহমান আননাসিরের আমলের কর্ডোভার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন,

> বনু উমাইয়ার প্রতি আল্লাহ দয়ার আচরণ করুন । বনু উমাইয়ার আমলে যখন কর্ডোভা নগরী তার পূর্ণতায় উপনীত হয়, তখন তার নিদর্শনাবলি ও বিশালত্ব সম্পর্কে বলা হত, নগরীর অভ্যন্তরে উযীর বা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিবর্গ বাদে কেবল সাধারণ জনসাধারণের বাড়ির সংখ্যা ছিল এক লক্ষ তের হাজার, মসজিদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার; আর আযযাহরা প্রাসাদ এলাকার অভ্যন্তরেই ছিল চার শ' বাড়ি । এগুলো ব্যবহৃত হত সুলতান এবং তার পরিবার-পরিজন ও অনুচরদের বসবাসের জন্য ।[৩৬৮]

ইবনে হিব্বানের সূত্রে মাক্কারী রহ. লিখেছেন,

---

[৩৬৫] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৫৬৬ ।

[৩৬৬] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/৪৩৬ ।

[৩৬৭] তারিক সুওয়াইদান, *আন্দালুস আলতাকারীখুল মুসাওওয়ার*, পৃ : ১৯৮ ।

[৩৬৮] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৩২ ।

Scanned with CamScanner

> ইবনে আবু আমিরের যুগে যখন কর্ডোভা তার পূর্ণতায় পৌঁছয়, তখন সেখানে মসজিদের সংখ্যা ছিল এক হাজার ছয়শত, সরকারী স্নানাগারের সংখ্যা ছিল নয়শত। প্রাচীন বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ আছে, পূর্ববর্তী যুগে কর্ডোভায় তিন হাজার নয় শ' সাতাত্তরটি মসজিদ ছিল। এর মধ্যে শাকুন্দায় (Secunda) ছিল আঠারটি মসজিদ, নয় শ' এগারটি স্নানাগার, এক লক্ষ বাড়ি; তের হাজার বাড়ি প্রজাদের জন্য নির্দিষ্ট, অর্ধেক বা তারও বেশি বাড়ি রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ও বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য।[৩৬৯]

এছাড়াও আবদুর রহমান আননাসির কর্ডোভা মসজিদের আরতন সম্প্রসারণ করেছিলেন। ফলে তা স্থাপত্যশিল্পের এক অপূর্ব বিস্ময়ে পরিণত হয়। মসজিদের মেহরাবটি ছিল ঝিনুকাকৃতির একটি আস্ত শ্বেতমর্মর দ্বারা তৈরি।[৩৭০]

উল্লিখিত স্থাপত্যসমূহ এবং এ জাতীয় নাগরিক সভ্যতার অন্যান্য নিদর্শনাবলির কারণে সমকালীন বিশ্বে কর্ডোভা পরিচিত লাভ করেছিল জাওহারাতুল আ'লম বা 'পৃথিবীর রত্নখণ্ড' নামে।[৩৭১]

অর্থনৈতিক খাত

আবদুর রহমান আননাসির রহ.-এর শাসনামলে আন্দালুস অভূতপূর্ব স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের মাঝে সময় অতিবাহিত করেছিল। রাষ্ট্রীয় সম্পদের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশের বার্ষিক রাজস্ব আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রায়। প্রপিতামহ আবদুর রহমান আদদাখিলের মতো আবদুর রহমান আননাসিরও রাষ্ট্রীয় আয়কে তিন ভাগে বণ্টন করে এক-তৃতীয়াংশ সামরিক খাতে, এক-তৃতীয়াংশ নির্মাণ ও সরকারী কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি খাতে ব্যয় করতেন আর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ রেখে দিতেন আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য।[৩৭২]

তার শাসনামলে কৃষিব্যবস্থাতেও যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল। আন্দালুসে এ সময় ধান, আখ, জলপাই, শণসহ বিভিন্ন প্রজাতির ফল ও

---

[৩৬৯] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৫৪০।

[৩৭০] ড. হুসাইন মুনিস, *মাজা'লিমু তারীখিল মাগরিব ওয়াল আন্দালুস*, পৃ : ৩৭৮।

[৩৭১] আবদুর রহমান আলহাজ্জী, *আতভারীখুল আন্দালুসী*, পৃ : ৩১৪।

[৩৭২] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৩১ ও ইকদুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ৩৮।

Scanned with CamScanner

ফসলের চাষ হত। তিনি রেশম পোকার প্রজনন ও প্রতিপালনের জন্য বিশেষ কয়েকটি খামার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফসলের ক্ষেতে নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সুশৃঙ্খল সেচ-ব্যবস্থা তথা পানির নালা ও খাল এবং পানি টেনে তোলার বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি চাষাবাদের জন্য মৌসুমভিত্তিক ক্যালেন্ডারের প্রবর্তন করেছিলেন। মুসলিম আন্দালুস থেকেই ইউরোপ লাভ করেছিল কৃষিব্যবস্থার এই সুশৃঙ্খল পদ্ধতি।[৩৭৩]

বিভিন্ন খনিজ ধাতু যেমন স্বর্ণ, রূপা ও তামা ইত্যাদি আহরণের প্রতিও তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। চামড়াজাত শিল্প, জাহাজনির্মাণ শিল্প, চাষাবাদের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তিনি বেশ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার শাসনামলে ঔষধশিল্পও বেশ উন্নতি সাধন করেছিল। আবদুর রহমান আননাসির রহ. এ জাতীয় বিভিন্ন পণ্য লেনদেন ও প্রদর্শনীর জন্য অনেকগুলো স্বতন্ত্র বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ কাঁসারীদের জন্য ছিল একটি বাজার, অন্য একটি বাজার গোশত বিক্রির জন্য। সেসময় কর্ডোভাতে ফুল কেনা-বেচার জন্যও আলাদা বাজার ছিল।[৩৭৪]

নিরাপত্তা খাত

পুলিশ প্রশাসন একটি দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশাসনিক বিভাগ। খলীফা আননাসিরের শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম আন্দালুসের পুলিশ বিভাগ দু'টি স্তরে বিন্যস্ত ছিল; উচ্চতর বিভাগ ও নিম্নতর বিভাগ। কিন্তু খলীফা আবদুর রহমান আননাসির রহ.-এর শাসনামলে ৩১৭ হিজরীতে পুলিশ বিভাগের বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় একে তিনটি স্তরে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়; উচ্চতর পুলিশ বিভাগ, মধ্যম স্তরের পুলিশ বিভাগ ও নিম্নতর পুলিশ বিভাগ। এছাড়াও ৩২৫ হিজরীতে তিনি বিচারব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজান এবং একে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেন। এর পূর্বে মোকাদ্দমা দায়ের ও বিচারিক কার্যক্রম একই প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত হত। তিনি অভিযোগ ও মোকাদ্দমা দায়েরের জন্য ভিন্ন প্রশাসনব্যবস্থা ও বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা চালু করেন।[৩৭৫]

---

[৩৭৩] আরিফ সুওয়াইদান, *আন্দালুস আতলান্টাদুল মুসাওওয়ার*, পৃ : ২০০।

[৩৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ : ২০০।

[৩৭৫] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/৬৮৫।

Scanned with CamScanner

বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গন

আবদুর রহমান আননাসির রহ.-এর শাসনামলে পঠন-পাঠন ও তা'লীম-তা'আল্লুম তথা একাডেমিক অঙ্গনেও লক্ষণীয় মাত্রায় উন্নতি সাধিত হয়। ইতঃপূর্বে প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভা গ্রন্থাগারের মানোন্নয়নের প্রতি তিনি যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। তিনি এর আয়তন ও সংরক্ষিত গ্রন্থের পরিমাণ বৃদ্ধিতে অবদান রাখেন। তার সময়ে এ গ্রন্থাগারের গ্রন্থের সংখ্যা ছিল চার লক্ষ[৩৭৬]। মনে রাখতে হবে, এটি সে সময়ের কথা, যখন মুদ্রণশিল্প আবিষ্কৃত হয়নি। কোন কিতাবের মালিক হতে চাইলে তখন একটাই পথ ছিল, লিপিকারের শরণাপন্ন হওয়া। আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলে কর্ডোভা গ্রন্থাগারের জন্য পেশাদার লিপিকার নিযুক্ত ছিল। লিপিকারগণ পালাক্রমে গ্রন্থাগারে যেতেন এবং ক্রেতা-চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রন্থের অনুলিপি তৈরি করে দিতেন।[৩৭৭]

বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনের এই আলোকজ্জ্বল পরিবেশের প্রভাবেই আবদুর রহমান আননাসির রহ.-এর শাসনামলের প্রতিভাবান ও শ্রেষ্ঠ অনেক আলিমের নাম ঐতিহাসিক উৎসগ্রন্থসমূহ এবং 'তারাজিম' ও 'তাবাকাত'-শাস্ত্রের গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন,

১. হাসসান বিন আবদুল্লাহ বিন হাসসান রহ.

তিনি ইসেজার অধিবাসী ছিলেন। জন্ম ২৭৮ হিজরীতে (৮৯১ খৃস্টাব্দে), মৃত্যু ৩৩৪ হিজরীতে (৯৪৬ খৃস্টাব্দে)। তারাজিমের গ্রন্থাদিতে তার পরিচয় এভাবে বিবৃত হয়েছে– তিনি ছিলেন ফিকহের বিদ্বান, ফাতাওয়ার হাফিয, হাদীস ও সাহাবাবাণীর বিশেষ অনুরাগী; ভাষাশাস্ত্র, ব্যাকরণ-শাস্ত্র, কাব্যরীতি ও কাব্যমর্ম নির্ধারণে সুপণ্ডিত। এ ছাড়াও মীরাস-শাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্রেও তার বুৎপত্তি ছিল। সুউচ্চ ইলমী মর্যাদার কারণে তার সম্পর্কে

---

[৩৭৬] ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত দেশের সবচে' বড় গ্রন্থাগার সুফিয়া কামাল গণগ্রন্থাগার (পাবলিক লাইব্রেরী)-এ ১৯-০২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মোট গ্রন্থের সংখ্যা ২,০৬,৯০০টি। অর্থাৎ সংখ্যার দিক থেকে কর্ডোভার গ্রন্থাগারের প্রায় অর্ধেক। (অনুবাদক)

[৩৭৭] তারিক সুওয়াইদান, *আন্দালুস আতলান্টীসুল মুসাওওয়ার*, পৃ। ২০১।

Scanned with CamScanner

বলা হত, ইসেজার ইতিহাসে তার পূর্বে বা পরে তার মানের কোন আলিমের জন্ম হয়নি।[৩৭৮]

২. মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আলগাইথী রহ.

কর্ডোভার অধিবাসী। কর্ডোভায় 'কাযিউল জামাআহ[৩৭৯]-এর দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথমে আন্দালুসের সমকালীন শায়খদের কাছে ইলম অর্জন করেন। এরপর তিনি ইলম অর্জনের জন্য পর্যায়ক্রমে মক্কা, মিশর, তিউনিসিয়া সফর করেন। তিনি ছিলেন ফকীহদের রেওয়ায়েতসমূহের হাফিয, আছার ও সাহাবাবাণী মুখস্থের ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান, সুনানের সংকলক, ইলমুল ই'রাব (নাহুশাস্ত্র) ও কাব্যমর্ম নির্ধারণ-শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতার অধিকারী। তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। আবদুর রহমান আননাসির তাকে প্রথমে ইলবেরা ও বাজ্জানার বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ৩২৬ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে তিনি তাকে কর্ডোভার কাযিউল জামাআ'হর পদ প্রদান করেন। তিনি প্রায়ই সীমান্তশহরগুলোতে সফর করতেন এবং সেখানকার দুর্বলতাসমূহ সংশোধনে সচেষ্ট হতেন। ৩৩৯ হিজরীতে (৯৫১ খৃস্টাব্দে) এমনই এক সফরে সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থানকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং টলেডোর নিকটবর্তী একটি দুর্গে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে সেখানেই দাফন করা হয়।[৩৮০]

আবদুর রহমান আননাসিরের পররাষ্ট্রনীতি

আবদুর রহমান আননাসির রহ.-এর সুখ্যাতি সমকালীন বিশ্বের সকল দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো তার সঙ্গে সন্ধি করে তাকে সন্তুষ্টচিত্তে জিযিয়া প্রদান করত। পুরো ইউরোপ থেকে বিভিন্ন দেশের দূতগণ তার দরবারে আগমন করে তার হৃদ্যতা প্রার্থনা করত। জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড থেকে এমনকি ইউরোপের একেবারে পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সটান্টিনোপল থেকেও প্রতিনিধিদল আগমন করে তার সাক্ষাতলাভে ধন্য হত।[৩৮১]

---

[৩৭৮] ইবনুল ফারাযী, *তারীখু উলামাইল আন্দালুস*, পৃ : ১১৬।

[৩৭৯] বাগদাদ-কেন্দ্রিক আব্বাসী খেলাফতের প্রধান বিচারপতিকে যেমন কাযিউল কুযাত বলা হত, আন্দালুসের উমাইয়া রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতিকে বলা হত কাযিউল জামাআ'হ। (অনুবাদক)

[৩৮০] ইবনুল ফারাযী, *তারীখু উলামাইল আন্দালুস*, পৃ : ৫৮-৫৯।

[৩৮১] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩৬৬।

Scanned with CamScanner

কন্সটান্টিনোপল ছিল আন্দালুস থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এতৎসত্ত্বেও বাইজান্টাইন সরকার প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে তার হৃদ্যতা প্রার্থনা করত এবং বিভিন্ন মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল অতি মূল্যবান বৃহৎ আকৃতির একটি মুক্তা, যা তিনি আযযাহরা রাজপ্রাসাদে স্থাপন করেছিলেন। অন্যান্য মূল্যবান উপঢৌকনের পাশাপাশি কন্সটান্টিনোপল-সম্রাট ইউনানী রাজপ্রাসাদের মূল্যবান বিভিন্ন উপহারসামগ্রীও আন্দালুস রাজদরবারে প্রেরণ করেছিলেন।[৩৮২]

আবদুর রহমান আননাসির রহ.-এর শাসনামলে এমনই ছিল ইসলামের মর্যাদা ও গৌরব। মুসলিম আন্দালুস পরিণত হয়েছিল মধ্যযুগের ইউরোপের অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বৃহত্তম ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে। তাই তো আজকের আধুনিক স্পেন একটি খৃস্টানপ্রধান রাষ্ট্র হয়েও ১৯৬৩ খৃস্টাব্দে আবদুর রহমান আননাসির রহ.-এর মৃত্যুর এক হাজার বছর পূর্তি উদযাপন করেছে। কেননা, কালের পরিক্রমায় তিনি ছিলেন স্পেনের শ্রেষ্ঠতম শাসক। যে মহান ব্যক্তি স্পেনকে বিশ্বদরবারে সমুন্নত আসনে উন্নীত করেছিলেন, যার শাসনামলে আন্দালুস পরিণত হয়েছিল বিশ্বের সবচে' শক্তিধর রাষ্ট্রে, আধুনিক স্পেন পারেনি তার প্রতি নিজের মুগ্ধতাকে গোপন রাখতে।

ব্যক্তি আবদুর রহমান আননাসির

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী এ মহান শাসকের যে ইতিহাস আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তা পাঠ করে পাঠকমনে এ চিন্তা ঘুরপাক খেতে পারে যে, এ ধরনের ব্যক্তি জীবনের চলার পথে শুধু একটি পথই চেনেন; আর তা হল গৌরব ও গাম্ভীর্যের পথ, সম্মান ও মর্যাদার পথ, হার না মানা অদম্য মানসিকতার পথ। পাঠকমনের এ চিন্তা যদিও অশুদ্ধ নয়; কিন্তু যিনি আবদুর রহমান আননাসিরের সুবিশাল ব্যক্তিত্বের দিকে তাকাবেন, অবলোকন করবেন তার অর্ধ শতাব্দীব্যাপী শাসকজীবন, তিনি লক্ষ করবেন এক আশ্চর্য বিস্ময়। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করবেন, এই মহান ব্যক্তি এ বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যস্ততা ও রাজদণ্ডের কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও সর্বদা আপন প্রতিপালকের যিকিরে নিমগ্ন, প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তনে সদা উদ্‌গ্রীব!

আন্দালুসে একবার দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টির কারণে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন আবদুর রহমান আননাসির ইসতেস্‌কার নামাযে ইমামতি

---

[৩৮২] প্রাগুক্ত, ১/৫৪১।

Scanned with CamScanner

করার আবেদন জানিয়ে কর্ডোভার খতীব কাযী মুনযির বিন সাঈদের কাছে একজন বার্তাবাহককে পাঠালেন। মুনযির বিন সাঈদ বার্তাবাহককে বললেন, হায়! আমি যদি জানতাম, খলীফা এখন কী করছেন? বার্তাবাহক বললেন, খলীফাকে আমি আজকের মতো কোনদিন আল্লাহর দরবারে এতটা বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করতে দেখিনি। তিনি দিশেহারা, কোলাহল-বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন, একেবারে নিম্নমানের বস্ত্র গায়ে জড়িয়ে মাটিতে বসে মাথা ও দাঁড়িতে মাটি মাখছেন আর কেঁদে কেঁদে নিজের অপরাধ ও তুচ্ছতার স্বীকারোক্তি করছেন। তিনি বলছেন, আয় আল্লাহ! আমার সবকিছু তো আপনারই কুদরতি হাতে। আহকামুল হাকিমীন হয়েও আপনি আমার গোনাহর কারণে প্রজাদের শাস্তি দেবেন?! আমার কোন কিছুই তো আপনার নিয়ন্ত্রণ-ঊর্ধ্ব নয়! বর্ণনাকারী বলেন, বার্তাবাহকের এ কথা শোনার পর মুনযির বিন সাঈদের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, বৎস! আমার ছাতাটি সঙ্গে নিয়ে নাও। আল্লাহ তো বৃষ্টিবর্ষণের নির্দেশ দিয়েই দিয়েছেন! মাটির প্রতাপশালী রাজা যখন বিনম্র হয়ে গেছেন, আকাশের মহা পরাক্রমশালী রাজাধিরাজ তো অবশ্যই দয়ার আচরণ করবেন। মুনযির যেমন বললেন, তেমনই হল। মানুষ ইসতেস্কার ময়দান থেকে ফিরে এল বৃষ্টি মাথায় করে।[৩৮৩]

আবদুর রহমান আননাসির মাঝে মধ্যে কবিতাও আবৃত্তি করতেন। আযযাহরা নগরীর পত্তনের বিষয়ে তার একটি কবিতার অংশ বিশেষ..

هِمَمُ الْمُلُوكِ إِذَا أَرَادُوا ذِكْرَهَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَبِأَلْسُنِ الْبُنْيَانِ

إِنَّ الْبِنَاءَ إِذَا تَعَاظَمَ شَأْنُهُ أَضْحَى يَدُلُّ عَلَى عَظِيمِ الشَّانِ

মৃত্যুর পরও পৃথিবীর বুকে আপন খ্যাতি ও আলোচনা টিকিয়ে রাখতে চাইলে শাসকগণ স্থাপত্যের মাধ্যমে খ্যাতিমান হতে চান।

কেননা, স্থাপনা যখন মানে ও সৌকর্যে খ্যাতি লাভ করে, প্রকৃতপক্ষে তা নির্মাতার শ্রেষ্ঠত্বেরই স্বীকৃতি প্রদান করে।[৩৮৪]

---

[৩৮৩] দেখুন : ইবনে খাক্কান, *মাতমাহুল আনফুস*, পৃ : ১০৩, যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ২৫/৪৪৪ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৫৭৩।

[৩৮৪] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৫৭৫।

Scanned with CamScanner

আবদুর রহমান আননাসির রহ. সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত

আল্লামা যাহাবী রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন,

> তিনি ছিলেন সাহসী, বীর, বিচক্ষণ, উদারমনা ও সুমহান চরিত্রের অধিকারী। আন্দালুসে তার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত তিনি জবরদখলকারীদের মূলোৎপাটনে সচেষ্ট ছিলেন। তার শাসনামলে আন্দালুসে যেভাবে আলিম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ ঘটেছিল, তা অন্য কারও আমলে হয়নি। তিনি গুরুত্বপূর্ণ, বিশাল ও ঐতিহাসিক অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ইবনে আবদি রব্বিহী বলেছেন, আমি রাজায ছন্দে একটি কবিতা রচনা করেছি এবং তাতে তার যুদ্ধাভিযানগুলোর ইতিহাস কবিতার ছন্দে বিবৃত করেছি। তিনি আরও বলেন, আবদুর রহমান আননাসির বড় বড় সত্তরটি দুর্গ জয় করেন। কবিগণ আপন আপন কবিতায় তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।[৩৮৫]

সাফাদী রহ. তার সম্পর্কে লিখেছেন,

> আবদুর রহমান আদদাখিলের পর সমরে নিপুণ, সিদ্ধান্তে নিখুঁত এবং বিপদ ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সদা অগ্রসর তার মতো আর কেউ আসেনি। তিনি লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে তবেই ক্ষান্ত হতেন। তিনি যেভাবে সৈন্যবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেছেন, ইতঃপূর্বে তা কেউ করে দেখাতে পারেনি। আহলে ইলমের কদর করতেন, কাযী ও বিচারক নির্বাচনে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করতেন, অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন; কেবল যথাযথ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় সম্পদ খরচ করতেন।[৩৮৬]

৭২ বছরের সংগ্রামী জীবন শেষে ৩৫০ হিজরীর রমযান মাসে (৯৬১ খৃস্টাব্দে) আন্দালুস ইতিহাসের এই মহান শাসক ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পর তার কোষাগারে তার স্বহস্তে লিখিত একটি চিরকুট পাওয়া যায়। চিরকুটটিতে তিনি তার জীবনের পেরেশানীমুক্ত দিনগুলোর বিবরণ উল্লেখ করেছেন। তাতে লেখা ছিল, অমুক বছরের অমুক মাসের অমুক দিনটি আমার দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানীমুক্ত কেটেছে। উপস্থিত লোকেরা হিসাব করে দেখল, তার জীবনে এমন মাত্র চৌদ্দটি দিন অতিবাহিত হয়েছে।[৩৮৭]

---

[৩৮৫] যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ২৫/২৩৭।

[৩৮৬] সাফাদী, *আলওয়াফী বিল ওয়াফাইয়াত*, ১৮/১৩৭।

[৩৮৭] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৩২ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩৭৯।

Scanned with CamScanner

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
হাকাম আলমুসতানসির রহ.

হাকাম আলমুসতানসির (৩০২-৩৬৬ হি./৯১৪-৯৭৬ খৃ.) ও উত্তরণের যুগ

আবদুর রহমান আননাসির তার উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন পুত্র হাকামকে। হাকাম ৩৫০ হিজরী হতে ৩৬৬ হিজরী পর্যন্ত (৯৬১-৯৭৬ খৃস্টাব্দ) আন্দালুস শাসন করেন। তিনি 'মুসতানসির বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেছিলেন।

শাসনভার গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল প্রায় সাতচল্লিশ বছর।[৩৮৮] আবদুর রহমান আননাসির নিজের জীবদ্দশায় তাকে সবসময় কাছে রাখতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে তার ওপর নির্ভর করতেন। ফলে শাসনভার গ্রহণের পূর্ব থেকেই তিনি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদিতে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। তার পিতা মহান শাসক আবদুর রহমান আননাসির রহ. আপন শাসনামলে মুসলিম আন্দালুস রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে এবং সব ধরনের ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে পিতার অবর্তমানে হাকামের পক্ষে আন্দালুসকে নাগরিক সভ্যতার অতি উন্নত স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া সহজ হয়েছে। তার শাসনামলে আন্দালুসে ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা এবং নাগরিক সভ্যতার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

ইবনুল খতীব রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন,

> তিনি ছিলেন আলিম, ফকীহ, মাযহাবসমূহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী, কুলজি-শাস্ত্রের ইমাম, ইতিহাসের হাফিয, গ্রন্থপ্রেমী ও প্রচুর গ্রন্থ সংগ্রহকারী, যুগ ও প্রজন্ম এবং দেশ ও সময়কালের বিবেচনায় মনীষীদের পাথক্য নিরূপণ-শাস্ত্রে সুদক্ষ। এ শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য তিনি যথেষ্ট একাগ্রতার সঙ্গে অধ্যয়ন করতেন এবং অনুসন্ধিৎসু থাকতেন। আর তাই এ বিষয়ে তিনি আদর্শ বলে বিবেচিত হতেন এবং এ বিষয়ে তার মন্তব্যকে হুজ্জত ও দলীল বিবেচনা করা হত।[৩৮৯]

---

[৩৮৮] ইবনে হাযম, *রাসাইলু ইবনি হাযম*, ২/১৯৪।
[৩৮৯] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ৪১।

Scanned with CamScanner

তার শাসনামলে আন্দালুসের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে উন্নতি সাধিত হয়েছিল, তা সম্পর্কে ইবনুল খতীব মন্তব্য করেছেন,

> তার মাধ্যমেই আন্দালুসের আড়ম্বরতা ও মর্যাদা, জ্ঞান ও আভিজাত্য, বিদ্যমান নিদর্শনাবলি ও উন্নত কল্যাণকর্মসমূহ পূর্ণতায় পৌঁছয়।[৩৯০]

হাকাম বিন আবদুর রহমান উমাইয়া গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন, যাকে সার্বিক বিবেচনায় মধ্যযুগের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার বলে গণ্য করা হত। মান ও পরিমাণের বিচারে উমাইয়া গ্রন্থাগার সমকালীন দুই বিখ্যাত গ্রন্থাগার মাকতাবায়ে কর্ডোভা ও মাকতাবায়ে বাগদাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত।

হাকাম বিন আবদুর রহমান বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুর্লভ ও বৃহৎ আকারের গ্রন্থাবলি সংগ্রহ করার জন্য হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করতেন। লাইব্রেরী-ব্যবস্থাপনার জন্য নিযুক্ত ছিলেন কয়েকজন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, যাদের একমাত্র দায়িত্ব ছিল মুসলিম বিশ্ব, অমুসলিম বিশ্ব নির্বিশেষে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের সকল দেশ থেকে বিভিন্ন দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করা। কর্মকর্তাগণ যখন কোন অমুসলিম দেশ থেকে জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা বা অন্য কোন শাস্ত্রের নতুন কোন গ্রন্থ নিয়ে আসতেন, তৎক্ষণাৎ তা আরবীতে অনুবাদ করে উমাইয়া গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালায় যুক্ত করা হত। হাকাম বিন আবদুর রহমান গ্রন্থাগারটির জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত পরিসরের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং অধিকসংখ্যক মুসলিম গ্রন্থপ্রেমীর অধ্যয়ন-সুবিধার উদ্দেশ্যে বড় বড় কয়েকটি হলরুমের ব্যবস্থা করেছিলেন।

হাকাম বিন আবদুর রহমান কোন কিতাবের ক্রয়মূল্য যত বেশিই হোক না কেন, তা ক্রয় করতেন। উমাইয়া মাকতাবার জন্য তিনি ইমাম আস্‌ফাহানী লিখিত (বিখ্যাত সাহিত্যগ্রন্থ) 'কিতাবুল আগানী'-এর মূল নোসখা সংগ্রহ করেছিলেন।[৩৯১] আসফাহান বর্তমান ইরানের একটি নগরী। ভেবে দেখুন, কোথায় ইরান আর কোথায় বর্তমান স্পেন? এই গ্রন্থপ্রেমী খলীফার জ্ঞানপ্রীতির সামনে কোন দূরত্ব বা সীমান্তরেখা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তার যুগে প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থের অনুলিপি তৈরি করা হত; এমনকি ইবনে খালদুন লিখেছেন,

> তিনি তার কার্যালয়ে অনুলিপিশিল্পে সুদক্ষ, মূল পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধারে দক্ষ, বাঁধাইয়ের কাজে অভিজ্ঞ পেশাদার লিপিকারদের সমবেত করেছিলেন। তার

---

[৩৯০] প্রাগুক্ত, পৃ : ৪২।

[৩৯১] ইবনে খালদুন, তারীখে ইবনে খালদুন, ১/১৪৬ ও মাক্কারী, নাফহুত তীব, ১/৩৮৬।

Scanned with CamScanner

আমলে আন্দালুসে যে গ্রন্থভাণ্ডার সংগৃহিত হয়েছে, তার পূর্বে বা পরে আর কারও সময়ে তা হয়নি। অবশ্য আব্বাসী খলীফা নাসির ইবনুল মুসতাযী সম্পর্কেও এরূপ গ্রন্থপ্রীতির কথা উল্লেখ আছে।[৩৯২]

তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল, তিনি দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য সরকারীভাবে শিক্ষকের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের বেতন-ভাতা বাইতুল মাল থেকেই প্রদান করা হত। এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল সাতাশটি; যার মধ্যে তিনটি ছিল কর্ডোভা কেন্দ্রীয় মসজিদের সন্নিকটে, আর বাকিগুলো কর্ডোভার বিভিন্ন উপকণ্ঠে।[৩৯৩] এছাড়াও তিনি কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন, যার অবস্থান ছিল কর্ডোভা মসজিদ ও তার সংলগ্ন স্থানে। মসজিদের ইলমী হালাকা ও পাঠচক্রগুলোতে বিভিন্ন শাস্ত্রের পাঠদান করা হত। হাদীসের দরস দিতেন আবু বকর বিন মুয়াবিয়া আলকুরাশী। 'যাইফুল আন্দালুস' (আন্দালুস-অতিথি) আবু আলী আলকালীর পাঠদানের বিষয় ছিল ইসলামপূর্ব আরবজাতির পরিচয়, তাদের ভাষা, কবিতা ও প্রবাদ-প্রবচন পরিচিতি। তিনি তার ছাত্রদের এ বিষয়ের সমৃদ্ধ দরসগুলো 'ইমলা' করাতেন। ইবনুল কুতিয়া দিতেন নাহু বা ব্যাকরণশাস্ত্রের দরস। অন্যান্য শাস্ত্রের পাঠদান করতেন সে যুগের বিদগ্ধ ও শাস্ত্রজ্ঞ আলিমগণ। হাজার হাজার ছাত্র ইলম অর্জনের জন্য বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটে আসত।[৩৯৪]

এ কারণেই আমরা ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে হাকাম বিন আবদুর রহমানের শাসনামলের অনেক আলিমের নাম পাঠ করে থাকি। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন,

১. আবু বকর যুবাইদী রহ.

তিনি কর্ডোভা-নিবাসী ছিলেন। জন্ম ৩১৬ হিজরীতে (৯২৮ খৃস্টাব্দে)। তার বংশধারা ইয়ামেনের একটি প্রসিদ্ধ ও বড় বংশ যুবায়দ-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইলমুন নাহু (ব্যাকরণশাস্ত্র) ও হিফযুল লুগাহ বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। নিজ সময়ে ইলমুল ই'রাব (ব্যাকরণশাস্ত্র), ইলমুল মাআ'নী (অলঙ্কারশাস্ত্র),

---

[৩৯২] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৪৬।

[৩৯৩] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৪০।

[৩৯৪] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/৫০৭। (এ বিবরণ বিখ্যাত স্প্যানিশ প্রাচ্যবিদ রেনহার্ট ডোজি-এর)।

Scanned with CamScanner

সিয়ার ও আখবার-শাস্ত্রে (ইতিহাস ও জীবনেতিহাসশাস্ত্র) সবচে' অভিজ্ঞ ছিলেন। পুরো আন্দালুসে তার শাস্ত্রে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। তার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ তার ইলমী শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য বহন করে। তার রচিত প্রসিদ্ধ কয়েকটি কিতাব হল:

- মুখতাসারু কিতাবিল আ'ইন (مختصر كتاب العين) (খলীল বিন আহমাদ রচিত 'কিতাবুল আইন'-এর সংক্ষেপন)।
- তাবাকাতুন নাহবিয়্যীন ওয়াল লুগাবিয়্যীন বিল মাশরিক্ব ওয়াল আন্দালুস (طبقات النحويّين واللغويّين بالمشرق والأندلس) (মুসলিম প্রাচ্য ও আন্দালুসের ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদদের ক্রমধারা)। এ গ্রন্থে তিনি আরবী ব্যাকরণ-শাস্ত্রের পুরোধা আবুল আসওয়াদ দুয়াইলীর সময়কাল থেকে আপন উসতায আবু আবদুল্লাহ আননাহবীর সময়কাল পর্যন্ত পুরো সময়কালের ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদদের কথা আলোচনা করেছেন।
- আলআব্নিয়া ফিন নাহ্ (الأبنية في النحو) (আরবী ব্যাকরণের মূলনীতিসমূহ)। এ শাস্ত্রে এটি অনন্য কিতাব বলে স্বীকৃত।

হাকাম বিন আবদুর রহমান তাকে নিজ পুত্র ও ওলিয়ে আ'হদ (ভাবী খলীফা) হিশামের শিক্ষাদানের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি হিশামকে গণিতশাস্ত্র ও আরবী ভাষা শিক্ষা দেন। এছাড়াও তিনি সেভিলের বিচার ও নিরাপত্তা বিভাগের উপদেষ্টার দায়িত্বও পালন করেছেন। তার প্রচুর স্ব-রচিত কবিতা রয়েছে। আবু মুসলিম বিন ফিহ্র সম্পর্কে তার রচিত একটি কবিতা নিম্নরূপ,

أَبَا مُسْلِمٍ إِنَّ الْفَتَى بِجَنَانِهِ ... وَمِقْوَلِهِ لَا بِالْمَرَاكِبِ وَاللُّبْسِ

وَلَيْسَ ثِيَابُ الْمَرْءِ تُغْنِي قُلَامَةً ... إِذَا كَانَ مَقْصُورًا عَلَى قِصَرِ النَّفْسِ

وَلَيْسَ يُفِيدُ الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالْحِجَا ... أَبَا مُسْلِمٍ طُولُ الْقُعُودِ عَلَى الْكُرْسِيِّ

আবু মুসলিম! তারুণ্যের পরিচয়-গৌরব তো আপন হৃদয় ও বচনে; বাহন বা পরিচ্ছেদে নয়।

মানুষ যখন নফসের সংকীর্ণ জগতে আবদ্ধ হয়ে যায়, তখন তো তার পরিচ্ছদের মূল্য কর্তিত নখের সমানও নয়।

আবু মুসলিম! দীর্ঘদিনের সিংহাসনের গৌরব দ্বারা আর যাই হোক জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা অর্জন করা যায় না।[৩৯৫]

আবু বকর যুবাইদী রহ. ৩৭৯ হিজরীতে (৯৮৯ খৃস্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন।

---

[৩৯৫] দেখুন : ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৪/৩৭২-৩৭৩।

Scanned with CamScanner

২. ইবনুল কুতিয়া রহ.

তার পুরো নাম আবু বকর মুহাম্মাদ বিন ওমর বিন আবদুল আযীয বিন ইবরাহীম বিন ঈসা বিন মুযাহিম। আমরা তার পুরো নাম উল্লেখ করলাম, কারণ তার নামের সঙ্গে একটি চমৎকার ঘটনা জড়িয়ে আছে। তার উর্ধ্বতন পুরুষ ঈসা বিন মুযাহিম বিয়ে করেছিলেন জুলিয়ানের দৌহিত্র সারা কুতিয়াকে। জুলিয়ান হলেন সেই সিউটা-প্রশাসক, যিনি আন্দালুস বিজয়ে মুসলিম বাহিনীকে সহায়তা করেছিলেন এবং বিজয়ের পথ সুগম করেছিলেন।

মৃত্যুর সময় জুলিয়ান দুই পুত্র ইফা ও সেযবুতকে রেখে যান। কিছুদিন পর ইফাও দুই পুত্র ও এক কন্যা সারাকে রেখে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু ইফার মৃত্যুর পর তার ভাই সেযবুত আপন ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় ও ভাতিজীর সম্পদ কেড়ে নেয়। সারা তার দু' ভাইকে নিয়ে তৎকালীন উমাইয়া খলীফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দামেশক সফর করেন এবং তার কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেন। খলীফা তার সঙ্গে ন্যায়ানুগ আচরণ করেন এবং তাকে তার প্রাপ্য পৈতৃক মিরাস সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। দামেশকেই সারা ঈসা বিন মুযাহিমের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের দু'টি পুত্র সন্তান ছিল, ইবরাহীম ও ইসহাক। এই ইসহাকের বংশধারাতেই জন্মগ্রহণ করেন আমাদের আলোচিত মনীষী বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবু বকর, যিনি তার এই বংশপরিচয়ের কারণে 'ইবনুল কুতিয়া' নামে অধিক খ্যাত।[৩৮৩]

নিজ যুগে তিনি আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ছিলেন। হাদীস, ফিকহ, আখবার ও নাওয়াদির-এর রেওয়ায়েত করতেন। কবিতা বর্ণনায় ছিলেন সমকালে সর্বশ্রেষ্ঠ। আন্দালুসের অতীত ইতিহাসেও বেশ পারদর্শী ছিলেন। আন্দালুসের আমীর-উমারাদের জীবন-বৃত্তান্ত, ফকীহ ও কবিদের জীবনেতিহাস তার নখদর্পণে ছিল। এসব তিনি ছাত্রদেরকে মুখস্থ লিখিয়ে দিতেন। অবশ্য তার কাছে ছাত্ররা বেশি ভীড় জমাত ভাষা বিষয়ক গ্রন্থসমূহের পাঠ গ্রহণের জন্য।

তিনি দীর্ঘ হায়াত লাভ করেছিলেন। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তার কাছ

---

[৩৮৩] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ১/৬১।

Scanned with CamScanner

থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছে এবং বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় ব্যক্তিরাও তার শিষ্যত্ব লাভ করেছে। তিনি নিজ যুগের আন্দালুসী মাশায়েখে কেরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মূল্যবান বিভিন্ন উক্তি প্রচুর বর্ণনা করেছেন। ভাষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তিনি বেশ কয়েকটি কিতাব লিখেছেন। যেমন:

- তাসারীফুল আফআ'ল (تصاريف الأفعال) (ক্রিয়াপদের রূপান্তর পদ্ধতি)। এটি এ বিষয়ের সর্বপ্রথম রচনা।
- আলমাক্বসূর ওয়াল মামদূদ (المقصور والممدود)। এতে তিনি অসংখ্য ফাওয়ায়িদ সংকলন করেছেন। এ গ্রন্থটি রচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধতা ও রচনাশৈলীর কুশলতায় তিনি পূর্বের সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন আর পরবর্তীদেরকে করে দিয়েছেন বিস্ময়ে নির্বাক। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ আল্লামা আবু আলী আলক্বালী তাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। খলীফা হাকাম বিন আবদুর রহমান একবার আবু আলীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের দেশের আলিমদের মধ্যে ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বে সবচে' যোগ্য কে? আবু আলী উত্তর দিলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল কুতিয়া।

ইলমের জগতে এই সুউচ্চ মর্যাদার পাশাপাশি তিনি ছিলেন অধিক ইবাদতগুযার, দরবেশমেজাজ, দক্ষ কবি, বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্টভাষী। বিশিষ্ট কবি ও ভাষা-সাহিত্যিক ইয়াহইয়া বিন হুযাইল তামীমী বর্ণনা করেন, একদিন আমি কর্ডোভা পাহাড়ের পাদদেশে আমার একটি খামারে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ আবু বকর ইবনুল কুতিয়াকে দেখতে পেলাম। আমাকে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। আমি তাকে দেখে রসিকতা করে পূর্ব চিন্তা ও প্রস্তুতি ছাড়াই ছন্দ মিলিয়ে বললাম,

مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ يَا مَنْ لَا شَبِيهَ لَهُ وَمَنْ هُوَ الشَّمْسُ وَالدُّنْيَا لَهُ فَلَكُ؟

কোথা হতে আগমন হযরত আপনার? অতুলনীয়, সূর্যের ন্যায় প্রদক্ষিণরত, ভূপৃষ্ঠ কক্ষপথ যার!

আমার কথা শুনে মৃদু হেসে তিনিও চিন্তা ও প্রস্তুতি ছাড়া তৎক্ষণাৎ ছন্দপূর্ণ ভাষায় উত্তর দিলেন,

مِنْ مَنْزِلٍ يُعْجِبُ النُّسَّاكَ خَلْوَتُهُ وَفِيهِ سَتْرٌ عَلَى الْفُتَّاكِ إِنْ فَتَكُوْا

আগমন মোর সেই ঘর হতে, নির্জনবাসী আবিদও বিস্মিত যার নির্জনতায়; আচ্ছাদিত ঘরখানা দুর্ভেদ্য পর্দায়, কী সাধ্য ঘাতকের ছিন্ন করে তার।

Scanned with CamScanner

ইয়াহইয়া বিন হুযাইল বলেন, তার এই ছন্দবদ্ধ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তর শুনে আমি উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে তার হাতে চুমু খেতে লাগলাম। তিনি যে আমার শায়খ! আমার শিক্ষক! আমি তাকে সম্মান করলাম এবং তার জন্য দোয়া করলাম।[৩৭]

উত্তর আফ্রিকার ক্ষেত্রে হাকাম আলমুসতানসিরের অবস্থান

পঞ্চাশ বছর আন্দালুস শাসন করার পর আবদুর রহমান আননাসির লি দ্বীনিল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি যখন শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন, তখন আন্দালুসে বনু উমাইয়ার প্রতাপ-সূর্য অস্ত যেতে বসেছে, পুরো আন্দালুসে ইসলামের প্রভাব-ভিত্তি বিধ্বস্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে, পুরো দেশ বিদ্রোহ ও ফিতনার আক্রমণে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে; প্রতিটি প্রদেশের নেতারা স্বেচ্ছাচারী আচরণ করছেন, অনেকে উত্তরে ওৎ পেতে থাকা খৃস্টানশক্তির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। এমন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআ'লা এ উম্মাহর ওপর অপার অনুগ্রহ করেছিলেন আবদুর রহমান আননাসিরের মাধ্যমে; যিনি যুদ্ধ ও সংগ্রাম, সাধনা ও অবিচলতার অপূর্ব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে পুরো দেশকে এক সুতোয় গাঁথতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার পঞ্চাশ বছরের শাসনামলের কর্মময় প্রচেষ্টায় আন্দালুসে বনু উমাইয়ার অস্তগামী সূর্যের নবোদয় হয়েছিল, ইসলামের বিধ্বস্তপ্রায় ভিত্তি পুনরায় সুদৃঢ় হয়েছিল। আন্দালুস ফিরে পেয়েছিল সেই হারানো প্রতিপত্তি, যার কারণে উত্তরের খৃস্টানশক্তি সংযত থাকতে এবং আবদুর রহমান আননাসিরের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল, বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল উত্তরের আফ্রিকান রাষ্ট্রপুঞ্জও।

অবশ্য আবদুর রহমান আননাসির উত্তর আফ্রিকার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হননি। তার দৃষ্টিতে উত্তর আফ্রিকা আন্দালুসের দক্ষিণ প্রবেশদ্বারের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু বিবেচিত হয়নি। উত্তর আফ্রিকায় দুষ্ট উবাইদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা না হলে তিনি কিছুতেই সেখানে প্রতিপত্তি বিস্তারে আগ্রহী হতেন না। তিনি জানতেন, দুষ্ট শিয়াদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও যদি উত্তর আফ্রিকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করা হয়, তাহলে কিছুদিন পর এ দুষ্ট শক্তিই আন্দালুসে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে

---

[৩৭] ইবনে খল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৪/৩৬৮-৩৭২।

Scanned with CamScanner

এবং বনু উমাইয়া ও তাদের সালতানাতকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। মূলত এ কারণেই তিনি উত্তর আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, যেন প্রথমত এ অঞ্চল আন্দালুসের নিরাপত্তার জন্য প্রাচীররূপে কাজ করে এবং পরবর্তী সময়ে সুযোগ পেলে উবাইদী সাম্রাজ্যকে দুর্বল করার সুযোগ কাজে লাগানো যায়।

সে সময়ের উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকদের অবস্থা তৎকালীন অধিকাংশ মুসলিম প্রশাসকের চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল না। তাদের মূল লক্ষ্য থাকত যে কোন মূল্যে নিজেদের শাসনক্ষমতা ধরে রাখা। এরপর সম্ভব হলে তারা নিজেদের রাষ্ট্রপরিসর বৃদ্ধির চিন্তা করত। তেমনই তাদের মাঝে আপন গোত্র ও জাতকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা প্রবল ছিল। আবদুর রহমান আননাসির তাদের এই স্বভাব দুর্বলতাটিকেই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজে আফ্রিকায় আক্রমণ না করে উবাইদী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহরত সেখানকার বিভিন্ন গোত্রকে সহায়তা করে তাদেরকে নিজের আনুগত্যে নিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য তিনি ভালো করেই জানতেন যে, এসব জাতিগোষ্ঠী তার আনুগত্য মেনে নেবে কেবল তার প্রতিপত্তির ভয়ে, উবাইদীদের দাপট থেকে আশ্রয় পাওয়ার আশায় এবং আপন আপন এলাকায় নিজেদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে। তিনি এও জানতেন যে, এরা যখনই এই উভয় শক্তি থেকে আত্মরক্ষার শক্তি অর্জন করবে, তখনই স্বাধীনতার ঘোষণা দেবে। এ কারণেই আবদুর রহমান আননাসির এ অঞ্চলে স্থায়ী স্থিতি গ্রহণ করেননি। মূলত এ অঞ্চলে নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি এসব আমীর ও প্রশাসকদের ওপর নির্ভর করতেন; যারা সাগ্রহে বা ভয়ে তার আনুগত্য গ্রহণ করত।

হাকাম আলমুসতানসিরও এ সবকিছুই জানতেন। পরিস্থিতির কোন দিকই তার অজানা ছিল না। বিশেষত তখন এতদঅঞ্চলে উবাইদীদের প্রভাব আরও সুদৃঢ় হয়েছিল। এ কারণেই তিনি এসব প্রশাসকদের সঙ্গে পূর্বের মৈত্রী চুক্তি আরও জোরদাররূপে বহাল রাখতে সচেষ্ট হন।

৩৬০ হিজরীতে হাকাম আলমুসতানসিরের উত্তর আফ্রিকান মিত্রবর্গ তৎকালীন উবাইদী শাসক আলমুঈয লি দীনিল্লাহ উবাইদীর গভর্নর যীরী বিন মানাদ সানহাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে। তারা তাকে হত্যা করে তার ও তার বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কর্তিত মস্তক নিয়ে কর্ডোভায় হাকাম আলমুসতানসিরের সঙ্গে সাক্ষাত করে। হাকাম তাদের বিজয়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন, তাদের নিয়ে বিজয় উদযাপন করেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করেন।[৩৬৮]

---

[৩৬৮] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৪২।

Scanned with CamScanner

উবাইদী সালতানাত এর প্রতিশোধ নিতে এবং হারানো অঞ্চলে নতুন করে কর্তৃত্ব ফিরে পেতে মনস্থ করে। ৩৬১ হিজরীতে তারা 'বালক্কীন' নামে খ্যাত সেনাপতি ইউসুফ বিন যীরী বিন মানাদ সানহাজীর নেতৃত্বে এ উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। হাকামের অনুসারীরা যে সেনাপতিকে হত্যা করেছিল, বালক্কীন ছিল তার পুত্র। হাকামের অনুসারীরাও যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়। উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ পরিস্থিতি হাকাম-অনুসারীদের প্রতিকূলে চলে যায়।

উত্তর আফ্রিকার যিনানা গোত্র হাকাম আলমুসতানসিরের সমর্থক ছিল। যিনানা গোত্রের প্রধান মুহাম্মাদ ইবনুল খাইর পরাজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর শত্রুর হাতে বন্দী হওয়ার অপমান থেকে বাঁচতে নিজেই নিজের তরবারি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

যাই হোক, হাকাম আলমুসতানসিরের সমর্থক দল যুদ্ধে পরাজিত হয় আর বালক্কীনের বাহিনী অর্জন করে নিরঙ্কুশ বিজয়। এরপর বালক্কীন যিনানা গোত্রের পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করে, তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে ফেলে এবং তাদের আপন এলাকা ত্যাগে বাধ্য করে। হাকামের অনুগত উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল বালক্কীনের দখলে চলে যায়। বালক্কীন সিউটায়ও প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু সিউটার নিরাপত্তাব্যবস্থা যথেষ্ট সুরক্ষিত থাকায় তার চেষ্টা সফল হয়নি।[৩৬৯]

মুহাম্মাদ ইবনুল খাইরের এই আচরণ এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, সে সময় এসব গোত্রের ওপর তাদের গোত্রীয় মূর্খতাপূর্ণ সাম্প্রদায়িকতা গভীরভাবে চেপে বসেছিল এবং পদ ও ক্ষমতার লালসা তাদের মাঝে প্রবল ছিল। বিষয়টি আরও সুদৃঢ় ও সুপ্রমাণিত হয় যিনানা গোত্রের বিরুদ্ধে বালক্কীনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অন্ধ প্রতিশোধ-আচরণে। ইদ্রীসী শাসক কুনূন আলহাসানী এ সময় বালক্কীনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং হাকাম আলমুসতানসিরের আনুগত্য ছেড়ে উবাইদীদের আনুগত্য মেনে নেন। তিনি তানজার মিম্বরে হাকামের পরিবর্তে উবাইদীদের জন্য দোয়া করা আরম্ভ করেন। হাকাম যখন পুরো ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবগত হন এবং উপলব্ধি করেন যে, আন্দালুসের ভাগ্যাকাশে শঙ্কার কালো মেঘ এতটা ঘনীভূত হয়েছে যে, তানজাও উবাইদীদের আনুগত্যে চলে গেছে, তখন তিনি ত্বরিত সিদ্ধান্ত

---

[৩৬৯] ইবনে আ'যারী, আলবায়ানুল মুগরিব, ২/২৪৩।

Scanned with CamScanner

নিয়ে সিউটার উদ্দেশে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন, যেন সিউটাকে পুরো উত্তর আফ্রিকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত অভিযানে মূল ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

সৈন্যবাহিনী রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হাকাম সেনাপতিকে উপদেশ দেন ইবনে কুনূনের বাহিনীর বিরুদ্ধে একাগ্রতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করতে। তিনি তাকে বলেন, আল্লাহ যদি আমাদের বিজয় দান করেন, পরাজিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মোটেই বালক্বীনের মতো আচরণ করবে না; বরং ক্ষমা ও উদারতার আচরণ করবে, যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকার সংস্কার ও জনসাধারণের সংশোধনের চেষ্টা করবে; যারা বনু উমাইয়ার আনুগত্য স্বীকার করে নেবে, এসব ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য নেবে।

আন্দালুস-বাহিনী ও হাসান বিন কুনূনের বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হাসান বিন কুনূন পরাজিত হন এবং যুদ্ধাস্ত্র ও সম্পদ ফেলে সসৈন্যে তানজা ছেড়ে পালিয়ে যান। তানজা আবারও হাকাম আলমুসতানসিরের বশীভূত হয়। হাকামের সেনাপতি তানজাবাসীকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং কর্ডোভায় বিজয়ের সুসংবাদ পাঠান। এরপর আন্দালুসী বাহিনী ইবনে কুনূনের বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং আবারও তাদেরকে পরাজিত করে। তাড়া খেয়ে ইবনে কুনূন তার সঙ্গীদের নিয়ে একটি সুরক্ষিত পাহাড়ে আশ্রয় নেন। আন্দালুস বাহিনী সেখানেও তাদেরকে অনুসরণ করে। উভয় বাহিনীর মধ্যে কয়েকবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়, প্রতিবারই ইবনে কুনূন পরাজিত হন। শেষে এখানেও তিনি সঙ্গে থাকা অস্ত্র ও সম্পদ ফেলে পালিয়ে যান। এরপর উত্তর আফ্রিকা-জুড়ে আন্দালুস বাহিনীর বিজয়াভিযান চলতে থাকে।

ক্রমাগত পরাজয়ের পরও হাসান বিন কুনূন হতোদ্যম হননি। তিনি পুনরায় তার বাহিনীকে সুবিন্যস্ত করে কয়েক মাস পরই আন্দালুস বাহিনীর মুখোমুখি হন। ৩৬২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে ফাহাস মেহরানে উভয় বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে আন্দালুসী বাহিনীর সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিম নিহত হন। যুদ্ধে আন্দালুসী বাহিনী পরাজিত হয় এবং তাদের প্রায় পাঁচ শ' অশ্বারোহী সৈন্য ও এক হাজার পদাতিক সৈন্য নিহত হয়। আন্দালুসী বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যরা সিউটায় ফিরে আসে এবং অতিরিক্ত সাহায্য ও সহায়তা চেয়ে হাকাম আলমুসতানসিরের কাছে বার্তা পাঠায়।[৪০০]

---

[৪০০] ইবনে আ'ষারী, আলবায়ানুল মুগরিব, ২/২৪৫-২৪৬।

Scanned with CamScanner

হাসান বিন কুনূন জানতেন যে, হাকাম আলমুসতানসির অবশিষ্ট আন্দালুসী বাহিনীর জন্য ত্বরিত সাহায্য পাঠাতে এবং বাহিনীকে পুনরায় আক্রমণ করার নির্দেশনা দিতে মোটেই শিথিলতা করবেন না। আন্দালুস তখন শক্তি ও সামর্থ্যে এবং সামরিক শক্তি ও রসদ-প্রাচুর্যে কতটা উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছে, তা তিনি ভালোভাবেই জানতেন। তিনি এও জানতেন যে, হাকামের শক্তির সামনে তিনি মোটেই দাঁড়াতে পারবেন না। তাই তিনি সন্ধিপ্রস্তাব, বন্দী বিনিময়ের প্রস্তাব ও আনুগত্যের ওয়াদার মাধ্যমে এ বিজয়ের সুফল ভোগ করার মনস্থ করেন। কিন্তু হাকাম তার এই কৃত্রিম আনুগত্যের প্রস্তাবে মোটেও প্রতারিত হননি। তিনি বুঝতে পারেন, হাসান বিন কুনূনের শান্তিস্থাপনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। সে মূলত আন্দালুসী বাহিনীর পরাজয়ের সুফল ভোগ করতে চাইছে। তার উদ্দেশ্যে হল সন্ধিকে পুঁজি করে নিজ বাহিনীকে পুনঃবিন্যস্ত করা এবং যখনই আন্দালুসী বাহিনীর ওপর হামলা করার শক্তি অর্জিত হবে, নতুন করে যুদ্ধ শুরু করা। যদি তার সন্ধি করার ইচ্ছাই থাকত, তাহলে সে শুরুতেই সন্ধি করত এবং পূর্বে কঠিন পরাজয়ের শিকার হওয়ার পরও বারবার আন্দালুসী বাহিনীর মুখোমুখি হত না।

তাই হাসানের সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হাকাম আলমুসতানসির মাগরেবের সীমান্তশহর আসিলার সেনাপতি আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন আরমাতিলকে প্রেরিত বার্তায় লেখেন,

> সে কীভাবে তার প্রতিশ্রুত পথে ফিরে আসবে? সে তো সর্বদাই স্বেচ্ছাচারিতা, অবাধ্যতা ও ভ্রান্ত মতবাদে অটল ছিল। তার এ প্রস্তাব প্রতারণা ও বিভ্রান্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ সম্পূর্ণই ধোঁকা। এ প্রস্তাব মেনে নেওয়ার অর্থ ধ্বংসকে অবধারিত করা। আমীরুল মুমিনীনের মত হল, তাকে ছাড়া এবং যারা তার পক্ষে থাকবে ও অবাধ্য আচরণ করবে, তাদের ছাড়া বাকি সকল মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান করা; যতক্ষণ না আল্লাহ তার ব্যাপারে কোন ফয়সালা করেন এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় দান করেন।[৪০১]

বাস্তবেও দেখা গেল, হাকাম আলমুসতানসিরের এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কুটনীতির কারণে হাসান বিন কুনূনের পক্ষে থাকা মাসমুদা গোত্রের সত্তর জন ব্যক্তি হাকামের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। সে বছরেরই (৩৬২ হি.) জুমাদাল

---

[৪০১] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/৪৬৯।

Scanned with CamScanner

উলার শুরুতে তারা কর্ডোভায় উপস্থিত হয়ে নিজেদের আনুগত্যের কথা ঘোষণা করে।

এরপর হাসান বিন কুনূনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য হাকাম শক্তিশালী একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং তার সবচে' শ্রেষ্ঠ এবং সবচে' সাহসী ও বিচক্ষণ সেনাপতি গালিব বিন আবদুর রহমানকে বাহিনীর প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করেন। হাকাম আলমুসতানসির প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র, অর্থ-সম্পদ ও জনবল দিয়ে সে বছরেরই রমযান মাসে তার বাহিনীকে আদওয়া ভূমিতে প্রেরণ করেন। বাহিনী রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি সেনাপতি গালিবকে বলেন,

> গালিব! তোমার এ সফর যেন এমন ব্যক্তির মতো হয়, যার বিজয়ী হয়ে জীবিত ফিরে আসা বা লড়তে লড়তে পরাভূত হয়ে মৃত ফিরে আসা ব্যতীত তৃতীয় কোন কারণে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি নেই।[৪০২]

হাসান বিন কুনূন তখন বুসরায় (বর্তমান মরক্কোর একটি শহর) অবস্থান করছিলেন। আন্দালুসী বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিয়ে বুসরা ছেড়ে সিউটার নিকটবর্তী হাজারুন নাসার নামক এক সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেন। হাজারুন নাসার-এর নিকটে তার সঙ্গে গালিব বিন আবদুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আন্দালুসী বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ চলাকালেই গালিব হাসানের পক্ষে লড়াইকারী বার্বার নেতাদের অর্থের বিনিময়ে আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ফলে তারা হাসানের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কয়েকদিন যুদ্ধ চলার পরও হাসান বিন কুনূন আপন অবাধ্যতায় অটল থাকেন এবং দুর্গের সুরক্ষিত পরিবেশে আত্মগোপন করে থাকেন।

এরপর গালিব দুর্গের চারপাশ অবরোধ করেন এবং ধীরে ধীরে ঘেরাও সংকীর্ণ করে ফেলেন। মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হাসান ও তার পরিবার গালিবের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। গালিব হাসানকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং তার কাছ থেকে দুর্গের দখল নিয়ে নেন। এরপর গালিব পুরো মাগরেবে হাকাম আলমুসতানসিরের আনুগত্য প্রত্যাখ্যানকারী অঞ্চলগুলোতে পরিশুদ্ধি অভিযান চালান। খলীফা হাকাম বার্বার গোত্রগুলোকে আকর্ষণ করার জন্য গালিবের কাছে প্রচুর অর্থ-সম্পদ

---

[৪০২] ইবনে খালদূন, তারীখে ইবনে খালদূন, ৬/২১৮।

Scanned with CamScanner

পাঠিয়েছিলেন। উত্তর আফ্রিকার যেসব প্রশাসক ইতঃপূর্বে হাকাম আলমুসতানসিরের আনুগত্য স্বীকার করেনি, এবার তারাও তার আনুগত্য গ্রহণ করে নেয়। এভাবে পুরো উত্তর আফ্রিকাতে হাকামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩৬৪ হিজরীতে সেনাপতি গালিব বিন আবদুর রহমান বিরাট শোভাযাত্রাসহ আন্দালুসে ফিরে আসেন। তার সঙ্গে ছিল হাসান বিন কুনূন ও বনু ইদরীস হাসানী গোত্রীয় তার অনুসারী দল। খলীফার দরবারে উপস্থিত হলে খলীফা হাকাম তাদের পূর্ণ সমাদর করেন, তাদের মনোতুষ্টির জন্য প্রচুর উপহার প্রদান করেন এবং তাদের বসবাসের জন্য কর্ডোভায় বাড়ি তৈরি করে দেন। এরপর থেকে তারা সেখানেই বসবাস করতে থাকে। অধিকন্তু তাদের প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রকাশার্থে তিনি তার দফতরে তাদের মধ্য হতে সত্তরজনকে চাকুরী প্রদান করেন। হাসান ও তার সঙ্গীরা প্রায় দু' বছর সেখানেই বসবাস করে।

কিন্তু হাসান বিন কুনূন ছিলেন বড় একগুঁয়ে ও দুশ্চরিত্র স্বভাবের। তাদের অত্যধিক ব্যয়ভার খলীফার ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। খলীফা তাদের প্রাচ্যের কোন দেশে চলে যেতে বলেন। এরপর তারা মিশরে চলে যায়। মিশরে আযীয বিল্লাহ উবাইদী তাদের স্বাগত জানান, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করেন এবং তারা যেন মাগরেবে তাদের রাজত্ব ফিরে পেতে পারে, সেজন্য সাহায্য-সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।[৪০৩]

আলমুসতানসিরের শাসনামলে খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিস্থিতি

১. লিওন রাষ্ট্র ও ক্যাস্টোলার স্বাধীনতা

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, লিওনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের রাজা স্যাঞ্চোকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার স্থলে তার চাচাতো ভাই আরডোনিয়োকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। এরপর স্যাঞ্চো তার নানী ও নাফার-সম্রাজ্ঞী তুতাকে সঙ্গে নিয়ে আবদুর রহমান আননাসিরের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেন তিনি তাকে তার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেন। আবদুর রহমান আননাসির তাদেরকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন এবং স্যাঞ্চোকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি স্যাঞ্চোর মেদজনিত রোগের চিকিৎসার জন্য

[৪০৩] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৪৪ ও ইবনে খালদুন, *তারীখে ইবনে খালদুন*, ৬/২১৯।

Scanned with CamScanner

কর্ডোভা থেকে একজন ইহুদি চিকিৎসককে পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার জন্য অর্থ ও জনবল দিয়ে সাহায্যও করেছিলেন। কথা ছিল, বিনিময়ে স্যাঞ্চো লিওন ও মুসলিম আন্দালুসের সীমান্তে অবস্থিত কিছু দুর্গ মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করবেন এবং কিছু দুর্গ ভেঙে ফেলবেন।

বাস্তবেও আবদুর রহমানের সহায়তায় স্যাঞ্চো তার ক্ষমতা ফিরে পান এবং তার ভাই চতুর্থ আরডোনিয়ো ক্যাস্টোলার বারগোসে পালিয়ে যান। এর কিছু দিন পরই আবদুর রহমান আননাসির ইন্তেকাল করেন। সুযোগ পেয়ে স্যাঞ্চো আবদুর রহমানের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং যেসব দুর্গ ভেঙে ফেলার কথা ছিল, তা ভাঙতে এবং যেগুলো মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার কথা ছিল, সেগুলো সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

স্যাঞ্চোর এ আচরণ মোটেই সুবিবেচনাপ্রসূত ছিল না। কেননা, চতুর্থ আরডোনিয়ো তখনও জীবিত ছিলেন। কাজেই তিনি যেমন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছেন, স্বাভাবিকভাবেই আরডোনিয়োও নিজ ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাবেন। সুতরাং কৃত প্রতিশ্রুতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে মুসলমানদের সঙ্গে নতুন করে শত্রুতা সৃষ্টি করে স্যাঞ্চো মূলত নিজের বিপদই ডেকে এনেছিলেন।

বাস্তবেও দেখা গেল, মুসলমানদের সঙ্গে লিওন-নৃপতির সম্পর্কের এই নতুন বিবর্তনকে সুযোগ মনে করে আরডোনিয়ো ক্ষমতা ফিরে পেতে হাকাম আলমুসতানসিরের কাছে সাহায্য চাইলেন এবং তার মিত্রতা প্রার্থনা করলেন। হাকাম তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানালেন এবং সাহায্য-সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। স্যাঞ্চো যখন জানতে পারলেন যে, খলীফা হাকাম তার প্রতিপক্ষকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তখন তিনি লিওনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও জ্ঞানী-গুণীদের সমন্বয়ে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদল গঠন করে খলীফা হাকামের দরবারে প্রেরণ করলেন এবং আপন আনুগত্যের স্বীকারোক্তি সহকারে পূর্বে আবদুর রহমান আননাসিরের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার অর্থাৎ সীমান্তের কিছু দুর্গ ভেঙে ফেলার এবং কিছু দুর্গ মুসলমানদের হাতে সমর্পণের অঙ্গীকার পূরণ করার প্রতিশ্রুতি নবায়ন করলেন।

কিন্তু কিছুদিন না যেতেই আরডোনিয়ো মারা গেলেন। স্যাঞ্চোও তার অঙ্গীকার পুনরায় ভঙ্গ করার ধৃষ্টতা দেখালেন। এবার খলীফা হাকাম তাকে

Scanned with CamScanner

উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার সংকল্প করলেন এবং লিওনে প্রেরণ করার জন্য একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী প্রস্তুত করতে লাগলেন। খৃস্টান আন্দালুসের সকল রাষ্ট্র এ সংবাদ জানতে পেরে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এর অল্প কয়েকদিন পূর্বে কেন্ট ফারনান গঞ্জালেস লিওন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্যাস্টোলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই একে কেন্দ্র করে তার ও লিওন-নৃপতি স্যাঞ্চোর মাঝে চরম শত্রুতা বিরাজ করছিল। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর ভয় তাদের সকলকে আগত মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করল। স্যাঞ্চো ক্যাস্টোলার প্রশাসক ফারনান গঞ্জালেস, নাফারের নৃপতি গার্সিয়া সানচেজ ও বার্সেলোনার কেন্টের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করলেন এবং সকলে মিলে মুসলিম বাহিনীর আসন্ন হামলার মোকাবেলায় প্রস্তুত হলেন।

৩৫২ হিজরীতে গ্রীষ্মকালীন অভিযানের মৌসুমে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে হাকাম তার বাহিনীসহ কর্ডোভা ত্যাগ করলেন। ইসলামী বাহিনী ক্যাস্টোলা ভূমিতে আক্রমণ করল এবং সেন্ট স্টিভেন প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে ক্যাস্টোলা-বাহিনীকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। ফারনান গঞ্জালেস ও স্যাঞ্চো সন্ধির আবেদন জানাতে বাধ্য হলেন। এরপর মুসলিম বাহিনী নাফার রাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হল। নাফার-নৃপতি ইতঃপূর্বে মুসলমানদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মুসলিম ভূখণ্ডে হামলা চালিয়েছিল। ৯৬৩ খৃস্টাব্দ হতে ৯৬৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পরবর্তী বছরগুলোতে ক্যাস্টোলা রাষ্ট্রে মুসলিম বাহিনীর অভিযান অব্যাহত রইল।

লিওন রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিয়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলমান সংঘাত– উভয় সংঘাতে বিপর্যস্ত স্যাঞ্চোর রাজত্ব ভেতরে-বাইরে ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ফলে দেশের বিভিন্ন নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নেতৃত্বে বারবার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হতে লাগল। এসব বিদ্রোহীদের মধ্যে একজন ছিল গ্যালিসিয়ার প্রশাসক কেন্ট জন দালফো সানচেজ। সে মিনো (Río Miño) ও দোরু (The Douro) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে নিজের স্বাধীন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং পর্তুগালের উত্তরে দরু নদীর ওপারে অবস্থিত লামেজো, বাজো ও কুলুমরিয়া -এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

স্যাঞ্চো তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা হলেন। কিন্তু সৈন্যদলসহ

Scanned with CamScanner

মিনো নদী পাড়ি দেওয়ার পরপরই বিদ্রোহী নেতা সানচেজ তার কাছে ক্ষমতা সমর্পণের এবং তার আনুগত্য মেনে নেওয়ার প্রস্তাব পাঠাল। এরপর সে স্যাঞ্চোকে সাক্ষাতে মিলিত হওয়ার অনুরোধ জানাল। অনুরোধ গ্রহণ করে স্যাঞ্চো তার কাছে উপস্থিত হলে সে স্যাঞ্চোর সঙ্গে প্রতারণা করল এবং খাবারের সময় একটি বিষমিশ্রিত ফল তার সামনে এগিয়ে দিল। ফলটি খাওয়ামাত্রই স্যাঞ্চো তার পুরো শরীরে বিষক্রিয়া অনুভব করলেন। দ্রুত তাকে লিওনে নিয়ে আসা হলেও এই বিষক্রিয়ায়ই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৯৬৬ খৃস্টাব্দে লিওনেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

স্যাঞ্চোর মৃত্যুর পর শাসনভার অর্পিত হয় তার পুত্র তৃতীয় রোমেরোর কাঁধে। তখন সে ছিল মাত্র পাঁচ বছর বয়সী শিশু। তাই তার ফুফু সন্ন্যাসিনী ইলবেরা তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নেন। কিন্তু রোমেরোর মনোনয়ন লিওনের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের মনঃপূত না হওয়ায় তারা তার নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। একে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে এবং শক্তিশালী অনেক নেতাই লিওন সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এক্ষেত্রে ফারনান গঞ্জালেসের ক্যাস্টোলার স্বাধীনতা ঘোষণা তাদের জন্য বিশেষ প্ররোচক ছিল। এসব বিদ্রোহের মধ্যে সবচে' ভয়াবহ ছিল স্যাঞ্চোর ঘাতক কেন্ট জন দালফো সানচেজের বিদ্রোহ। সে গ্যালিসিয়ায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে এবং পূর্বোল্লিখিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গের শাসন করতে থাকে।

এরই মধ্যে ৯৭০ খৃস্টাব্দে ক্যাস্টোলার প্রশাসক ফারনান গঞ্জালেস মারা গেলে তার পুত্র গার্সিয়া ফার্নান্দেজ তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এদিকে নাফার রাষ্ট্রের অধিপতি গার্সিয়া সানচেজ মারা গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হয় তার পুত্র দ্বিতীয় স্যাঞ্চো গার্সিয়া।

অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও অস্থিরতার কারণে খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলো দীর্ঘ সময় মুসলমানদের সঙ্গে কোন প্রকার সংঘাতে না জড়িয়ে শান্তিকালীন পরিস্থিতি বজায় রেখেছিল। বরং এ সময় খৃস্টান শাসক ও প্রশাসকগণ মুসলমানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়তে উদ্যোগী ছিল এবং সন্ধি ও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন দূত ও প্রতিনিধিদল খলীফা হাকাম আলমুসতানসিরের দরবারে আগমন করেছিল।

গ্যালিসিয়ার প্রশাসক, এস্টোরিয়াস (Asturias)-এর প্রশাসক হাকাম আলমুসতানসিরের দরবারে আগমন করেছিলেন। এরপর নাফার নৃপতি

Scanned with CamScanner

গার্সিয়ার পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে একটি প্রতিনিধিদল আগমন করেছিল। প্রতিনিধিদের মাঝে পাদ্রী ও বিশপদের বড় একটি দল অন্তর্ভুক্ত ছিল। খলীফা হাকাম তাদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছিলেন। বার্সেলোনার প্রশাসকও ৩৬০ হিজরীর শাবান মাসে (৯৭১ খৃস্টাব্দের জুন মাসে) হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব নবায়নের প্রস্তাবসহ একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছিলেন। প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বন্ধুত্বের নিদর্শন ও শুভেচ্ছা-উপহার হিসেবে ছিল ত্রিশজন মুসলিম যুদ্ধবন্দী, যারা এতদিন বার্সেলোনায় আটক ছিল। লিওন সম্রাটের অভিভাবক সন্ন্যাসী ইলবেরাও শান্তির প্রস্তাবসহ দূত পাঠিয়েছিলেন। খলীফা তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন এবং শান্তিপ্রস্তাবে সাড়া দিয়েছিলেন। ক্যাস্টোলা-প্রশাসক গার্সিয়া ফার্নান্দেজ ও সালামানকার (Salamanca) প্রশাসক ফারনান লিনেজসহ অন্যান্য প্রশাসকদের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন প্রতিনিধিদল হাকামের দরবারে আগমন করেছিল।

এ সমস্ত প্রতিনিধিদলের অধিকাংশের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রার্থনা ও খলীফা হাকামের হৃদ্যতা কামনা। কোন কোন প্রতিনিধিদলের আগমন ছিল আনুগত্যের ঘোষণা নিয়ে কিংবা সাহায্যের প্রত্যাশায়।

২. ক্যাস্টোলার স্বাধীনতা

পূর্বেই বলেছি, আবদুর রহমান আননাসির লিওন নৃপতি স্যাঞ্চোর ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ক্যাস্টোলার প্রশাসক লিওনের শাসনক্ষমতা সংক্রান্ত এই গৃহসংঘাতের ফল পুরোপুরি ভোগ করেছিলেন এবং ক্যাস্টোলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। নিজের ক্ষমতা মজবুত করা এবং রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যেই তিনি মুসলিম ভূখণ্ডে হামলা চালাতেন। মুসলমানদের মোকাবেলায় ময়দানে নেমে এসে এবং মুসলমানদের দুর্বল করার চেষ্টা করে তিনি চাচ্ছিলেন খৃস্টান জনগণের অন্তরে তার প্রভাব শক্তিশালী করতে, তাদের আবেগ ও ভালোবাসাকে নিজের পক্ষে টেনে নিতে; পাশাপাশি লিওন রাষ্ট্রের মোকাবেলায় তার ক্ষমতাকে সুসংহত করতে; যে লিওন রাষ্ট্র এ পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছে কেবল আন্দালুসী খৃস্টানদের প্রবল শত্রু আবদুর রহমান আননাসিরের পৃষ্ঠপোষকতায়।

এ সময় থেকেই ক্যাস্টোলা মুসলিম আন্দালুস ও খৃস্টান আন্দালুসের মধ্যকার যুদ্ধ-ইতিহাসে জায়গা করে নিতে শুরু করে। ক্যাস্টোলা রাষ্ট্রের

Scanned with CamScanner

অভ্যুদয় একেবারে সাম্প্রতিক হলেও ধীরে ধীরে ক্যাস্টোলা হয়ে ওঠে ভূখণ্ডের দিক থেকে সবচে' বড় খৃস্টান রাষ্ট্র, শক্তি ও ক্ষমতার দিক থেকে সবচে' সমৃদ্ধ এবং মুসলমানদের মোকাবেলায় সবচে' অদম্য ও বিনাশী শক্তি।

৩. নাফার রাষ্ট্র

আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলের শেষ দিকে ক্যাস্টোলা ও নাফারের মধ্যকার সম্পর্কে টানাপোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধও সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত ক্যাস্টোলা যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং ক্যাস্টোলার প্রধান নেতা কেন্ট ফারনান গঞ্জালেস বন্দী হন।

আবদুর রহমান আননাসিরের মৃত্যুর পর যখন তার পুত্র হাকাম আলমুসতানসির শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি নাফার-নৃপতির কাছে ফারনান গঞ্জালেসকে তার হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানান। কিন্তু নাফারের নৃপতি হাকামের দাবি প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত না হয়ে উল্টো গঞ্জালেসকে মুক্তি দিয়ে দেন।

এর কিছুদিন পরই লিওন-নৃপতি স্যাঞ্চো মুসলমানদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় মুসলমানরা যখন সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, সমস্ত খৃস্টানশক্তি মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হয়। মুসলিম বাহিনী নাফারের পশ্চিমে হামলা চালায় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়, যেমনটি আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। গার্সিয়া সানচেজ ৯৭০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত নাফারের শাসক ছিলেন। তার মাতা সম্রাজ্ঞী তুতা ৯৬০ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছেলেকে তত্ত্বাবধান করেন এবং শাসনকার্যে মূল ভূমিকা পালন করেন।[৪০৪]

হাকাম আলমুসতানসিরের যুদ্ধ ও সম্প্রসারণনীতি

উত্তরের খৃস্টান আন্দালুসের রাষ্ট্রগুলোর ধারণা ছিল আবদুর রহমান আননাসিরের মৃত্যু মুসলিম আন্দালুসে বেশ প্রভাব ফেলবে এবং আন্দালুস তার মৃত্যুর পূর্বে যে সুউচ্চ ও সমুন্নত অবস্থানে ছিল, তার মৃত্যুর পর কিছুতেই সে অবস্থান ধরে রাখতে পারবে না। তারা এও ধারণা করেছিল

---

[৪০৪] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/৫৯৪।

Scanned with CamScanner

যে, নিজের শাসনকালের শুরুতে আবদুর রহমান আননাসির যেসব বিদ্রোহ দমন করেছিলেন, তার মৃত্যুর পর তা আবার নতুন করে শুরু হবে। এ কারণে শুরুতে তারা নতুন খলীফা হাকাম আলমুসতানসিরকে তুচ্ছজ্ঞান করতে থাকে। কেননা, তিনি তখন সবেমাত্র শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের ক্ষমতা সুসংহত করতে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মূলত এ ধরনের ধারণা থেকেই, আমরা পূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, খৃস্টান শাসক স্যাঞ্চো আবদুর রহমানের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে চাপে পড়ে হাকামের সঙ্গে নতুন করে অঙ্গীকার করার পরও পুনরায় একই কাজ করেছিলেন। একই সময়ে নাফার রাষ্ট্র তাদের হাতে বন্দী থাকা ক্যাস্টোলার নেতা (মুসলিম সীমান্তশহরগুলোতে একাধিকবার আক্রমণকারী) ফারনান গঞ্জালেসকে মুসলমানদের কাছে সমর্পণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

এ সময় হাকাম ভেবে দেখলেন, খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো যে ধরনের আচরণ করেছে এবং করে যাচ্ছে, তাতে তাদের একটা সমুচিত শিক্ষা দেওয়া অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। এ উদ্দেশ্যে ৩৫১ হিজরীতে তিনি একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোতে হামলা চালান। এ অভিযানে তিনি অনেকগুলো দুর্গ জয় করেন। প্রচুর খৃস্টান সৈন্য নিহত বা বন্দী হয়, প্রভূত যুদ্ধলব্ধ সম্পদও অর্জিত হয়। এরপর তিনি বিজয়ীরূপে কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন।[৪০৫]

পরবর্তী বছর ৩৫২ হিজরীতে খৃস্টানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি আবারও একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং খৃস্টানশক্তিকে বাধ্য করেন নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ ও শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলায় পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে। এ বাহিনী নিয়ে হাকাম উত্তরের তিন খৃস্টান রাষ্ট্রেই হামলা চালান এবং তাদের বাহিনীকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তিনি তাদেরকে সন্ধিপ্রস্তাব প্রদান ও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।[৪০৬] বরং নিজেদের প্রতিরক্ষায় অক্ষম দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের রীতি অনুযায়ী খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো হাকাম আলমুসতানসিরের সঙ্গে শান্তি সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। তারা প্রতিবছর প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে হাকামের সঙ্গে কৃত

---

[৪০৫] ইবনে আ'যারী, আলবায়ানুল মুগরিব, ২/২৩৪।

[৪০৬] ইবনে আ'যারী, আলবায়ানুল মুগরিব, ২/২৩৬ ও ইবনে খালদুন, তারীখে ইবনে খালদুন, ৪/১৪৪-১৪৫।

Scanned with CamScanner

সন্ধিচুক্তি নবায়নের অনুরোধ করত কিংবা তার আনুগত্য মেনে নিয়ে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়ার আবেদন জানাত।[৪০৭]

আন্দালুসের উপকূলীয় অঞ্চলে ভাইকিং জলদস্যুদের হামলা

হাকাম আলমুসতানসির তার এই সুউচ্চ মনোবল ও সংকল্প পূরণে অবিচলতার মাধ্যমে উত্তরের খৃস্টভূমিকে পদানত করতে, তাদেরকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করতে এবং মুসলিম আন্দালুস থেকে কিছু অর্জনের ব্যাপারে তাদেরকে নিরাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এসব কারণে তারা হাকামের সঙ্গে শান্তি-অবস্থা বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু শান্তি ও সমৃদ্ধির এ পরিস্থিতি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বরং বলা ভালো, যুদ্ধমুক্ত এ শান্ত পরিস্থিতি ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাচুর্যই দূরের বিভিন্ন জাতিকে আন্দালুসে হামলা করতে প্ররোচিত করেছিল।

৩৫৫ হিজরীতে ভাইকিং জলদস্যু গোষ্ঠী আন্দালুসের পশ্চিম উপকূলে হামলা চালায়। তারা ইতঃপূর্বে আবদুর রহমান আলআওসাতের শাসনামলেও আন্দালুসে হামলা চালিয়েছিল এবং আবদুর রহমান আলআওসাত তাদেরকে পরাজিত করে আন্দালুস-ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। পূর্বে যেমন বলেছি, তিনি তখন সেভিলের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ়করণে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু হাকামের শাসনামলের এই প্রাচুর্যময় অবস্থা সম্ভবত তাদেরকে তাদের পূর্বের পরাজয়ের স্মৃতি বিস্মৃত করে দিয়েছিল এবং সম্পদের দুর্নিবার আকর্ষণ তাদেরকে নতুন করে আন্দালুসে হামলা করতে প্ররোচিত করেছিল। এবার তারা আটাশটি নৌযান নিয়ে পশ্চিম আন্দালুসের উপকূলীয় এলাকায় আক্রমণ করে এবং সেখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

উপকূলীয় অঞ্চলের মুসলমানগণ তাদের প্রতিরোধে এগিয়ে এলে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং উভয় পক্ষেই প্রচুর হতাহতের ঘটনা ঘটে। এ অঞ্চলের প্রশাসকগণ কর্ডোভায় হাকামের কাছে বার্তা পাঠিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং দ্রুত সাহায্য পাঠানোর আবেদন জানান। সংবাদ পেয়ে হাকাম আন্দালুসী নৌবাহিনীকে উপদ্রুত এলাকার মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য দ্রুত সেখানে গমনের নির্দেশ

---

[৪০৭] ইবনে খালদুন, তারীখে ইবনে খালদুন, ৪/১৪৫।

Scanned with CamScanner

সেন। বেশ করেকবারের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুসলিম নৌবাহিনী তাদেরকে পরাজিত করে এবং তাদের বেশ কয়েকটি নৌযান ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। মুসলিম নৌবাহিনী শত্রুদের কাছ থেকে বন্দী মুসলিম নাগরিকদের উদ্ধার করে এবং ভাইকিং জলদস্যুদের পরাজিত ও ব্যর্থ অবস্থায় আন্দালুস উপকূল থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। ভাইকিংদের অবশিষ্ট নৌযানগুলোকে এরপর বেশ কিছুদিন আন্দালুসের পশ্চিম জলসীমায় দেখা গেলেও সেগুলো আন্দালুসে হামলা করার দুঃসাহস দেখায়নি। কিছুদিন পর তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।[৩০৮]

এরপর হাকাম আলমুসতানসির উত্তর আফ্রিকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং উত্তর আফ্রিকাকে নিজ ক্ষমতার বশে আনতে সচেষ্ট হন। এসব সামরিক তৎপরতা এবং আন্দালুসের প্রতিরক্ষা বিষয়ক কর্ম-তৎপরতার পাশাপাশি হাকাম আলমুসতানসির জ্ঞানচর্চা, জ্ঞানের প্রসার এবং আন্দালুসের নাগরিক সভ্যতার উন্নয়নেও যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। পুত্র হিশাম শৈশবের গণ্ডি পেরোনোর পূর্বেই তার পক্ষে বাইআত গ্রহণ সম্পন্ন করার পর ৩৬৬ হিজরীতে হাকাম আলমুসতানসির ইন্তেকাল করেন।

---

[৩০৮] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৩৯ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ১/২৪৬।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিশাম আলমুআইয়াদ ইবনুল হাকাম ও আমিরিয়া সাম্রাজ্যের সূচনা

হাকাম বিন আবদুর রহমান ... মহান ব্যক্তির মহা স্খলন

নিঃসন্দেহে হাকাম বিন আবদুর রহমান আননাসির ছিলেন আন্দালুসের শ্রেষ্ঠতম শাসকদের একজন। কিন্তু তিনি তার শাসনামলের শেষদিকে বিরাট একটি ভুল করেছিলেন। জীবনের শেষদিকে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন তিনি তার বড় পুত্র হিশাম ইবনুল হাকামকে তার ওলিয়ে আ'হদ (ভবিষ্যৎ খলীফা) হিসেবে ঘোষণা করেন। অথচ তখন হিশামের বয়স ছিল মাত্র এগার বছর।[৪০৯] এগার বছরের কিশোর পুত্রকে তিনি এমন একটি রাষ্ট্রের ভাবী খলীফা হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন, যার দুই সীমান্তে ওৎ পেতে আছে দুই চরম শত্রু; উত্তরে খৃস্টান রাষ্ট্রসমূহ আর দক্ষিণে উবাইদী (ফাতেমী) সাম্রাজ্য। বরং বলা ভালো, ইউরোপের প্রতিটি জাতি ও রাষ্ট্র তখন ইউরোপের মহা শক্তিধর এই রাষ্ট্রটিকে ষড়যন্ত্রের ফাঁদে ফেলে পরাজিত করার জন্য ওৎ পেতে ছিল।

নিঃসন্দেহে এ সিদ্ধান্ত ছিল মহান খলীফা হাকাম বিন আবদুর রহমানের মারাত্মক এক বিচ্যুতি। তার কর্তব্য ছিল, এই মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করা এবং বনু উমাইয়ার অন্য কাউকে ভবিষ্যৎ খলীফা হিসেবে ঘোষণা করা, যিনি আন্দালুসের ন্যায় অধিক শত্রুবিশিষ্ট ও বিস্তৃত একটি রাষ্ট্রের দায়িত্বভার পালন করতে সক্ষম হবেন।

৩৬৬ হিজরীতে (৯৭৬ খৃস্টাব্দে) হাকাম বিন আবদুর রহমানের মৃত্যুর সময় আযযাহরা রাজপ্রাসাদে শক্তিশালী দু'টি পক্ষ সক্রিয় ছিল। একদিকে ছিল

---

[৪০৯] ইবনে আ'যারী *'আলবায়ানুল মুগরিব'* গ্রন্থে (২/২৫৩) উল্লেখ করেছেন, ওলিয়ে আ'হদ নির্বাচনের সময় হিশামের বয়স ছিল এগার বছর আট মাস। ইবনুল খতীব *'আ'মালুল আ'লাম'* গ্রন্থে (পৃ : ৪৪) উল্লেখ করেছেন, সে সময় তার বয়স ছিল দশ বছর। আর *'নাফহুত তীব'* গ্রন্থে (১/৩৯৬) মাক্কারীর অভ্যমতে এ সময় তার বয়স ছিল নয় বছর।

Scanned with CamScanner

সাকলাবী (Saqaliba) পরিচারকদের দল, যারা রাজপ্রাসাদে রাজপরিবারের একান্ত ও পারিবারিক খেদমত আঞ্জাম দিত; অপরদিকে ছিলেন প্রধান রাজপ্রহরী হাজিব[৪১০] জাফর বিন উসমান আলমিসহাফী এবং নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান ও খলীফার ব্যক্তিগত সচিব মুহাম্মাদ বিন আবু আমির। পর্দার আড়াল থেকে এ দলের পক্ষে সমর্থন যোগাচ্ছিলেন নতুন খলীফার মাতা সবাহ বাশকানসিয়া; যিনি সে সময় এ দলের সবচে' শক্তিধর ব্যক্তি ছিলেন। বংশগতভাবে তিনি ছিলেন নাফারী (বাশকানসিয়া) বংশোদ্ভূত এবং প্রয়াত খলীফা হাকামের সবচে' প্রিয়তমা ও সৌভাগ্যবতী সহধর্মিণী।

সাকলাবী পরিচারকদের প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র

উমাইয়া প্রশাসকগণ পরিচারক ও গৃহভৃত্য হিসেবে প্রচুর সাকলাবী তরুণকে[৪১১] নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং প্রাসাদের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কাজ ও ঘরোয়া একান্ত সেবামূলক কাজগুলো তারা তাদের মাধ্যমেই সম্পাদন করাতেন। পরবর্তী সময়ে খেলাফত আমলে খলীফা আবদুর রহমান আননাসির ও হাকাম আলমুসতানসিরও একই ধারা অবলম্বন করেন। ফলে তাদের শাসনামলে সাকলাবী ভৃত্যদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। হাকামের শাসনামলের শেষদিকে কেবল প্রাসাদের অভ্যন্তরেই কর্মরত ছিল এক হাজারের বেশি সাকলাবী তরুণ। স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অনেক বেশি এবং সংখ্যাধিক্য ও খলীফার একান্ত নৈকট্যের কারণে তারা পরিণত হয়েছিল একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিতে। খলীফা তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কাজে তাদের ওপর নির্ভর করতেন। দীর্ঘকাল

---

[৪১০] তৎকালে প্রধান রাজপ্রহরীকে হাজিব বলা হত। হাজিব পদধারী ব্যক্তি খলীফার মূল পরামর্শক ও উপদেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হতেন। হাজিবের পদমর্যাদা অনেকটা বর্তমান সময়ের প্রধানমন্ত্রীর সমপর্যায়ের ছিল। (অনুবাদক)

[৪১১] সাকলাবী পরিচিতি: ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তৎকালীন দাস ব্যবসায়ীগণ কিশোর দাস সংগ্রহ করে আন্দালুসে এনে বিক্রি করত। উমাইয়া শাসক-প্রশাসকগণ এদেরকে খরীদ করে রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন সেবাসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োগ দিতেন। বিশেষ করে আবদুর রহমান আদদাখিল রহ. প্রচুর পরিমাণে এ জাতীয় ক্রীতদাস খরীদ করেছিলেন এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর সেবক পদে ও সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তৎকালীন আন্দালুসী গোত্রগুলো বিদ্রোহ-প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকায় তিনি এ নীতি অবলম্বন করেছিলেন। পরবর্তীতে আবদুর রহমান আননাসির তাদেরকে রাজপ্রহরা, মন্ত্রিত্ব ও সেনাপরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ প্রদান করেন। ফলে তারা আন্দালুসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

ধরে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার কারণে এসব কাজে একমাত্র তারাই অভিজ্ঞ ছিল। ফলে তারা মনে করত, রাজত্ব তাদেরই হাতে এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব ফলানোর মতো শক্তি কারও নেই!

সাকলাবী ভৃত্যদের মধ্যে সবচে' প্রভাবশালী ছিল ফায়েক নামক জনৈক ভৃত্য, আর পদমর্যাদা ও অবস্থানের দিক থেকে তার পরেই ছিল আরেক পরিচারক 'জুযার'। খলীফা হাকাম যখন মৃত্যুবরণ করলেন, এই দুই পরিচারক তার মৃত্যুর সংবাদ চেপে রাখল এবং রাজপ্রাসাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে এনে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করতে লাগল, যেন মনে হয়, অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি। তারা উভয়ে একমত হল যে, বয়সে অপরিপক্ক হওয়ায় খেলাফতের গুরুদায়িত্ব কিছুতেই হিশামের হাতে দেওয়া যাবে না। কেননা, হিশামকে খলীফা বানানো হলে প্রকৃতপক্ষে খেলাফতের চাবিকাঠি চলে যাবে মিসহাফী, ইবনে আবু আমির ও সবাহের দলের হাতে। তারা উভয়ে যে কোন মূল্যে খেলাফতের দায়িত্ব প্রয়াত খলীফা হাকামের সহোদর মুগীরা বিন আবদুর রহমান আননাসিরের কাছে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিল। তাদের আশা ছিল, এর ফলে ভবিষ্যতে তারা মুগীরার বিশেষ প্রিয়পাত্রে পরিণত হবে এবং তাদের উভয়ের বরং পুরো সাকলাবী গোষ্ঠীর খেলাফতের কাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পাবে।

নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সাকলাবী পরিচারকদ্বয় ছক করতে বসল। জুযার প্রধান রাজপ্রহরী মিসহাফীকে হত্যার করার মত প্রকাশ করল, যেন তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ নিষ্কণ্টক হয়ে যায়। কিন্তু ফায়েক তাতে রাজী হল না। সে মত দিল, প্রহরী-প্রধানকে ডেকে এনে তাদের প্রস্তাব মেনে নিতে বলা হোক এবং রাজী না হলে তখন তাকে হত্যা করা হোক। তার কথা মতো প্রধান রাজপ্রহরী জাফর মিসহাফীকে ডেকে আনা হল। প্রথমে তারা তাকে খলীফা হাকামের মৃত্যুসংবাদ শোনাল। এরপর নিজেদের পরিকল্পনার কথা খুলে বলল যে, বয়সে অনুপযুক্ত হওয়ায় হিশামকে বাদ দিয়ে তারা হাকামের ভাই মুগীরাকে খলীফা পদে দেখতে চায়। জাফর তাদের প্রচ্ছন্ন হুমকিটুকু ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারলেন। তাই তিনি তার হৃদয়ের ভাব গোপন রেখে মুখে তাদের সিদ্ধান্তে সম্মতি প্রকাশ করে বললেন, আল্লাহর শপথ! এ তো একেবারেই সঠিক সিদ্ধান্ত ও কল্যাণ-উপযোগী পদক্ষেপ। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পুরো অধিকার তোমাদের; আমি ও অন্যরা এক্ষেত্রে তোমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করব।

Scanned with CamScanner

তোমরা যে কোন মূল্যে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ কর। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সহায়তা চেয়ে নিও, যেন ভবিষ্যতে বিতর্ক ও মতবিরোধের পথ বন্ধ হয়ে যায়। আমি (রাজপ্রাসাদের) সদর দরজায় চলে যাচ্ছি এবং সদর দরজার নিয়ন্ত্রণভার নিয়ে নিচ্ছি। তোমরা যে কোন প্রয়োজনে আমাকে ডাকতে পার।

এরপর তিনি দ্রুত রাজপ্রাসাদের সদর দরজার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলেন, যেন হাকামের মৃত্যুসংবাদ ছড়াতে না পারে। অব্যবহিত পরেই জাফর খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনরত আরব ও বার্বার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তলব করলেন, যাদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরও ছিলেন। পাশাপাশি তিনি তার অনুসারী ও অধীনস্থদেরও সমবেত করলেন। সবাই উপস্থিত হলে জাফর তাদেরকে খলীফা হাকামের মৃত্যুসংবাদ জানালেন এবং সাকলাবী পরিচারকরা যে হিশামের পরিবর্তে মুগীরাকে খলীফা-পদে বসানোর পরিকল্পনা করছে, তা অবহিত করলেন। এরপর তিনি তাদের সামনে এর ক্ষতিকর দিকসমূহ তুলে ধরে বললেন, যদি আমরা হিশামকেই খলীফা পদে ধরে রাখতে পারি, তাহলে আমরা নিরাপদেও থাকব, আর ক্ষমতার চাবিকাঠিও আমাদের হাতে থাকবে। পক্ষান্তরে খেলাফত যদি মুগীরার কাছে চলে যায়, তাহলে তিনি আমাদের ছাঁটাই করে নিজের শত্রুতা ও বিদ্বেষ চরিতার্থ করবেন। উপস্থিত সকলে মুগীরা বিন আবদুর রহমানকে হত্যা করার পরামর্শ দিল। কিন্তু সমস্যা হল, বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?! এ কাজ সম্পাদন করার জন্য অগ্রসর হতে কেউ-ই সাহস করল না।

সকলকে নীরব দেখে ইবনে আবু আমির নিজের দক্ষতা প্রদর্শন ও জাফর বিন উসমানের আনুগত্য প্রকাশার্থে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে নিজেই আগ্রহ প্রকাশ করলেন। উপস্থিত সকলে তার এই স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহে মুগ্ধ হল এবং সকলের কাছে তার মূল্যায়ন বেড়ে গেল। জাফর বললেন, হ্যাঁ, তুমি-ই এ 'মহান' দায়িত্ব পালনের সবচে' উপযুক্ত; কেননা, তুমি আমাদের নতুন খলীফা হিশামের একান্ত ব্যক্তি এবং রাজমহলে তোমার বিশেষ অবস্থান রয়েছে।

এরপর জাফর একদল সৈন্যসহ ইবনে আবু আমিরকে 'মুগীরা-হত্যামিশন' সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। সৈন্যদল দ্রুত মুগীরার বাড়িতে উপস্থিত হল এবং চতুর্দিক থেকে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। ইবনে আবু আমির কয়েকজন সৈন্য নিয়ে অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন। মুগীরা তখনও তার

Scanned with CamScanner

ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ জানতেন না। ইবনে আবু আমীর প্রথমে তাকে তার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ শোনালেন; এরপর বললেন, মন্ত্রিবর্গ আশঙ্কা করছেন যে, আপনি হিশামের খেলাফতের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন। তাই তারা আপনার মানসিকতা পরখ করার জন্য, ভ্রাতুষ্পুত্রের খেলাফতের প্রতি আপনার আন্তরিকতা সম্পর্কে আশ্বস্ত হওয়ার জন্য এবং আপনি আপনার বাইআতে অটল আছেন কিনা তা জানার জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। ইবনে আবু আমিরের কথা শুনে মুগীরা প্রথমে ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। এরপর ইন্নালিল্লাহ পাঠ করে ভ্রাতুষ্পুত্রের খেলাফতপ্রাপ্তিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন এবং বললেন, তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি আমার বাইআতের ওপর অটল আছি এবং অকুণ্ঠচিত্তে নতুন খলীফার আনুগত্যে প্রস্তুত আছি। তোমরা যে পদ্ধতিতে চাও, আমার আনুগত্যের প্রত্যয়ন নিতে পার।

এরপর মুগীরা ইবনে আবু আমিরকে দয়াশীল ও উদারমনা ভেবে তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং আল্লাহর দোহাই দিয়ে তাকে হত্যা না করে তার বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করার অনুরোধ করলেন। মুগীরার অনুনয়-বিনয়ে ইবনে আবু আমিরের মন নরম হয়ে গেল। তিনি জাফর আলমিসহাফীর কাছে বার্তাবাহক পাঠিয়ে মুগীরার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং তাকে আশ্বস্ত করলেন যে, মুগীরা বাধ্য ও অনুগত আছেন।

কিন্তু জাফর ও তার সঙ্গীরা মুগীরার অবস্থান যেমনই হোক না কেন, খেলাফতের নিরাপত্তা পুরোপুরি নিশ্চিত করার জন্য যে কোন মূল্যে মুগীরার বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে চাইছিলেন। জাফর যখন দেখলেন যে, ইবনে আবু আমির মুগীরাকে জীবিত ছেড়ে দিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন, তখন তাকে তার দায়িত্ব পালনে বিলম্বের জন্য তিরস্কার করে বার্তা পাঠালেন এবং বললেন, তুমি তো তোমার ব্যাপারে আমাদেরকে প্রতারিত করেছ। হয় তোমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন কর, নয়তো ফিরে আস; আমরা তোমার পরিবর্তে অন্য কাউকে পাঠাই।

ইবনে আবু আমির বুঝতে পারলেন, মুগীরার বাঁচার কোন পথ নেই। জাফরের কঠিন উচ্চারণ ইবনে আবু আমিরকে ঘাবড়ে দিল। তাই তিনি মুগীরাকে হত্যা করার জন্য তার সঙ্গীদের আদেশ দিলেন। মুগীরাকে তার পরিবারের সদস্যদের সামনে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হল। এরপর হত্যাকারীরা মৃতদেহের গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির মতো করে ঝুলিয়ে রাখল, যেন পরবর্তী সময়ে বলা যায়, তারা মুগীরাকে নতুন

Scanned with CamScanner

খলীফার হাতে বাইআত গ্রহণের জন্য রাজপ্রাসাদে যেতে পীড়াপীড়ি করায় তিনি আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যুর সময় মুগীরার বয়স ছিল সাতাশ বছর।[৪১২]

মুগীরা কি সাকলাবী পরিচারকদের পরিকল্পনায় শরীক ছিলেন?

হাকাম যদিও তার কিশোর পুত্র হিশামের পক্ষে ভবিষ্যৎ খেলাফতের বাইআত গ্রহণ করে ভুল করেছিলেন; কিন্তু তৎকালীন রীতি অনুযায়ী হিশামের পক্ষে শরয়ী বাইআত সম্পন্ন হয়েছিল এবং এ বাইআতের বিরুদ্ধাচরণ শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ খলীফার বিরুদ্ধাচরণ হিসেবেই বিবেচিত ছিল। এদিকে মুগীরা ছিলেন বনু উমাইয়ারই একজন যুবক এবং খেলাফতলাভের উপযুক্ত ব্যক্তিদের একজন। 'আযযাখীরা' গ্রন্থে উল্লিখিত ইবনে বাস্সামের একটি বর্ণনা দ্বারা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মুগীরা তার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্যোগী ছিলেন। ইবনে বাস্সাম লিখেছেন,

> তিনি (মুগীরা বিন আবদুর রহমান আননাসির) ছিলেন বনু উমাইয়ার উদার, মহানুভব ও বীরপুরুষদের একজন। অভ্যন্তরীণ নানাবিধ কারণে খেলাফতের উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে তার নামও আলোচিত ছিল। তাই তিনি এর প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন।[৪১৩]

এছাড়াও 'খেলাফত যদি মুগীরার কাছে চলে যায়, তাহলে তিনি আমাদের ছাঁটাই করে নিজের শত্রুতা ও বিদ্বেষ চরিতার্থ করবেন।' মিসহাফীর প্রাগুক্ত এই উক্তি দ্বারাও প্রতিভাত হয় যে, মিসহাফীদের সঙ্গে তার পূর্ব শত্রুতা ছিল; আর মিসহাফীরা হল হাকামের বরং বলা ভালো বর্তমানে হিশামের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সুতরাং এটিও একটি প্রমাণ যে, মুগীরা চলমান প্রাসাদ-সংঘাত হতে দূরে ছিলেন না।

অধিকন্তু সাকলাবী পরিচারকরা মুগীরার সঙ্গে পূর্ব-যোগাযোগ ও সমঝোতা ছাড়াই তাকে ক্ষমতায় বসানোর চিন্তা ও সক্রিয় পরিকল্পনা করার মতো নির্বুদ্ধিতা ও সরলতা দেখাবে, এমনটিও আমরা ধারণা করি না। পরিস্থিতির স্বভাব দাবিও এই নয় যে, তারা যাকে খলীফা পদে বসাতে চায়, তার সঙ্গে

---

[৪১২] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৯৫।

[৪১৩] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৭/৫৮।

Scanned with CamScanner

পূর্ব-যোগাযোগ ছাড়াই এ বিষয়ে উদ্যোগী হবে?

এসব শক্তিশালী ইঙ্গিতের ভিত্তিতে আমাদের মত এই যে, মুগীরা তার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ইচ্ছা করেছিলেন। তবে সালতানাতের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী জাফর মিসহাফী মুগীরার পূর্বেই হাকামের মৃত্যু সংবাদ জেনে যান এবং মুগীরা যখন নিজেকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ভাবছিলেন, তখনই ইবনে আবু আমিরের নেতৃত্বে ঘাতক দল তার কাছে পৌঁছে যায়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মুগীরাকে সরিয়ে দিয়ে তার বিষয়টি চিরতরে মুছে ফেলার মধ্যেই মিসহাফীর স্বার্থ নিহিত ছিল। মিসহাফী-পক্ষ চাচ্ছিল একই সঙ্গে সাকলাবীদের ষড়যন্ত্র সমূলে নিপাত করার গ্যারান্টি এবং পরবর্তী সময়ে যে শক্তিশালী ব্যক্তিটি খলীফা পদে হিশামের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পারেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করার চেষ্টা করতে পারেন, তার বিষয়টির নিষ্পত্তি।

এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, মুগীরা যখন ইবনে আবু আমির ও তার সঙ্গীদের দেখেছিলেন, তখনই নিজের পরিণতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। আর তাই তিনি নিজেকে রক্ষা করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন। আবার এ বিষয়টিও সংশয়মুক্ত যে, মিসহাফী যখন জানতে পেরেছিলেন যে, মুগীরা আনুগত্যের ঘোষণা দেওয়ায় ইবনে আবু আমির তাকে হত্যা না করার মনস্থ করেছেন, তখন এর সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে, তা মিসহাফী অনুমান করে নিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, মুগীরাকে যদি এখন জীবিত ছেড়ে দেওয়া হয়, ভবিষ্যতে পট পরিবর্তনের পর তিনি অবশ্যই মিসহাফী ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে নির্মম প্রতিশোধ নেবেন। কেননা, তারাই তো তাকে হত্যা করতে মনস্থ করেছিল। আর তাই মিসহাফী এ দরজাটি পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন এবং ইবনে আবু আমিরের কাছে এমন বার্তা পাঠিয়েছিলেন, যার কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বে হলেও মুগীরাকে হত্যা করা ছাড়া ভিন্ন কোন চিন্তা করার অবকাশ ইবনে আবু আমিরের না থাকে।

অবশ্য অন্য করেকটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, মুগীরা সাকলাবীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত ছিলেন না এবং তার কোন ধরনের অভ্যুত্থান-চিন্তাও ছিল না। কেননা, তার কাছ থেকে এ ধরনের কোন লক্ষণ কখনো প্রকাশ পায়নি। তার হত্যা মূলত ছিল এমন একটি ষড়যন্ত্রের

Scanned with CamScanner

ফলাফল, যাতে তিনি কোন পক্ষেই ছিলেন না। কিন্তু মিসহাফীর স্বার্থ ছিল তাকে হত্যা করে নিজের প্রভাব সুসংহত করার মধ্যে। আর তাই অন্যের স্বার্থের নির্মম বলি হতে হয়েছিল মুগীরাকে।

ইবনে আবু আমির ফিরে এসে জাফরকে 'মুগীরা-সংকট' মিটে যাওয়ার সুসংবাদ দিলেন। সংবাদ শুনে জাফর অত্যন্ত খুশি হলেন এবং ইবনে আবু আমিরকে আরও নিকটভাজন করে নিলেন। ফায়েক ও জুযার যখন জানতে পারল যে, পাশার দান সম্পূর্ণ উল্টে গেছে, তাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। দিশেহারা হয়ে তারা একে অন্যকে ভর্ৎসনা করতে লাগল।

এরপর তারা জাফরের কাছে বার্তা পাঠিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করল এবং বলল যে, আল্লাহ আপনাকে যে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, আকস্মিক উৎকণ্ঠার কারণে আমরা তা থেকে বিস্মৃত ছিলাম। আল্লাহ আপনাকে আমাদের প্রয়াত খলীফার পুত্রের পক্ষ থেকে এবং সালতানাত ও পুরো মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। তারা উভয়ে জাফরের সামনে হিশামের খেলাফত মেনে নেওয়ার এবং আনন্দিত হওয়ার ভান করল।

প্রধান রাজপ্রহরী হাজিব জাফরও তাদের কৈফিয়ত মেনে নেওয়ার এবং তাদেরকে কোনরূপ দোষারোপ না করার কৃত্রিম ভাব প্রকাশ করলেন। তবে উভয় পক্ষের মধ্যকার সুপ্ত শত্রুতা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। একদিকে সাকলাবী পরিচারক পক্ষ, অপরদিকে হিশামের পক্ষ। জাফর সাকলাবীদের ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্ক হয়ে গেলেন এবং তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য গুপ্তচর ও গোয়েন্দা নিযুক্ত করলেন। পাশাপাশি তিনি সাকলাবী পরিচারকদের শক্তি খর্ব করার এবং তাদের একতাকে বিভক্ত করার উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুদিন পর তিনি এ সুযোগ পেয়েও গেলেন এবং সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করলেন।

(গুপ্তচর মারফত) মিসহাফী জানতে পারলেন যে, ফায়েক ও জুযার প্রাসাদের বাইরের-ভেতরের কিছু সাকলাবী অনুসারীদের সঙ্গে একজোট হয়ে হিশামকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করার পাঁয়তারা করছে। সঙ্গে সঙ্গে জাফর সাকলাবীদের ওপর প্রহরা ও পর্যবেক্ষণব্যবস্থা জোরদার করলেন এবং সাকলাবীদের জন্য নির্ধারিত প্রাসাদে প্রবেশের বিশেষ দরজাটি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি নির্দেশ জারী করলেন, এখন থেকে সাকলাবীরা অন্যদের মতো সাধারণ দরজা দিয়েই প্রাসাদে আসা-যাওয়া করবে।

এরপর জাফর ইবনে আবু আমিরের কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন, ইবনে আবু

Scanned with CamScanner

আমির যেন কিছু সাকলাবী পরিচারককে তার অধীনস্থদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ইবনে আবু আমির জাফরের প্রস্তাব মেনে নিলেন। পাঁচ শ' সাকলাবীকে পূর্ব-দায়িত্ব হতে সরিয়ে ইবনে আবু আমিরের অনুচর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হল। ইবনে আবু আমির তাদের সঙ্গে সদাচরণ করলেন এবং তাদের মনোতুষ্টির চেষ্টা করলেন। ফলে এদের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে ইবনে আবু আমিরের প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সামগ্রিক পরিস্থিতিতে অন্যান্য সাকলাবী পরিচারকগণ উপলব্ধি করতে পারল যে, তাদের বিরুদ্ধে গোপন কোন পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে। তাই তারা রাজপ্রহরী জাফরের ওপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালাল। জুযার নিজের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করল। সে ভেবেছিল, রাজপ্রাসাদে তার একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে এবং তাকে ছাড়া রাজপ্রাসাদের কাজ চলবে না। কিন্তু তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হল এবং এর মাধ্যমে অন্যান্য সাকলাবী পরিচারকদের উদ্দেশ্যে একটি সুস্পষ্ট বার্তা পৌঁছিয়ে দেওয়া হল যে, তারা নিজেদের যতটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবছে, প্রকৃতপক্ষে সালতানাতের চোখে তারা ততটা গুরুত্বের অধিকারী নয়।

জুযারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করায় সাকলাবীদের অসন্তোষ ও ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পেল। দিরী নামের জনৈক পরিচারক এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছিল। সে ছিল মূর্খ ও একরোখা প্রকৃতির। জাফর এই নতুন সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তার সবচে' মেধাবী ও শক্তিশালী সহকারী ইবনে আবু আমিরকে প্রণোদিত করলেন। ইবনে আবু আমির এবার নতুন ছক আঁকলেন। তিনি পরিচারক দিরীর অধীনে যারা কাজ করত, তাদেরকে দিরীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলতে প্ররোচিত করলেন যে, সে তাদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন করে এবং তারা তার অনাচার থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়।

পরিকল্পনা সফল হওয়ার পর হাজিব জাফর মিসহাফী দিরীর বিষয়টি খলীফা হিশাম আলমুআইয়াদের দরবারে উত্থাপন করলেন। খলীফা দিরী ও তার হাতে নিগৃহীতদের সমবেত করে বিষয়টি তদন্ত করার নির্দেশ দিলেন। ইবনে আবু আমির তদন্ত করার জন্য তাদেরকে মন্ত্রিসভার বৈঠকখানায় তলব করলেন। দিরী বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হতেই বিপদ টের পেয়ে গেল। কিন্তু সে ফিরে যাওয়ার পথ ধরতেই ইবনে আবু আমির তাকে গ্রেফতার করলেন।

Scanned with CamScanner

গ্রেফতার হওয়ার সময় দিয়ী ইবনে আবু আমিরের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে লাগল এবং তর্কে জড়িয়ে পড়ল। সে ইবনে আবু আমিরের দাড়ি ধরে টানতে লাগল। ইবনে আবু আমিরের নির্দেশে তাকে বেঁধে নিরাপত্তা চৌকিতে নিয়ে যাওয়া হল এবং সেদিন রাতেই হত্যা করা হল।

এরপর অন্যান্য সাকলাবী পরিচারকদের প্রাসাদ ত্যাগ করে নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করার নির্দেশ দেওয়া হল এবং বাড়ি থেকে বের হতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হল। সবকিছু ঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর ইবনে আবু আমির তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলেন এবং কঠিনতর পন্থায় তাদের বিতাড়িত করলেন। ভবিষ্যতে তারা যেন সালতানাতের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র করার চিন্তাও না করে, ইবনে আবু আমির তা নিশ্চিত করলেন। ফায়েককে পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে (বর্তমান ব্যালেরিক দ্বীপপুঞ্জ) নির্বাসনে পাঠানো হল। মৃত্যু অবধি ফায়েক সেখানেই ছিল।

এভাবেই জাফর মিসহাফীর দল সাকলাবী পরিচারকদের প্রভাব সমূলে উপড়ে ফেলতে সক্ষম হল এবং সাকলাবী ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।[৪১৪]

মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের পরিচয়

তার পুরো নাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আমির বিন আবু আমির বিন ওয়ালিদ বিন ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক আলমাআ'ফিরী। তার পূর্বপুরুষ আবদুল মালিক আলমাআ'ফিরী সেসব মহান আরব অভিযাত্রীদের একজন, যারা তারিক বিন যিয়াদের সঙ্গে আন্দালুসে প্রবেশ করেছিলেন। আবদুল মালিক আলমাআ'ফিরী দক্ষিণ আন্দালুসের জাযিরাতুল খাযরাতে অবতরণ করেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন একজন দ্বীনদার, সচ্চরিত্রবান এবং প্রশাসন ও দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি। তিনি হজের সফরে ফেরার পথে পশ্চিম ত্রিপোলীতে (Tripoli) ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের মা বুরাইহা বিনতে ইয়াহইয়া ছিলেন আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র বনু তামীম বংশোদ্ভূত।

মুহাম্মাদ বিন আবু আমির এমনই এক দ্বীনদার পরিবারে উত্তম পরিচর্যার মাঝে বেড়ে ওঠেন। শৈশব থেকেই তার মধ্যে আভিজাত্যের ধারা প্রস্ফুটিত

---

[৪১৪] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৯৫।

Scanned with CamScanner

ছিল। তিনি তার পারিবারিক ধারা অনুসরণ করে বিচারক হওয়ার লক্ষ্যে পড়াশোনা শুরু করেন। প্রথমে হাদীস ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেন। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য কর্ডোভায় গমন করেন।

মুহাম্মাদ বিন আবু আমির ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী; উন্নত মনোবল ও প্রখর মেধার অধিকারী। কর্ডোভায় তিনি কাযী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন সালীমের কেরানী পদে কাজ শুরু করেন। কাযী মুহাম্মাদ তার মেধা ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তার ব্যাপারে হাজিব জাফর মিসহাফীর কাছে সুপারিশ করেন। ভাগ্যচক্রে এর কিছুদিন পূর্বেই খলীফা হাকাম আলমুসতানসিরের বাঁদী সবাহ বাশকানসিয়ার উদরে তার প্রথম পুত্র আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেছিল। খলীফা তার শিশুপুত্রের তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনা করার জন্য একজন উপযুক্ত লোক খোঁজ করছিলেন। প্রধান রাজপ্রহরী জাফর এ দায়িত্বের জন্য মেধাবী যুবক মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরকে নির্বাচন করেন এবং খলীফার নিকট তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। খলীফা ইবনে আবু আমিরকে পুত্র আবদুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক ও গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এটি ৩৫৬ হিজরীর ঘটনা।

কিছুদিন না যেতেই খলীফা হাকাম আলমুসতানসিরও মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের সচ্চরিত্র, মেধা ও প্রতিভা এবং কর্মদক্ষতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হন। পাশাপাশি এ যুবকের ইলমী যোগ্যতাও তাকে প্রভাবিত করে। পূর্বেই বলেছি, হাকাম নিজে একজন আলিম ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং ইতিহাস ও কুলজিশাস্ত্রে তার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তাই ইবনে আবু আমিরের বিস্তৃত জ্ঞান ও পড়াশোনা খলীফার নিকটভাজন ও প্রিয়পাত্র হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

হাকাম-পুত্র আবদুর রহমান শৈশবেই মারা গিয়েছিল। এর কিছুদিন পরই সবাহর গর্ভে তার দ্বিতীয় পুত্র হিশামের জন্ম হয়। খলীফা তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও ইবনে আবু আমিরকে প্রদান করেন। এটি ৩৫৯ হিজরীর কথা।

দিনে দিনে খলীফার দরবারে; বরং বলা ভালো খলীফা-পরিবারে ইবনে আবু আমিরের অবস্থান সুদৃঢ় হতে থাকে এবং তিনি বিভিন্ন উঁচু পদে অধিষ্ঠিত হতে থাকেন। প্রথমে তাকে সরকারী টাকশালের পরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং রাষ্ট্রীয় ট্রেজারি ও মীরাস-বন্টন প্রকল্পের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর তিনি সেভিল ও নিয়েব্লার (Niebla) কাযী মনোনীত হন। কিছুদিন পর খলীফা তাকে জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের মধ্যম

Scanned with CamScanner

স্তরের পরিচালক পদে নিয়োগ দেন। এরপর তাকে উপকূলীয় অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি এসব অঞ্চলের সংস্কারকার্যে ব্যাপক অবদান রাখেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এরপর খলীফা হাকাম তাকে উত্তর আফ্রিকার প্রধান বিচারপতি হিসেবে নির্ধারণ করেন এবং সেখানকার সকল গভর্নর ও সেনাক্যাম্প-প্রধানদের যে কোন বিষয়ে ইবনে আবু আমিরের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে সিদ্ধান্ত নিতে নিষেধ করে দেন। মারা যাওয়ার কিছুদিন পূর্বে মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় খলীফা হাকাম তাকে দেশে ফিরিয়ে আনেন এবং বিশেষ রাজকীয় পরিচারকদের তত্ত্বাবধায়ক ও উপদেষ্টার পদ প্রদান করেন।

বিস্ময়ের বিষয় হল, মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরকে যখন যে দায়িত্ব বা পদ-ই প্রদান করা হয়েছে, তিনি সে পদে পূর্বে যারা অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাদের সবার চেয়ে অধিক কুশলতা ও দক্ষতার সঙ্গে তা সম্পাদন করেছেন; অথচ তিনি তাদের সবার তুলনায় বয়স ও অভিজ্ঞতায় ছোট ছিলেন। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হল, তার ওপর একসঙ্গে যত দায়িত্বই অর্পণ করা হয়েছে, তা যত বেশিই হোক এবং যত বিচিত্র ও বিভিন্নমুখীই হোক, একসঙ্গে সবগুলোই তিনি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে আঞ্জাম দিয়েছেন। প্রশাসনিক পরিচালন দক্ষতা ও কর্মদক্ষতা উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নিজের কুশলতা প্রমাণ করেছেন। অথচ আন্দালুস তখন তার সোনালী যুগ অতিবাহিত করছিল এবং সুবিশাল ও সুবিস্তৃত সালতানাতের দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত বিচিত্র, সূক্ষ্ম ও জটিল; আর এসব দায়িত্ব পালনে প্রয়োজন ছিল প্রচুর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার।

স্বল্পতম সময়ে এত দ্রুততার সঙ্গে সুউচ্চ ও অনন্য মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার পেছনে মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের বিরল মেধা ও প্রতিভার পাশাপাশি আরেকটি বিষয় সহায়তা করেছিল। আর তা হল, তিনি খলীফা হাকাম আলমুসতানসিরের বাঁদী ও পরবর্তী খলীফা হিশামের মা সবাহ বাশকানসিয়ার মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইবনে আবু আমির রানী বাশকানসিয়া ও তার সন্তানের সর্বোত্তম সেবা করেন এবং বিভিন্ন সময় রানীকে উপহার প্রদান করার পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

তিনি তাকে এমন এমন উপহার দিতেন, যা ইতঃপূর্বে কেউ দেখেনি। টাকশালের দায়িত্বে থাকার সময় ইবনে আবু আমির রূপা দিয়ে তৈরি রাজপ্রাসাদের একটি প্রতিকৃতি (Replica) সবাহকে উপহার দিয়েছিলেন। প্রচুর অর্থ ব্যয়ে তৈরি অপূর্ব প্রতিকৃতিটি এত সুন্দর হয়েছিল যে, যখন তা

Scanned with CamScanner

ইবনে আবু আমিরের বাড়ি থেকে রাজপ্রাসাদের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কর্ডোভার জনগণ তা দেখার জন্য রাস্তার দু' পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। এরূপ ভীড় ইতঃপূর্বে কর্ডোভার রাজপথে কখনো দেখা যায়নি।

অবশ্য খলীফা হাকাম আলমুসতানসির যে এ সবকিছু সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, তা নয়। বর্ণিত আছে, একবার খলীফার সন্দেহ হল, ইবনে আবু আমির হয়তো তার নিয়ন্ত্রণাধীন টাকশাল থেকে অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করছেন। তাই তিনি ইবনে আবু আমিরের কাছে গচ্ছিত সব অর্থ তার দরবারে উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন, যেন খলীফা নিজে তা যাচাই করতে পারেন এবং ইবনে আবু আমিরের সততা ও দক্ষতা সম্পর্কে আশ্বস্ত হতে পারেন। কথিত আছে, ইবনে আবু আমির তখন কোষাগার থেকে কিছু অর্থ খরচ করে ফেলেছিলেন। তলবের সংবাদ পৌঁছামাত্র তিনি ত্রাস পরিমাণ অর্থ ধার নেওয়ার জন্য তার বন্ধু উযীর ইবনে হাদীরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ইবনে হাদীর তাকে সে পরিমাণ অর্থ ধার দিলে তিনি তা নিয়ে খলীফাকে হিসাব বুঝিয়ে দিলেন। এর ফলে খলীফা ইবনে আবু আমির সম্পর্কে আশ্বস্ত হলেন এবং তার আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তার পদমর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিলেন। এদিকে খলীফা আশ্বস্ত হওয়ামাত্রই ইবনে আবু আমির ইবনে হাদীরকে তার অর্থ ফিরিয়ে দিলেন।

এ সবকিছুর পাশাপাশি তিনি প্রধান রাজপ্রহরী জাফর বিন উসমানের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন, তার মন যুগিয়ে চলতেন এবং সর্বদা তার কাছ থেকে পরামর্শ ও উপদেশ নিতেন।[৪১৫]

মুহাম্মাদ বিন আবু আমির ও আমিরিয়া সালতানাতের অঙ্কুরোদ্গম

হাকাম আলমুসতানসিরের মৃত্যু-পরবর্তী সাকলাবী ষড়যন্ত্র নস্যাৎ এবং প্রাসাদে সাকলাবী চক্রের শক্তি ও প্রভাব নিঃশেষ হওয়ার মাধ্যমে তাদের প্রতিপক্ষের পথ নিষ্কণ্টক হয়ে গেল। আগেই বলেছি, এ দলটি মূলত প্রধান রাজপ্রহরী জাফর মিসহাফী, কিশোর খলীফা হিশামের মা সবাহ বাশকানসিয়া ও মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ছিল। সবাহ ছিলেন প্রাসাদের অভ্যন্তরে অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং

---

[৪১৫] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৫৬।

Scanned with CamScanner

হাকামের সবচে' প্রিয়তমা নারী। এদিকে মুহাম্মাদ ছিলেন আরেক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, যিনি প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রধান রাজপ্রহরী জাফর তার ওপর নির্ভর করতেন। অধিকন্তু সবাহর সঙ্গেও তার সুসম্পর্ক ছিল। কারণ তিনি সবাহ-পুত্র বর্তমান খলীফা হিশামের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং প্রাসাদের একান্ত বিষয়গুলোর দায়িত্বশীল ছিলেন।

ইতিহাস-গ্রন্থগুলোর ভাষ্যমতে, এ সময় সবাহ ও মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের মাঝে গভীর প্রণয়-সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল এবং ইবনে আবু আমিরের ব্যক্তি-যোগ্যতার পাশাপাশি এ প্রণয়-সম্পর্ক তার বিভিন্ন পদপ্রাপ্তি এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের বাঁকে বাঁকে (যার বিবরণ সামনে আসছে) ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল।

বাস্তবতা হল, এ ধরনের কিছু ঘটা যদিও অসম্ভব নয়; কিন্তু নিশ্চিত ঘটেছে, এরূপ দাবি করাও মুশকিল। সবাহ ছিলেন উদ্ভিন্ন-যৌবনা এক তরুণী, যার স্বামী সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেও ইতোমধ্যে বার্ধক্যের স্তরে উপনীত হয়েছেন; পক্ষান্তরে ইবনে আবু আমির মেধাবী, সুদর্শন, কর্মদক্ষ এক টগবগে তরুণ। অধিকন্তু তিনি প্রায়ই বিভিন্ন উপলক্ষে বা বিনা উপলক্ষে মূল্যবান ও বিচিত্র সব উপহার প্রদান করে সবাহের নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট থাকেন। সুতরাং হয়তো ..., সম্ভবত ...।

কিন্তু 'হয়তো' 'সম্ভবত' দিয়ে তো আর ইতিহাসের বিচার হয় না। এসব সম্ভাবনা ও গুঞ্জনের ভিত্তিতে আমরা কিছুতেই এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না যে, অবশ্যই তাদের মধ্যে কোন ধরনের প্রণয়-সম্পর্ক ছিল। এক ধাপ অগ্রসর হয়ে তাদের মাঝে অন্যায় ও অনৈতিক সম্পর্কের দাবি করা তো আরও দূরের কথা; যদিও ঐতিহাসিকগণের অনেকেই এমনটি করেছেন। আমরা মনে করি, ইবনে আবু আমিরের উত্থান ও উন্নতির পেছনে উভয়ের মধ্যকার যে সম্পর্ক সক্রিয় ছিল, তা কখনোই বৈধতার সীমা অতিক্রম করে হারাম পর্যায়ে পৌঁছয়নি।

বরং পূর্বাপর ঘটনাপ্রবাহের আলোকে আমাদের বিশ্বাস, ইবনে আবু আমির ও সবাহের মধ্যকার এ সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে যৌথ স্বার্থরক্ষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছিল এবং তা উভয়ের স্বার্থরক্ষার পরিধিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা, ইবনে আবু আমিরের এমন কোন বংশপরিচয় বা পারিবারিক পরিচিতি ছিল না, যার ওপর নির্ভর করে তিনি উন্নতির পথে অগ্রসর হবেন।

Scanned with CamScanner

তাই প্রশাসনে নিজ পদ ও প্রতিপত্তি ধরে রাখতে তার প্রয়োজন ছিল খলীফা পদে হিশামের অবস্থান। অপরদিকে হিশাম যদি খলীফা পদে অধিষ্ঠিত না থাকেন, তাহলে প্রয়াত খলীফা হাকামের ক্রীতদাসী বাশকানসিয়ার উল্লেখযোগ্য কোন মর্যাদাই থাকবে না। অধিকন্তু প্রত্যেক মায়ের অন্তরেই থাকে সন্তানের প্রতি সহজাত স্নেহ-মমতা, যা নিজ পুত্রকে দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত দেখতে যথাসম্ভব সবধরণের চেষ্টা করতে সবাহকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর এভাবেই ইবনে আবু আমির ও সবাহ– উভয়ের স্বার্থ একই মোহনায় মিলিত হয়েছিল এবং একে কেন্দ্র করে উভয়ের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল।

যাই হোক, আন্দালুস ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে তিনটি শক্তিশালী চরিত্র ঘটনাপ্রবাহে দৃশ্যমান ছিল। এক. প্রধান রাজপ্রহরী জাফর মিসহাফী, যার শক্তি ছিল নিজ গোত্রের লোকজন অর্থাৎ মিসহাফী গোষ্ঠী। দুই. ইবনে আবু আমির, যার শক্তি ছিল নিজের অতুচ্চ্য কর্মদক্ষতা, পরিচালন যোগ্যতা এবং খলীফা ও তার মায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক। তিন. সবাহ, যার নির্ভরতা হল পুত্র খলীফা হিশাম ও তার তত্ত্বাবধায়ক ইবনে আবু আমির। অবশ্য এ তিন কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে আরও একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বকে আমরা যোগ করতে পারি। তিনি হলেন তৎকালীন আন্দালুসের বিখ্যাত বীর যোদ্ধা ও গৌরবময় সমর-ইতিহাসের অধিকারী সেনাপতি গালিব আননাসিরী।

গালিব আননাসিরী প্রধান রাজপ্রহরী জাফরকে মোটেই পছন্দ করতেন না এবং তার পরিবর্তে জাফর 'হাজিব' পদের অধিকারী হয়েছেন, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না। কারণ, রাষ্ট্রের কর্মমুখর অঙ্গন বা রণাঙ্গনের উত্তপ্ত ময়দান কোথাও জাফরের উল্লেখযোগ্য কোন অতীত অবদান ছিল না। অধিকন্তু কর্ডোভার অভিজাত অঙ্গনে কৃপণ হিসেবে জাফরের বিশেষ খ্যাতি (!) ছিল। রাষ্ট্রের এ ধরনের উচ্চতর পদে আসীন হওয়ার পেছনে তার একমাত্র 'যোগ্যতা' এই ছিল যে, খলীফা আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলে তিনি হাকাম আলমুসতানসিরের শিক্ষক ও দীক্ষক ছিলেন। তৎকালীন ওলিয়ে আ'হদ (যুবরাজ) হাকাম পরবর্তী সময়ে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হলে আপন উসতায জাফরকে এই মর্যাদাপূর্ণ পদ প্রদান করে সম্মানিত করেন।

ইতিহাসের ধারা বর্ণনায় ফিরে আসি। হাকামের মৃত্যু ও হিশামের দায়িত্ব গ্রহণ– আন্দালুস ইতিহাসের এই বাঁক পরিবর্তনের সময় হঠাৎ করেই

Scanned with CamScanner

মুসলিম আন্দালুসের দিগন্তে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিল। খলীফা হাকামের মৃত্যুসংবাদ যেন উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর সামনে এক পরম আকাঙ্ক্ষিত দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। তারা খলীফা হাকামের সঙ্গে কৃত চুক্তি ও অঙ্গীকারসমূহ ভঙ্গ করতে লাগল এবং প্রতিশোধ-নেশায় উন্মত্ত হয়ে মুসলিম আন্দালুসের সীমান্তশহরগুলোতে হামলা করতে শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর ধারণা ছিল, মুসলমানরা এখন নতুন করে নিজেদের শক্তি পুনরুদ্ধার করার সুযোগ পাবে না এবং নতুন মুসলিম খলীফাও ক্ষমতা সুসংহত করার সুযোগ পাবেন না।

উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো আন্দালুসের সীমান্তশহরগুলোতে একের পর এক প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে লাগল। মুসলিম আন্দালুস-প্রশাসন থেকে কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না পাওয়ায় খৃস্টানশক্তির দুঃসাহস আরও বেড়ে গেল এবং তারা মুসলিম আন্দালুসের রাজধানী কর্ডোভায় হামলা চালাতে উদ্যত হল।

রাষ্ট্রের শীর্ষ পদবীধারী ব্যক্তি যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও দায়িত্ব পালনে অক্ষম, তখন তার এই দুর্বলতা যেন রাষ্ট্রের প্রতিটি পদস্থ কর্মকর্তাকেই আক্রান্ত করল। খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর এই দুঃসাহসী পদক্ষেপের কথা শুনে কেউ এর প্রতিরোধে অগ্রসর হল না। আবার তারা এমন কাউকে খুঁজেও পেল না, যিনি এই গুরুদায়িত্ব পালনে আগ্রহী হবেন। বীর যোদ্ধা গালিব আননাসিরী তখন সীমান্ত নগরী সালিম (Medinaceli)-এ অবস্থান করছিলেন। তিনি এই যুক্তিতে সালিম ছাড়তে রাজী হলেন না যে, তার অনুপস্থিতিতে সীমান্ত নগরীটি অরক্ষিত হয়ে পড়বে এবং শত্রু-আক্রান্ত হবে। অবশ্য কতক ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী হাজিব মিসহাফীকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলতে এবং প্রশাসন ও জনগণের কাছে নিজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করতেই মূলত গালিব আননাসিরী ঈসায়ীশক্তির মোকাবেলায় অগ্রসর হননি।

চরিত্রগত দিক থেকে মিসহাফী ছিলেন অত্যন্ত ভীরু, দুর্বল ও দ্বিধাচিত্ত। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে দশবার ভেবেও তিনি কূল-কিনারা করতে পারতেন না। এ সঙ্গীন পরিস্থিতিতে কী করা উচিত, তা সম্পর্কে তার মোটেও ধারণা ছিল না। আবার স্বভাব-ভীতির কারণে তিনি নিজে শত্রুর মোকাবেলায় বের হতেও ভয় পাচ্ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে খলীফা হাকাম আলমুসতানসির আন্দালুসে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সেনাবাহিনী রেখে

Scanned with CamScanner

গিয়েছিলেন এবং পর্যাপ্ত যুদ্ধাস্ত্র, রসদ ও অর্থের ভাণ্ডারও রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু মিসহাফীর কাপুরুষতার পরিমাণ দেখুন, প্রস্তুত সেনাবাহিনী নিয়ে প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় বের হবেন দূরে থাক, তিনি রাবাহ দুর্গের (Calatrava la Vieja) অধিবাসীদের দুর্গসংলগ্ন নদীর বাঁধ কেটে ফেলতে নির্দেশ দিলেন, যেন শত্রুপক্ষ হামলার উদ্দেশ্যে দুর্গে প্রবেশ করতে না পারে!

এভাবেই শক্তিশালী ও প্রতাপশালী রাষ্ট্র আন্দালুস অপরিপক্ক শাসক নির্বাচন, অপরিণামদর্শী হাজিবের সিদ্ধান্তহীনতা ও অবিবেচক দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের পারস্পরিক মতবিরোধের কারণে এক অনাকাঙ্ক্ষিত পতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হল।

এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে মুহাম্মাদ বিন আবু আমির উদ্যোগী হলেন। তার দৃষ্টিতে প্রধান রাজপ্রহরীর এই নির্দেশনা ছিল পরোক্ষভাবে নিজেদের দুর্বলতা ও পরাজয়েরই স্বীকৃতি; এর মাধ্যমে যেন দুর্বল কণ্ঠে স্বীকার করা হচ্ছে যে, আন্দালুসের সুবিশাল ইসলামী ভূখণ্ডে ঈসায়ীশক্তির আগ্রাসন প্রতিরোধ করার মতো উপযুক্ত কোন বীর পুরুষ নেই, বিদ্যমান শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো রণকুশলী কোন সেনানায়ক নেই; আর তাই তারা এই লাঞ্ছনাকর প্রতিরক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। অথচ এ ধরনের হাস্যকর পদক্ষেপ প্রতিরক্ষার কোন কাজে তো আসবেই না; বরং আত্মঘাতী বলে বিবেচিত হবে।

ইবনে আবু আমির জাফর মিসহাফীর এই নির্দেশনাকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করলেন এবং এর পরিবর্তে মিসহাফীর কাছে যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে বাহিনী প্রস্তুত করার প্রস্তাব পেশ করলেন। কিন্তু জাফর মিসহাফী সিদ্ধান্ত গ্রহণে গড়িমসি করতে লাগলেন। তার চিন্তা, মুসলিম বাহিনীকে নেতৃত্ব দেবে কে? নিজে নেতৃত্ব দেওয়ার চিন্তা করা তো বহুত দূর কী বাত! তার যে রণাঙ্গনে লড়াই করার অভিজ্ঞতাই নেই।

এবার ইবনে আবু আমির নিজেই অগ্রসর হলেন এবং অভিযানের জন্য যোদ্ধা বাছাই করতে লাগলেন। তিনি সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির জন্য এক লক্ষ দীনার মঞ্জুরী চাইলেন। উপস্থিত সভাসদদের কেউ একজন একে অনেক বেশি বলে মন্তব্য করলে ইবনে আবু আমির তাকে বললেন, আপনি এর দ্বিগুণ নিয়ে এখান থেকে চলে যান। আপনার প্রাচুর্য আপনার জন্য কল্যাণকর হোক! লোকটি এ কথা শুনে স্তম্ভিত ও নিশ্চুপ হয়ে গেল।

Scanned with CamScanner

মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের উত্থান

আসন্ন অভিযানের জন্য ইবনে আবু আমির সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ৩৬৬ হিজরীর রজব মাসে ইবনে আবু আমির পর্যাপ্ত অর্থ ও যুদ্ধাস্ত্রসহ তার বাহিনী নিয়ে উত্তরের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। মুসলিম বাহিনীর আগমন-সংবাদ পেয়ে খৃস্টান বাহিনী পলায়ন করল।

ইবনে আবু আমির এ অভিযানে হামা ও রাবযা দুর্গ জয় করতে সক্ষম হলেন। অভিযানে বের হওয়ার বায়ান্ন দিন পর প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী নিয়ে তিনি কর্ডোভায় ফিরে এলেন। তার এই বীরত্বপূর্ণ অভিযান ও বিজয় সাফল্যে চারিদিকে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। সবাই অত্যন্ত খুশী হল এবং প্রশাসন ও জনসাধারণ সবার কাছে তার ভালোবাসা ও মূল্যায়ন বেড়ে গেল। কেননা, তিনি তার বীরত্বপূর্ণ অভিযানের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করেছেন। তার সঙ্গে অভিযানে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনীও তার উদারতা, সদাচরণ এবং রণক্ষেত্রে তার বীরত্বের পরিচয় পেয়ে তার ভক্ত হয়ে গেল। এককথায়, এই বিজয়াভিযানের মাধ্যমে তিনি সকলের হৃদ্যতা, ভালোবাসা ও অন্তরজগতের বিশেষ স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হলেন। তিনি নিজেও এরপর থেকে সকলের প্রতি অনুগ্রহ আচরণ বাড়িয়ে দিলেন।

এভাবেই ইবনে আবু আমিরের প্রথম অভিযান সাধারণভাবে আন্দালুসের মুসলিম জনসাধারণের জন্য বিজয়-বার্তা বয়ে নিয়ে এল এবং বিশেষভাবে তার নিজের জন্য নিয়ে এল গৌরবজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তা। এই একটি অভিযানের পরই ইবনে আবু আমিরের অদম্য স্পৃহা হ্রাস পেল না; বরং তিনি আরও উচ্চতর মনোবলে বলীয়ান হয়ে এ বিজয়ের সুফল সর্বস্তরে কাজে লাগাতে ব্রতী হলেন।

হাকামের মৃত্যুর পর মুসলিম আন্দালুস-সীমান্তে খৃস্টানদের অব্যাহত হামলা এবং তাদের মোকাবেলায় গালিবের নীরবতা গালিব আননাসিরীর অবস্থানকে দুর্বল করে ফেলেছিল এবং রাষ্ট্রের কাছে তার মর্যাদা ও গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল। ইবনে আবু আমির জানতেন, গালিব হাজিব জাফরকে অপছন্দ করেন এবং নিজেকে তার চেয়ে যোগ্যতর মনে করেন। তিনি এও জানতেন যে, রণাঙ্গনে অতীত অবদান না থাকা সত্ত্বেও মিসহাফীর হাজিব পদপ্রাপ্তি গালিবকে ক্রুদ্ধ করেছে। ইবনে আবু আমির এবার কিশোর খলীফা ও তার

Scanned with CamScanner

মায়ের কাছে গালিবের গুরুত্ব ও দক্ষতার কথা তুলে ধরলেন এবং তাকে সমর্থন করলেন। তার সুপারিশে গালিবের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা হল এবং তাকে একসঙ্গে দু'টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হল। পাশাপাশি গালিব যেহেতু সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধান; আর ইবনে আবু আমির রাজধানী কর্ডোভার প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান, তাই উভয়কে একসঙ্গে গ্রীষ্মকালীন অভিযান প্রস্তুতির তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব প্রদান হল।

৩৬৬ হিজরীর ঈদুল ফিতরের দিন ইবনে আবু আমির তার বাহিনী নিয়ে উত্তরের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। মাজরীত (বর্তমান মাদ্রিদ) শহরে পৌছে তিনি গালিবের সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর উভয় বীর সেনানী সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে চললেন ক্যাস্টোলার উদ্দেশে। তারা মুলা দুর্গ জয় করলেন এবং প্রচুর গনীমত ও যুদ্ধবন্দী করায়ত্ত করলেন। গালিব ও তার অধীনস্থ বাহিনী যুদ্ধে বীরত্ব ও রণদক্ষতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করল। বলতে গেলে তারাই ছিল বিজয় কৃতিত্বের মূল দাবিদার।

ইবনে আবু আমিরের প্রতিভা ও স্বভাব-যোগ্যতা গালিবকে মুগ্ধ করল। অধিকন্তু তিনি জানতেন যে, ইবনে আবু আমির খলীফা ও প্রাসাদের মূল নিয়ন্ত্রী খলীফা-মাতার কাছে তার জন্য সুপারিশ করেছেন এবং তার পদোন্নতিতে ভূমিকা রেখেছেন। আজ যে তিনি একই সঙ্গে দু'টি মন্ত্রণালয়ের অধিকারী, এর পেছনেও আছে ইবনে আবু আমিরের পরোক্ষ অবদান। বিপরীতে বর্তমান হাজিব জাফর মিসহাফী গালিবের চরম শত্রু। সবকিছু মিলিয়ে গালিব ভাবতে লাগলেন, মিসহাফী নয়; বরং ইবনে আবু আমিরই আন্দালুসের 'হাজিব' পদের প্রকৃত উপযুক্ত ব্যক্তি।

উল্লিখিত কোন একটি কারণে কিংবা সবগুলোর সম্মিলনে গালিব ইবনে আবু আমিরকে স্নেহের নজরে দেখতে লাগলেন এবং উভয়ের মধ্যে একটি দৃঢ় ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠল। এমনকি নিজের ও নিজ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও গালিব 'মুলা' দুর্গ বিজয়ের পুরো কৃতিত্ব ইবনে আবু আমিরকে প্রদান করলেন এবং ইবনে আবু আমিরের বীরত্ব, রণদক্ষতা ও তার হাতে অর্জিত এ বিজয়ের মাহাত্ম্য তুলে ধরে অত্যুচ্চ প্রশংসা সম্বলিত কয়েকটি বার্তা কর্ডোভায় প্রেরণ করলেন।

এরপর উভয় সেনাপতি দেশ ও জাতির স্বার্থে দুর্বল-দ্বিধাচিত্ত হাজিব মিসহাফীকে তার পদ থেকে অপসারণের ব্যাপারে একমত হলেন। গালিব ইবনে আবু আমিরকে বললেন, এ বিজয়ের কারণে নিশ্চয়ই তোমার খ্যাতি ও

Scanned with CamScanner

মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে। জনগণ এই বিজয়ের আনন্দে মেতে থাকায় পরবর্তী সময়ে তুমি কী করলে, তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবে না। কর্ডোভায় পৌঁছার পর প্রথমে তুমি জাফরের পুত্রকে কর্ডোভার গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করবে এবং অন্য কাউকে গভর্নর পদে বসানোর পূর্বে বাড়ি থেকে বের হবে না। উল্লেখ্য, জাফর মিসহাফীর পুত্র ছিল রাজধানী কর্ডোভার গভর্নর। তাকে বরখাস্ত করা মূলত মিসহাফীকে হাজিবের পদ থেকে অপসারণ করারই প্রাথমিক পদক্ষেপ।

প্রচুর গনীমত ও যুদ্ধবন্দী নিয়ে ইবনে আবু আমির কর্ডোভায় ফিরে এলেন। এবারের বিজয়ের মাধ্যমে তিনি নির্বিশেষে সর্বশ্রেণির মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে সক্ষম হলেন। সবাই তার স্বভাব-দৃঢ়তা ও ইস্পাতকঠিন সংকল্পের প্রশংসা করতে লাগল। যেদিন ইবনে আবু আমির কর্ডোভায় পৌঁছলেন, সেদিনই খলীফা হিশাম জাফর-পুত্র মুহাম্মাদকে কর্ডোভার গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করে মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরকে সে পদে নিযুক্ত করলেন।

পূর্বের অন্যান্য দায়িত্বের ন্যায় এ দায়িত্বেও ইবনে আবু আমির অপূর্ব কর্মদক্ষতার পরিচয় দিলেন; এমনকি ইবনে আ'যারী মারৃরাকেশী তার এবং পূর্বের গভর্নর মুহাম্মাদ বিন জাফর মিসহাফীর গভর্নর-আমলের তুলনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

> মুহাম্মাদ বিন আবু আমির কর্ডোভা শহরে এমন অভূতপূর্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন, যা কর্ডোভাবাসীকে পূর্ববর্তী নগরসেবক ও রাজনীতিকদের কথা বিস্মৃত করে দেয়। এর পূর্বে তারা কঠিন দুর্যোগে দিনাতিপাত করছিল। নিরাপত্তার জন্য তারা নিজেরাই রাত জেগে বাড়ি-ঘর পাহারা দিত। সীমান্তশহরগুলোর অধিবাসীরা শত্রুর ভয়ে যতটা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত, কর্ডোভাবাসী তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত ডাকাতদের ভয়ে। মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের পরিচালন দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাদেরকে এই ভীতকর পরিস্থিতি হতে উদ্ধার করেন। ইতঃপূর্বে মুহাম্মাদ বিন জাফর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ লোকমুখে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ বিন আবু আমির ছিলেন এসব অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি সুপারিশ ও তদবীরের পথ বন্ধ করে দেন। অপরাধী ও দুশ্চরিত্রদের কঠোর হস্তে দমন করেন। ফলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত

Scanned with CamScanner

হয় এবং মানুষ নিরাপত্তা লাভ করে। এমনকি একবার তার এক চাচাতো ভাই আসকালাজার একটি অপরাধ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তদন্তের উদ্দেশ্যে তিনি তাকে তলব করেন এবং তাকে এত কঠিনভাবে চাবুকাঘাত করেন যে, তাতেই তার মৃত্যু হয়। মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের আমলে কর্ডোভা নগরীতে অন্যায় ও সন্ত্রাস একেবারেই দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল।[৪১৬]

প্রধান রাজপ্রহরী জাফর যখন দেখলেন যে, মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে গেছে এবং বিপরীতে তার শক্তি ও প্রভাব দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে, তখন তিনি গালিবকে কাছে টানতে নিজের ছেলের জন্য গালিবের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। বিষয়টি জানামাত্রই ইবনে আবু আমির গালিবকে দু'জনের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বার্তা পাঠালেন এবং গালিবের মেয়ের জন্য নিজের নাম প্রস্তাব করলেন। খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরকে সমর্থন করল। আযযাহরা রাজপ্রাসাদ থেকেও গালিব-কন্যা আসমার জন্য মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের পানিপ্রার্থনার সংবাদ প্রচারিত হল। ফলে পাল্লা পুরোপুরি মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের দিকে হেলে পড়ল। গালিব তার কন্যাকে মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের কাছে বিয়ে দিতে সম্মত হলেন এবং ৩৬৭ হিজরীর মুহাররম মাসে উভয়ের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হল।

এতদিনে জাফর মিসহাফী নিজের দুর্ভাগ্য ও দুর্যোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেন এবং মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের কোন বিষয়ে আপত্তি করা থেকে নিবৃত্ত হলেন। জনগণ মিসহাফীকে তুচ্ছজ্ঞান করতে লাগল এবং সকল বিষয়ে মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের শরণাপন্ন হতে লাগল। একপর্যায়ে অবস্থা এই দাঁড়াল যে, মিসহাফী সকালে একাকী রাজপ্রাসাদে আসেন; সন্ধ্যায় একাকী ফিরে যান। 'হাজিব' নাম ছাড়া তার কাছে আর কিছুই রইল না।

গালিব-কন্যা আসমার সঙ্গে আকদ সম্পন্ন হওয়ার পর মুহাম্মাদ বিন আবু আমির তার তৃতীয় অভিযানে বের হলেন। ৩৬৭ হিজরীর সফরের শুরুতে তিনি টলেডোর উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। টলেডো পৌঁছে তিনি তার শ্বশুর গালিবের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং উভয়ে একসঙ্গে উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর দিকে অগ্রসর হলেন। তারা আলমাল ও যামবাক দুর্গ জয় করার

---

[৪১৬] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৬৬।

Scanned with CamScanner

পর সালামানকা নগরীতে প্রবেশ করলেন এবং নগরীর উপকণ্ঠগুলো দখল করে নিলেন। অভিযানে বের হওয়ার চৌত্রিশ দিন পর মুহাম্মাদ বিন আবু আমির প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যুদ্ধবন্দী ও প্রতিপক্ষ খৃস্টানদের বড় বড় কয়েকজন নেতাকে বন্দী করে নিয়ে কর্ডোভায় ফিরে এলেন। এ অভিযানের ফলে তার প্রতি খলীফার আন্তরিকতা ও সমাদর আরও বৃদ্ধি পেল। গালিব ও মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের পদমর্যাদা সমান করার জন্য খলীফা হিশাম মুহাম্মাদকেও দু'টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করলেন এবং তার বেতন বাড়িয়ে মাসিক আশি দীনারে উন্নীত করলেন। সেকালে আন্দালুস প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ 'হাজিব' (প্রধান উযীর পর্যায়ের পদ)-এর জন্য আশি দীনার বেতন ধার্য করা ছিল। এরপর নববর্ষ (নওরোয) উৎসবের রাতে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে গালিব-কন্যা আসমাকে মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের বাসর ঘরে পাঠানো হল। আন্দালুসে ইতঃপূর্বে এরূপ জাকজমকপূর্ণ বিয়ে আর হয়নি।

এর কয়েকদিন পর খলীফা হিশাম জাফর মিসহাফীর পাশাপাশি ইবনে আবু আমিরকেও হাজিব পদ প্রদান করলেন। কিছুদিন পর খলীফা জাফরের প্রতি বিরাগ ও ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে, তার পুত্রকে ও তার নিকটাত্মীয়দেরকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদ থেকে বরখাস্ত করার এবং গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেন।

খলীফার আদেশ জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মাদ বিন আবু আমির তাদের সম্পদের হিসাব তলব করলেন এবং তাদের সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলেন। জাফর মিসহাফী নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, তার পতন সুনিশ্চিত। এবার তিনি মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরকে তুষ্ট করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই কাজে লাগল না। এককালের প্রতাপশালী হাজিব মিসহাফীর ঠাঁই হল কারা-প্রকোষ্ঠে। অবশেষে তিনি কারা অভ্যন্তরেই ৩৭২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। অবশ্য কোন কোন বর্ণনামতে তাকে হত্যা করা হয়েছিল; আবার কতক বর্ণনা অনুযায়ী তাকে বিষমিশ্রিত পানীয় পান করানো হয়েছিল।[৪১৭]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়ান জাফর মিসহাফীর এই সুকরুণ পরিণতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

---

[৪১৭] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৬৪।

Scanned with CamScanner

অপরিপক্ক হিশামকে খেলাফতের মসনদে বসানোর জন্য প্রচেষ্টা, সম্পদ-মোহ, প্রবৃত্তির অনুসারী স্বেচ্ছাচারী জীবন-যাপন এবং প্রাণদণ্ডের মতো কোন অপরাধ ব্যতীত প্রথম সুযোগে মুগীরাকে হত্যা করা ইত্যাদি নানামুখী অপরাধের কারণে তাকসীরের কাছে জাফরের এমন কিছুই পাওনা ছিল। আর তাই তার নামের প্রভাব কাজে লাগিয়ে যে ব্যক্তি অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করত, শেষপর্যন্ত তাকেই তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল![৪১৮]

আমিরিয়া সাম্রাজ্য (৩৬৬-৩৯৯ হি./৯৭৬-১০০৯ খৃ.)

পরিস্থিতি এবার পুরোপুরি মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের অনুকূলে চলে এল। তিনি এখন রাষ্ট্রের প্রভাবশালী পদের অধিকারী; যিনি রাষ্ট্র ও জাতিকে পরিচালনা করেন, গ্রীষ্মে ও শীতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন এবং নিজেই তাতে নেতৃত্ব দেন। খৃস্টানদের বিরুদ্ধে প্রতিটি অভিযানে তিনি জয়লাভ করছেন। বিপরীতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে বার নাম, সেই বালক খলীফা এখনও পরিণত বয়সে পৌছেননি; রাষ্ট্রের অবস্থা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তাই কার্যত এখন ইবনে আবু আমিরই আন্দালুস রাষ্ট্রের শাসক।

রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নেতৃত্বের লাগাম হাজিব মুহাম্মাদ বিন আবু আমির এবার নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। নির্বাহী আদেশ-নিষেধাজ্ঞা প্রদান, বিভিন্ন পদে নিয়োগ-বিয়োগ, সেনাবাহিনী প্রেরণ, বিভিন্ন সমঝোতা ও সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষরকরণ– সব এখন তিনিই করেন। খেলাফতব্যবস্থায় ইবনে আবু আমির হয়ে উঠলেন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। আর এ যুগটি ইতিহাসে পরিচিত হল 'আমিরিয়া সাম্রাজ্যের যুগ' নামে।

আমিরিয়া সাম্রাজ্যের সময়কাল সর্ব বিবেচনায় মুসলিম আন্দালুস-ইতিহাসের সবচে' প্রতাপের যুগ। এ সময় মুসলিম আন্দালুস শক্তি ও প্রভাবের শীর্ষ চূড়ায় পৌছেছিল; বিপরীতে খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো চূড়ান্ত পর্যায়ের দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আমিরিয়া সালতানাতের প্রকৃত সূচনাকাল ধরা যেতে পারে ৩৬৬ হিজরীকে (৯৭৬ খৃস্টাব্দ), যখন মুহাম্মাদ বিন আবু আমির খলীফা হিশাম বিন হাকামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমিরিয়া সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ছিল ৩৯৯ হিজরী (১০০৯ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত; অর্থাৎ একটানা প্রায়

---

[৪১৮] দেখুন : ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৭/৬৫।

Scanned with CamScanner

তেত্রিশ বছর। অবশ্য ঐতিহাসিক বিবেচনায় আমিরিয়া সালতানাতকে উমাইয়া খেলাফতকালের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। কারণ, এ সময়কালে খলীফা পদবী উমাইয়াদের কাছেই ছিল; যদিও খলীফা পদের অস্তিত্ব তখন নিছক কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আমিরিয়া সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধ্যায়

আমরা মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের শাসনকাল নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এ প্রসঙ্গে পাঠককে এ তথ্যটিও স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, মুহাম্মাদ বিন আবু আমির ছিলেন বিশেষ কোন বংশীয় পরিচয়হীন একজন শাসক। অর্থাৎ ক্ষমতার এই সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পেছনে তার বংশীয় পরিচয়ের কোন ভূমিকা ছিল না। তিনি এমন কোন ক্ষমতাসীন পরিবার থেকে উঠে আসেননি, যারা তাকে শক্তি যোগাবে এবং তার ক্ষমতাপ্রাপ্তিতে ভূমিকা রাখবে; যেমনটি আমরা বনু উমাইয়া, বনু আব্বাস ও ইতিহাসখ্যাত বিভিন্ন রাজপরিবারের ক্ষেত্রে দেখে থাকি।

পাশাপাশি এ তথ্যটিও আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, অধুনা প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপত্তির পূর্ব পর্যন্ত সারা বিশ্বে 'বংশীয় পরিচিতি'ই ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মূল কার্যকারণ। তাই যিনি-ই শাসন বা প্রশাসনক্ষমতা লাভের স্বপ্ন দেখতেন, তার জন্য অবশ্যম্ভাবী শর্ত ছিল এমন কোন বংশপরিচয় থাকা, যার মাধ্যমে তিনি প্রচার ও জনসমর্থনের মুখ দেখবেন এবং বংশশক্তির ওপর নির্ভর করেই তিনি অগ্রসর হবেন।

পাঠকের স্মরণ থাকার কথা, আবদুর রহমান আদদাখিল যখন আন্দালুসে প্রবেশ করেছিলেন, তখন তিনি সেখানে বিদ্যমান আরবদের পারস্পরিক বিরোধকে কাজে লাগিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি কায়সীদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তারা প্রত্যাখ্যান করার পরে তিনি ইয়ামেনীদের সঙ্গে মৈত্রী করে তাদের সাহায্য নিয়েই জয়লাভ করেছিলেন। আবদুর রহমান আদদাখিল উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি যদি একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাহলে এই গোত্রপ্রীতির রোগ দূর করে প্রতিটি আরব গোষ্ঠীর সমর্থন অর্জন করতে হবে এবং নিজের জন্য এমন কিছু লোক প্রয়োজন হবে, যারা সাম্প্রদায়িকতা ও গোত্রপ্রীতির ব্যাধি হতে মুক্ত। আবদুর রহমান আদদাখিল এক্ষেত্রে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচুর পরিমাণে মাওয়ালীদের

Scanned with CamScanner

নিয়োগ দিয়েছিলেন, উমাইয়া প্রশাসন বিনির্মাণে যাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অপরদিকে আরব নেতৃবৃন্দ তখন পর্দার আড়ালে চলে গিয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদ থেকে দূরে সরে ছিলেন। রাষ্ট্রে তাদের মর্যাদা ছিল কেবলই সম্মানসূচক। তারা কেবল বিভিন্ন সভা ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেন।

আবদুর রহমান আননাসিরও একই কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে তিনি বেশি নির্ভর করতেন বার্বারদের উপর, যারা সাগর পাড়ি দিয়ে মাগরেব অঞ্চল থেকে আন্দালুসে এসেছিল। এসব বিবেচনায় আমরা দাবি করতে পারি যে, আন্দালুসের মুসলিম সাম্রাজ্যের সফলতার সঙ্গে টিকে থাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ছিল রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদ হতে সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজালে আবদ্ধ আরব গোষ্ঠীগুলোকে আড়ালে রাখা।

মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। বার্বাররাই হল তার সরকারের মূল চালিকাশক্তি। সামরিক-বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই তিনি প্রচুর পরিমাণে বার্বারদের নিয়োগ দিলেন এবং তাদের দ্বারাই প্রশাসনব্যবস্থা দৃঢ়করণে তৎপর হলেন।

ইবনে আবু আমির ইতঃপূর্বে প্রয়াত খলীফা হাকামের শাসনামলে মাগরেবে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সে সময় তীক্ষ্ণ মেধা ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে তিনি সেখানকার সবচে' প্রভাবশালী বার্বার গোত্র বনু বারযাল ও তাদের গোত্রপতি জাফর বিন হামদূনকে উবাইদীদের মিত্রতা পরিত্যাগ করে উমাইয়া সরকারের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার এই কূটনৈতিক সাফল্যই পরবর্তীতে মাগরেব অঞ্চলে উবাইদীদের পতন এবং উমাইয়া শাসনপ্রতিষ্ঠার পথ উন্মোচিত করেছিল।[৪১৯]

আমরা এমন এক ব্যক্তির আলোচনা করছি, যিনি একই সঙ্গে কুদরতপ্রদত্ত মেধা-প্রতিভা ও সুদক্ষ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী। খলীফা হিসেবে বালক হিশাম আলমুআইয়াদ বিল্লাহর নাম সবখানে প্রচারিত হলেও কার্যত তিনিই এখন আন্দালুস শাসন করছেন। এ কথা সত্য যে, তখনকার আন্দালুসে ক্ষমতা নিয়ে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো শক্তিশালী কোন ব্যক্তিত্ব ছিল না। আন্দালুসের মহান বীর গালিব আননাসিরী যদিও এক্ষেত্রে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচিত হতে পারতেন; কিন্তু তিনি তো বর্তমানে মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের শ্বশুর এবং উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সমঝোতা বিদ্যমান।

---

[৪১৯] দেখুন : ইবনে আ'ষারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৭৮ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৪৭।

Scanned with CamScanner

মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের এই একচ্ছত্র রাজনৈতিক অবস্থান বনু উমাইয়ার দৃষ্টিতে মোটেও সুখকর মনে হল না। তারা লক্ষ করল, খেলাফত বনু উমাইয়ার নামে পরিচালিত হলেও ক্ষমতা কার্যত তাদের হাতে নেই। স্বাভাবিকভাবেই ইবনে আবু আমির বনু উমাইয়ার পথের কাঁটা হিসেবে বিবেচিত হতে লাগলেন। একইভাবে তিনি মিসহাফী গোষ্ঠীরও শত্রুতে পরিণত হলেন। কেননা, তার কারণেই সাবেক প্রধান রাজপ্রহরী জাফর মিসহাফী হাজিব পদ থেকে অপসারিত হয়েছিলেন আর এ কারণেই প্রশাসনে মিসহাফীদের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তারা শিকার হয়েছিল কঠিন দুঃসময়ের। এছাড়াও তৃতীয় আরেকটি প্রতিপক্ষ কিছুদিন পরেই মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের বিরুদ্ধে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হবেন। অত্যন্ত মেধাবী ও বিপজ্জনক এই প্রতিপক্ষ হলেন বালক খলীফা হিশামের মা সবাহ। তিনি যখন দেখবেন যে, খেলাফতকর্তৃত্ব ধীরে ধীরে তার পুত্রের হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরই হতে যাচ্ছেন সবকিছুর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক, স্বাভাবিকভাবেই তখন স্বার্থনির্ভর সম্পর্কে শুরু হবে ভাটার টান।

এই সব প্রেক্ষাপটকে স্মরণে রেখে এবার আমরা আমিরিয়া সালতানাতের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধ্যায় অধ্যয়ন শুরু করব। সেগুলো হল,

১. আযযাহিরা নগরী নির্মাণ

আবদুর রহমান আননাসির যেমন নিজ খেলাফতের কেন্দ্র হিসেবে কর্ডোভার উত্তর-পশ্চিম অংশে আযযাহরা নগরী নির্মাণ করেছিলেন, এবার মুহাম্মাদ বিন আবু আমির কর্ডোভার পূর্ব অংশে একটি নতুন রাজকীয় নগরীর পত্তন করেন। তিনি এর নামকরণ করেন 'আযযাহিরা' বা 'আলআমিরিয়া' নগরী। এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ৩৬৮ হিজরীতে। ৩৭০ হিজরীতে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি আযযাহিরায় স্থানান্তরিত হন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক দফতর সেখানে স্থানান্তরিত করেন। নিজের বসবাসের জন্য তিনি এ শহরে একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। ফলে আযযাহিরা নগরী আন্দালুসের কেন্দ্রীয় শহর ও রাষ্ট্রপ্রধানের নিবাসস্থলে পরিণত হয়।[৪২০]

---

[৪২০] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৭৮, ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৪৭ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৫৭৮।

Scanned with CamScanner

আযযাহিরা নগরী নির্মাণের ফলে মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য একই সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়। ১. তার ক্ষমতার জন্য মূল হুমকি ও সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রের কারণ হতে পারে যারা, অর্থাৎ উমাইয়া জনগোষ্ঠী এবং খলীফা ও তার মা, তাদের অবস্থানস্থল থেকে তিনি নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে সক্ষম হন। এ আশঙ্কা মোটেই অমূলক ছিল না যে, বিভিন্ন কারণে তার ওপর ক্ষিপ্ত উমাইয়া গোত্র, তাদের মাওয়ালী বা প্রাসাদের পরিচারকগণ তার বিরুদ্ধে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র করতে পারে। ২. এর মাধ্যমে তিনি তার ক্ষমতা ও প্রভাবকে আরও সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন। বস্তুত এটি ছিল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও অন্যান্য বিষয়াদিতে তার একক কর্তৃত্ব অর্জনের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

২. দৃশ্যপটে জাফর বিন হামদূনের আগমন

৩৭০ হিজরীতে মুহাম্মাদ বিন আবু আমির মাগরেব অঞ্চল থেকে বিখ্যাত যোদ্ধা পুরুষ বনু বুরযাল গোত্রপ্রধান জাফর বিন হামদূনকে আন্দালুসে তলব করেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মুহাম্মাদ বিন আবু আমির যখন মাগরেবে বিচারক পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তখন থেকেই তাদের দু'জনের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তলব পাওয়ামাত্র জাফর বিন হামদূন আন্দালুসে উপস্থিত হলেন। মুহাম্মাদ বিন আবু আমির তাকে কাছে টেনে নিলেন এবং উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করলেন।

নিঃসন্দেহে এ পদক্ষেপের ফলে মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের শক্তি ও ক্ষমতার ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হল। কারণ, একদিকে জাফর নিজে একজন বীর পুরুষ ও সুদক্ষ যোদ্ধা, অপরদিকে তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং বার্বারদের নেতা। সুতরাং তাকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করার অর্থ একই সঙ্গে ব্যক্তি জাফর ও বার্বার জাতির শক্তি ও সমর্থন লাভ করা। ইবনে আবু আমির যেহেতু পরবর্তীতে প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বার্বারদের সহায়তা গ্রহণ করবেন, তাই বার্বার-সমাজে তার প্রভাব, মর্যাদা ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি এ সবকিছুই লাভ করলেন।

তবে জাফর বিন হামদূনের আন্দালুসে আগমন এবং এর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিণতি আন্দালুস সেনানী গালিব আননাসিরের মোটেও অজানা ছিল না। তিনি স্পষ্টই অনুভব করছিলেন যে, জাফরের উপস্থিতি তার জন্য এক

Scanned with CamScanner

অদৃশ্য চ্যালেঞ্জের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে তাকে এ কথাই জানিয়ে হয়েছে যে, আন্দালুস-প্রশাসন তাকে ছাড়া অন্যের মাধ্যমেও সামরিক প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে তিনিই এখন একমাত্র অবলম্বন নন।

বস্তুত মুহাম্মাদ বিন আবু আমির নিকট-অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি ভুলে যাননি যে, মিসহাফী যখন প্রধান রাজপ্রহরী ছিলেন এবং খৃস্টানশক্তি আন্দালুসের সীমান্তবর্তী শহরগুলোতে হামলা করছিল, তখন এই গালিব সালতানাতের কাছে নিজের অবস্থান মজবুত করতে এবং মিসহাফীকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলতে শত্রুর মোকাবেলায় অগ্রসর হননি। এ ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে, এ কারণেই তিনি মাগরেব থেকে জাফরকে ডেকে এনেছিলেন। মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের এ আশঙ্কা মোটেই অমূলক ছিল না। কেননা, কোন কোন বর্ণনামতে, সামরিক বিভিন্ন বিষয়ে গালিব তখন মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের সঙ্গে অসদাচরণ করছিলেন। মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের তার মতো সমৃদ্ধ সামরিক অভিজ্ঞতা না থাকায় গালিব নিজেকে তার চেয়ে শ্রেয়তর ভেবে সামরিক বিষয়াদিতে সরাসরি তার বিরোধিতা করছিলেন।[৪২১]

এসব কারণে গালিব ও ইবনে আবু আমিরের মধ্যকার সম্পর্ক নাজুক হতে থাকে এবং একে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় এক দুঃখজনক ঘটনা, যার বিবরণ আমরা সামনে উল্লেখ করছি।

৩. গালিব আননাসিরের বিদ্রোহ

এর কিছুদিন পর মুহাম্মাদ বিন আবু আমির এক গ্রীষ্মকালীন অভিযানে ক্যাস্টোলার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। সংবাদ পেয়ে গালিব আননাসিরী তাকে আন্‌তিসা (Atienza) নগরদুর্গে আয়োজিত এক ভোজ অনুষ্ঠানে দাওয়াত করলেন এবং তাকে উপস্থিত হতে পীড়াপীড়ি করলেন। মুহাম্মাদ বিন আবু আমির দাওয়াতে উপস্থিত হলে উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ হল এবং উত্তেজিত হয়ে একপর্যায়ে গালিব মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরকে গালি দিয়ে বললেন, আরে কুকুর! তুই-ই তো দেশটাকে শেষ করে ফেলেছিস, সুরক্ষিত দুর্গগুলোকে ধ্বংস করেছিস, দেশে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেছিস। এ কথা বলে

---

[৪২১] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৭৮।

Scanned with CamScanner

গালিব তরবারি কোষমুক্ত করলেন এবং মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরকে আঘাত করলেন।[৪২২] উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি যদি তার হাত ধরে বাধা না দিত এবং এ কারণে তরবারির আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট না হত, তাহলে হয়তো এ আঘাতেই মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের মৃত্যু হত। লক্ষ্যভ্রষ্ট আঘাত তার মাথার একপাশে আঘাত করল।

সৌভাগ্যক্রমে ইবনে আবু আমীর আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হলেন এবং দ্রুত দুর্গের ওপর থেকে নেমে এলেন। এরপর তিনি দ্রুত কর্ডোভায় ফিরে এলেন। উভয় মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধ এবার প্রকাশ্য সংঘাতে রূপ নিল।

ইবনে আবু আমির কর্ডোভায় পৌঁছে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে দ্রুতই গালিব আননাসিরের মোকাবেলা করতে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় আন্দালুসের মহান বীর গালিব এমন এক আত্মঘাতী ভুল করে বসলেন, যাকে তার সামরিক অবদানে সমৃদ্ধ আশি বছরের বর্ণাঢ্য জীবনের এক নিকৃষ্টতম পরিণতি বলে গণ্য করা হয়। মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের বাহিনীর মোকাবেলার জন্য তিনি খৃস্টান রাষ্ট্র লিওনের নৃপতি তৃতীয় রোমেরোর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং কর্ডোভার বাহিনীর মোকাবেলায় তার সহায়তা কামনা করলেন। রোমেরো তাকে নিজ সেনাবাহিনীর একটি অংশ দিয়ে সহায়তা করলেন।

যে গালিব আননাসিরী ইতঃপূর্বে অসংখ্য যুদ্ধক্ষেত্রে রোমেরো ও তার সাম্রাজ্যকে লাঞ্ছনা ও পরাজয় উপহার দিয়েছিলেন, আজ সেই দুঃসাহসী বীর যোদ্ধা যখন সাহায্যের আবেদন নিয়ে রোমেরোর কাছে নত হলেন, তখন রোমেরো নিজেকে কী পরিমাণ সৌভাগ্যবান ভাবছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। তিনি হয়তো স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন যে, এর মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে এক দীর্ঘমেয়াদী মৈত্রীর সূচনা হল!

নিয়তির আশ্চর্য লিখন

উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল। এক দিকে কর্ডোভা-বাহিনী; যার কেন্দ্রীয় অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুহাম্মাদ বিন আবু আমির, দক্ষিণ বাহুর নিয়ন্ত্রণে আছেন মাগরেবের বিখ্যাত বীর জাফর বিন হামদূন; বর্তমানে যার পরিচয় মাগরেব ও আন্দালুসের বীর, বাম বাহুতে আছেন উযীর আহমাদ বিন হাযম

[৪২২] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৯১।

Scanned with CamScanner

(বিখ্যাত ইমাম ইবনে হাযমের পিতা) ও সালতানাতের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। অপর দিকে গালিব আননাসিরীর বাহিনী; যাদের সঙ্গী হয়েছে লিওনের খৃস্টান বাহিনী।

শুরু হল উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই। গালিব যদিও তখন আশি বছর বয়সে উপনীত হয়েছিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সেও প্রবল বিক্রমে তিনি প্রতিপক্ষের দক্ষিণ বাহুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং এ অংশকে পরাভূত করে সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। এরপর তিনি ততোধিক তেজে কর্ডোভা বাহিনীর বাম বাহুর ওপর হামলা চালালেন এবং এ অংশকেও পরাজিত ও ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলেন। অব্যবহিত পরেই তিনি ইবনে আবু আমিরের নেতৃত্বাধীন মূল অংশের মুখোমুখি হলেন।

আবেগহীন সামরিক বিবেচনায় এ মুহূর্তটি অত্যন্ত উত্তেজনাকর ও উপভোগ্য একটি মুহূর্ত। কারণ, আমরা এখন এমন দু'জন মহান বীরের লড়াই উপভোগ করব, যারা অতীতে কখনো কোন যুদ্ধে পরাজিত হননি। তাকদীর আজ তাদের দু'জনকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং নিশ্চিত করে দিয়েছে যে, আজকের এই মুখোমুখি লড়াই হবে কোন একজনের জীবনের প্রথম পরাজয় এবং হয়তো জীবনের শেষ পরাজয়ও! হয়তো এ পরাজয়ই তার বীরত্বপূর্ণ জীবনের সমাপ্তি টেনে দেবে।

মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের মুখোমুখি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে গালিব হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন, হে আল্লাহ! মুসলমানদের জন্য আমি যদি ইবনে আবু আমিরের তুলনায় শ্রেয়তর হয়ে থাকি, তাহলে আমাকে সাহায্য করুন আর যদি সে শ্রেয়তর হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সাহায্য করুন! এরপর যা ঘটল, পরিস্থিতির বিচারে তাকে কল্পনাযোগ্য সবচে' আশ্চর্যজনক সম্ভাবনা বললেও কম বলা হবে। কল্পনাতীত এ ঘটনা যদি নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রমাণিত সূত্রে বর্ণিত না হত, তাহলে ঐতিহাসিকগণ কেউ তা বিশ্বাসই করতেন না।[৪২৩] গালিব হঠাৎ তার অশ্ব নিয়ে যুদ্ধরত দু' পক্ষের মাঝ থেকে বেরিয়ে দূরে চলে গেলেন। সবাই মনে করল, তিনি হয়তো অনিবার্য কোন প্রয়োজনে দূরে গিয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পরও তার সাড়া না পাওয়ায় সৈন্যদের কেউ কেউ তাকে খুঁজতে বের হল। তারা তাকে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে মৃত অবস্থায়

---

[৪২৩] বিখ্যাত ইমাম ইবনে হাযম এ ঘটনা তার পিতা ও তৎকালীন উযীর আহমদ বিন হাযম (যিনি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দেখুন : ইবনে হাযম, *রাসাইলু ইবনি হাযম*, ২/৯৪-৯৫।

Scanned with CamScanner

গেল; অথচ তার শরীরে কোন আঘাত বা ক্ষত-চিহ্ন ছিল না। এরপর তারা মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের কাছে সুসংবাদ নিয়ে ফিরে এল।

আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন, দ্বীনের ময়দানে অনন্য খেদমত আঞ্জাম দেওয়া এ মহান সেনাপতিদ্বয় উভয়েই মৃত্যুর অনিবার্য স্বাদ গ্রহণ করবেন; কিন্তু কারও কপালেই পরাজয়ের চিহ্ন অঙ্কিত হবে না। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা গালিবের দোয়া কবুল করেছিলেন। তাই মুসলিম জাতির জন্য যার নেতৃত্ব শ্রেয়তর হবে, আল্লাহ তাকেই বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।[৪২৪]

তবে এই আকস্মিক দুর্ঘটনার পর পরিস্থিতি এমন আশ্চর্য মোড় নিল, যা কেউ ধারণাই করেনি। গালিবের মুসলিম সৈন্যরা কর্ডোভা বাহিনীর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে লিওনের খৃস্টান সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লিওন-সৈন্যদের অবস্থা তখন ...!

গালিব আননাসিরের বিদ্রোহ সংক্রান্ত চলমান আলোচনা শেষ করার পূর্বে আরেকটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়। কতক ঐতিহাসিকের অনুমান হল, গালিবের এই বিদ্রোহের নেপথ্যে অন্যতম কার্যকারণ ছিল জনৈকা নারীর প্ররোচনা; যিনি দেখছিলেন যে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রক্ষমতা ধীরে ধীরে তার পুত্রের হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে।

৪. খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোতে উপর্যুপরি অভিযান

গালিবের সৈন্যদল যারা ইতোমধ্যে মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের বাহিনীতে যোগ দিয়েছে, তাদের সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের বাহিনী এবার লিওন বাহিনীর মোকাবেলা করল। এর মাধ্যমে সূচনা হল খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের এক দীর্ঘমেয়াদী অভিযানধারার, যা পরবর্তী সাতাশ বছর অব্যাহত ছিল এবং প্রতি বছরের প্রতিটি অভিযানই ছিল মুসলিম বাহিনীর বিজয় সমাপ্তিতে ধন্য।

ইবনে আবু আমির প্রথমে লিওন-নৃপতি তৃতীয় রোমেরোর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য লিওন সাম্রাজ্যভুক্ত সামূরা (Zamora) নগরীর উদ্দেশে রওয়ানা হলেন এবং শহরটি অবরোধ করে আশেপাশের অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানকার সেনাবাহিনী শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। ভীত রোমেরো তৎক্ষণাৎ ক্যাস্টোলার নৃপতি গার্সিয়া ও নাভারের নৃপতি স্যাঞ্চোর

[৪২৪] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ৬৪।

Scanned with CamScanner

সহায়তা কামনা করলেন। তিন খৃস্টান শাসকের মাঝে মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হল এবং মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলায় সম্মিলিত খৃস্টান বাহিনী এগিয়ে এল। কিন্তু সম্মুখ লড়াইয়ে খৃস্টান বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল।

এরপর মুসলিম বাহিনী চূড়ান্ত সাহসিকতাপূর্ণ একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করল এবং লিওন সাম্রাজ্যের রাজধানী লিওন নগরীর দিকে অগ্রসর হল। মুসলিম বাহিনী লিওন নগরীর প্রবেশধারে পৌঁছে গিয়েছিল; কিন্তু শীত মৌসুমের আগমন ও তুষারপাতের কারণে অনন্যোপায় হয়ে মুসলিম বাহিনী এ নগরী জয় না করেই কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হল। প্রত্যাবর্তনের সময় মুহাম্মাদ বিন আবু আমির সঙ্গে করে নিয়ে এলেন এক আকস্মিক সৌভাগ্য, যার বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য পাঠককে আর একটু অপেক্ষা করতে হবে।

৫. 'আলহাজিব আলমানসুর'

গালিব আননাসিরের বিদ্রোহ দমন, লিওন সাম্রাজ্যের সহায়ক বাহিনীকে পরাজিত করা, এরপর খৃস্টানদের সম্মিলিত বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করা, তারপর অভিযান অব্যাহত রেখে রাজধানী লিওন নগরীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া– এতগুলো সাফল্যের মাল্যে ভূষিত হয়ে মুসলিম বাহিনী যখন কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করল, তখন মুহাম্মাদ বিন আবু আমির 'আলমানসুর' (Al manzor) রাজকীয় উপাধি ধারণ করলেন। ৩৭১ হিজরীতে (৯৮২ খৃস্টাব্দে) এই উপাধি ধারণ করার পর থেকে তিনি পরিচিত হতে লাগলেন 'হাজিব আলমানসুর' নামে। ইতঃপূর্বে একমাত্র খলীফারাই রাজকীয় উপাধি ধারণ করতেন। ইবনে আবু আমিরই প্রথম সেই ধারা ভেঙে নিজেকে রাজকীয় পরিচয়ে অলঙ্কৃত করলেন। এরপর থেকে মসজিদের মিম্বরসমূহে খলীফা হিশাম বিন হাকামের পাশাপাশি তার নামেও দোয়া পাঠ করা শুরু হল। এর কিছুদিন পর সরকারী মুদ্রা, রাষ্ট্রীয় চিঠি-পত্র ও সরকারী কাগজপত্রেও আলমানসুরের নাম খোঁদাই করা বা সিলমোহর প্রদান করা শুরু হল।[৪২৫]

আলমানসূর বিন আবু আমিরের শাসনামল ছিল প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শাসনদক্ষতার বিচারের সর্বোচ্চ স্তরের শাসনামল। প্রতিবছর আলমানসুর দু'বার অভিযানে বের হতেন এবং প্রতিবারই বিজয় ছিনিয়ে আনতেন।

---

[৪২৫] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৭৯।

Scanned with CamScanner

দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও ছিল শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ এবং সুখ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। সভ্যতা ও নাগরিক সুবিধাদির বিচারে আন্দালুস রাষ্ট্র তখন তার সর্বোচ্চ সমৃদ্ধিতে অবগাহন করছিল।

আমীরিয়া সালতানাত পুরোপুরি হাজিব আলমানসুরের একক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতে লাগল। খলীফা হিশামের আলোচনা একেবারেই আড়ালে হারিয়ে গেল এবং খলীফার বিচরণ আযযাহরার জৌলুসপূর্ণ রাজপ্রাসাদের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। রাষ্ট্র ও রাজত্বের কোন কিছুতেই তার সামান্য ভূমিকা রইল না। এ কারণেই খলীফা হিশামের অবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে প্রচুর বৈপরিত্য পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনামতে তিনি নিজেকে ইবাদত ও জ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন রাখতেন এবং অভাবী ও দরিদ্রদের প্রচুর দান-খয়রাত করতেন।[৪২৬] বিপরীতে অন্য কিছু বর্ণনার ভাষ্যমতে তিনি খেল-তামাশায় লিপ্ত থাকতেন, সর্বদা বাঁদীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন এবং তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয় কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন।[৪২৭] আবার কতক ঐতিহাসিকের মতে তিনি অত্যন্ত মেধাবী, প্রজ্ঞাবান ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ছিলেন।[৪২৮] তবে ক্ষমতার রাজনীতিতে তিনি অসহায় ও পরাস্ত ছিলেন এবং তার হাতে এমন কোন ক্ষমতা ছিল না, যার মাধ্যমে তিনি প্রশাসনিক বিষয়ে হাজিব আলমানসুরের ওপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে নিজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

ক্ষমতা সুসংহত করার প্রস্তুতিমূলক এসব ধাপ সমাপ্ত করার পর নতুন যুগের সূচনালগ্নে ৩৮১ হিজরীতে আলমানসুর বিন আবু আমির এমন এক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন, আন্দালুসের ইতিহাসে বরং সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে যার অতীত দৃষ্টান্ত নেই। জীবদ্দশায়ই তিনি তার মৃত্যুর পর হাজিব পদের জন্য নিজ পুত্র আবদুল মালিক বিন আলমানসুরের নামে আগাম বাইআত গ্রহণ করলেন। ইতঃপূর্বে কেবল খেলাফতের জন্যই আগাম প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ও ভবিষ্যৎ খলীফার নামে বাইআত গ্রহণের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং তা কেবল খলীফার পক্ষ থেকেই হত। এরও পাঁচ বছর পর ৩৮৬ হিজরীতে হাজিব আলমানসুর নিজের জন্য 'আলমালিকুল কারীম' উপাধি পছন্দ করলেন।[৪২৯]

---

[৪২৬] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৫৩।

[৪২৭] ইবনে সাঈদ মাগরিবী, *আলমুগরিব ফী হুলাল মাগরিব*, ১/১৯৪-১৯৫।

[৪২৮] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৪/৩৭৩।

[৪২৯] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৯৩-২৯৪।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
হাজিব ইবনে আবু আমির আলমানসুরের রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রাম

মুহাম্মাদ বিন আবু আমির শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন ৩৬৬ হিজরীতে আর তার ক্ষমতা বহাল ছিল তার মৃত্যু অবধি অর্থাৎ ৩৯২ হিজরী পর্যন্ত (৯৭৬-১০০২ খৃস্টাব্দ)। এ পুরো সময়কালে তিনি উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোতে অবিচ্ছিন্ন বিজয়াভিযান পরিচালনা করেছেন; সুদক্ষ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে আন্দালুসের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। এ কারণেই তার শাসনামলে আন্দালুস পৌঁছেছিল গৌরব ও মর্যাদার শীর্ষতম আসনে।[৪০০]

আপন শাসনামলে ইসলাম ও ইসলামী ভূখণ্ডের জন্য ইবনে আবু আমির যে মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তাকে আমরা এভাবে বিন্যস্ত করতে পারি।

এক. রণাঙ্গনের সংগ্রামী সৈনিক

মুহাম্মাদ বিন আবু আমির মোট চুয়ান্নটি যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন; কিন্তু এর একটিতেও কোন মুহূর্তেই পরাজয়ের সম্মুখীন হননি! এর চেয়েও বিস্ময়ের বিষয় এই ছিল যে, তিনি এসব বিজয়াভিযানে লিওন ও অন্যান্য খৃস্টান রাষ্ট্রের এমন সব স্থানেও পৌঁছে গিয়েছিলেন, যেখানে ইতঃপূর্বে অন্য কোন মুসলিম শাসক এমনকি মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদের ন্যায় প্রথম যুগের বিজেতাগণও পৌঁছতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ হাজিব আলমানসুর সেই সাখরা অঞ্চলেও পৌঁছেছিলেন, যা ইতঃপূর্বে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক বিজিত হয়নি।

তিনি বিভিন্ন অভিযানে খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর কেন্দ্রে প্রবেশ করে যুদ্ধ করেছেন। এভাবে তিনি উত্তরে বিস্কে উপসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। তার এসব অভিযানের কোনটিতেই মুসলিম

---

[৪০০] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/৩০১, ইবনে খালদুন, *তারীখে ইবনে খালদুন*, ৪/১৪৮ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩৯৮।

Scanned with CamScanner

বাহিনীর পতাকা অবনমিত হয়নি, কোন বাহিনী পরাজয়ের মুখ দেখেনি, মুসলিম বাহিনীর কোন অংশ ধ্বংসও হয়নি।[৪৩১]

হাজিব আলমানসুরের আমলের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম আন্দালুসে কেবল গ্রীষ্মকালে যুদ্ধাভিযানে বের হওয়ার রীতি ও প্রচলন ছিল। কিন্তু হাজিব আলমানসুর প্রতিবছর দু'বার বিজয়াভিযানের উদ্দেশ্যে বের হতেন। তার সময়ে এ অভিযানদ্বয় গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন অভিযান নামে খ্যাত ছিল। তার পরিচালিত অভিযানগুলোর মধ্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ছিল শান্ত ইয়াকুবের যুদ্ধ। তৎকালে সেন্ট ইয়াকুবকে আরবীতে শান্ত ইয়াকুব উচ্চারণ করা হত। এর অর্থ হল সাধু ইয়াকুব। এ নগরীটি আইবেরিয়ান উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত ছিল। সমকালীন মুসলিম আন্দালুস হতে দূরত্বের বিবেচনায় অত্যন্ত দূরবর্তী হওয়ার পাশাপাশি এ অঞ্চল ছিল অত্যন্ত দুর্গম। এ কারণে আলমানসুরের শাসনামলের পূর্বে কোন মুসলিম বাহিনী এ অঞ্চলে পৌছতে পারেনি। অধিকন্তু সুনির্দিষ্টভাবে সেন্ট ইয়াকুব অঞ্চলটি সমকালীন খৃস্টান জাতির কাছে অত্যন্ত পবিত্র নগরী হিসেবে বিবেচিত ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খৃস্টানরা এ শহরে সফর করত এই মহান সাধক পুরুষের সমাধি দর্শনের উদ্দেশ্যে। ইবনে আ'যারী লিখেছেন,

> সেন্ট ইয়াকুব আন্দালুস ও তৎসংলগ্ন সুবিশাল খৃস্টান অঞ্চলের খৃস্টানদের কাছে সবচে' দর্শনীয় ও পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত ছিল। মুসলিম জাতি পবিত্র কাবাঘরকে যেমন মর্যাদা ও ভক্তির চোখে দেখে থাকে, তারাও এখানকার গির্জাকে তেমনি যথেষ্ট মর্যাদার চোখে দেখত। এ গির্জার নামে তারা শপথ করত, রোম ও তার চেয়েও দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ গির্জার উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করত।[৪৩২]

ইবনে আবু আমির যখনই উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর রাজধানীতে আক্রমণ করতেন, খৃস্টান রাজন্যবর্গ এই দুর্গম অঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করত। এ কারণে ইবনে আবু আমির এ শহরে অভিযান পরিচালনা করে নগরপ্রাচীর ও দুর্গ ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এসব খৃস্টান রাজন্যবর্গকে এ কথা জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, পুরো (আইবেরিয়ান) উপদ্বীপে এমন কোন জায়গা নেই, ইবনে আবু আমিরের মুসলিম বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে যেখানে তারা আশ্রয় নিতে পারে।

---

[৪৩১] বিস্তারিত জানতে : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৯৪, ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪১৩।

[৪৩২] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৯৪।

Scanned with CamScanner

এ প্রাচীন নগরীটির ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়, যে সাধু পুরুষের সমাধিকে কেন্দ্র করে নগরীটির পত্তন হয়েছিল, সেই সেন্ট ইয়াকুব ছিলেন নবী হযরত ঈসা বিন মরিয়ম আ.-এর প্রসিদ্ধ বার শিষ্যের একজন। তিনি হযরত ঈসা আ.-এর অত্যন্ত নিকটভাজন ছিলেন; এমনকি সবসময় ঈসা আ.-এর সঙ্গে থাকার কারণে মানুষ তাকে ঈসা আ.-এর ভাই অর্থাৎ তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে প্রভু যিশুখৃস্টের ভাই বলে সম্বোধন করত। (প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদের এসব বিকৃত আকীদা-বিশ্বাস এবং কথিত সম্পর্ক-সম্বন্ধ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র)। খৃস্টানদের একদলের ধারণা, তিনি ছুতার ইউসুফের (সেন্ট জোসেফ/Saint Joseph) পুত্র ছিলেন। খৃস্টীয় রূপকথা মতে, এখানে সমাধিস্থ ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাসের যাজক ছিলেন। তিনি তার মতাদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে পৃথিবীর দেশে দেশে ভ্রমণ করেন এবং শেষে এই দূরবর্তী অঞ্চলে এসে পৌছেন। এরপর তিনি পুনরায় শামে ফিরে যান এবং সেখানেই নিহত হন। যেহেতু এ অঞ্চল ছিল তার ধর্মপ্রচার অভিযানের সর্বশেষ এলাকা, তাই তার মৃত্যুর পর অনুচরবৃন্দ তার দেহাবশেষ এখানে এনে সমাধিস্থ করেন।

৩৭৮ হিজরীর গ্রীষ্মকালীন অভিযানের সময় ইবনে আবু আমির তার সেনাবাহিনী নিয়ে উত্তরে সেন্ট ইয়াকুবের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। এটি ছিল খৃস্টান আন্দালুসে তার আটচল্লিশতম অভিযান। একই সময় এ অভিযানের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতি গ্রহণকারী আন্দালুস নৌবাহিনী আন্দালুসের পশ্চিমাঞ্চলের (বর্তমান পর্তুগালের বিখ্যাত কৃষি অঞ্চল) কাস্‌রে আবি দানিস (Alcácer do Sal) এলাকা থেকে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে খৃস্টান আন্দালুসের বিভিন্ন নগরীর গভর্নরগণ ইবনে আবু আমিরের সঙ্গে কৃত সন্ধিচুক্তির শর্তের ভিত্তিতে তার সঙ্গে যোগ দিল।

ইবনে আবু আমির পাহাড়ী দুর্গম ও বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে সেন্ট ইয়াকুবের লক্ষ্যে অগ্রসর হলেন। পথে তিনি প্রতিটি দুর্গ ও শহর জয় করলেন এবং প্রচুর যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করলেন। অবশেষে সেন্ট ইয়াকুবে পৌছার পর তিনি দেখতে পেলেন পুরো নগরী জনশূন্য; কেবল একজন সন্ন্যাসী সাধু ইয়াকুবের সমাধির পাশে বসে আছে। সবাই পালিয়ে যাওয়ার পরও তার একাকী রয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বলল, আমি ইয়াকুবকে সঙ্গ দিচ্ছি। আলমানসুর তার বাহিনীকে এ ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে বললেন এবং তার কোন ক্ষতি করতে নিষেধ করলেন। তিনি এ নগরীর দুর্গ,

Scanned with CamScanner

নগরপ্রাচীরগুলো ধ্বংস করে ফেলতে বললেন; কিন্তু সাধু ইয়াকুবের সমাধির কোন ক্ষতি করতে নিষেধ করলেন। অভিযান অব্যাহত রেখে তিনি আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত পৌঁছলেন; কিন্তু খৃস্টান নৃপতিদের কেউ-ই তার প্রতিরোধে অগ্রসর হল না।

অভিযান সমাপ্ত করে ফেরার পূর্বে ইবনে আবু আমির অভিযানে অংশগ্রহণকারী খৃস্টান গভর্নরদের প্রচুর অর্থ-সম্পদ ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করলেন এবং আন্দালুসের মুসলমানদের উদ্দেশে বিজয়ের সুসংবাদ-বার্তা প্রেরণ করার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।[৪০৩]

আলমানসুরের সৈনিকজীবনের উজ্জ্বল কিছু খণ্ডচিত্র

ক. অপহৃত তিন মুসলিম নারীকে উদ্ধারে বিশাল বাহিনী প্রেরণ

হাজিব আলমানসুরের সামরিক জীবনের বর্ণনায় পাওয়া যায়, একবার তিনি অপহৃত তিন মুসলিম নারীকে উদ্ধারের জন্য পূর্ণ একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। অপহৃত তিন নারী নাফার রাষ্ট্রে বন্দী ছিল। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হল, তৎকালীন নাফার-নৃপতি এ মর্মে আলমানসুরের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন যে, তিনি নিয়মিত ইবনে আবু আমিরকে জিযিয়া প্রদান করবেন। চুক্তিতে এ কথাও উল্লেখ ছিল যে, নাফার রাষ্ট্র কখনো কোন মুসলমানকে বন্দী করবে না বা আটকে রাখবে না। একবার হাজিব আলমানসুরের জনৈক দূত নাফার সফর করেন। নাফারের রাজার কাছে আলমানসুরের বার্তা পৌঁছিয়ে দেওয়ার পর নাফার-প্রশাসন মুসলিম দূতের জন্য নাফারের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণের ব্যবস্থা করে। এই রাজকীয় ভ্রমণ চলাকালেই মুসলিম দূত খৃস্টানদের একটি গির্জায় তিনজন মুসলিম নারীকে দেখতে পান। তিনি তাদেরকে সেখানে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত অবাক হন এবং তাদের সেখানে অবস্থানের কারণ জানতে চান। তারা তাকে জানায় যে, তাদেরকে এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

আলমানসুরের দূত এ কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং দ্রুত দেশে ফিরে এসে আলমানসুরকে বিষয়টি অবহিত করেন। আলমানসুর বন্দী তিন

---

[৪০৩] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৯৪।

Scanned with CamScanner

মুসলিম নারীকে উদ্ধারের জন্য তৎক্ষণাৎ বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করেন। নাফারের দ্বারপ্রান্তে যুদ্ধসাজে মুসলিম বাহিনীকে দেখে নাফার-নৃপতি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, আমরা তো বুঝতেই পারছি না, আপনারা কেন এসেছেন? আপনাদের সঙ্গে তো আমাদের এ চুক্তি আছে যে, আমরা পরস্পর যুদ্ধ করব না এবং আমরা আপনাদের জিযিয়া প্রদান করব। আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ মুসলিম সৈনিকগণ উত্তর দেয়, তোমরা তো চুক্তি ভঙ্গ করেছ এবং তোমাদের দেশে তিনজন মুসলিম নারীকে আটকে রেখেছ। তখন খৃস্টান নেতৃবৃন্দ জানায় যে, তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। মুসলিম দূত গির্জায় গিয়ে অপহৃত তিন নারীকে বের করে নিয়ে আসেন। তখন নাফারের নৃপতি বলেন যে, আমরা এ নারীদের সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আমাদের জনৈক সৈন্য তাদেরকে আটকে রেখেছিল। ইতোমধ্যে তাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এরপর নাফার-নৃপতি আলমানসুরের কাছে বার্তা পাঠিয়ে বারবার ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং জানান যে, সেই গির্জাটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এরপর উদ্ধারকৃত তিন মুসলিম নারীকে নিয়ে মুসলিম বাহিনী কর্ডোভায় ফিরে আসে।[৪৩৪]

খ. অভিযান শেষে ফেরার পথে খৃস্টানদের পথরোধ এবং আলমানসুরের অভিনব কৌশল

হাজিব আলমানসুরের যুদ্ধ ইতিহাসে আরও উল্লেখ আছে যে, একবার উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রে অভিযান চলাকালে তিনি দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ একটি উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন। মুসলিম বাহিনীর অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে খৃস্টানরা সেখানে একটি বড় ফাঁদ পেতে রেখেছিল। তারা ইবনে আবু আমিরকে পুরো বাহিনীসহ গিরিপথ পার হওয়ার সুযোগ দিল। অভিযান শেষে আলমানসুর যখন প্রত্যাবর্তনের মনস্থ করলেন, খৃস্টান সৈনিকরা সংকীর্ণ গিরিপথটি পুরো বন্ধ করে দিল। গিরিপথের নিকটে পৌঁছে আলমানসুর দেখতে পেলেন, ফেরার পথ বন্ধ!

এ অবস্থা দেখে হাজিব আলমানসুর পুনরায় উত্তরে ফিরে গেলেন এবং খৃস্টানদের একটি শহর দখল করলেন। এরপর শহরের অধিবাসীদের বের

---

[৪৩৪] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৯৭ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪০৩।

Scanned with CamScanner

করে দিয়ে সেখানেই শিবির স্থাপন করলেন এবং শহরের ঘর-বাড়িগুলো তার সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। তিনি সেখানে মুসলিম বাহিনীর নিরাপত্তাব্যবস্থা সুদৃঢ় করলেন এবং দীর্ঘদিন সেখানেই অবস্থান করলেন। এরপর উক্ত শহরকেই সেনানিবাস বানিয়ে সেখান থেকে তিনি সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে লাগলেন। তার নির্দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন সৈন্যদল খৃস্টান রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে হামলা চালাতে লাগল এবং প্রচুর গনীমত লাভ করল। এসব অভিযানে প্রতিপক্ষের যেসব যোদ্ধা নিহত হত, হাজিব আলমানসুরের নির্দেশে মুসলিম বাহিনী তাদের লাশ নিয়ে সেই গিরিপথে নিক্ষেপ করত, যা দখল করে খৃস্টানরা তাদের প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ করে রেখেছিল!

খৃস্টানদের অবস্থা তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি! বিক্ষুব্ধ খৃস্টান জনগণ তাদের নেতাদের কাছে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর জন্য পথ খুলে দেওয়ার আবেদন করল, যেন মুসলিম বাহিনী নিজ দেশে ফিরে যায়; অথবা খৃস্টান নেতৃবৃন্দ যেন এই লোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য অন্য কোন পন্থা বের করে। খৃস্টান নেতৃবৃন্দও পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে হাজিব আলমানসুরের কাছে আবেদন জানাল, তিনি যেন দয়া করে যে পথে এসেছিলেন, সে পথেই দেশে ফিরে যান; খৃস্টানরা এখন সসম্মানে মুসলিম বাহিনীকে পথ করে দেবে। কিন্তু আলমানসুর তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বিদ্রূপ করে তাদেরকে উত্তর দিলেন, আমি তো প্রতিবছর দু'বার গ্রীষ্মে ও শীতে তোমাদের দেশে আসতাম। এবার ইচ্ছা করেছি, পরবর্তী অভিযানের নির্ধারিত সময় আসা পর্যন্ত বছরের বাকি সময়টুকু এখানেই কাটিয়ে দেব এবং কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় ফিরে আসার পরিবর্তে এখানেই অবস্থান করে এ ঘাঁটি থেকেই গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন উভয় অভিযান পরিচালনা করব।

খৃস্টান নেতৃবৃন্দের তখন পায়ে পড়া বাকি! তারা বারবার তাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করল এবং প্রথমে এ শর্তে সন্ধিচুক্তি করার প্রস্তাব দিল যে, তিনি সঙ্গে থাকা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ রেখে নিরাপদে চলে যাবেন। আলমানসুর উত্তর পাঠালেন, নাহ! আমি এখানেই থেকে যাওয়ার মনস্থ করেছি! এবার তারা গনীমত-সম্পদ নিয়ে যাওয়ার শর্তেই সন্ধির প্রস্তাব দিল; কিন্তু আলমানসুর তবুও তাদের প্রস্তাবে সাড়া দিলেন না। নিরুপায় হয়ে খৃস্টানরা প্রস্তাব দিল, গনীমত সম্পদ দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবহনব্যয় ও বাহনের ব্যবস্থা

Scanned with CamScanner

তারাই করে দেবে। তারপরও যেন দয়া করে তিনি দেশে ফিরে যান। যথেষ্ট হয়েছে ভেবে আলমানসুর এবার তাদের সন্ধি প্রস্তাবে সাড়া দিলেন আর খৃস্টানরা তার জন্য গিরিপথ উন্মুক্ত করে দিল।[৪৩৫]

গ. কবরে সঙ্গে দেওয়ার জন্য রণাঙ্গনে ব্যবহৃত কাপড়ে লেগে থাকা ধুলো-বালি সংরক্ষণ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ»

আল্লাহর পথের ধুলো ও জাহান্নামের আগুন একত্রিত হবে না।[৪৩৬]

এ হাদীসের অনুসরণার্থে হাজিব আলমানসুরের অভ্যাস ছিল, প্রতিটি যুদ্ধাভিযান থেকে ফিরে আসার পর তিনি পরনের পোশাক ঝেড়ে নিতেন এবং যে ধুলো-বালি বের হত, তা একটি বোতলে রেখে নিতেন। জীবনসায়াহ্নে তিনি অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে যেন এ বোতলটিও দাফন করা হয়; যেন এ ধুলোকণাগুলো কিয়ামতের কঠিন দিবসে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার অবদানের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে।[৪৩৭]

হাজিব আলমানসুরের অন্যতম সমরনীতি ও সামরিক বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি সবসময় প্রথমে আক্রমণ করতেন এবং প্রতিপক্ষের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র-প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই শেষ করে দিতে সচেষ্ট থাকতেন। তিনি কখনোই তার পূর্বসূরিদের মতো প্রতিপক্ষের আক্রমণের অপেক্ষায় থেকে প্রতিরক্ষার চিন্তা করতেন না।[৪৩৮]

দুই. নাগরিক উন্নয়নের অনন্য রূপকার

হাজিব আলমানসুরের শাসনামলের আরেকটি উজ্জ্বলতম দিক হল তিনি আন্দালুসের বস্তুগত উন্নতি ও নাগরিক সভ্যতার অগ্রযাত্রায়ও যথেষ্ট

---

[৪৩৫] ইবনুল আছীর, *আলকামিল ফিত তারীখ*, ৭/৩৬৯।

[৪৩৬] *জামে' তিরমিযী*, হাদীস নং ১৬৩৩, *সুনানে নাসায়ী*, হাদীস নং ৪৩১৬ ও *সুনানে ইবনে মাজা*, হাদীস নং ২৭৭৪।

[৪৩৭] দেখুন : যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৭/১৬ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪০৯।

[৪৩৮] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/৫৪০।

Scanned with CamScanner

গুরুত্বারোপ করেছিলেন। পূর্বেও উল্লেখ করেছি, তিনি মদীনাতুয যাহিরা নামে নতুন ও আধুনিকতম একটি শহরের পত্তন করেছিলেন। এছাড়াও তিনি কর্ডোভা মসজিদের আয়তন যথেষ্ট সম্প্রসারিত করেন এবং মূল আয়তনের প্রায় দ্বিগুণ অংশ মসজিদে যোগ করেন। মসজিদসংলগ্ন এ ভূমিগুলোতে যারা বসবাস করত, তাদের দাবিকৃত মূল্য প্রদান করে তাদের সন্তুষ্টচিত্তে তিনি তা ক্রয় করেছিলেন।[৪৩৯]

ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ আছে, মসজিদের সন্নিকটেই ছিল এক মহিলার বাড়ি। তার বাড়িতে একটি খেজুর গাছ ছিল। ভদ্র মহিলা কেবল এ শর্তেই তার বাড়িটি বিক্রি করতে সম্মত হলেন যে, বিনিময়ে তাকে এমনই খেজুর-বৃক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়ি প্রদান করতে হবে। আলমানসুর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলেন বাইতুল মাল হতে যত অর্থ খরচ হোক, মহিলাটিকে যেন তার চাহিদামতো খেজুর গাছ-বিশিষ্ট একটি বাড়ি কিনে দেওয়া হয়। ব্যবস্থা হওয়ার পর তিনি বাড়িটিকে মসজিদ-সীমার অন্তর্ভুক্ত করে নেন।[৪৪০]

আলমানসুর কর্ডোভা মসজিদের পরিসর ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন। ফলে কর্ডোভা মসজিদ পরিণত হয়েছিল সমকালীন বিশ্বের সবচে' বড় মসজিদ বরং সবচে' বড় উপাসনালয়ে। কর্ডোভার ঐতিহাসিক মসজিদ স্পেনের বুকে আজও দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু 'মসজিদ' পরিচয়ে নয় এবং মুমিনের সিজদাচিহ্নকে ধারণ করে নয়। মুসলিম আন্দালুসের পতনের পর মসজিদটিকে গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়।

এর পাশাপাশি আলমানসুরের শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প ও উৎপাদনখাতসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। শান্তি ও সমৃদ্ধি ব্যাপক হয়েছিল, রাষ্ট্রীয় কোষাগার অর্থ-সম্পদে ভরপুর ছিল। হাকাম বিন আবদুর রহমান আননাসির ও আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলের মতো আলমানসুরের শাসনামলেও পুরো মুসলিম আন্দালুসে কোন দরিদ্র খুঁজে পাওয়া যেত না।

এমনকি আলমানসুর খৃস্টান আন্দালুসের যেসব অঞ্চল জয় করেছিলেন, সেগুলোর পুনঃগঠন ও আবাদকরণেও যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। ফলে পুরো আইবেরিয়ান উপদ্বীপ পরস্পর সংযুক্ত আবাদ অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল; পরিণত হয়েছিল উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ, শ্যামল ও মনোরম আবাসভূমিতে।[৪৪১]

---

[৪৩৯] দেখুন : ইবনে আ'ষারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৮৭।

[৪৪০] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৫৪৬।

[৪৪১] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৮১।

Scanned with CamScanner

তিন. বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলামুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার সফল নির্মাতা

হাজিব আলমানসুরের শাসনামলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল ৩৬৬ হিজরী হতে ৩৯২ হিজরী (৯৭৬-১০০২ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত ছাব্বিশ বছরের দীর্ঘ শাসনামলে তার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা সংঘটিত হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম হল তার ও গালিব আননাসিরীর মধ্যকার সংঘাত, যার আলোচনা আমরা পূর্বেই করে এসেছি। অথচ তার শাসনামল সময়ের পরিধি বিবেচনায় যেমন দীর্ঘতর ছিল, তেমনই শাসনক্ষেত্রও ছিল সুবিশাল, সুবিস্তৃত এবং বিভিন্নমুখী রুচি ও বৈশিষ্ট্যের মানুষে পরিপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে আলমানসুর ছিলেন অত্যন্ত উন্নত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন শাসক। দক্ষ ও সুশৃঙ্খল নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রেখেছিলেন। পাশাপাশি তিনি ছিলেন প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও ন্যায়বান। প্রজাদের সঙ্গে সদাচরণ সংক্রান্ত তার একটি ঘটনার বিবরণ কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থে এভাবে এসেছে যে, একদিন গ্রাম্য সহজ-সরল জনৈক ব্যক্তি তার দরবারে বিচারপ্রার্থী হয়ে এল। সে অভিযোগ করল, তার একটি মামলায় রাষ্ট্রীয় বিচারক ন্যায়বিচার করেননি। অভিযোগ শোনামাত্র আলমানসুর বিচারককে তলব করে এ মামলার তথ্যাদি উপস্থিত করতে বললেন এবং বিচারপ্রার্থীর সুবিচার না পাওয়ার কারণ দর্শাতে বললেন। বিচারক জানালেন, তার অভিযোগপত্রটি আমার কাছে নয়; বরং ওয়াসিত বা সচিবের (আমাদের বর্তমান সময়ের উপপ্রধানমন্ত্রীর সমমানসম্পন্ন) কাছে আছে। হাজিব আলমানসুর তৎক্ষণাৎ সচিবকে ডেকে পাঠালেন এবং উপস্থিত হওয়ামাত্র তাকে বললেন, তুমি তোমার পোশাক (সংশ্লিষ্ট পদের বিশেষ প্রশাসনিক ইউনিফরম) খুলে রাখ এবং তরবারিও রেখে দাও; তারপর এই গ্রাম্য ব্যক্তিটির মতো বিচারকের সামনে বস। তারপর তিনি বিচারককে বললেন, এখন উভয়ের বিচারকাজ সম্পাদন করুন। তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক ফয়সালা করলেন যে, এ মামলায় গ্রাম্য ব্যক্তিটির দাবি সত্য এবং তার বিরুদ্ধে ইতঃপূর্বে যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছিল, তা সচিবের ওপর বর্তাবে। আলমানসুর বিচারপ্রার্থী লোকটির প্রাপ্য পূরণ করলেন, এরপর সচিবের জন্য বিচারক যে শাস্তি নির্ধারণ করেছিলেন, তার কয়েক গুণ বেশি শাস্তি প্রদান করলেন। বিচারক অবাক হয়ে বললেন, জনাব! আমি তো এত অধিক শাস্তির ফয়সালা করিনি। আলমানসুর উত্তর দিলেন, সে আমার কাছের লোক হওয়ায় এরূপ অন্যায় আচরণ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। আমি তার শাস্তির পরিমাণ বাড়িয়ে তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, আমার নৈকট্য তাকে প্রজাদের ওপর জুলুম করার অনুমতি দেয়নি।[৪৪২]

---

[৪৪২] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৮৯।

Scanned with CamScanner

আলমানসুরের আমলে আন্দালুসের

খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিস্থিতি

১. ক্যাস্টোলা

হাকাম আলমুসতানসিরের মৃত্যুর পর মুসলমানগণ নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ফলে অভ্যাসবশত খৃস্টানরা ভেবেছিল, হাকামের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করার এবং পুনরায় মুসলিম রাষ্ট্রে আক্রমণ করার সুযোগ এসে গেছে। এই ভেবে ক্যাস্টোলার খৃস্টান বাহিনী ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর হামলা চালায় এবং আন্দালুসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ইবনে আবু আমির তাদের প্রতিরোধ করার এবং উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার মনস্থ করেন। তিনি ৩৬৬ হিজরীর শুরুর দিকে (৯৭৭ খৃস্টাব্দে) ক্যাস্টোলায় হামলা করেন। পরের বছর পুনরায় তিনি ক্যাস্টোলার অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সালামানকা নগরী দখল করে নেন। এ অভিযানের মাধ্যমেই ইবনে আবু আমিরের উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রমুখী ঐতিহাসিক 'ধারাবাহিক যুদ্ধাভিযান'-এর সূচনা হয়, যা তার মৃত্যু অবধি অব্যাহত ছিল।

২. লিওন

লিওনের নৃপতি তৃতীয় রোমেরো আলমানসুরের বিরুদ্ধে সেনাপতি গালিব আননাসিরীর বিদ্রোহের সময় তাকে নিজ বাহিনীর কিছু সৈন্য দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। হাজিব আলমানসুর এর জবাব দেওয়ার মনস্থ করেন এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। সংবাদ পেয়ে লিওন-নৃপতি রোমেরো ক্যাস্টোলার প্রশাসক গার্সিয়া ফার্নান্দেজ ও নাফারের নৃপতি স্যাঞ্চো গার্সিয়ার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলায় প্রস্তুত হন। ৩৭১ হিজরীতে (৯৮১ খৃস্টাব্দে) সেন্ট ম্যানকিলে সংঘটিত যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী খৃস্টানদের সম্মিলিত বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।

এ যুদ্ধে তৃতীয় রোমেরো পরাজিত হওয়ার পর লিওন সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দাবি তোলে যে, রোমেরো রাষ্ট্রশাসনের উপযুক্ত নন। তারা তাকে অপসারণ করে তার স্থলে তার চাচাতো ভাই বার্মোডোকে (Bermudo) ক্ষমতায় বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু রোমেরো তাদের এ সিদ্ধান্তকে

Scanned with CamScanner

প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার সমর্থক ও অনুসারীদের নিয়ে চাচাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রোমেরো পালিয়ে আস্তরিয়াসে (Astorga) আশ্রয় নেন।

পরবর্তীতে রোমেরো আলমানসুরের কাছে আশ্রয় নেওয়ার এবং তার সাহায্য নিয়ে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তাকদীরের ফয়সালা ছিল ভিন্ন। কিছুদিন পরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফলে লিওনের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি চলে যায় বার্মোডোর হাতে।

কিন্তু বার্মোডো নিজেও নিশ্চিন্তে রাষ্ট্রশাসন করতে পারেননি। বিশেষত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকে তার শাসনের বিরোধিতা শুরু করায় তিনি আশঙ্কা করেন যে, হয়তো তার সঙ্গেও তার চাচাতো ভাইয়ের মতো একই আচরণ করা হয়ে। এ আশঙ্কায় তিনি হাজিব আলমানসুরের কাছে সাহায্য ও সমর্থন চান এবং বিনিময়ে আলমানসুরের আনুগত্য মেনে নেওয়ার এবং নিয়মিত জিযিয়া প্রদানের অঙ্গীকার করেন। আলমানসুর বার্মোডোর আবেদন গ্রহণ করেন এবং তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য তার রাষ্ট্রের রাজধানী লিওন নগরীতে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। বস্তুত এ চুক্তির মাধ্যমে লিওন রাষ্ট্র মুসলিম আন্দালুসের করদ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

কিন্তু এত সুখ বুঝি বার্মোডোর সহ্য হল না। সিংহাসনের ওপর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হতেই তিনি মুসলমানদের সঙ্গে প্রতারণা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ইবনে আবু আমিরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। তিনি লিওনে অবস্থানরত মুসলিম সৈন্যদের গ্যারিসনে হামলা চালান এবং রাজধানী লিওন নগরীর নিয়ন্ত্রণ তাদের হাত থেকে নিজের কাছে নিয়ে নেন। সংবাদ পেয়ে আলমানসুর লিওন নগরীতে হামলা চালিয়ে খৃস্টান বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেন।

এরপর আলমানসুর নিয়মিত লিওন সাম্রাজ্যে অভিযান চালান এবং প্রতিবার বার্মোডোকে পরাজিত করেন। বিধ্বস্ত-পরাজিত বার্মোডো কূল-কিনারা না পেয়ে ৯৯৫ খৃস্টাব্দে আলমানসুরের কাছে পুনরায় সন্ধির আবেদন জানান এবং তার আনুগত্য স্বীকার করে নেন।

বার্মোডো এরপর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। ৯৯৯ খৃস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। লিওন রাষ্ট্রের সিংহাসনে তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র পঞ্চম আলফোন্সো। কিন্তু আলফোন্সো বয়সে অনুপযুক্ত হওয়ায় শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে লিওনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য হতে কাউন্ট মেনেন্ডিজ গঞ্জালেসকে (Count Menéndez González) কিশোর শাসকের তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ করা হয়।

Scanned with CamScanner

৩. নাফার

নাফার রাষ্ট্রের নৃপতি গার্সিয়া সানচেজের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় স্যাঞ্চো গার্সিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তার আমলে নাফারের আয়তন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। মূল নাফার প্রদেশ ছাড়াও ক্যান্টবেরি, সোব্রেবি ও রিবা জর্জিয়াসহ বিভিন্ন প্রদেশ নাফারের অধিভুক্ত হয়েছিল। এ সময় নাফার রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক অবস্থাও অন্যান্য সময়ের চেয়ে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল।

এসব কারণে স্যাঞ্চো গার্সিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই মুসলিম আন্দালুসের বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালাতে শুরু করেন। নাফার-নৃপতির এই আগ্রাসনের সংবাদ পেয়ে হাজিব আলমানসুরের প্রতিক্রিয়া ছিল ততোধিক আগ্রাসী। তিনি নাফার রাষ্ট্রে একের পর এক অভিযান পরিচালনা করেন এবং ৯৮৭ খৃস্টাব্দে দেশটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে রাজধানী বানাবলুনা পর্যন্ত পৌঁছে যান।

স্যাঞ্চোর মৃত্যুর পর তার পুত্র তৃতীয় গার্সিয়া সানচেজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তৃতীয় গার্সিয়ার শাসনামলে আলমানসুর ৯৯৯ খৃস্টাব্দে আরও একবার নাফার রাষ্ট্রে অভিযান চালান। এর একবছর পরই মাত্র পাঁচ বছর শাসন পরিচালনা করার পর তৃতীয় গার্সিয়া সানচেজ মারা যান এবং তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র তৃতীয় স্যাঞ্চো, যিনি মহান স্যাঞ্চো (Sancho the Great) নামে সমধিক পরিচিত।[৪৮৩]

এককথায় আলমানসুরের অব্যাহত সামরিক তৎপরতার কারণে তার শাসনামলে আন্দালুসের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক, দুর্বল ও ভঙ্গুর।

---

[৪৮৩] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/৫৯৮।

Scanned with CamScanner

সপ্তম পরিচ্ছেদ
(আন্দালুস-ইতিহাসের সমৃদ্ধতম যুগ)
হাজিব মুযাফফার বিন আলমানসুর

আলমানসুর বিন আবু আমির যখন মৃত্যুবরণ করেন, মুসলিম আন্দালুস তখন মর্যাদা ও প্রতিপত্তিতে আন্দালুস ইতিহাসের শীর্ষতম চূড়ায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সামরিক শক্তি ও প্রভাবের দিক থেকে আন্দালুস এমন স্তরে পৌঁছেছিল, যেখানে ইতঃপূর্বে কখনোই পৌঁছতে পারেনি। পাশাপাশি একই সময় আশেপাশের শত্রুরাষ্ট্রগুলো চরম দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আন্দালুসের এ মর্যাদা কেবল বহিঃরাষ্ট্রের কাছেই ছিল এমন নয়; বরং দেশের অভ্যন্তরেও পরিস্থিতি ছিল শান্ত ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ। উমাইয়া খলীফা হিশাম আলমুআইয়াদ বিল্লাহ দুর্বল প্রকৃতির শাসক ছিলেন। কর্ডোভা প্রশাসনে তখন একচ্ছত্র আধিপত্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল আমিরিয়াদের। তারপরও দেখা গেল, আলমানসুরের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্র অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটার পূর্বেই হাজিব পদের দায়িত্ব বুঝে নিতে আলমানসুর-পুত্র আবদুল মালিক দ্রুত কর্ডোভায় খলীফা হিশামের কাছে ছুটে এলেন। অথচ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, ইতঃপূর্বে তার পিতা আলমানসুর তার অবর্তমানে পুত্র আবদুল মালিকের হাজিব পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্পাদন করে গিয়েছিলেন। ৩৯২ হিজরীর ২৬ রমযান সোমবার আবদুল মালিকের হাজিব পদে অভিষেক হয়। এরপর একটানা সাত বছর তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন এবং ৩৯৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৪৪]

দায়িত্ব গ্রহণ করার পর অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বহিঃরাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই আবদুল মালিক আপন পিতার আদর্শ অনুসরণ করে দক্ষতার সঙ্গে অগ্রসর হন। পাশাপাশি তিনি উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোতে অভিযান পরিচালনার ধারাও অব্যাহত রাখেন। ঐতিহাসিক মাক্কারী রহ. *'নাফহুত তীব'* গ্রন্থে আবদুল মালিক সম্পর্কে লিখেছেন,

---

[৪৪৪] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৩।

Scanned with CamScanner

তিনি প্রশাসন পরিচালন ও সমরনীতির ক্ষেত্রে আপন পিতার আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। তার সাত বছর মেয়াদী শাসনামলকে আনন্দ ও সুখের কাল বলে গণ্য করা হয়েছিল এবং 'সাবিউল আ'রূস[৪৫৫]'-এর সঙ্গে তুলনা করে এ সময়কালকে সাবি' নামকরণ করা হয়েছিল। উপাধি যেমন মুযাফফার, বাস্তবেও তিনি ছিলেন মুযাফফার ও সফল। তিনি ৩৯৯ হিজরীর মুহাররম মাসে ইন্তেকাল করেন। অবশ্য কতক বর্ণনামতে তার মৃত্যুসন ৩৯৮ হিজরী।[৪৫৬]

আন্দালুসের আপামর মুসলিম জনসাধারণ তার শাসনব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল এবং তারা তাকে অত্যন্ত ভালোবাসত। জনসাধারণ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। তার প্রতি জনগণের মুগ্ধতা ও হৃদ্যতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি জনগণের ওপর আরোপিত করের এক-ষষ্ঠাংশ মওকুফ করে দেন।[৪৫৭] ফলে শুরুতেই জনসাধারণের হৃদয়ে তার প্রতি প্রীতি ও প্রত্যাশা গড়ে ওঠে। তার পিতার মৃত্যুতে জনহৃদয়ে যে বেদনা সৃষ্টি হয়েছিল, তার সদাচরণ যেন তাতে সান্ত্বনার প্রলেপরূপে কাজ করেছিল।

তার প্রশাসনদক্ষতার অন্যতম কারণ হল, পিতা আলমানসুর জীবদ্দশায়ই তাতে উপযুক্ত শাসক ও সামরিক অধিনায়করূপে গড়ে তুলেছিলেন। আলমানসুর সর্বদা তার ওপর নির্ভর করতেন এবং সামরিক অভিযানে নেতৃত্বদানসহ বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব তার স্কন্ধে অর্পণ করতেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, উত্তর আন্দালুসের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর রীতি ছিল, যখনই মুসলিম আন্দালুসে কোন শাসকের মৃত্যু হত, তখনই তারা মুসলমানদের সঙ্গে কৃত চুক্তি ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করত এবং মুসলমানদের দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তশহরগুলোতে হামলা চালাত। বিশেষত প্রয়াত মুসলিম শাসক যদি প্রতাপসম্পন্ন হতেন, তাহলে তার মৃত্যুতে ঈসায়ী শক্তির এ ধরনের আস্ফালন বেশি দেখা যেত। প্রতিশোধস্পৃহা ও মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠনের লক্ষ্য তো তাদের থাকত-ই; পাশাপাশি তাদের

---

[৪৫৫] আরব দেশগুলোতে বিয়ের সাতদিন পর নববধূকে নিয়ে আয়োজিত এক ধরনের আনন্দ উৎসবকে সাবিউল আ'রূস বলা হয়। (অনুবাদক)

[৪৫৬] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪২৩।

[৪৫৭] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৩ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ৮৪।

Scanned with CamScanner

প্রচেষ্টা থাকত মুসলিম রাষ্ট্রের নতুন শাসকের অবস্থানকে দুর্বল করে তোলা এবং তাকে ক্ষমতা সুদৃঢ়করণের সুযোগ না দেওয়া।

খৃস্টানদের এই রীতি ও নীতির বাস্তবায়ন আমরা ইতঃপূর্বে আলমুসতানসিরের সময় দেখেছি, দেখেছি তার পুত্র হিশাম আলমুআইয়াদের শাসনামলেও। কিন্তু এবার আলমানসুরের মৃত্যুর পর এর ব্যত্যয় ঘটল এবং খৃস্টানশক্তি আশ্চর্য নীরবতা পালন করল। আলমানসুরের শাসনামলে অব্যাহত আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়াতেই সম্ভবত এবার তারা কোন প্রকার দুঃসাহস প্রকাশে বিরত রইল।

কিন্তু হাজিব আলমুযাফফার খৃস্টানদের এ নীরবতায় নিশ্চিত হয়ে বসে রইলেন না। কারণ, আজ হয়তো তারা নিশ্চুপ রয়েছে; আগামীকাল শক্তি সঞ্চিত হলেও যে নীরব বসে থাকবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? তাছাড়া আলমানসুরের ইন্তেকালের পর আলমুযাফফার শান্ত বসে থাকলে খৃস্টানশক্তি ভেবে নেবে যে, আলমুযাফফার হয়তো দুর্বলতা ও ভীরুতার কারণে তাদের মোকাবেলায় অগ্রসর হতে ভয় পাচ্ছেন। তাই দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরপরই হাজিব আলমুযাফফার উত্তর আন্দালুসের খৃস্টান রাষ্ট্রসমূহে অভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণ এ প্রস্তুতির সংবাদ জানতে পেরে অভিযানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে দলে দলে সমবেত হল। তাদের মাঝে সেসব এলাকার গভর্নর, প্রশাসক, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও আলিম-ফকীহসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বড় একটি জামাতও ছিল। হাজিব আলমুযাফফার সবাইকে সাদরে স্বাগত জানালেন এবং উদার হস্তে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ভাতা প্রদান করলেন। কেউ কেউ তা গ্রহণ করল, আবার কেউ কেউ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল।

হিজরী ৩৯৩ সনের ১১ শাবান রাতে হাজিব আলমুযাফফার পূর্ণ আড়ম্বরতার সঙ্গে আপন বাহিনী নিয়ে মদীনাতুয যাহিরা হতে রওয়ানা হলেন। আলমানসুরের আমলে কৃত চুক্তির ভিত্তিতে পথিমধ্যে ক্যাস্টোলা থেকে খৃস্টানদের একটি দল মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল। এরপর আলমুযাফফার বার্সেলোনা প্রদেশে পৌঁছলেন। সেখানে বার্সেলোনার খৃস্টানদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল এবং যুদ্ধে বার্সেলোনা-বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। মুসলিম বাহিনী বার্সেলোনার বেশ কয়েকটি দুর্গ দখল করে নিল এবং নিরাপত্তার জন্য হুমকি বিবেচিত হওয়ায় অন্য কিছু দুর্গ ধ্বংস করে

Scanned with CamScanner

ফেলল। এ অভিযানে মুসলিম বাহিনী প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধবন্দীর অধিকারী হল।

হাজিব আলমুযাফফার এ সময় একটি দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বিজিত অঞ্চলটি মুসলিম অধিবাসীদের দ্বারা আবাদ করার উদ্দেশ্যে তিনি তার সৈন্যদেরকে এ অঞ্চলের ঘর-বাড়ি ও আবাদী এলাকা ধ্বংস করতে নিষেধ করলেন এবং এ অঞ্চল আবাদ করার জন্য মুসলিম ভূখণ্ড থেকে মুসলমানদেরকে এখানে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিলেন। যারা এখানে বসবাস করে এ অঞ্চলে মুসলিম বসতি তৈরিতে ভূমিকা রাখবে, তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মাসিক ভাতা নির্ধারণ করা হল।

দায়িত্বগ্রহণের পর জীবনের প্রথম ঈদুল ফিতরের দিনটি হাজিব আলমুযাফফার বার্সেলোনার মাটিতে রণাঙ্গনে কাটালেন এবং অধীনস্থ কর্মকর্তা ও সৈন্যদের সঙ্গে মাতৃভূমি হতে দূরে অপরিচিত ভূমিতে ঈদ উদযাপন করলেন। এরপর তিনি বিজয়ের সুসংবাদ সম্বলিত দু'টি বার্তা প্রেরণের নির্দেশ দিলেন। একটি খলীফা হিশাম আলমুআইয়াদ বরাবর, অপরটি প্রথমে কর্ডোভায় এবং পরবর্তীতে অন্যান্য প্রদেশে মুসলিম জনসাধারণের সামনে পাঠ করার উদ্দেশ্যে।

বার্তাদু'টির বিবরণ অনুযায়ী এ অভিযানে শত্রুপক্ষের যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা ছিল ৫৫৭০ জন, যুদ্ধ করে বিজিত দুর্গের সংখ্যা ছিল ৬টি, শত্রুরা পালিয়ে ফেলে রেখে যাওয়া দুর্গের সংখ্যা ছিল ৮৫টি। এ দুর্গগুলো ধ্বংস করে ফেলা হল। বার্তাদু'টিতে সকল দুর্গের নামও উল্লেখ ছিল। এরপর আলমুযাফফার যারা স্বেচ্ছায় মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, তাদেরকে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। কেননা, যে মহান উদ্দেশ্যে তারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, তা ইতোমধ্যে পূর্ণ হয়েছে। আলমুযাফফারের এ ঘোষণার পর স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকগণ আল্লাহপ্রদত্ত বিজয়ের আনন্দে প্রফুল্লচিত্তে আপন আপন এলাকায় ফিরে গেল।[৪৪৮]

আলমুযাফফারের শাসনামলে মুসলিম আন্দালুস রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে যে সমুন্নত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণরূপেই

---

[৪৪৮] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৪।

Scanned with CamScanner

যেন পরের বছর ৩৯৪ হিজরীতে খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যকার বিবাদ নিরসনের জন্য আলমুযাফফারের দ্বারস্থ হল।[৪৪৯] তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহের অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী বিখ্যাত ফকীহ ও ঐতিহাসিক আবু মুতাররিফ বিন আ'ওনুল্লাহর সূত্রে ঐতিহাসিক ইবনে আ'যারী লিখেছেন,

> পিতা আলমানসুরের মতই আলমুযাফফারও তার শাসনামলে সমকালীন অনারবী রাজন্যবর্গের (খৃস্টান নৃপতিদের) কাছে বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। আলমুযাফফারের মর্যাদা ও মহত্ত্ব এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তার তেজোদীপ্ত ভূমিকার কারণে শত্রু-অন্তরে তার প্রভাব-ভীতি বিরাজমান ছিল। সর্বোপরি তার কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় খৃস্টান রাজন্যবর্গ আনুগত্য, বশ্যতা স্বীকার ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আলমুযাফফারকে তার পিতা আলমানসুরের মতো অত্যুচ্চ আসনেই রেখেছিল। এমনকি এসব রাষ্ট্রের নৃপতিগণ নিজেদের বিভিন্ন বিবাদ নিরসনের জন্যও তার দ্বারস্থ হত এবং তিনি যে ফয়সালা করতেন, তারা তা প্রসন্ন বদনে মেনে নিত।[৪৫০]

হাজিব আলমুযাফফারও তার পিতার ন্যায় উত্তরাঞ্চলের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোতে অভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন। ৩৯৭ হিজরীতে তার শাসনামলের পঞ্চম অভিযানে তিনি তার বাহিনী নিয়ে ক্যাস্টোলা সাম্রাজ্যের উদ্দেশে রওয়ানা হন। মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য সকল খৃস্টান রাষ্ট্র ও সামরিক শক্তি একজোট হয়ে তার বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আল্লাহ তাআ'লা মুসলিম বাহিনীকে নিরঙ্কুশ বিজয় দান করেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই আন্দালুসে সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল যে, মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো একজোট হয়েছে। ফলে মুসলিম জনগণ ইসলামী ফৌজের পরিণতি ও যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে আশঙ্কায় পড়ে গিয়েছিল। বিশেষত যুদ্ধে গমনকারী সৈনিকদের আত্মীয়স্বজনের দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী ছিল সবচে' বেশি। যুদ্ধ শেষে যখন মুসলিম বাহিনীর নিরঙ্কুশ বিজয়ের সংবাদ আন্দালুসে পৌঁছয়, তখন তারা কী পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়। এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পরই

---

[৪৪৯] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১০ ও ইবনে খালদুন, *তারীখে ইবনে খালদুন*, ৪/১৮১।

[৪৫০] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১০।

Scanned with CamScanner

আবদুল মালিক 'আলমুযাফফার বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন এবং 'হাজিব আলমুযাফফার' নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৪৫১]

৩৯৮ হিজরীতে আলমুযাফফার শীতকালীন অভিযানে বের হন। এটিই ছিল তার একমাত্র শীতকালীন অভিযান। এবারও তার লক্ষ্য ছিল ক্যাস্টোলা রাষ্ট্র। ক্যাস্টোলা বাহিনী ও মুসলিম বাহিনীর মধ্যে কয়েক দিনব্যাপী তীব্র যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।[৪৫২]

এই শীতকালীন অভিযানটি ছিল তার জীবনের শেষ অভিযানের পূর্ব অভিযান। ৩৯৮ হিজরীতেই গ্রীষ্মকালীন অভিযানে ক্যাস্টোলার উদ্দেশে বের হয়ে পথিমধ্যে উত্তর আন্দালুসের সালিম নগরীতে পৌঁছার পর আলমুযাফফার কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। ফলে স্বেচ্ছাসেবী সৈনিকদের অনেকেই বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ-পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তিনি কর্ডোভায় ফিরে আসেন।[৪৫৩]

এরপর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে অনেকটা শরীরের ওপর বলপ্রয়োগ করেই তিনি নতুন করে ক্যাস্টোলা অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং অসুস্থ শরীর নিয়েই ৩৯৯ হিজরীর শীতকালে ক্যাস্টোলার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু সফর করার কারণে তার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। যুদ্ধ পরিচালনা করার মতো পরিস্থিতি না থাকায় মুসলিম বাহিনী তাকে পালকিতে নিয়ে কর্ডোভার উদ্দেশে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে ৩৯৯ হিজরীর সফর মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৪৫৪]

আমিরিয়া সাম্রাজ্যের খ্যাতিমান কয়েকজন আলিম

১. আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন খাকওয়ান রহ.

তার পুরো নাম আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হারছামা বিন যাকওয়ান বিন উবায়দুস বিন যাকওয়ান। জন্ম ৩৪২ হিজরী মোতাবেক ৯৫৩ খৃস্টাব্দে, মৃত্যু ৪১৩ হিজরী মোতাবেক ১০২২ খৃস্টাব্দে।

---

[৪৫১] প্রাগুক্ত, ৩/১৪।

[৪৫২] প্রাগুক্ত, ৩/২১।

[৪৫৩] প্রাগুক্ত, ৩/২৩।

[৪৫৪] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৭ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ৮৯।

Scanned with CamScanner

তিনি কর্ডোভার প্রধান বিচারপতি (কাযিউল জামাআ'হ) ও কেন্দ্রীয় মসজিদের খতীব ছিলেন। আলমানসুর তাকে বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন সফর ও অভিযানে আলমানসুরের সঙ্গে থাকতেন। আলমানসুরের কাছে তার অবস্থান ও মর্যাদা উযীরদেরও উর্ধ্বে ছিল। রাষ্ট্র পরিচালনা ও প্রশাসনিক-সামরিক বিভিন্ন বিষয়ে আলমানসুর তার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। আলমানসুরের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র মুযাফফার ও শানজুলও তার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতেন। মুযাফফারের মৃত্যুর পর তার ভাই আবদুর রহমান তার পদমর্যাদা আরও বৃদ্ধি করেন এবং বিচারক পদের পাশাপাশি তাকে উযীরের পদও প্রদান করেন। এককথায় আহমাদ বিন যাকওয়ান সমকালীন আন্দালুসের নেতৃস্থানীয় ও শীর্ষ ব্যক্তিদের একজন ছিলেন এবং প্রশাসনের অত্যন্ত নিকটভাজন ও উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৪৫৫]

২. ইবনে জুলজুল রহ.

তার নাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন হাস্‌সান। প্রসিদ্ধ ছিলেন ইবনে জুলজুল নামে। জন্ম ৩৩২ হিজরী মোতাবেক ৯৪৩ খৃস্টাব্দে, মৃত্যু ৩৭৭ হিজরীর (৯৮৭ খৃস্টাব্দের) পরে। তিনি ছিলেন দক্ষ চিকিৎসক এবং বিষমুক্ত ঔষধ নির্ণয়ে শাস্ত্রজ্ঞ। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ ডিওস্‌কোরিডাস (Dioscorides)-এর গ্রন্থ সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান ছিল।

উল্লেখ্য, আলোচিত এ গ্রন্থটি আব্বাসী খলীফা মুতাওয়াক্কিলের আমলে বাগদাদে আরবীতে অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু অনুবাদ করার সময় গ্রিক ভাষায় লেখা মূল গ্রন্থটির অনেক শব্দের মর্মার্থই দুর্বোধ্য থাকায় আরবী না করে গ্রিক ভাষায় রেখে দেওয়া হয়েছিল। এ গ্রন্থ সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে জুলজুল বলেন,

> চিকিৎসকগণ এ গ্রন্থটির কেবল আরবী অংশ থেকে উপকৃত হতেন। আন্দালুসে যখন আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামল চলছিল, তখন তৎকালীন কনস্টানটিনোপল সাম্রাজ্যের অধিপতি রোমানুস (Romanus II) সমকালীন (মুসলিম পরাশক্তি) আন্দালুসের খলীফা আননাসিরের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ করেন এবং বিভিন্ন মূল্যবান

[৪৫৫] আবুল হাসান নুবাহী, *তারীখু কুযাতিল আন্দালুস*, পৃ : ৮৫ ও যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ২৮/৩১২।

Scanned with CamScanner

উপহারসামগ্রী প্রেরণ করেন। এসব উপহারের মধ্যে (ঔষধশাস্ত্রে ব্যবহৃত) বিভিন্ন উদ্ভিদের বিস্ময়কর চিত্রসম্বলিত ডিওস্কোরিডাসের গ্রন্থটির একটি অনুলিপিও ছিল। গ্রন্থটি গ্রিক ভাষায় লিখিত ছিল। উপহারসামগ্রীর মধ্যে আরও ছিল (বিখ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক) হিরোডোটাস (Herodotus)-এর লিখিত গ্রন্থ, যা প্রাচীন জাতি ও রাষ্ট্রসমূহ সম্পর্কে ল্যাটিন ভাষায় রচিত এক আশ্চর্য ইতিহাসগ্রন্থ। আর আন্দালুসে ল্যাটিন ভাষা জানেন, এমন মানুষও ছিল। এরপর আননাসির কনস্টানটিনোপল অধিপতি রোমানুসের সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন এবং গ্রিক ও ল্যাটিন উভয় ভাষায় দক্ষ একজন বিদ্বান ব্যক্তিকে পাঠাতে অনুরোধ করেন; যিনি আন্দালুসে এসে এখানকার শিক্ষার্থীদেরকে গ্রিক ভাষা শেখাবেন এবং পরবর্তী সময়ে তারা গ্রিক ভাষায় লিখিত চিকিৎসাগ্রন্থটির অনুবাদ করবে। রোমানুস 'নাকুলা' নামক জনৈক পাদ্রীকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ৩৪০ হিজরীতে নাকুলা কর্ডোভায় পৌছেন। তিনি ডিওস্কোরিডাসের চিকিৎসাগ্রন্থের দুর্বোধ্য অংশগুলোর মর্মোদ্ধার করেন। আন্দালুসে তখন একদল সুদক্ষ ও প্রাজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। তাদের প্রচেষ্টায় গ্রন্থটির আরবীরূপ নিখুঁততর হয়। আমি পাদ্রী নাকুলা ও সেসব চিকিৎসকদের পেয়েছি এবং তাদের সংস্পর্শে থেকে অনেককিছু অর্জন করেছি। পাদ্রী নাকুলা মুসতানসিরের শাসনামলের শুরুর দিকে মারা যান।

ইবনে জুলজুলের লেখা গ্রন্থাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ হল তারীখুল আতিব্বা ওয়াল ফালাসিফা (تاريخ الأطباء والفلاسفة) (চিকিৎসক ও দার্শনিকদের জীবনকথা)। এ ছাড়াও তিনি ডিওস্কোরিডাসের ঐতিহাসিক চিকিৎসাগ্রন্থের ওপর কাজ করেছেন এবং তাতে এমন কিছু তথ্য সংযোজন করেছেন, যা স্বয়ং ডিওস্কোরিডাসও জানতেন না।[৪৫৬]

৩. আন্দালুসে গণিতশাস্ত্রের পথিকৃৎ মাসলামা আলমাজরীতি রহ.

বিখ্যাত দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, রসায়নবিদ ও জ্যোতির্বিদ আলমাজরীতির পুরো নাম আবুল কাসিম মাসলামা বিন আহমাদ বিন কাসিম বিন আবদুল্লাহ

[৪৫৬] দেখুন : যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ২৭/২১৩।

Scanned with CamScanner

আলমাজরীতি। জন্ম ৩৩৮ হিজরীতে (৯৫০ খৃস্টাব্দে) মাজরীত (বর্তমান স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ) নগরীতে। তিনি আন্দালুসে গণিত-শাস্ত্রজ্ঞদের ইমাম ছিলেন এবং জ্যোতির্বিদ্যা ও তারকা-গতিবিধিশাস্ত্রে সমকালীন আন্দালুসের সবচে' প্রাজ্ঞ আলিম ছিলেন।[৪৫৭]

তিনি অন্যান্য আরও অনেক শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে খালদূন তার দু'টি গ্রন্থের অধ্যয়নের কথা উল্লেখ করেছেন। একটির নাম 'রুত্‌বাতুল হাকীম' (رتبة الحكيم), যা আন্দালুসে রসায়নশাস্ত্রের অন্যতম আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত ছিল; অপর গ্রন্থটির নাম 'গাইয়াতুল হাকীম' (غاية الحكيم), যা অত্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল একটি জ্ঞানকোষ। প্রচুর তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ এ গ্রন্থটি খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এতে সুপ্রাচীন কালের সভ্যতার ইতিহাস, নিবতী, কিবতী, সুরিয়ানী ও ভারতীয়সহ প্রাচীনকালের প্রাচ্যের বিভিন্ন জাতিবর্গের ঐতিহাসিক বিভিন্ন গবেষণা ও আবিষ্কারের ইতিহাস এবং সভ্যতার উন্নতি ও উত্থানে এসব জাতিগোষ্ঠীর উদ্ভাবনী সাধনা ও প্রচেষ্টার ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়াও গ্রন্থটিতে গণিতশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, সম্মোহনশাস্ত্র, বলবিদ্যা (Mechanics), প্রাকৃতিক ইতিহাস (Natural history), সৃষ্টি-ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের মনোজ্ঞ আলোচনা রয়েছে।[৪৫৮] তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি পঞ্জিকা প্রস্তুত করেছিলেন, যা সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি হল, মাসলামা (আলমাজরিতী) ও ইবনুস সামাহ-এর পঞ্জিকার মতো উন্নত পঞ্জিকা কখনো রচিত হয়নি।[৪৫৯]

তার গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু রচনা হল,

- রাওযাতুল হাদায়িক্ব ওয়া রিয়াযুল খালাইক্ব «روضة الحدائق ورياض الخلائق»
- ছিমারুল আ'দাদ «ثمار العدد»
- ইখতিসারু তা'দীলিল কাওয়াকিব মিন যীজিল বাত্তানী «اختصار تعديل الكواكب من زيج البتاني»
- কিতাবুল আহজার «كتاب الأحجار»

ইকতিফাউল কুনূ' বি-মা হুওয়া মাতবূ' (اكتفاء القنوع بما هو مطبوع) গ্রন্থের

---

[৪৫৭] যিরিক্বলী, *আলআ'লাম*, ৭/২২৪।

[৪৫৮] দেখুন : মুহাম্মাদ আমীন ফারশূখ, *মাওসূআ'তু আ'বাকিরাতিল ইসলাম*, ৫/১১১।

[৪৫৯] দেখুন : খাক্বারী, *নাফহুত তীব*, ২/১৭৬।

Scanned with CamScanner

লেখক এডওয়ার্ড ভ্যানডিক (Edward Cornelius Van Dyck) লিখেছেন,

> হাকীম মাজরীতি আলকুরতুবীর অত্যন্ত তথ্যবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসমৃদ্ধ আরেকটি সংকলন পাওয়া যায় 'আররাসাইলুল জামিআ' (الرسائل الجامعة) নামে। গ্রন্থটি 'রাসাইলু ইখওয়ানিস সাফা' (رسائل إخوان الصفا) নামেও খ্যাত। মাজরীতীর এ গ্রন্থটি যদিও মূল রাসাইলু ইখওয়ানিস সাফা-এর[৪৬০] আঙ্গিকেই রচিত; তবে তা এখনও ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি এবং মূল রাসাইলু ইখওয়ানিস সাফা-এর মতো প্রসিদ্ধিও লাভ করতে পারেনি।[৪৬১]

সম্ভবত গ্রন্থটির এই অপ্রসিদ্ধির কারণেই আলআ'লাম প্রণেতা খাইরুদ্দীন যিরিক্‌লী মন্তব্য করেছেন,

> কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, তিনি রাসাইলু ইখওয়ানিস সাফা-এরও সংকলক; কিন্তু তা সুপ্রমাণিত নয়।[৪৬২]

আল্লামা মাসলামা মাজরীতী ৩৯৮ হিজরী মোতাবেক ১০০৭ খৃস্টাব্দে মাদ্রিদে ইন্তেকাল করেন।

৪. ইবনুল ফারাযী রহ.

তার পুরো নাম আবুল ওয়ালিদ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন নাস্‌র আলআযদী। মৃত্যু ৪০৩ হিজরী মোতাবেক ১০১৩ খৃস্টাব্দে।

প্রতিভাবান এ মহান হাফিয ও ইমাম 'ইবনুল ফারাযী' নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীসশাস্ত্রে 'হাফিয', ঐতিহাসিক ও সুসাহিত্যিক। কর্ডোভায় ৩৫১ হিজরী মোতাবেক ৯৬২ খৃস্টাব্দে তার জন্ম। আন্দালুসের কবি-সাহিত্যিকদের জীবনেতিহাস সম্পর্কে তিনি একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ ছাড়াও তার গুরুত্বপূর্ণ রচনা হল, আলমু'তালাফ ওয়াল

---

[৪৬০] খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে (হিজরী তৃতীয় শতাব্দী) ইরাকের বসরা নগরীর কয়েকজন মুসলিম দার্শনিক মিলে একটি দর্শন-সংঘ গড়ে তোলেন, ইতিহাসে যা 'ইখওয়ানুস সাফা' নামে পরিচিত। তাদের লক্ষ্য ছিল ইসলামের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ও তৎকালে প্রচলিত দর্শননীতির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা। তাদের একনিষ্ঠ গবেষণার অর্জিত দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ মোট ৫২টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে যে গ্রন্থটি সংকলন করা হয়, তার নামই হল *'রাসাইলু ইখওয়ানিস সাফা'*। এখানে মূল *রাসাইলু ইখওয়ানিস সাফা* বলে এ গ্রন্থটিকেই বোঝানো হয়েছে। (অনুবাদক)

[৪৬১] এডওয়ার্ড ভ্যানডিক, *ইকতিফাউল কুনূ' বি-মা হওয়া মাতবূ'*, পৃ : ১৮৪।

[৪৬২] যিরিক্‌লী, *আলআ'লাম*, ৭/২৩১।

Scanned with CamScanner

মুখতালাফ (المؤتلف والمختلف) ও মুশতাবিহুন নিসবাহ (مشتبه النسبة)।
তার শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম হলেন মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম আবু ওমর ইবনে আবদুল বার। ইবনে আবদুল বার তার এই মহান উসতায সম্পর্কে বলেছেন, তিনি ছিলেন ফকীহ, হাদীসশাস্ত্রে হাফিয, উলূমে হাদীস ও রিজালশাস্ত্রের সকল অঙ্গনে যোগ্য আলিম। আমি আমার অধিকাংশ শায়খের কাছে তার সঙ্গে ইলম অর্জন করেছি। তিনি মার্জিত স্বভাবসম্পন্ন, সদাচারী ব্যক্তি ছিলেন।
আন্দালুস ইতিহাসের ইমাম বলে যাকে গণ্য করা হয়, সেই ইবনে হাইয়ান তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, রেওয়ায়েতের প্রাচুর্য, হাদীস কণ্ঠস্থকরণ, 'রিজাল' সম্পর্কে বুৎপত্তি এবং বিভিন্ন শাস্ত্র ও সাহিত্যে অপূর্ব দক্ষতা ইত্যাদি বিবেচনায় কর্ডোভায় তার পর্যায়ের কোন আলিমের দেখা মেলেনি। অন্য সকল আলিমের চেয়ে গ্রন্থসংগ্রহেও তিনি অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ ভাষাভাষী ও সুন্দর হস্তাক্ষরের অধিকারী ছিলেন।
ইবনুল ফারাযীর চমৎকার কিছু কবিতা রয়েছে। তার রচিত হৃদয়কাড়া কয়েকটি পঙ্‌ক্তি হল,

أَسِيرُ الْخَطَايَا عِنْدَ بَابِكَ وَاقِفٌ عَلَى وَجَلٍ مِمَّا بِهِ أَنْتَ عَارِفُ
يَخَافُ ذُنُوبًا لَمْ يَغِبْ عَنْكَ غَيْبُهَا وَيَرْجُوكَ فِيهَا فَهْوَ رَاجٍ وَخَائِفُ

গোনাহের ফাঁদে বন্দী অধম তব দ্বারে আজ দণ্ডায়মান; সবই জানেন আপনি, তাই শঙ্কিত সে কম্পমান।
আপনার অজানা নয়, কোন গোনাহ-অন্যায়; বান্দার তাই ভয়, না জানি কী হয়! ভয়-আশা, আশা-ভয় এই তো বান্দার পরিচয়!

وَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْجُو سِوَاكَ وَيَتَّقِي وَمَا لَكَ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ مُخَالِفُ
فَيَا سَيِّدِي لَا تُخْزِنِي فِي صَحِيفَتِي إِذَا نُشِرَتْ يَوْمَ الْحِسَابِ الصَّحَائِفُ

আশা ও ভয় আপনি ছাড়া আর কার শানে হয়?! আপনার বিচার ও ফয়সালায় নেই কারও বিরোধিতা-সংশয়।
সুতরাং হে মালিক আমার! সাইয়িদ আমার! বিচারদিবসে যেদিন প্রকাশিত হবে সকল হিসাবনামা, আমায় যেন লাঞ্ছিত না হতে হয়।[৪৬৩]

[৪৬৩] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৭/১৭৭।

Scanned with CamScanner

৫. বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক আবুল কাসিম যাহরাবী রহ.

এ মহান ব্যক্তিটির জীবনী আলোচনায় আমরা কিছুটা দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নেব। কেননা, খাল্ফ বিন আব্বাস যাহরাবী (মৃ: ৪২৭ হি./১০৩৬ খৃ.) নামের এই মহান ব্যক্তিটিকে কেবল আন্দালুসের নয়; পুরো ইসলামী ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাতারে গণ্য করা হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে তার রচিত গ্রন্থ আততাসরীফ লিমান আ'জাযা আ'নিত তালীফ «التصريف لمن عجز عن التأليف»-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এত উর্ধ্বে যে, শুধু এই একটি গ্রন্থের কারণে তাকে শ্রেষ্ঠতম আরব মুসলিম শল্যবিদ এবং মধ্যযুগ ও ইউরোপীয় জাগরণের যুগ থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত সময়কালের শল্যচিকিৎসা-শাস্ত্রের পথিকৃৎ ও গুরু বলে আখ্যায়িত করা হয়। তার গ্রন্থাদি অধ্যয়নে প্রতীয়মান হয় যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম মূত্রথলির পাথর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বের করার ধারণা পেশ করেন। এছাড়াও তিনি গ্রন্থিপ্রদাহ, যক্ষ্মাসহ বিভিন্ন রোগ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।[৪৬৪]

ইউরোপ যাকে Abulcasis (আবুল কাসিম) নামে চেনে, সেই যাহরাবী-ই সর্বপ্রথম অপোরেশনের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন শল্যছুরি, সার্জিক্যাল কাঁচি ইত্যাদি আবিষ্কার করেন। তিনি অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন নিয়ম ও মৌলিক সূত্র যেমন অপোরেশন চলাকালে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে ধমনী সংযোগ পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। অস্ত্রোপচারের সময় ক্ষতস্থানকে সেলাই করার বিশেষ সুতা বা তন্তুও তিনিই উদ্ভাবন করেন। এসব বিবেচনায় বলা যায়, যাহরাবী ছিলেন সেসব ক্ষণজন্মা মনীষীদের একজন, বিশ্বমানবতা যাদের সেবায় ধন্য হয়েছে।

আবুল কাসিম যাহরাবীর জন্ম মদীনাতুয যাহরায়। এ শহরের প্রতি সম্বন্ধিত করেই তাকে যাহরাবী নামে ডাকা হয়। তিনি একজন প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। বিযুক্ত ও কম্পোজিট উভয় ধরনের ঔষধ সম্বন্ধে তার ব্যাপক জ্ঞান ছিল। সঠিক ও নির্ভুল চিকিৎসার জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার বিভিন্ন রচনা খ্যাতি লাভ করেছে। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল আলকিতাবুল কাবীর, যা গ্রন্থকারের নামে-ই (আযযাহরাবী) সুপরিচিত।

---

[৪৬৪] ইবনে আবি উসাইবিআ', *তাবাক্বাতুল আতিব্বা*, ১/৩৩৩ ও শাওকী আবু খলীল, *আলহাযা-রাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়া*, পৃ: ৫১৩।

Scanned with CamScanner

তার আরেকটি কালজয়ী গ্রন্থ 'আততাসরীফ লিমান আ'জাযা আ'নিত তালীফ'। চিকিৎসাশাস্ত্রে এ গ্রন্থটিকে একটি উৎসগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি যাহরাবীর সর্ববৃহৎ ও সবচে' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।[৪৬৫]

যাহরাবী রোগীর আক্রান্ত অঙ্গের কাটাচেরার কাজ অন্যান্য চিকিৎসকদের মতো রক্তমোক্ষক যা ক্ষৌরকারদের হাতে ছেড়ে দিতেন না; বরং তৎকালীন প্রচলিত রীতির বাইরে গিয়ে নিজেই অস্ত্রোপচার-শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা ও অনুশীলন করতেন। এভাবে চর্চা, গবেষণা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি শল্যবিদ্যায় দক্ষ থেকে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান ও অস্ত্রোপচার-বিদ্যায় এমন অত্যুচ্চ মর্যাদা অর্জন করেন যে, শল্যচিকিৎসা ইতিহাসের সঙ্গে তার নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে।[৪৬৬]

অস্ত্রোপচার সম্পর্কিত তার গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তসমূহ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আলোচিত পূর্বসূরি চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের গবেষণাসমূহের স্থলবর্তী বলে বিবেচিত হয়েছে। বস্তুত খৃস্টীয় ষষ্টদশ শতক পর্যন্ত শল্যচিকিৎসা-শাস্ত্রে যাহরাবীর আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ও সূত্রসমূহই ছিল মূল অবলম্বন। তার উদ্ভাবনী চিন্তাসমূহ চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। রোগীর সুস্থতার জন্য অপোরেশনের এমন আধুনিকতম সব পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেছেন, যা সমকালীন ও পরবর্তী যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। তার উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতিই ছিল ইউরোপে শল্যচিকিৎসা সূচনার প্রাথমিক অবলম্বন।[৪৬৭]

নিজের আবিষ্কৃত এসব সরঞ্জামাদির (Surgical equipment) বিশদ বিবরণ, এগুলো তৈরি ও ব্যবহার করার পদ্ধতি তিনি তার রচনাবলিতে বিশদভাবে বর্ণনা করে গেছেন। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডেলিভারীর কাজে ব্যবহৃত সাঁড়াশি, বর্তমানকালে মহিলাদের বিভিন্ন ডাক্তারী পরীক্ষায় (Medical checkup) ব্যবহৃত যোনী আরশি (Vaginal speculum/Endoscope), প্রচলিত সিরিঞ্জ ও ইনজেকশন, মলদ্বারে ব্যবহৃত বিশেষ পিচকারী, মুখের গহ্বর পরীক্ষার সময় জিহ্বা নামিয়ে

---

[৪৬৫] ইবনে আবি উসাইবিআ', *আযযাক্বাতুল আতিব্বা*, ১/২৪৬ ও যিরিক্বলী, *আলআ'লাম*, ২/৩১০।

[৪৬৬] শাওকী আবু খলীল, *উলামাউল আন্দালুস ইবদাআ'তুহুমুল মুমাইয়িযা ওয়া আছারুহা ফিন নাহযাতিল উরুপ্পবিয়্যা*, পৃ : ৩১, জালাল মুযহির, *হাযা-রাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত তারীখিল আ'লামী*, পৃ : ৩৩১-৩৩২ ও আলী বিন আবদুল্লাহ আলদাফা', *রুওয়াদু ইলমিয়্ যিব ফিল হাযা-রাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ : ৩৬২।

[৪৬৭] জালাল মুযহির, *হাযা-রাতুল ইসলাম*, পৃ : ৩৩২।

Scanned with CamScanner

রাখতে ব্যবহৃত বিশেষ চামচ (Spoon), টনসিলের গিলোটিন, দাঁত অপসারণের ছোট সাঁড়াশি (Forceps) ও চিমটি, হাড় কাটার সার্জারী করাত, বিভিন্ন ধরনের উত্তপ্ত লৌহদণ্ড ও শল্যছুরিকা এবং অন্যান্য বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জামাদি। তার এসব আবিষ্কারই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির মূল বা বীজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে এগুলোই আধুনিক সার্জিকাল সরঞ্জামাদিতে পরিণত হয়েছে।[৪৬৮]

ক্যাম্পবেল তার *'আতত্তিকবুল আরাবী'* (الطب العربي) গ্রন্থে লিখেছেন,

> সমকালীন যুগে আন্দালুসের শল্যচিকিৎসার সুখ্যাতি প্যারিস, লন্ডন বা এডিনবেরার চেয়েও অনেক বেশি ছিল। বস্তুত এ কারণেই জারাগোযার শল্যচিকিৎসকদের উপাধি প্রদান করা হয়েছিল 'শল্যচিকিৎসক' আর ইউরোপের শল্যবিদদের উপাধি ছিল 'শল্য-ক্ষৌরকার'। হিজরী দশম শতাব্দী পর্যন্ত এ প্রচলনই বহাল ছিল।[৪৬৯]

যাহরাবী লিখিত গ্রন্থ 'আততাসরীফ লিমান আ'জাযা আ'নিত তালীফ' প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সমৃদ্ধ একটি আকর গ্রন্থ। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর চেয়ে সমৃদ্ধ এবং তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক (theorical & practical) যুগপৎ আলোচনাবিশিষ্ট কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। একে মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের রচিত সবচে' মহান গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা হয়। সমালোচকদের অনেকে একে 'বিশ্বকোষ' (Encyclopedia) নামে, আবার অনেকে 'পূর্ণাঙ্গতর গ্রন্থ' বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এ সুসমৃদ্ধ জ্ঞানকোষটি কীভাবে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাত্যের শল্যচিকিৎসকদের কাছে মূল উৎস গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হল এবং কীভাবে সালের্নো (Salerno) ইউনিভার্সিটি ও মন্টপেলিয়ার (Montpellier) ইউনিভার্সিটির মতো ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ষষ্টদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুষদে অধ্যয়নকারীদের জন্য অন্যতম মৌলিক পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে গণ্য হল।

এ ঐতিহাসিক বাস্তবতাও বিস্মৃত হওয়া মোটেই উচিত হবে না যে, রেনেসাঁ যুগ ও তৎপরবর্তী যুগে ইটালির যেসব শল্যচিকিৎসক প্রভূত সুনাম অর্জন

---

[৪৬৮] আমির নাজ্জার, *কী তারীখিত তিবিবি ফিল দাওলাতিল ইসলামিয়া*, পৃ : ১৭৬।

[৪৬৯] আলাল মুমহির, *হাযা-রাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত তারাক্কিল আ'লামী*, পৃ : ৩৩৬।

Scanned with CamScanner

করেছিলেন, তারা যাহরাবীর গ্রন্থ আততাসরীফ লিমান আ'জাযা আ'নিত তালীফ-এর ওপর অনেকটাই নির্ভর করতেন।[৪৭০] শারীরতত্ত্বের (Physiology) বিখ্যাত মনীষী হাল্লার (Haller) বলেছেন,

> খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পর যেসব শল্যচিকিৎসক আত্মপ্রকাশ করেছেন, তারা সকলে আবুল কাসিম রচিত এসব অনন্যসাধারণ উৎসগ্রন্থগুলো থেকে উপকৃত হয়েছেন।[৪৭১]

যাহরাবী-ই সর্বপ্রথম শল্যচিকিৎসাকে বিশ্লেষণনির্ভর শাস্ত্র হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম একে স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে তুলে ধরেন। শল্যচিকিৎসার নতুন নতুন ধারা উদ্ভাবন এবং বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি তৈরির কৃতিত্বও তারই।[৪৭২] তিনিই সর্বপ্রথম মূত্রথলিতে নল প্রতিস্থাপনের অপোরেশনের ধারণা দেন এবং এর পদ্ধতি নির্ণয়ের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি আবিষ্কার করেন। শ্বাসনালী (Trachea) ছিদ্র করার জটিল অস্ত্রোপচারও তিনি করেছিলেন। ইবনে সীনা ও রাযীর ন্যায় তার পূর্ববর্তী চিকিৎসকগণ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এ অস্ত্রোপচার করতে সভয়ে পিছিয়ে আসতেন।

শিশুদের মূত্রনালির বাইরের ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেলে সহজে প্রস্রাব চালু করার জন্য যাহরাবী অতি সূক্ষ্ম একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি বক্ষগহ্বর ও অন্য যে কোন গভীর ক্ষতস্থান থেকে সাধারণভাবে দূষিত রক্ত অপসারণ করতেও সফল হয়েছিলেন। এছাড়াও যাহরাবী-ই সর্বপ্রথম চিকিৎসক, যিনি অস্ত্রোপচার চলাকালে রক্তক্ষরণ (bleeding) বন্ধ করতে ধমণী সংযোগ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। পশ্চিমা চিকিৎসকদের কমপক্ষে ছয় শ' বছর পূর্বে তিনি এ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, অনেক পরে এসে জনৈক চিকিৎসক একে নিজের আবিষ্কার বলে দাবি করেছেন। ১৫৫২ খৃস্টাব্দে শল্যচিকিৎসক অ্যাম্বরোয়া যিবেরা (Ambroa zibara) একে নিজের কৃতিত্ব বলে দাবি করেন।

যাহরাবীই সর্বপ্রথম ক্ষতস্থান সেলাই করার জন্য সার্জিকাল সুতা তৈরি করেন

---

[৪৭০] আমির নাজ্জার, *ফী তারীখিত তিবিব ফিল দাওলাতিল ইসলামিয়া*, পৃ : ২২১।

[৪৭১] গোস্তাভ লি বোন, *হাযা-রাতুল আরব*, পৃ : ৪৯০।

[৪৭২] আলী বিন আবদুল্লাহ আলদাফা', *রুওয়াদু ইলমিত তিব ফিল হাযা-রাতিল ইসলামিয়া*, পৃ : ২৬৫ ও মাহমুদ আলহাজ্জ কাসিম, *আতাতিব ই'নদাল আরব ওয়াল মুসলিমীন তারীখুন ওয়া মুসামাহাতুন*, পৃ : ১০৬।

Scanned with CamScanner

এবং বিশেষ করে অস্ত্র ও নাড়িভুঁড়ি সেলাইয়ের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করেন। এ সুতা তিনি বিড়ালের আঁতড়ি দ্বারা প্রস্তুত করেছিলেন। দু'টি সুঁই ও একটি সুতার মাধ্যমে দাগমুক্ত সেলাই পদ্ধতিও তিনি আবিষ্কার করেন। তিনি এ ধরনের অপোরেশনের নাম দিয়েছিলেন 'ত্বকের তলদেশে ক্ষত মিশে যাওয়া'। অধিকন্তু তিনিই সর্বপ্রথম রোগীর শরীরের নিম্নাংশের যে কোন অপোরেশনের সময় প্রথমেই রোগীর শ্রোণিদেশ ও দু' পা উপরে উঠিয়ে রাখার পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তার এ আবিষ্কার ছিল জার্মান শল্যচিকিৎসক ফ্রেডরিক ট্রিডলেনোবার্গ (Frederick Trdlenoburg)-এর আগমনের প্রায় তিন শ' বছর পূর্বে। এই মহান আবিষ্কারের কৃতিত্ব উক্ত জার্মান চিকিৎসককে প্রদান করা যাহরাবীর প্রতি একটি ঐতিহাসিক অন্যায় ও সভ্যতাগত অধিকার ছিনতাই ছাড়া আর কিছুই নয়।[৪৭৩]

যাহরাবীকে মুদ্রণ পরিকল্পনার প্রথম পথপ্রদর্শক বা পথিকৃৎ বলেও গণ্য করা হয়। মুদ্রণশিল্পের প্রথম পদক্ষেপ তিনিই নিয়েছিলেন এবং মুদ্রণশিল্পের কথিত জনক জার্মান নাগরিক জোহানেস গুথেনবার্গের (Jobannes Gutenberg) কয়েক শতাব্দী পূর্বেই মুদ্রণের ধারণা পেশ করেছিলেন।

যাহরাবী তার মুদ্রণ পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার অনন্যসাধারণ গ্রন্থ 'আততাসরীফ লিমান আ'জাযা আ'নিত তালীফ'-এর আটাশতম প্রবন্ধে। উক্ত প্রবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে চিকিৎসা ও ফার্মাসি ইতিহাসে প্রথমবারের মতো যাহরাবী এমন ট্যাবলেট তৈরির ফর্মুলা পেশ করেন, যাতে ঔষধের নামও অঙ্কিত থাকবে। তিনি উক্ত প্রবন্ধে এ ধরনের ট্যাবলেট তৈরির ছাঁচ প্রস্তুত করার জন্য আবলুস কাঠ বা হাতির দাঁতের তৈরি পাত ব্যবহারের ফর্মুলা বাতলে দিয়েছেন। পাতটি মাঝ বরাবর লম্বালম্বি চেরা থাকবে এবং উভয় অংশে ট্যাবলেটের অর্ধেক পুরুত্ব পরিমাণ ছিদ্র করা থাকবে। যে কোন এক অংশের ছিদ্রে উদ্দিষ্ট ট্যাবলেটটির নাম উল্টো করে অঙ্কিত থাকবে। উক্ত ছাঁচে ঔষধ তৈরির কাঁচামাল ঢেলে যখন ট্যাবলেট তৈরি করা হবে, তখন তাতে নামও অঙ্কিত হয়ে যাবে। তিনি এ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন ঔষধশিল্পে নকল ও প্রতারণা রোধ করতে এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঔষধ প্রস্তুত শিল্পকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে।

---

[৪৭৩] শাওকী আবু খলীল, *উলামাউল আন্দালুস ইবদাআ'তুহুম মুমাইয়িরা ওয়া আছারুহা ফিল মাহফাজিল উরুবিয়্যা*, পৃ : ৩৫ ও আমির নাজ্জার, *ফী তারীখিত তিবিব ফিল মাওলাতিল ইসলামিয়া*, পৃ : ১৬২।

Scanned with CamScanner

শাওকী আবু খলীল এ সম্পর্কে লিখেছেন,

> নিঃসন্দেহে যাহরাবীর আবিষ্কৃত এ পদ্ধতি তাকে মুদ্রণশিল্প ও ঔষধের নামাঙ্কিত ট্যাবলেট তৈরির পথিকৃৎ ও আবিষ্কারক হওয়ার সভ্যতাগত অধিকার প্রদান করে। আজকের আধুনিক বিশ্বের কোন আন্তর্জাতিক ঔষধ কোম্পানীই এ দু'টি শিল্পের প্রয়োজন অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু যাহরাবীর এই আবিষ্কার-অধিকারকে চুরি করে অন্যদের নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে; যে বিষয়ে অনেকেই অবহিত নন।[৪৭৪]

এছাড়াও যাহরাবী-ই প্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞানী, যিনি শরীরের মূল শিরা ও পায়ের নলার ধমনী-স্ফীতির চিকিৎসার জন্য পায়ের নলা থেকে রগ অপসারণের ধারণা দেন। তিনি সফলভাবে এ অস্ত্রোপচার সম্পাদন করেন। বর্তমানে প্রচলিত অস্ত্রোপচারের সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল আছে। সামান্য কিছু সংস্কারসহ এ ধরনের অস্ত্রোপচার আমরা মাত্র ত্রিশ বছর যাবৎ দেখছি।[৪৭৫] দন্ত চিকিৎসা-শাস্ত্র ও চোয়ালের অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেও যাহরাবী অনেক নতুন নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন করেছেন। এ বিষয়ে তিনি তার গ্রন্থে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন।[৪৭৬]

ক্যান্সার ও তার প্রতিকার আবিষ্কার নিয়েও যাহরাবী যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তিনি তার গ্রন্থে এ প্রাণঘাতী রোগের বিবরণ ও চিকিৎসাপদ্ধতি আলোচনা করেছেন। বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ এমনকি বর্তমানেও ক্যান্সার চিকিৎসায় যাহরাবীর বাতলানো পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাও শল্যচিকিৎসার পথপ্রদর্শক যাহরাবী ক্যান্সার চিকিৎসার যে ব্যবস্থাপত্র উপস্থাপন করেছেন, তার সঙ্গে খুব বেশি নতুন তত্ত্ব সংযোজন করতে পারেননি।[৪৭৭]

সিজার অপোরেশন ও ধাত্রীবিদ্যা সম্পর্কে যাহরাবী যা লিখে গেছেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানে আজও তা মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। গর্ভস্থ মৃত সন্তানকে বের করার জন্য তিনি একটি বিশেষ যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। অর্থাৎ এই আবিষ্কারের দাবিদার ডাক্তার প্যালসারের প্রায় নয় শ' বছর

---

[৪৭৪] শাওকী আবু খলীল, *উলামাউল আন্দালুস ইবরাআ'তুহুমুল মুমাইয়িরা ওয়া আছারুহা ফিল মাহফাযিল উরুবিয়্যা*, পৃ। ৩২-৩৩।

[৪৭৫] মুহাম্মাদ কামিল হুসাইন, *আলমুলায় ফী তারীখিত তিবি ওয়াস সাইদালাতি ই'নদাল আরব*, পৃ : ১৪২-১৪৩।

[৪৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ : ২০১।

[৪৭৭] দেখুন : আদদাফা', *রুওয়াদু ইলমিত তিব*, পৃ : ২৬৪।

Scanned with CamScanner

পূর্বেই তিনি এ সংক্রান্ত চিকিৎসাপদ্ধতির বিবরণ প্রদান করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম গর্ভাশয়ের মুখ প্রসারিত করার বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করেন এবং সর্বপ্রথম স্ত্রীরোগ পরীক্ষার জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেন, যা বর্তমানেও ব্যবহৃত হচ্ছে।[৪৭৮]

(ফরাসী বহুবিদ্যাবিশারদ) গোস্তাভ লি বোন (Gustave Le Bon) যাহরাবীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছেন,

> তিনি ছিলেন আরবের সবচে' বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক এবং বিশেষ করে মূত্রথলির পাথর ভেঙে ফেলার উদ্ভাবক। তার এ আবিষ্কারকে অন্যায়ভাবে বর্তমান যুগের আবিষ্কার বলে দাবি করা হয়।[৪৭৯]

ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় (The Encyclopedia Britannica) যাহরাবী সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

> আরব মুসলিম মনীষীদের মধ্যে যারা শল্য-চিকিৎসাশাস্ত্রে কলম ধরেছেন, তিনি তাদের মধ্যে সবচে' বিখ্যাত। তিনিই সর্বপ্রথম রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্য ধমনী (artery) সংযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করেন।[৪৮০]

---

[৪৭৮] দেখুন : কামাল আসসামিরাঈ, *আলজামরাবুন নিসাইয়্যা ফিত তিবিল আ'রাবিয়্যিল ক্বাদীম*, 'আলমিয়ানুত তাবিয়্যা' ম্যাগাজিন, সংখ্যা: ১, ১৯৬৪ খৃস্টাব্দ ও মাহমুদ আলহাজ্জ কাসিম, *আতিবাউ ই'দাদাল আরব ওয়াল মুসলিমীন*, পৃ : ১৬৩।

[৪৭৯] গোস্তাভ লি বোন, *হাযা-রাতুল আরব*, পৃ : ৪৯০-৪৯২।

[৪৮০] যিরিক্লী, *আলআ'লাম*, ২/৩১০।

Scanned with CamScanner

অষ্টম পরিচ্ছেদ
আমিরিয়া সালতানাতের পতন

আন্দালুস তখন উমাইয়া খেলাফতের নামে পরিচালিত হলেও মূলত রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছিল হাজিব পদধারীর কর্তৃত্বেই। আর এ কারণেই ইতিহাসে এ সময়কালটুকু উমাইয়া খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হলেও তা মূলত ছিল আমিরিয়া শাসনামল।

হাজিব আলমানসুর আন্দালুস শাসন করেছিলেন ৩৬৬ হিজরী থেকে তার মৃত্যুকাল ৩৯২ হিজরী (৯৭৬-১০০২ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুল মালিক বিন আলমানসুর হাজিব পদ গ্রহণ করে রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তার পিতা নিহত হওয়ার পর থেকে একটানা সাত বছর (৩৯৯ হি./১০০৯ খৃ.) পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তার পিতার আদর্শেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন এবং প্রতিবছর এক-দু'বার খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। আর এ সবকিছুই তিনি করেন তার পিতার মতই উমাইয়া খেলাফতের পরিচয়ে।

আবদুল মালিক বিন আলমানসুর যখন হাজিব পদ গ্রহণ করেন, তখন খলীফা হিশাম ইবনুল হাকামের বয়স আটত্রিশ বছর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শাসনক্ষমতা দাবি করেননি এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও সামরিক বিষয়াদিতে প্রভাব ও কর্তৃত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেননি। বস্তুত তখন তিনি নির্ঝঞ্ঝাট, ঝামেলামুক্ত জীবনের স্বাদ পেয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রথমে হাজিব আলমানসুর ও পরবর্তী সময়ে তার সন্তানদের শাসনকর্তৃত্বে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

আবদুর রহমান বিন আলমানসুরের দায়িত্ব গ্রহণ এবং আমিরিয়া সালতানাতের পতন

সাত বছর দায়িত্ব পালন করার পর ৩৯৯ হিজরীতে (১০০৯ খৃস্টাব্দে) হাজিব আলমুযাফফার মৃত্যুবরণ করেন। ক্ষমতার বাগডোর আমিরিয়া

Scanned with CamScanner

বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের হাতে থাকার যে ধারা চলে আসছিল, তারই ধারাবাহিকতায় এরপর হাজিব পদ গ্রহণ করেন আলমুযাফফারের ভাই আবদুর রহমান বিন আলমানসুর। তিনিও তার পিতা ও ভাইয়ের মতো হাজিব পরিচয়ের আড়ালে মূলত দেশের শাসনকর্তায় পরিণত হন। কিন্তু আবদুর রহমান তার পিতা আলমানসুর ও ভ্রাতা আলমুযাফফার থেকে সম্পূর্ণই ব্যতিক্রম ছিলেন। একে তো তার মাতা ছিলেন নাফার-নৃপতি-দুহিতা তথা খৃস্টান নারী; অধিকন্তু আবদুর রহমান নিজে মদপান, ব্যভিচারসহ বিভিন্ন হারাম ও অন্যায় কাজে অভ্যস্ত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই আন্দালুসের মুসলিম জনগণ তাকে পছন্দ করতে পারেনি।[৪৮১]

অধিকন্তু হাজিব পদ গ্রহণ করার পরই আবদুর রহমান এমন একটি কাজ করেন, যা তার পূর্বে তার পিতা বা ভ্রাতা করেননি। তিনি খলীফা হিশাম ইবনুল হাকামকে বাধ্য করেন, যেন আবদুর রহমানকে পরবর্তী খলীফা (ওলিয়ে আ'হদ) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ তিনি তার পিতা ও ভাইয়ের মতো হাজিব পদের আড়ালে থেকে রাষ্ট্র পরিচালনায় তুষ্ট ছিলেন না। তার ইচ্ছা ছিল হাজিব পদের আড়াল ছেড়ে সরাসরি খলীফা হিসেবে আন্দালুসের শাসনক্ষমতার অধিকারী হওয়া।

স্বাভাবিকভাবেই তার এই আচরণে বনু উমাইয়া বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং বনু উমাইয়াসহ আপামর জনসাধারণের অন্তরে তার প্রতি ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। কিন্তু ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বা অপ্রীতিকর কিছু করার শক্তি ও সামর্থ্য তাদের ছিল না। আবদুর রহমান আন্দালুসের প্রতিটি প্রদেশে আমিরিয়া বা বার্বার গোত্রের লোকজনকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়ে রেখেছিলেন। আর আগেই উল্লেখ করেছি, বার্বাররা সেই আলমানসুরের যুগ থেকেই প্রশাসনে আমিরিয়াদের সহযোগী ছিল।[৪৮২]

আবদুর রহমান নিজে যদিও অন্যায়-পাপাচার ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপন করতেন; কিন্তু তৎকালীন আন্দালুসের জনগণ ছিল সামরিক জীবনে অভ্যস্ত। প্রতিবছর তারা নিয়ম করে খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোতে অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আবদুর রহমানও যখন মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে উত্তরে অভিযানে বের হন, কর্ডোভায় বিদ্যমান জনগণ এ সুযোগ লুফে

---

[৪৮১] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৩৮ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ৬৬।

[৪৮২] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ৯৪, তারীখে ইবনে খালদূন, ৪/১৪৯ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪২৬।

Scanned with CamScanner

নেয় এবং পট পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়। তারা প্রাসাদে জড়ো হয়ে জোরপূর্বক খলীফা হিশাম ইবনুল হাকামকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং তার পরিবর্তে মুহাম্মাদ বিন হিশাম বিন আবদুল জাব্বার বিন আবদুর রহমান আননাসির নামক (আবদুর রহমান আননাসিরের প্রপৌত্র) বনু উমাইয়ার জনৈক রাজপুত্রকে খলীফা হিসেবে নির্বাচন করে। হাজিব আবদুর রহমানের কাছে এ সংবাদ পৌঁছামাত্র তার সঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সৈন্যরা ধীরে ধীরে তার কাছ থেকে সটকে পড়ে। আবদুর রহমান যখন কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন, মানুষ তার পরিবর্তে 'মাহদী' উপাধিধারী মুহাম্মাদ বিন হিশামের কাছে ভীড় জমাতে থাকে। অব্যবহিত পরেই মাহদী আবদুর রহমানের উদ্দেশে একদল সৈনিক প্রেরণ করলে তারা প্রথমে তাকে গ্রেফতার করে, এরপর তাকে হত্যা করে তার কর্তিত মস্তক মাহদীর কাছে পাঠিয়ে দেয়।[৪৮৩]

কোন কোন বর্ণনামতে, তিনি একটি মঠে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং জনৈক সন্ন্যাসী তাকে পানাহার দ্রব্য দিয়ে সহায়তা করেছিল। এরপর বনু উমাইয়ার একদল উন্মত্ত লোক তার সন্ধান পেয়ে যায়। প্রাণ বাঁচাতে তিনি মাহদীর আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং অনুনয়-বিনয় করে তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চান; কিন্তু ঘাতক দল সামান্যও করুণা না করে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করে।[৪৮৪]

এর পরপরই পুরো আন্দালুস জুড়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। আবদুর রহমানের হত্যা এবং বিদ্রোহ-ফিতনার আগুন জ্বলে ওঠার নির্ধারিত সময় যেন একই সুতোয় গাঁথা ছিল। যখনই আবদুর রহমান ইবনে আলমানসুর নিহত হলেন, আন্দালুস নামক মালাটির সুতো যেন ছিঁড়ে গেল এবং দানাগুলো খসে পড়তে লাগল। বিদ্রোহ-চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও অভ্যুত্থান চেষ্টা একের পর এক ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ল মুসলিম আন্দালুসের ওপর। একক রাষ্ট্র আন্দালুস ভেঙে বহুধা বিভক্ত হতে শুরু করল।

---

[৪৮৩] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ৯৬, ইবনে খালদূন, তারীখে ইবনে খালদূন, ৪/১৪৯ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪২৬।

[৪৮৪] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৭২।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নবম পরিচ্ছেদ
অব্যাহত অরাজকতা ও উমাইয়া খেলাফতের পতন

হিশাম ইবনুল হাকাম বিন আবদুর রহমান আননাসিরের অপসারণ এবং মাহদী উপাধি গ্রহণকারী মুহাম্মাদ বিন হিশাম বিন আবদুল জাব্বার বিন আবদুর রহমান আননাসিরের খেলাফতপ্রাপ্তির পর আন্দালুসের শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ল। মাহদী ছিলেন নামমাত্র খলীফা, রাষ্ট্র পরিচালনা ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের কোন দক্ষতাই তার ছিল না। ক্ষমতা প্রাপ্তির পর প্রথমেই তিনি যা করলেন, তা হল,

১. প্রশাসনের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত আমিরিয়া বংশোদ্ভূত প্রচুর লোককে তিনি বন্দী করলেন, তাদেরকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাসিত করলেন এবং আমিরিয়াদের ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-আবরুর ওপর নির্দয় হামলা চালালেন। আমিরিয়া গোষ্ঠী এ পরিমাণ লুণ্ঠন, নির্যাতন ও সম্মানহরণের শিকার হল যে, জনসাধারণ আমিরিয়া শাসনামলের কথা স্মরণ করে তাদের জন্য করুণা প্রার্থনা করতে লাগল। তিনি আলমানসুর প্রতিষ্ঠিত আযযাহিরা নগরী ধ্বংস করে ফেললেন এবং সেখানে অবাধ লুণ্ঠনের অনুমতি দিলেন। নির্বোধ শ্রেণির দুষ্ট লোকেরা উন্মত্ত হয়ে মদীনাতুয যাহিরার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল। কিছুদিন পূর্বেও যে নগরী ছিল জৌলুস ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, সামান্য সময়ের ব্যবধানে তা এমন বিরান নগরীতে পরিণত হল যে; মনে হচ্ছিল গতকালও এখানে কিছুই ছিল না![৪৮৫]

২. আন্দালুস সেনাবাহিনী হতে তিনি সাত হাজার সেনাকে ছাঁটাই করলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই বিশালসংখ্যক সেনাসদস্য তার বিরাগভাজন হয়ে গেল।[৪৮৬]

---

[৪৮৫] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৬৩।
[৪৮৬] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৭৮।

Scanned with CamScanner

৩. বার্বারদের প্রতি তিনি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও অবজ্ঞাসূচক আচরণ করতে লাগলেন। ফলে সাধারণ জনগণও তাদের সঙ্গে ধৃষ্টতামূলক ব্যবহার শুরু করল।

বার্বাররা ক'দিন পূর্বেও ছিল সালতানাত ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ; তাছাড়া তারা ছিল সংখ্যা ও ক্ষমতার বিচারে তৎকালীন আন্দালুসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। অধিকন্তু শানজুলের (আবদুর রহমান বিন আলমানসুর) অসৎ চালচলন ও অদক্ষ প্রশাসন পরিচালনার কারণে বার্বাররা ইতঃপূর্বে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার প্রতিপক্ষ (অর্থাৎ মাহদী) কে সহায়তাও করেছিল। কিন্তু এ সবকিছু সত্ত্বেও বনু উমাইয়ার মন তাদের প্রতি প্রসন্ন ছিল না। কারণ, বনু উমাইয়া যাদের হাত থেকে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেছে, বার্বাররা ছিল সেই অধুনা বিলুপ্ত আমিরিয়া সালতানাতের মূল স্তম্ভ। তাই বনু উমাইয়া বার্বারদের সঙ্গে অত্যন্ত অসদাচরণ করল। তাদের প্রতি কঠোরতার বিষয়টি মাহদী গোপন রাখলেন না; বরং প্রকাশ্যেই তাদের প্রতি কঠোরতা করতে লাগলেন; এমনকি একপর্যায়ে তিনি ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি কোন বার্বারকে হত্যা করবে, সে খলীফার পক্ষ থেকে পুরস্কার লাভ করবে!

এ ঘোষণার পর কর্ডোভাবাসী বার্বারদের হত্যা ও মানহানিতে মেতে উঠল। মাহদীর শত্রুতাপূর্ণ আচরণের কারণে পূর্ব থেকেই বার্বাররা বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এ ঘোষণার পর নতুন করে যে অরাজকতা সৃষ্টি হল, তাতে বার্বারদের ক্রোধ ও রোষ আরও বৃদ্ধি পেল এবং তারা পূর্ণ উদ্যমে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিল।[৪৮৭]

খলীফা মাহদীর এই অদূরদর্শী আচরণ বার্বার ও আমিরিয়া গোষ্ঠীর মাঝে তীব্র ক্ষোভ জাগিয়ে তুলল। এমনকি খোদ উমাইয়া গোত্রের লোকেরাও মাহদীর এই নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ, বাস্তুচ্যুতকরণ ও বেপরোয়া কর্মকাণ্ড পছন্দ করতে পারল না। ফলে সর্বদিকে সকল জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে মাহদীর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হল।

বিষয়টি এতটুকুতেই থেমে রইল না। বার্বাররা সমবেত হয়ে উত্তরে সীমান্ত এলাকায় চলে গেল। সেখানে তারা সুলাইমান বিন হাকাম বিন সুলাইমান বিন আবদুর রহমান আননাসিরকে নিয়ে এল এবং তাকে নিজেদের নেতা নির্ধারণ করে 'আলমুসতাঈন আমীরুল মুমিনীন' উপাধি প্রদান করল। শুরু

---

৪৮৭ ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৭৫-৮০, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১১৩ ও *তারীখে ইবনে খালদুন*, ৪/১৫০।

Scanned with CamScanner

হল দু' পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘাত। একদিকে কর্ডোভা নিয়ন্ত্রণকারী মাহদী, অপরদিকে বার্বারদের মদদপুষ্ট সুলাইমান বিন হাকাম।

এর পূর্বে বার্বাররা (খেলাফতের আরেক দাবিদার) হিশাম বিন সুলাইমান বিন আবদুর রহমান আননাসিরকে সহায়তা করার পরিকল্পনা করেছিল; কিন্তু বিষয়টি জানতে পেরে মাহদী হিশাম ও তার ভাইকে গ্রেফতার করেন এবং উভয়কে হত্যা করেন। তখন তাদের উভয়ের চাচাতো ভাই সুলাইমান বিন হাকাম কর্ডোভা থেকে পালিয়ে বার্বারদের কাছে চলে যান। বার্বাররা এবার তার হাতেই বাইআত গ্রহণ করে এবং তাকে 'মুসতাঈন বিল্লাহ' উপাধি প্রদান করে।[৪৮৮]

মুখোমুখি মাহদী-সুলাইমান ... এক বিস্ময়কর ঘটনা

সুলাইমান বিন হাকাম ও তার সঙ্গী বার্বাররা উপলব্ধি করল যে, মাহদীর নেতৃত্বাধীন কর্ডোভা বাহিনীর তুলনায় তাদের সামরিক শক্তি অনেক দুর্বল। এ শক্তি নিয়ে তারা কিছুতেই মাহদী-বাহিনীর সামনে দাঁড়াতে পারবে না। এ দুর্বলতা দূর করতে তারা এমন এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত নিল, ইতঃপূর্বে আন্দালুসের ইতিহাসে বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে যা কখনো করা হয়নি। নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে তারা ক্যাস্টোলার শাসকের কাছে সহায়তা চাইল।

মূলত ক্যাস্টোলা ছিল লিওন সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমের একটি অংশ। লিওনের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন ধরে চলা গৃহযুদ্ধের পর ৩৫৯ হিজরীতে (৯৭০ খৃস্টাব্দে) রাষ্ট্রটি দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পশ্চিম অংশটি মূল রাষ্ট্র অর্থাৎ লিওন সাম্রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে আর পূর্ব অংশটির নাম হয় ক্যাস্টোলা রাষ্ট্র। ক্যাস্টোলা মূলত 'কাসতুল্লা'-এর বিকৃত রূপ। স্প্যানিশ ভাষায় দুর্গকে কাসতুল্লা বলা হয়। এ শব্দটিই আরবীতে এসে কুশতালা (ইংরেজিতে ক্যাস্টোলা) হয়েছে। বিভক্ত শাসকবর্গের শাসনামলে (যার আলোচনা সামনে যথাস্থানে আসবে) ক্যাস্টোলা ধীরে ধীরে শক্তি ও আয়তনে বড় হতে শুরু করে। এই ক্যাস্টোলা রাষ্ট্রের কাছেই সুলাইমান বিন হাকাম ও তার বার্বার সঙ্গীরা মাহদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সাহায্য চাইল।

ক্যাস্টোলা রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট সুলাইমানের নেতৃত্বাধীন বার্বার বাহিনীর সঙ্গে

---

[৪৮৮] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৫০।

Scanned with CamScanner

মাহদীর বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হল। যুদ্ধে মাহদী পরাজিত হলেন। আন্দালুসের ক্ষমতার লাগাম চলে গেল সুলাইমান বিন হাকামের হাতে। যে ক্যাস্টোলা রাষ্ট্র ক'দিন পূর্ব পর্যন্তও অধিকাংশ সময় মুসলমানদের জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকার করে নিত, আজ যেন তাদের জন্য আসমান থেকে অবারিত সৌভাগ্যের বারিধারা নেমে এল! তারাই এখন আন্দালুসের মুসলমানদের পরস্পর গৃহযুদ্ধে লিপ্ত রাখার ও আন্দালুস-ভূমিতে নিজেদের সেনাঘাঁটি স্থাপন করার সুযোগ পেয়ে গেল।[৪৮৯]

পরবর্তী মাত্র বাইশ বছরের সময়কালে আন্দালুস প্রত্যক্ষ করল একের পর এক তেরজন খলীফার ক্ষমতায় আরোহণ এবং পতন কিংবা অপসারণ। প্রকৃতপক্ষে এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আমলের সূচনা হয়েছিল ৩৫৯ হিজরীতে (৯৭০ খৃস্টাব্দে) হিশাম বিন হাকামের মাধ্যমে। এরপর পর্যায়ক্রমে ক্ষমতায় আরোহণ করলেন মাহদী ও সুলাইমান বিন হাকাম। সুলাইমান ক্যাস্টোলা-নৃপতির প্রত্যক্ষ সহায়তায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন ৪০০ হিজরীতে (১০১০ খৃস্টাব্দে)।

মুখোমুখি সুলাইমান-মাহদী ... অতি-বিস্ময়কর ঘটনা!

ঘটনাপ্রবাহ আপন গতিতে এগিয়ে চলল। পরাজিত মাহদী ফেরারী হয়ে চলে গেলেন উত্তরে তুরতুশার দিকে। তুরতুশায় পৌঁছার পর থেকে মাহদী ভাবতে লাগলেন তার সীমিত কয়েক মাসব্যাপী শাসনক্ষমতার কথা; ভাবতে লাগলেন কীভাবে সুলাইমানের হাত থেকে হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা যায়, সে কথা। এ লক্ষ্যে তিনি এবার আমিরিয়া গোষ্ঠীর কারও সাহায্য নেওয়ার পরিকল্পনা করলেন! অথচ এ বনু আমিরই ছিল ক্ষমতায় থাকাকালে তার নির্দয়তার প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

তুরতুশায় অবস্থানকালে মাহদী বনু আমিরের জনৈক মাওয়ালীর সাক্ষাৎ পেলেন। লোকটিকে 'পরিচারক ওয়াযিহ' নামে ডাকা হত। মাহদী খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করামাত্রই এই ওয়াযিহ তার হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। কর্ডোভায় মাহদী যখন প্রাণহানির আশঙ্কা করেছিলেন, তখন পালিয়ে প্রথমে তিনি টলেডোতে এই ওয়াযিহের কাছেই আশ্রয় নেন।

---

৪৮৯ ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৯১, ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ১/১৫০ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪২৮।

Scanned with CamScanner

ওয়াযিহ মাহদীকে আশ্বস্ত করলেন যে, তিনি মাহদীকে নতুন করে ক্ষমতা ফিরে পেতে সহায়তা করবেন এবং বিনিময়ে তাকে কোন উযীরের পদ দিলেই চলবে; যেমন তিনি ইতঃপূর্বে আমিরিয়া সালতানাতের সময় ছিলেন। মাহদীর কাছে ওয়াযিহের প্রস্তাব সন্তোষজনক মনে হওয়ায় তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং উভয়ে মিলে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হলেন। মাঠে নামার পর শুরুতেই তারা অনুভব করলেন যে, সুলাইমান বিন হাকাম ও বার্বারদের বিশাল শক্তি, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্যাস্টোলার সামরিক সহায়তা, এ বিশাল শক্তির সামনে তারা কিছুতেই অটল থাকতে পারবেন না। চিন্তা-ভাবনা করার পর তারা খৃস্টান প্রদেশ বার্সেলোনার প্রশাসকের সহায়তা কামনার সিদ্ধান্ত নিলেন! বার্সেলোনা তখন আন্দালুসের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত অ্যারাগোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বার্সেলোনা ইতঃপূর্বে আবদুর রহমান আননাসির, হাকাম বিন আবদুর রহমান ও পরবর্তী সময়ে হাজিব আলমানসুরের শাসনামলেও মুসলিম আন্দালুসকে জিযিয়া প্রদান করে আসছিল। মুসলিম আন্দালুস রাষ্ট্রে যখন এই গৃহবিবাদ শুরু হল, বার্সেলোনা-প্রশাসন তাদের পুরোনো লাঞ্ছনার কথা ভুলে নব উদ্যমে জেগে উঠল এবং সুলাইমান ও ক্যাস্টোলা-শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মাহদী ও পরিচারক ওয়াযিহকে নিজেদের বাহিনী দিয়ে সহায়তা করল।

বার্সেলোনার প্রশাসক কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে মাহদী ও ওয়াযিহকে সহায়তা করতে সম্মত হলেন। শর্তগুলো হল,

১. যুদ্ধের প্রতিদিনের জন্য বার্সেলোনা-প্রশাসককে প্রদান করতে হবে এক শ' স্বর্ণমুদ্রা।

২. যুদ্ধের প্রতিদিনের জন্য বার্সেলোনার প্রতিটি সৈন্যকে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে। উল্লেখ্য, মুসলমানদের এই পারস্পরিক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য বার্সেলোনার অনেক মানুষই স্বেচ্ছায় সমবেত হয়েছিল। তাই সৈন্যসংখ্যাও ছিল অনেক বেশি।

৩. মাহদী ও ওয়াযিহের সঙ্গী বার্সেলোনার সৈন্যরা যদি যুদ্ধে জয়লাভ করে, তাহলে যুদ্ধলব্ধ সকল অস্ত্র বার্সেলোনা-প্রশাসক লাভ করবেন।

৪. যে সালিম নগরী মুসলিম আন্দালুসের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তশহর হিসেবে বিবেচিত হয় এবং যেখান থেকে সবসময় খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশে যুদ্ধাভিযান প্রেরিত হয়, সেই সালিম নগরী বার্সেলোনা-প্রশাসকের হাতে সমর্পণ করতে হবে।

Scanned with CamScanner

নিঃসন্দেহে এ শর্তগুলো ছিল অত্যন্ত লাঞ্ছনাকর ও অপমানজনক। ভাবতে অবাক লাগে, একজন মুসলমান নেতা কী করে এ ধরনের অবমাননাকর শর্ত মেনে নিয়ে চুক্তি করতে সম্মত হলেন! ঐতিহাসিক ইবনে আ'যারীও এক্ষেত্রে তার বিস্ময় ও ঘৃণা লুকিয়ে রাখতে পারেননি। তিনি লিখেছেন,

> মাহদী সালিম নগরীতে খৃস্টান বাহিনীর প্রবেশের অনুমতি দান ও নগরীটির কর্তৃত্ব তাদেরকে প্রদান করতে সম্মত হলেন। বার্বারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা লাভের জন্য দূরাচার ইবনে আবদুল জাব্বার (মাহদী) পুরো শহর থেকে মুসলমান নাগরিকদের বের করে দিয়ে কাফির সৈন্যদের অবতরণের সুযোগ করে দিলেন। ফিরিঙ্গী সৈন্যরা আন্দালুসের মধ্য সীমান্ত-নগরী সালিম শহরে প্রবেশ করল এবং এর নিয়ন্ত্রণভার নিজেদের হাতে নিয়ে নিল। শহরে প্রবেশ করে প্রথমেই তারা (কেন্দ্রীয়) মসজিদে প্রবেশ করল; মসজিদে একটি ঘন্টা ঝুলিয়ে দিল এবং মসজিদের কেবলার দিক পরিবর্তন করে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়ে দিল।
>
> এরপর তারা ওয়াযিহের কাছে দাবি জানাল, প্রত্যেক সৈন্যের জন্য দৈনিক দু'টি স্বর্ণমুদ্রা, প্রয়োজনীয় শরাব-মাংস ও অন্যান্য সুবিধাদি দিতে হবে। আর বার্সেলোনার প্রশাসক (কাউন্ট) গোমেজকে প্রদান করতে হবে দৈনিক এক শ' স্বর্ণমুদ্রা, প্রয়োজনীয় শরাব-মাংস ও অন্যান্য সুবিধাদি। তারা আরও দাবি জানাল, বার্বার সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাওয়া যাবে, তা থেকে কেবল অস্ত্র-শস্ত্র নয়; বরং যুদ্ধবাহন, যুদ্ধাস্ত্র ও অর্থ-সম্পদসহ সকল যুদ্ধলব্ধ সম্পদই তাদেরকে দিতে হবে আর বার্বারদের জান-মাল ও নারী সবই বার্সেলোনার সৈনিকদের জন্য বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে মাহদীর বাহিনীর কেউ কোন প্রকার বাধা দিতে পারবে না। এ ছাড়াও আরও অনেক শর্তই তারা আরোপ করল; আর ওয়াযিহ সব শর্তই মেনে নিলেন।[৪৯০]

কর্ডোভার উত্তরে উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হল। এক দিকে মাহদী (মুহাম্মাদ বিন হিশাম বিন আবদুল জাব্বার), তার সঙ্গে পরিচারক ওয়াযিহ আলআমিরী ও বার্সেলোনার প্রশাসক; অপর দিকে 'মুসতাঈন

---

[৪৯০] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৯৪।

Scanned with CamScanner

বিল্লাহ' উপাধিধারী খলীফা সুলাইমান বিন হাকাম, তার সঙ্গে বার্বার সৈন্যদল। যুদ্ধে মাহদীর দল জয়লাভ করল আর পরাজিত সুলাইমান বেঁচে থাকা বার্বার সৈন্যদের নিয়ে পালিয়ে গেলেন। চুক্তিমতো সালিম নগরীর কর্তৃত্ব ও যাবতীয় যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বার্সেলোনার প্রশাসককে প্রদান করা হল। মাহদী নতুন করে লাভ করলেন কর্ডোভার শাসনক্ষমতা;[৪৯১] বিনিময়ে হারালেন ...!

দৃশ্যপটে ওয়াযিহ ও পদচ্যুত খলীফা হিশাম বিন হাকাম

নতুন করে ক্ষমতা দখল করার পর মাহদী এবারও তার পূর্বের ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নীতি হতে ফিরে এলেন না। তিনি পুনরায় বার্বারদের পেছনে লাগলেন এবং খৃস্টানশক্তির সহায়তায় নির্বিচারে তাদের হত্যা ও সম্ভ্রমহানি করতে লাগলেন। বার্বাররাও নিরুপায় হয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হল এবং মাঝেমধ্যেই কর্ডোভার ঝটিকা হামলা চালাতে লাগল।
কর্ডোভাবাসী এ পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে মাহদীর প্রশাসনের হাজিব ওয়াযিহের শরণাপন্ন হল এবং মাহদীকে হত্যা করার জন্য তাকে প্ররোচিত করতে লাগল। কারণ, মাহদীর কারণেই তাদের ওপর এই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্যোগ নেমে এসেছে। আর পরিস্থিতিও ছিল ওয়াযিহের অনুকূলে। কেননা, এই বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও মাহদী ব্যস্ত ছিলেন খেল-তামাশা ও আনন্দ-প্রমোদে।
এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, স্বয়ং ওয়াযিহের মনও মাহদীর প্রতি প্রসন্ন ছিল না। কেননা, এ মাহদীই কিছুদিন পূর্বে তার প্রথমবারের শাসনামলে বনু আমিরকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে এবং দেশ থেকে নির্বাসিত করেছে। কারণ যাই হোক, কিছুদিন পরই ওয়াযিহ মাহদীর বিরুদ্ধে চলে গেলেন এবং তাকে হত্যা করে নিজেই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন।
ওয়াযিহ ছিলেন আবদুর রহমান বিন আলমানসুরের তুলনায় মেধাবী। আবদুর রহমান ইতঃপূর্বে খলীফা হিশাম বিন হাকামের কাছ থেকে জোরপূর্বক ভবিষ্যৎ খলীফা হওয়ার স্বীকৃতি লিখিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়াযিহ সে পথে গেলেন না। তিনি ভালো করেই জানতেন, জনগণ বনু আমিরের কাউকে নয় বরং বনু উমাইয়ার কাউকে খলীফার আসনে দেখে অভ্যস্ত। সুতরাং ওয়াযিহ যদি বনু উমাইয়ার কাউকে খলীফা হিসেবে বরণ

---

[৪৯১] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৯৫ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ: ১১৫।

Scanned with CamScanner

করে নেন, তাহলে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। ভবিষ্যতে তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিদ্রোহ হওয়ার আশঙ্কাও থাকবে না এবং বিরোধরত সকল দল ও মতের লোকেরা তার এই সিদ্ধান্তকে প্রশান্তচিত্তে মেনে নিবে।

এ সকল দিক বিবেচনা করে ওয়াযিহ সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি একজন উমাইয়া ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করবেন এবং নিজে পর্দার আড়ালে থেকেই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করবেন। সবদিক বিবেচনা করে তিনি দেখলেন, পদচ্যুত খলীফা হিশাম বিন হাকামই এ ভূমিকা পালন করার এবং একজন নামমাত্র খলীফার চরিত্র বাস্তবায়ন করার সবচে' উপযুক্ত ব্যক্তি; যিনি ইতঃপূর্বে হাজিব আলমানসুর, আবদুল মালিক বিন আলমানসুর ও আবদুর রহমান বিন মানসুরের শাসনামলে একটানা তেত্রিশ বছর 'খলীফা' চরিত্রে সফল অভিনয় করেছেন।

'মুজাইয়াদ বিল্লাহ' উপাধিধারী হিশাম বিন হাকাম নতুন করে খেলাফতের পদে সমাসীন হলেন। কিন্তু এবারও তার ভাগ্যে জুটলো না প্রকৃত ক্ষমতা। ক্ষমতার বাগডোর রয়ে গেল বর্তমান 'হাজিবুস সালতানাত' পরিচারক ওয়াযিহের হাতে।[৪৯২]

সুলাইমান বিন হাকামের গর্হিত কিছু পদক্ষেপ ইতিহাস যার স্মরণে আজও ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ক্ষমতার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সুলাইমান বিন হাকাম জান বাঁচিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পালিয়ে গিয়ে তিনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই অবস্থান করে নতুন করে ক্ষমতা দখলের জন্য নানাবিধ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। নিজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি দ্বিতীয়বারের মতো ক্যাস্টোলা-শাসকের শরণাপন্ন হলেন। ইতঃপূর্বে প্রথমবার মাহদীকে পরাজিত করে ক্ষমতা লাভ করার সময়ও তিনি ক্যাস্টোলা-সম্রাটের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। এবার তিনি ভৃত্য ওয়াযিহ ও হিশাম বিন হাকামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পুনরায় খেলাফত লাভ করতে ক্যাস্টোলা-নৃপতির সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

সম্ভবত সুলাইমানের এই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের সংবাদ কর্ডোভার রাজদরবারেও পৌঁছেছিল। এ সম্ভাবনাও আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না যে,

---

[৪৯২] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৯৭, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১১৪, ইবনে খালদুন, *তারীখে ইবনে খালদুন*, ৪/১৫১ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪২৮।

Scanned with CamScanner

স্বয়ং ক্যাস্টোলা-নৃপতিই এ সংবাদ কর্ডোভায় পৌঁছিয়েছিলেন। আর তাই ক্যাস্টোলা-নৃপতিকে নিজেদের পক্ষে টানতে হিশাম-ওয়াযিহ প্রশাসন উত্তরের এমন দুই শ' দুর্গের কর্তৃত্ব ক্যাস্টোলার হাতে ছেড়ে দিল, যা ইতঃপূর্বে খলীফা হাকাম, হাজিব আলমানসুর ও হাজিব আলমুযাফফার জয় করেছিলেন। এর ফলে ক্যাস্টোলা রাষ্ট্রের আয়তন অনেক বেড়ে গেল এবং আয়তনে তা লিওনের চেয়েও বড় হয়ে গেল। অথচ ক'দিন পূর্বেও ক্যাস্টোলা ছিল লিওন হতে বিচ্ছিন্ন ছোট্ট একটি রাষ্ট্র। পাশাপাশি এর ফলে আন্দালুসের উত্তর সীমান্তের খৃস্টান অধিকৃত অঞ্চলও আয়তনে অনেক বড় হয়ে গেল।[৪৯৩]

নিঃসন্দেহে এ সিদ্ধান্তটি ছিল মুসলিম আন্দালুসের জন্য বড় দুর্যোগের বিষয়। এরই প্রেক্ষাপটে চলতে লাগল হত্যাযজ্ঞ, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র, সংঘাত, খৃস্টানদের সহায়তা গ্রহণ এবং এরই ধারাবাহিকতায় একসময় মুসলিম রাষ্ট্রে খৃস্টানশক্তির অনুপ্রবেশ। আর এ সবকিছুই হল মাত্র তিন বছরের মধ্যে।
৪০৩ হিজরীতে (১০১২ খৃস্টাব্দে) সুলাইমান বিন হাকাম বার্বারদের সঙ্গে নিয়ে এমন একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন, মুসলমানদের ইতিহাসে ইতঃপূর্বে কখনো যা ঘটেনি। সুলাইমান তার বাহিনী নিয়ে কর্ডোভায় হামলা করলেন, ব্যাপক ধ্বংস-হত্যাযজ্ঞ-সম্ভ্রমহানি চালালেন। এরপর সুলাইমান নতুন করে আন্দালুসের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। খলীফা হিশাম বিন হাকাম পালিয়ে গেলেন কিংবা নিহত হলেন। তার পরিণতি সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা গেল না। কর্ডোভা যদিও তখন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ও প্রশাসনের মূল কেন্দ্র ছিল; কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা তখন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল। সুলাইমান ক্ষমতা দখল করার পর বনু আমিরের লোকজন আন্দালুসের উত্তর সীমান্তে ভ্যালেন্সিয়া ও তার আশেপাশের এলাকায় পালিয়ে গেল।[৪৯৪]

সুলাইমানের বিরুদ্ধে বার্বারদের বিদ্রোহ ... নতুন সংঘাত

৪০৩ হিজরীতে সুলাইমান বিন হাকাম দ্বিতীয়বারের মতো খেলাফতের

---

[৪৯৩] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৪/১৫১, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১১৭ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪২৮।
[৪৯৪] দেখুন : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১১, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১১৮, *তারীখে ইবনে খালদুন*, ৪/১৫১ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪২৯।

Scanned with CamScanner

দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তার বাহিনীর অধিকাংশ সদস্যই ছিল বার্বার বংশোদ্ভূত। এবার ক্ষমতায় আরোহণের একবছর পরই সুলাইমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হল। সিউটা নগরীর প্রশাসক আলী বিন হামুদ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। বার্বার নেতা আলী বিন হামুদ দাবি করলেন, তিনি সাবেক খলীফা হিশাম বিন হাকামের (দু'বারের পদচ্যুত খলীফা) কাছ থেকে একটি বার্তা লাভ করেছেন এবং বার্তায় হিশাম তার মৃত্যুর পর আলী বিন হামুদকে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার অসিয়ত করে গেছেন।[৪৯৫] অবশ্য কোন কোন বর্ণনামতে, প্রথমে সুলাইমানের মূল শক্তি আন্দালুসী বার্বার গোষ্ঠী-ই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনস্থ করেছিল এবং তারাই সাবেক খলীফা হিশামের নামে এ বার্তাটি তৈরি করে আলী বিন হামুদের কাছে প্রেরণ করেছিল।

প্রেক্ষাপট যাই হোক, সিউটায় আলী বিন হামুদ বিদ্রোহ করলেন এবং আন্দালুসে তার সমমনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর তিনি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুসের মূল ভূখণ্ডে পা রাখলেন। ৪০৭ হিজরীতে (১০১৬ খৃস্টাব্দে) আলী বিন হামুদ ও খলীফা সুলাইমানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হল। যুদ্ধে বার্বার নেতা আলী বিন হামুদ জয়লাভ করলেন। কর্ডোভার সিংহাসনে আবারও পালাবদল হল।

শাসনক্ষমতা দখল করে আলী বিন হামুদ প্রথমেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-প্রচেষ্টার পথ বন্ধ করে দিতে মনস্থ করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সুলাইমান, তার জীবিত এক ভাই ও তাদের পিতা হাকামকে হত্যা করলেন। এরপর তিনি 'আননাসির বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে কর্ডোভা-সিংহাসনে আরোহণ করলেন।[৪৯৬]

ক্ষমতার লাগাম পুরোপুরি আলী বিন হামুদের হাতে চলে এল। এখান থেকে শুরু হল আন্দালুস ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। উমাইয়া সালতানাতের পরিবর্তে আন্দালুসে এখন হামুদিয়া সালতানাত। আলী তার ভাই কাসিম বিন হামুদকে সেভিলের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। কর্ডোভা ও আশেপাশের অঞ্চলগুলোর প্রশাসনদায়িত্ব বার্বাররাই পালন করতে লাগল।

পরিবর্তিত এ প্রেক্ষাপটে আন্দালুসের পূর্ব সীমান্তে আশ্রয় নেওয়া বনু আমীর গোত্রের লোকেরা মোটেই সন্তুষ্ট হল না। তারা খলীফা হিসেবে বরণ করার জন্য আরেকজন উমাইয়া ব্যক্তিকে খুঁজতে লাগল। অবশেষে তারা আবদুর রহমান আলনাসিরের আরেকজন দৌহিত্র আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন

---

[৪৯৫] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১১৬।

[৪৯৬] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ। ১২১।

Scanned with CamScanner

আবদুল্লাহকে নির্বাচন করল এবং তার হাতে খেলাফতের বাইআত গ্রহণ করল। আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ 'মুরতাযী বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করলেন।[৪৮৭]

রাজধানী কর্ডোভা দখলের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমিরিয়া গোষ্ঠী মুরতাযী বিল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে গ্রানাডা অভিমুখে রওয়ানা হল। কিন্তু ফিতনার যুগের নিয়ম মেনেই যেন আবারও ঘটল এক বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা। আমিরিয়াদের তৎকালীন নেতা খাইরান আলআমিরী মুরতাযীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বিস্মিত হলেন এবং নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আর যাই হোক এই ব্যক্তি হিশাম আলমুআইয়াদ বিল্লাহর ন্যায় ননীর পুতুল কিছুতেই হবে না। তাই তিনি গোপনে মুরতাযীর বিপক্ষে চলে গেলেন এবং হামুদীদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। গ্রানাডার বার্বার গভর্নর যাবী বিন যীরীর বাহিনীর সঙ্গে মুরতাযীর বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হলে খাইরান স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করলেন; ফলে মুরতাযীর বাহিনীও হেরে গেল। এর পরপরই খাইরানের কয়েকজন ভৃত্য মুরতাযীকে পাকড়াও করে হত্যা করল।

এদিকে এ ঘটনার সামান্য পূর্বে কর্ডোভায় সংঘটিত হল আরেক বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা। বনু উমাইয়ার মাওয়ালী তিন সাকলাবী ভৃত্য গোপনে নতুন খলীফা আলী বিন হামুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল এবং রাজপ্রাসাদের স্নানাগারের মধ্যে তাকে হত্যা করল।

আলী বিন হামুদ নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ডোভা নিয়ন্ত্রণকারী বার্বাররা নিহত আলীর ভাই সেভিল-প্রশাসক কাসিম বিন হামুদের কাছে বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ উল্লেখ করে বার্তা পাঠাল।

বিবাদমান দু' পক্ষের দুই প্রধান নেতার মৃত্যুতেও কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত হল না। এবার কাসিম বিন হামুদের বিরুদ্ধে সিউটায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তারই ভ্রাতুষ্পুত্র ও নিহত খলীফা আলীর পুত্র ইয়াহইয়া বিন আলী বিন হামুদ। ইয়াহইয়ার দাবি পিতার মৃত্যুর পর স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে তিনিই এখন মুসলিম আন্দালুসের খলীফা। একদল বার্বারও তার পক্ষে সমবেত হল। ইয়াহইয়া তাদের নিয়ে কর্ডোভার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। সংবাদ পেয়ে চাচা কাসিম কর্ডোভা ছেড়ে সেভিলে চলে গেলেন। এরপর যা ঘটল, তাকে অত্যাশ্চর্য বললেও কম বলা হবে। চাচা-ভাতিজার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হল এবং একে অপরকে খলীফা বলে মেনে নিলেন। অর্থাৎ একই রাষ্ট্রে

---

[৪৮৭] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ। ১৩০।

Scanned with CamScanner

দু'জন খলীফা! ইয়াহইয়া কর্ডোভার; কাসিম সেভিলের। এ সম্পর্কেই ইবনে হাযম রহ. লিখেছেন,

> পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে কুৎসিত ও জঘন্য কোন বিষয় এবং পশ্চাৎপদতার এরূপ সুস্পষ্ট উদাহরণ কোনদিন শোনা যায়নি। ইয়াহইয়া কর্ডোভার খলীফা; আর কাসিম সেভিলের![৪৯৮]

অবশ্য এতেও পরিস্থিতি মোটেই শান্ত হল না; বরং ক্ষমতার পালাবদল ও বিদ্রোহ-প্রচেষ্টার এক ধারা চালু হয়ে গেল। যখনই কর্ডোভার নতুন কোন খলীফা নির্ধারণ করা হত, তিনি বার্বার বংশোদ্ভূত হলে কর্ডোভাবাসী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত; আর উমাইয়া গোত্রের হলে খলীফা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। কারণ, কালের পরিক্রমায় বনু উমাইয়া ততদিনে তার শ্রেষ্ঠতম ও শক্তিশালী পুরুষদের হারিয়ে ফেলেছিল এবং কিছু দুর্বল ও ভীরুচিত্তের মানুষের মাঝে বনু উমাইয়ার অস্তিত্ব টিকে ছিল।

এরপর একের পর এক অনেকগুলো সংঘাত ও হানাহানির ঘটনা ঘটল। ৪২২ হিজরী (১০৩১ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত এরূপ অস্থিতিশীল পরিস্থিতিই বজায় রইল আন্দালুস-ভূমিতে।

খলীফানির্ভর শাসনযুগের সমাপ্তি এবং শুরা-পদ্ধতির সূচনা

মুসলিম আন্দালুস জুড়ে বিরাজমান এই সংকট ও জটিলতা থেকে মুক্তি এবং চলমান সংঘাতের এই বিশাল তরঙ্গকে স্তিমিত করার প্রচেষ্টা হিসেবে ৪২২ হিজরীতে (১০৩১ খৃস্টাব্দে) কর্ডোভার আলিমসমাজ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একত্র হলেন। তারা এ বিষয়ে একমত হলেন যে, বর্তমানে বনু উমাইয়ার মধ্যে এমন কোন প্রতিনিধি নেই, যিনি প্রশাসন পরিচালনার যোগ্যতা রাখেন। এ পরামর্শসভার সভাপতি ও মধ্যমণি ছিলেন কর্ডোভার বিখ্যাত বিচারক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব আবুল হাযম বিন জাহওয়ার। আবুল হাযম তৎকোলীন আন্দালুসের বিশিষ্ট আলিম ছিলেন এবং তাকওয়া ও খোদাভীতি, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

এ অবস্থায়ই কেটে গেল আরও প্রায় তিন বছর। এরপর ইবনে জাহওয়ার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি মজলিসে শুরা গঠন করলেন। কিন্তু বাস্তবতা হল, ইবনে জাহওয়ার ও তার মজলিসে শুরা মুসলিম আন্দালুস-ভূমির মধ্যে

---

[৪৯৮] ইবনে হাযম, রাসাইলু ইবনি হাযম, ২/৯২।

Scanned with CamScanner

কেবল কর্ডোভার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পেরেছিল। দেশের বাকি অংশ তখন পুরোপুরি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। প্রকৃতপক্ষে আন্দালুস তখন গোত্র-বংশ ও জাতি-শ্রেণির ভিন্নতার ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হতে শুরু করেছিল এবং এর মাধ্যমেই পরবর্তী সময়ে গঠিত 'জাতিভিত্তিক বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের যুগ'-এর পথ উন্মুক্ত হয়েছিল।[৪৯৯]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আন্দালুসের আয়তন ছিল ছয় লক্ষ কিলোমিটার। এর মধ্যে উত্তর সীমান্তের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো যে এলাকা দখল করে রেখেছিল, তা বাদ দিলে থাকে সাড়ে চার লক্ষ কিলোমিটার (মিশরের আয়তনের অর্ধেকেরও কম)[৫০০]। সাড়ে চার লক্ষ কিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট মুসলিম আন্দালুস রাষ্ট্র এ সময় খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বাইশটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল এবং প্রতিটি রাষ্ট্রেরই ছিল রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাবাহিনী, মন্ত্রিপরিষদ্, কর্মকর্তাপরিষদ্, দূত ও রাষ্ট্রদূতসহ একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রকাঠামোর প্রয়োজনীয় সকল উপাদান।

এভাবে আন্দালুসের মুসলমানগণ এমনভাবে বিভক্ত হয়ে গেল, যার দৃষ্টান্ত তাদের অতীত ইতিহাসে ছিল না। এর মাধ্যমে যদিও তারা নিজেদের জাতিপরিচয়ের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রভূমি লাভ করেছিল; কিন্তু হারিয়ে ফেলেছিল তাদের শক্তির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটিকেই; আর তা হল একতার উপাদান। পরিণতিতে যে পতন ও নিম্নগামিতা তাদের ঘিরে ধরেছিল, তা ছিল বড় ভয়াবহ।

---

[৪৯৯] তারীখে ইবনে খালদুন, ৪/১৯৫।

[৫০০] পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মিশরের মোট আয়তন ১০,০২,৪৫০ বর্গ কিলোমিটার। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দশম পরিচ্ছেদ
পতনের কারণ অনুসন্ধান

একদল গবেষকের মতে আমিরিয়া সালতানাতের পতন এবং তার অনিবার্য পরিণতিরূপে উমাইয়া খেলাফতের বিলোপ– উভয়টির কার্যকারণ ছিল আবদুর রহমান বিন আলমানসুরের ক্ষমতাগ্রহণ। এই দুরাচার-নির্লজ্জ ব্যক্তিটিই বনু উমাইয়াকে খেলাফত ত্যাগে বাধ্য করেছিল এবং আন্দালুসে সংঘাত ও অস্থিতিশীল পরিবেশের জন্ম দিয়েছিল।

কিন্তু বাস্তবতা হল, মাত্র একজন পাপী ব্যক্তির সীমিত কয়েক মাসের শাসনের কারণে একটি জাতিকে এভাবে ধ্বংস করে ফেলা মহান আল্লাহ তাআ'লার রীতি নয়। আবদুর রহমান বিন হাকাম তো এক বছরেরও কম সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার অন্যায়-অপকর্ম ও অশ্লীলতা-বেহায়াপনা যতই বেশিই হোক না কেন, কিছুতেই তা আন্দালুস রাষ্ট্রের এ ধরনের ব্যাপক পতন ও ভাঙনের কারণ হতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অন্য কিছু কারণ ও কার্যকারণ লুকিয়ে আছে, যা বহু পূর্ব হতেই বীজ থেকে চারা হয়ে বেড়ে উঠছিল এবং কালের পরিক্রমায় বড় হতে হতে অবশেষে আবদুর রহমান বিন আলমানসুরের শাসনামলে গগনচুম্বী আকার ধারণ করেছিল। আর তখনই তার পরিণতিতে এই বিভক্তি ও ভাঙন সৃষ্টি হয়েছিল।

পূর্বে উমাইয়া প্রশাসক-আমলের দুর্বলতার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করতে গিয়েও আমরা দেখেছি যে, সেসব কারণ ও কার্যকারণের শিকড় বহু পূর্বে প্রতাপশালী উমাইয়া প্রশাসকদের আমলেই চারা হয়ে গজিয়ে উঠেছিল। আমাদের বিবেচনায় আমিরিয়া সালতানাত ও উমাইয়া খেলাফতের পতনের মৌলিক কার্যকারণ তিনটি।

১. ভোগ-বিলাস ও শৌখিনতার ব্যাপক প্রচলন

মূলত আবদুর রহমান আননাসিরের শাসনামলে তার মাধ্যমেই এর সূচনা হয়েছিল। এ মহান শাসকের শাসনামল অন্যান্য নানা বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি

Scanned with CamScanner

সীমাহীন বিলাসিতা, শৌখিনতা এবং পার্থিব চাকচিক্য ও সাজসজ্জার পেছনে প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার দিক থেকেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। রাজ্য চলে রাজার চালে, এ প্রবাদকে মেনে জনগণও বিভিন্ন অর্থহীন ও তুচ্ছ কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। আর এটা তো চিরন্তন সত্য যে, পৃথিবী ও পার্থিব-সম্পদ হল সংহারক ও বিনাশী এক সত্তা।

আমাদের এ দাবির সবচে' জ্বলন্ত প্রমাণ হল আবদুর রহমান আননাসিরের প্রতিষ্ঠিত আযযাহরা রাজপ্রাসাদ। আযযাহরা রাজপ্রাসাদ ছিল সৌন্দর্য ও জৌলুসের, আকর্ষণ ও চমৎকারিত্বের অনন্য-অসাধারণ নিদর্শন। আযযাহরা প্রাসাদ ছিল সে সময়ের 'যুগের বিস্ময়'। আয়তনের বিশালতা ও প্রশস্ততার পাশাপাশি এর পুরো ভেতরাবরণ ছিল স্বর্ণ দ্বারা আচ্ছাদিত। এমনকি এর সুবিশাল ছাদও স্বর্ণ-রূপার মিশ্রণ দ্বারা আস্তর করা ছিল। আযযাহরার বিশালতা ও কাঠামো-সৌন্দর্য পর্যটক ও দর্শনার্থীদের দৃষ্টি ঝলসে দিত, চিন্তা ও বোধশক্তিকে সাময়িক নিশ্চল করে দিত।[৫০১] আবদুর রহমান আননাসির যদিও শিক্ষাখাত, সামরিক খাতসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কোন খাতেই প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ে কোন প্রকার কার্পণ্য করেননি; কিন্তু তার আযযাহরা নগরী ও আযযাহরা প্রাসাদ নির্মাণকে অতিশয় বিলাসিতা ও সীমাতিরিক্ত শৌখিনতা ছাড়া আর কী-ইবা বলা যেতে পারে! আর বিলাসিতা ও শৌখিনতাই শেষ পর্যন্ত মানবহৃদয়কে পার্থিব চিন্তা-চেতনা ও চাকচিক্যের প্রতি অনুরক্ত করে তোলে।

আযযাহরা প্রাসাদ সম্পর্কিত ইতিহাসবিবরণীতে এসেছে, কর্ডোভার খতীব কাযী মুনযির বিন সাঈদ রহ. একবার আবদুর রহমান আননাসিরের সঙ্গে তার আযযাহরা রাজপ্রাসাদে সাক্ষাৎ করলেন। অনেকটা অহমিকা-ভারে আক্রান্ত হয়েই আননাসির তাকে প্রশ্ন করলেন, মুনযির! এ রাজপ্রাসাদ সম্পর্কে আপনার কী মতামত?

মুনযির বিন সাঈদ যখন উত্তর দিচ্ছিলেন, হৃদয়-বেদনা ও মর্মযাতনা অশ্রুতে পরিণত হয়ে তার গণ্ডদেশ বেয়ে পড়ছিল এবং শ্মশ্রুকে সিক্ত করছিল। তিনি বললেন, আল্লাহ আপনাকে যে অফুরন্ত নেয়ামত প্রদান করেছেন এবং তার অনেক বান্দার ওপর কর্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তাকে পুঁজি করে শয়তান তো আপনার ওপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে যে, আপনাকে কাফিরদের স্তরেই নামিয়ে দিয়েছে!

---

[৫০১] দেখুন : মাক্কারী, নাফহুত তীব, ১/৫৬৬।

Scanned with CamScanner

-মুনযির! এ কী বলছেন আপনি?! বিস্ময়ভরা কণ্ঠে আবদুর রহমান আননাসির বললেন। কী বলছেন, ভেবে দেখেছেন? শয়তান আমাকে কাফিরদের স্তরে নামিয়ে দিয়েছে?!

মুনযির উত্তর দিলেন, আল্লাহ তাআ'লা কি পবিত্র কোরআনে এ কথা ঘোষণা করেননি,

﴿وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا

مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾

> সমস্ত মানুষ একই মতাবলম্বী (অর্থাৎ কাফির) হয়ে যাবে– এই আশঙ্কা না থাকলে, যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে, আমি তাদের ঘরের ছাদও করে দিতাম রূপার এবং তারা যে সিঁড়ি দিয়ে চড়ে তাও। [সূরা যুখরুফ : ৩৩]

আল্লাহ তাআ'লা তো এ আয়াতে রৌপ্য-নির্মিত ছাদের কথা অসাধ্য ও অসম্ভবরূপে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, পার্থিব আকর্ষণ ও আখিরাত-ত্যাগের কারণে যদি সব মানুষের কুফরীর আশঙ্কা না থাকত, তাহলে আমি পৃথিবীতে তাদের এ ধরনের গৃহ দান করতাম। কারণ, দুনিয়া তো আমি আল্লাহর কাছে একেবারেই তুচ্ছ। কিন্তু আমি তা করিনি। অথচ আবদুর রহমান আননাসির তা-ই করেছে এবং নিজের প্রাসাদের জন্য নির্মাণ করেছে রৌপ্যনির্মিত ছাদ!

মুনযির বিন সাঈদ বলে যাচ্ছিলেন আর তার উচ্চারিত একেকটি শব্দ যেন আবদুর রহমান আননাসিরের অন্তরে পাথরের শেল হয়ে বিদ্ধ হচ্ছিল। মুনযিরের কথা শেষ হলে আবদুর রহমান আননাসির একেবারে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। তার গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে প্রাসাদের উক্ত ছাদটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং তাতে যে স্বর্ণ-রূপার প্রলেপ ছিল, তা অপসারণ করলেন। এরপর তৎকালীন প্রচলিত নিয়মে পুনরায় ছাদটি নির্মাণ করলেন। তবে সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কালের পরিক্রমায় বিলাসিতা আবারও দৃশ্যপটে ফিরে এল; বরং নব উদ্যমে উদ্ভাসিত হল; এমনকি অর্থহীন বিভিন্ন কাজেও সেদারসে অর্থব্যয় হতে লাগল। আর আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

Scanned with CamScanner

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾

যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তাদের বিত্তবান লোকদেরকে (ঈমান ও আনুগত্যের) হুকুম দিই; কিন্তু তারা তাতে নাফরমানী করে। ফলে তাদের সম্পর্কে কথা চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলি। [সূরা বনী ইসরাঈল : ১৬]

২. অযোগ্য ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব অর্পণ

বিলাসিতা-শৌখিনতা ও অপব্যয়ের পাশাপাশি আমিরিয়া সালতানাত ও উমাইয়া খেলাফতের পতনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণ ছিল অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ। এ কার্যকারণটি পরিপূর্ণ সুস্পষ্টরূপে মূর্ত হয়ে ওঠে যখন হাকাম বিন আবদুর রহমান আননাসির তার পরবর্তী খলীফা হিসেবে নিজ পুত্র হিশামকে নির্বাচন করেন; অথচ হিশাম তখন নিতান্তই বালক; যার বয়স তখনও বার পেরোয়নি। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে হাকাম যেন উমাইয়া খেলাফতের পতনকেই ত্বরান্বিত করেছিলেন। কেননা, এর ফলে ক্ষমতা এমন কিছু ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল, যারা উমাইয়া চেতনার অধিকারী ছিল না। যদিও তাদের মধ্যে আলমানসুর ও তার পুত্র আলমুযাফফারের মতো প্রভাবশালী ও সহজাত দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বও ছিলেন; কিন্তু তাদের পরবর্তীদের মধ্যে যোগ্যতা ও দক্ষতার অভাব যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল।

কিয়ামতের নিদর্শন ও সময়কাল সম্পর্কে জনৈক সাহাবীর করা এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন,

«فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»

যখন আমানত বিনষ্ট হবে, তখন শীঘ্রই কেয়ামত আগমনের অপেক্ষা করো। বিচক্ষণ সাহাবী পরবর্তী প্রশ্ন করেছিলেন, আমানত কীভাবে বিনষ্ট হবে? নবীজী উত্তর দিলেন,

Scanned with CamScanner

«إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»

কোন দায়িত্ব যখন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।[৫০২]

এভাবেই কোন পদ ও দায়িত্বের অযোগ্য ব্যক্তি যখন উক্ত পদ গ্রহণ বা অধিগ্রহণ করে, তখন অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে রাষ্ট্রে আন্দোলন ও প্রকম্পন এবং ভাঙন ও পতন নেমে আসে। তাহলে এবার ভেবে দেখুন, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ (খলীফার পদ) যখন এই অনাচার ও অনধিকার চর্চার শিকার হয়, তখন অবস্থা কতটা ভয়াবহ হতে পারে?।

আর তাই আমানত যখন বিনষ্ট হল, দায়িত্ব যখন অযোগ্যের হাতে অর্পিত হল, মুসলিম আন্দালুসের ভাগ্যেও নেমে এল বিপর্যয়; আর খেলাফতে উমাইয়া ও সালতানাতে আমিরিয়ার ওপর নেমে এল পতনের মহাপ্রলয়![৫০৩]

---

[৫০২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৭১৪।

[৫০৩] গ্রন্থকার পরিচ্ছেদের শুরুতে তিনটি কার্যকারণ আলোচনা করার কথা বললেও 'ক্বিসসাতুল আন্দালুস' (قصة الأندلس)-এর গ্রন্থ-সংস্করণে কেবল দু'টির আলোচনা রয়েছে। তৃতীয় কারণটি সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদ বা অনিবার্য অন্য কোন কারণে ছুটে গেছে। অনলাইনভিত্তিক আরবী গ্রন্থের সুপরিচিত সাইট 'আলমাকতাবাতুশ শামিলা'-তে ক্বিসসাতুল আন্দালুস-এর যে সংস্করণ আছে, তাতে তৃতীয় কারণটিও উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য, মাকতাবার সংস্করণটি ক্বিসসাতুল আন্দালুস-এর গ্রন্থরূপ নয়; বরং গ্রন্থকারের আন্দালুস বিষয়ক লেকচার-সমগ্র। গ্রন্থরূপে প্রকাশ করার সময় স্বাভাবিকভাবেই তাতে অনেক পরিবর্তন-পরিমার্জন করা হয়েছে। আমরা এখানে 'আলমাকতাবাতুশ শামিলা' থেকে তৃতীয় কারণটি উদ্ধৃত করছি। (অনুবাদক)

উমাইয়া খেলাফত ও আমিরিয়া সালতানাতের পতনের তৃতীয় কারণ হল, আমিরিয়া সালতানাতের প্রারম্ভকাল হতেই আন্দালুস-প্রশাসন নির্ভর করেছিল জনবল, অস্ত্রবল, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি বস্তুশক্তির উপর। নিজেদের মনোযোগ ও চিন্তা, আস্থা ও নির্ভরতা তারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি নিবদ্ধ করেনি; সাধারণ জনগণকে তারা গড়ে তোলেনি সংগ্রামী চেতনায়; শাহাদাত ও জান্নাত লাভের তাড়নায়। আমিরিয়া সালতানাতের দীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে চলা এই দীক্ষা-শূন্যতা আন্দালুসবাসীর অন্তর থেকে ঈমানী চেতনা মুছে ফেলেছিল। সম্পদ ও গনীমত প্রাপ্তির লালসা জনমনে শিকড় গেড়ে বসেছিল। আর সুন্নাতুল্লাহ হল মুসলিম জাতি যখন ঈমানী চেতনা বিস্মৃত হয়ে সম্পদের পেছনে ধাবিত হয়, তখন ভাঙন ও পতন-ই হয় তাদের অনিবার্য পরিণতি।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

একাদশ পরিচ্ছেদ
পৃথিবীর রত্নখণ্ড কর্ডোভা নগরী

চলমান আলোচনা হতে পরবর্তী প্রেক্ষাপটের বিবরণীতে গমনের পূর্বে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের পূর্ণতা টানতে আমরা এবার আন্দালুসের রাজধানী কর্ডোভা সম্পর্কে পাঠককে কিছুটা অবগত করা সঙ্গত মনে করছি। এর মাধ্যমে আমরা কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারব যে, গৌরব ও ঐতিহ্যের সেই সোনালী দিনগুলোতে কেমন ছিল সে সময়ের জমকালো ও আড়ম্বরপূর্ণ নগরী 'কর্ডোভা'।

> খৃস্টীয় দশম শতকের মধ্যবর্তী যুগে যে কর্ডোভা নগরী ইউরোপীয় সভ্যতার সকল নগরীকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে সেই কর্ডোভা ছিল সমকালীন পৃথিবীর বিস্ময় ও বিহ্বলতার কেন্দ্রবিন্দু। কর্ডোভার অবস্থান ছিল তেমনই, যেমন ছিল বলকান রাষ্ট্রসমূহের চোখে ভেনিস নগরীর অবস্থান। উত্তর থেকে আগত পর্যটক ও দর্শনার্থীগণ অবাক বিস্ময়ে ও বিস্ফোরিত-প্রকম্পিত চিত্তে এ শহরের বিবরণ শ্রবণ করত। কর্ডোভায় ছিল সত্তরটি গণপাঠাগার আর নয় শ' স্নানাগার। লিওন, নাফার কিংবা বার্সেলোনার শাসক-প্রশাসকগণ কোন প্রকৌশলী, স্থপতি, শল্যচিকিৎসক, নামকরা দর্জি কিংবা বিনোদনদায়ী সঙ্গীতজ্ঞের প্রয়োজন হলে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে একমাত্র কর্ডোভাতেই গমন করতেন।[৫০৪]

না, এ মন্তব্য আমাদের নয়; এটি হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর (খৃস্টীয় দশম শতাব্দীর) কর্ডোভা সম্পর্কে একজন পশ্চিমা লেখকের স্বীকৃতি। লেখকের নাম জন ব্রান্ড ট্রেন্ড (John Brande Trend)।[৫০৫]

---

[৫০৪] জন ব্রান্ড ট্রেন্ড, *ইসবানিয়া ওয়াল বুরতুগাল*, আরবদের-এর তত্ত্বাবধানে 'দুরাসুল ইসলাম' গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ, পৃ: ২৭।

[৫০৫] জন ব্রান্ড ট্রেন্ড (১৮৮৭-১৯৫৮ খৃস্টাব্দ) ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। তাকে আন্দালুসের ইতিহাস নিয়ে গবেষণাকারী ইউরোপীয় গবেষকদের পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

ইসলামী সভ্যতার বিস্তৃতির সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, মর্যাদা-মূল্যবোধ এবং গৌরব ও ঐতিহ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্ডোভা নগরীর ভাগ্যতারকাও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছিল। ইতিহাসের সেই সুপ্রাচীন স্তরে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যলগ্নে মুসলমানদের সভ্যতা ও ইসলামের মর্যাদা যে সমুন্নত স্তরে উপনীত হয়েছিল, তার জীবন্ত প্রমাণরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছিল কর্ডোভা নগরী। আর আজকের সভ্য ইউরোপ?। ইউরোপ তখন নিমজ্জিত ছিল মূর্খতা, অজ্ঞতা ও পশ্চাৎপদতার ঘোর অন্ধকারে।

কর্ডোভা ...।

একসময় এ শব্দটি শুনলেই মুসলিম কর্ণকুহরে এক মধুর ঝংকার সৃষ্টি হয়ে হৃদয়-জগতে তা অনুরণিত হত। শুধু মুসলমানদের কথাই-বা বলি কেন; মানবসভ্যতার জাগরণ প্রত্যাশী প্রতিটি ইউরোপবাসীর কর্ণকুহরে কর্ডোভা শব্দটির একটি ভিন্ন আবেদন ছিল।

ঐতিহাসিক মাক্কারী লিখেছেন, আন্দালুসের জনৈক আলিম কর্ডোভার শানে নিম্নোক্ত কাব্যপঙ্‌ক্তি রচনা করেছিলেন,

بِأَرْبَعٍ فَاقَتِ الْأَمْصَارَ قُرْطُبَةُ مِنْهُنَّ قَنْطَرَةُ الْوَادِي وَجَامِعُهَا
هَاتَانِ ثِنْتَانِ وَالزَّهْرَاءُ ثَالِثَةٌ وَالْعِلْمُ أَعْظَمُ شَيْءٍ وَهْوَ رَابِعُهَا

চারটি বৈশিষ্ট্যে কর্ডোভা ছাড়িয়ে গেছে পৃথিবীর সকল নগরীকে, আর তা হল ওয়াদিল কাবীর (নদীর) সেতু ও কর্ডোভা মসজিদ।

এ তো গেল দু'টির কথা, (শোন এবার বাকি দু'টি) তৃতীয়টি হল আযযাহরা; আর চতুর্থটি তো সব কিছুর সেরা; জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব।[৫০৬]

সামনে আমরা অনিন্দ্যসুন্দর নগরী কর্ডোভার কিছু বিবরণ তুলে ধরব নিম্নোক্ত কয়েকটি শিরোনামে।

১. কর্ডোভার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য
২. কর্ডোভার উল্লেখযোগ্য কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন
৩. কর্ডোভা ... এক সর্বাধুনিক নগরী
৪. আলিমসমাজ ও কবি-সাহিত্যিকদের চোখে কর্ডোভা

---

[৫০৬] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/১৫৩।

Scanned with CamScanner

কর্ডোভার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য

কর্ডোভা স্পেনের দক্ষিণ অংশে ওয়াদিল কাবীর নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর। আধুনিক 'আলমাওরিদ' অভিধানে কর্ডোভার প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে,

> ধারণা করা হয়, কারতাজীরা এ শহরের পত্তন করে। (মুসলমানদের পূর্বে) এ শহর রোমান ও পশ্চিমা গোথ গোষ্ঠীর শাসনাধীন ছিল'।[৫০৭]

বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ ৯৩ হিজরীতে (৭১১ খৃস্টাব্দে) এ নগরী জয় করেন। তখন থেকেই কর্ডোভা তার ইতিহাসের নতুন যুগের সূচনা রেখা টানতে সক্ষম হয় এবং নিজের জন্য সভ্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে নেয়। বিশেষ করে দামেশকে আব্বাসীদের হাতে উমাইয়া খেলাফতের পতনের পর ১৩৮ হিজরীতে (৭৫৬ খৃস্টাব্দে) 'কুরাইশী ঈগল' খ্যাত আবদুর রহমান আদদাখিল যখন আন্দালুসে উমাইয়া শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, তখন থেকে শুরু হয় একটি আন্তর্জাতিক সভ্যতার অধিকারী নগরী হিসেবে কর্ডোভার অগ্রযাত্রা।

আবদুর রহমান আননাসির (আন্দালুসে প্রথম উমাইয়া খলীফা) ও তার পর তার পুত্র হাকাম আলমুসতানসিরের শাসনামলে কর্ডোভা উন্নতি-সমৃদ্ধি এবং সভ্যতার নেতৃত্বের শীর্ষ চূড়ায় উপনীত হয়। বিশেষ করে আবদুর রহমান আননাসির কর্ডোভাকে তার নবগঠিত খেলাফতব্যবস্থার প্রশাসনিক রাজধানী এবং মুসলিম প্রতীচ্যের একজন খলীফা হিসেবে তার সদর দফতর ও নিবাসস্থল নির্ধারণ করেন। কর্ডোভাকে তিনি পরিণত করেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও নাগরিক সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় মঞ্চে। আর তাই কর্ডোভা তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্টানটিনোপল, মুসলিম প্রাচ্যের আব্বাসী খেলাফতের রাজধানী বাগদাদ, সভ্যতার সূতিকাগার কায়রো ও আফ্রিকার ঐতিহাসিক নগরী কায়রোওয়ানের সঙ্গে। কর্ডোভার সৌন্দর্য ও উন্নত নাগরিক সভ্যতার গুণমুগ্ধ ইউরোপীয়রা আদর করে কর্ডোভাকে ডাকত 'পৃথিবীর রত্নখণ্ড' নামে।

উমাইয়া প্রশাসক ও খলীফাগণ কর্ডোভায় নিরাপত্তাদুর্গ ও নগরপ্রাচীর নির্মাণ, অস্ত্র-কারখানা প্রতিষ্ঠা, কৃষি ও শিল্প খাতসহ নাগরিক জীবনব্যবস্থার বিভিন্ন

---

[৫০৭] *আলমাওরিদ আধুনিক জ্ঞানকোষ, ১৯৯৫ খৃস্টাব্দ-সংস্করণ।*

Scanned with CamScanner

অঞ্চলের উন্নতিতে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। তারা কৃত্রিম হ্রদ, খাল খনন করেছেন, সেচ সুবিধার জন্য নালা তৈরি করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নানা প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছের চারা এনে তারা আন্দালুসে সেগুলোর উৎপাদন ও চাষাবাদের ব্যবস্থা করেছেন।

কর্ডোভার উল্লেখযোগ্য কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন

সামনে আমরা সভ্যতা ও নাগরিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নির্মিত এমন কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শনের আলোচনা করব, যা ব্যাপকভাবে আন্দালুস সভ্যতাকে এবং বিশেষ করে কর্ডোভাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। আশা করি, এর মাধ্যমে মানবতার অগ্রযাত্রায় ইসলামের অংশগ্রহণ ও অবদান সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পাওয়া যাবে।

১. কর্ডোভা সেতু

কর্ডোভার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলোর অন্যতম হল কর্ডোভা সেতু। সেতুটি ওয়াদিল কাবীর নদীর ওপর নির্মিত হয়েছিল। এটি الجسر (সেতু), قنطرة الدهر (কালজয়ী সেতু) ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সেতুটির দৈর্ঘ্য প্রায় চার শ' মিটার, প্রস্থ চল্লিশ মিটার আর উচ্চতা ত্রিশ মিটার!

ইবনুল ওয়ারদী, ইদরীসী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ কর্ডোভা সেতু সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নির্মাণকুশলতা ও নিপুণতায় কর্ডোভা সেতু পৃথিবীর সকল সেতুর ওপর গর্ব করতে পারে।[৫০৮]

সেতুটির খিলানের সংখ্যা ছিল সতেরটি। প্রতি দুই খিলানের মাঝে দূরত্ব ছিল বার মিটার আর একেকটি খিলানের ব্যাসও ছিল বার মিটার। খিলানগুলোর প্রস্থ ছিল প্রায় সাত মিটার আর নদীর পানির স্তর থেকে খিলানগুলোর উচ্চতা ছিল পনের মিটার।[৫০৯]

যে সেতুটির বিবরণ আলোচনা করা হচ্ছে, ভুলে গেলে চলবে না, তা নির্মিত হয়েছিল ওমর বিন আবদুল আযীয রহ. কর্তৃক নিযুক্ত আন্দালুসের গভর্নর সামাহ বিন মালিক আলখাওলানীর নির্দেশনায় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে,

---

[৫০৮] ইবনুল ওয়ারদী, *খরীদাতুল আজাইব ওয়া ফারীদাতুল গারাইব*, পৃ : ১২ ও ইদরীসী, *নুযহাতুল মুশতাক*, ২/৫৭৯।

[৫০৯] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪২০।

Scanned with CamScanner

নির্দিষ্ট করে বললে ১০১ হিজরীতে; অর্থাৎ আজ থেকে তের শ' বছরেরও অধিক পূর্বে। এ সেতু এমন যুগে নির্মিত হয়েছিল, যখন মানুষ যাতায়াত ও পরিবহনের মাধ্যম বলতে কেবল ঘোড়া-গাধা-খচ্চরের কথাই চিন্তা করত। অধিকন্তু বর্তমানকালের মতো উন্নতমানের নির্মাণ রীতি-কৌশল ও যন্ত্রপাতিও তখন ছিল না। আর তাই আলোচিত কাঠামোয় নির্মিত কর্ডোভা সেতু তৎকালে বিবেচিত হত ইসলামী সভ্যতার অন্যতম গৌরবময় নির্দর্শন হিসেবে।

২. কর্ডোভা মসজিদ

কর্ডোভা-কেন্দ্রীয় মসজিদকে এখনও পর্যন্ত কর্ডোভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন এবং কালের পরিক্রমায় টিকে থাকা বিশ্ব ঐতিহ্য (World Heritage Site) হিসেবে গণ্য করা হয়। স্প্যানিশ ভাষায় একে মেয্কিটা (Mezqueta) বলা হয়, যা আরবী 'মাসজিদ' শব্দের অপভ্রংশ। কর্ডোভা মসজিদ ছিল আন্দালুসের সবচে' বড় মসজিদ; বরং পুরো ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ[৫১০] (অবশ্য এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে এটি মসজিদ নয়; বরং একটি ক্যাথিড্রাল[৫১১] হিসেবে পরিচিত।)।

আন্দালুসে স্বাধীন উমাইয়া প্রশাসনের স্থপতি আবদুর রহমান আদদাখিল ১৭০ হিজরীতে (৭৮৬ খৃস্টাব্দে) এর নির্মাণকাজ সূচনা করেন। এরপর তার পুত্র প্রথম হিশাম এবং পরবর্তী সময়ে প্রত্যেক নতুন প্রশাসক ও খলীফাই এর আয়তন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখেন। ফলে তা কর্ডোভা নগরীর সবচে' দৃষ্টিনন্দন মসজিদ এবং সমকালীন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মসজিদে পরিণত হয়।

কর্ডোভা মসজিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত ঐতিহাসিক হিময়ারী লিখেছেন,

কর্ডোভার মসজিদের সুখ্যাতি ও আলোচনা দুনিয়াজোড়া। নির্মাণ-

---

[৫১০] হাজিব আলমানসুর-এর আমলে (৯৮৭ খৃস্টাব্দে) কর্ডোভা মসজিদের কেবল ছাদঢাকা অংশের আয়তন দাঁড়ায় ২২,৫০০ বর্গমিটারে। মুফতি তকী উসমানী সাহেব দা.বা. তার আন্দালুস ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন, সম্ভবত এত বিশাল ছাদবিশিষ্ট মসজিদ বর্তমানেও পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। পাঠকের অনুমানের সুবিধার্থে উল্লেখ করা যেতে পারে, আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররম মসজিদের আয়তন প্রায় ২,৭০০ বর্গমিটার। অর্থাৎ কর্ডোভা মসজিদের শুধু ছাদঢাকা অংশ ছিল পুরো বাইতুল মুকাররমের আট গুণেরও বেশি বড়! (অনুবাদক)

[৫১১] একজন বিশপের এলাকাধীন যে গির্জায় বিশপের জন্য বিশেষ আসন থাকে, তাকে ক্যাথিড্রাল (Cathedral) বলা হয়। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

স্থায়িত্ব, কাঠামো-সৌন্দর্য, আয়তন-বিশালতা ও স্থাপত্য-কুশলতায় এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মসজিদ। মারওয়ানী খলীফাগণ এর পেছনে নিজেদের সর্বোচ্চ শ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন; একের পর এক প্রত্যেকে এর আয়তন বৃদ্ধি ও পূর্ণতা সাধনে যত্নবান হয়েছেন। ফলে মসজিদটি নিপুণতার এমন অত্যুচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছে যে, দর্শক-দৃষ্টি এর সম্মুখে মুগ্ধতায় বিমূঢ় হয়ে যায় এবং বচন সৌন্দর্য বর্ণনার ভাষা হারিয়ে ফেলে।

মুসলিম বিশ্বে অলংকরণ ও সৌন্দর্যে, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে জামে কর্ডোভার সঙ্গে তুল্য কোন মসজিদ নেই। এর দৈর্ঘ্য ১৮০ বা[৫১২]; অর্ধেক অংশ ছাদবিশিষ্ট, বাকি অর্ধেক ছাদহীন আঙ্গিনা। ছাদের খিলানের সংখ্যা চৌদ্দটি; কিবলা ও তার আশেপাশের বড় খুঁটিগুলোসহ মসজিদের কলামের মাঝের, খিলানের মাঝের ছোট-বড় মোট স্তম্ভের সংখ্যা এক হাজার। পুরো মসজিদে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য বাতিদানের সংখ্যা ১১৩টি। বড় বাতিদানগুলোর প্রতিটির মধ্যে এক হাজার প্রদীপ জ্বালানো যায় আর সবচে' ছোটগুলোতে বারটি।

তারতুশ অঞ্চলের পাইন (Pine) গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে মসজিদের সকল কাষ্ঠকাঠামো। ছাদের কড়িকাঠের (Beam) পুরুত্ব এক বিঘত বাই তিন আঙুল কম এক বিঘত। প্রতিটি কড়িকাঠের দৈর্ঘ্য ৩৭ বিঘত; প্রতি দুই কড়িকাঠের মধ্যে এক কড়িকাঠ পরিমাণ ফাঁক আছে।

মসজিদের পুরো ছাদে বিচিত্র ও অপূর্ব নানা কারুকাজ, নকশা ও আল্পনা অঙ্কিত আছে। নকশাগুলোর বিন্যাস যেমন মনোরম ও সুপরিকল্পিত; তেমনই লাল, সাদা, নীল, সবুজ, সুরমাবর্ণসহ নানা রং ও বর্ণে সজ্জিত। কারুকার্যখচিত অপরূপ ছাদের দিকে তাকালে দৃষ্টি জুড়িয়ে যায় এবং নিপুণতা ও বর্ণচ্ছটার কুশলতায় মন ভরে যায়। ছাদের প্রতিটি টালির প্রসার ৩৩ বিঘত। প্রতি দু' স্তম্ভের মাঝে দূরত্ব ১৫ বিঘত। প্রতিটি স্তম্ভের মূল কাঠামো ও অগ্রভাগ মর্মর পাথরের তৈরি।

---

[৫১২] প্রাচীনকালে দূরত্ব ও দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক ছিল বিরা', বা', শিবর ইত্যাদি। এক শিবর বর্তমানের একক অনুযায়ী প্রায় ২৩ সেন্টিমিটার; আর এক বিরা' প্রায় আধা মিটার। দেখুন : *মু'জামু মুসতিলহাতিল হাদীসি*, ১/২৫৬ ও ২/৪৮। (লেখক)

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ দু' হাত দু' পাশে বিস্তৃত করে দিলে উভয় হাতের মাঝে যে দূরত্ব তৈরি হয়, তাকে বলা হত বা'। দেখুন : *আননিহায়া ফী গারীবিল হাদীসি ওয়াল আছার*, ১/১৬৫। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

কর্ডোভা মসজিদের কেবলার দিকের শোভা-সৌন্দর্যও দর্শককে বিমুগ্ধ-বিমোহিত করে দেয়। নির্মাণকুশলতার অভিনবত্বে চিন্তাশক্তি বিমূঢ় হয়ে যায়। কেবলার দিকে লাগানো আছে স্বর্ণখচিত মোজাইক ও স্ফটিক, যা কন্‌স্টানটিনোপল সাম্রাজ্যের নৃপতি খলীফা আবদুর রহমান আননাসিরের সকাশে প্রেরণ করেছিলেন। মেহরাবের দু'দিকে আছে চারটি স্তম্ভ; দু'টি সবুজ বর্ণের আর দু'টি বেগুনী বর্ণের। মেহরাবের অগ্রভাগে আছে স্বর্ণ, নীলকান্তমণি ও বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব অলঙ্করণে খচিত মর্মর পাথরের ঢালাইকৃত একটি খণ্ড।

মেহরাবের উপরে আছে কাষ্ঠনির্মিত একটি ডিম্বাকৃতি কাঠামো, যা বিরল ও অপূর্ব কারুকার্য-খচিত। মেহরাবের ডান প্রান্তে রাখা আছে আবলুস (Ebony), বাক্সাস (Buxus) ও আগর কাঠ দিয়ে নির্মিত দৃষ্টিকাড়া একটি মিম্বর; শিল্পকুশলতায় জগতে যায় জুড়ি মেলা ভার! কথিত আছে, ছয়জন সুদক্ষ কারিগর বেশ কয়েকজন সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে সাত বছরে এ মিম্বরটি তৈরি করেছেন।

মেহরাবের বাম প্রান্তে একটি বিশেষ কক্ষ। কক্ষটিতে স্বর্ণ-রূপার তৈরি বিভিন্ন পাত্র রাখা আছে। প্রতিবছর সাতাশ রমযানের রাতে এই পাত্রগুলো চেরাগদানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কক্ষটিতে বিশাল আকৃতির একটি কোরআন শরীফও আছে; অত্যন্ত ভারী মাসহাফটি দু'জন ব্যক্তি মিলে বহন করে আনে। হযরত ওসমান রাযি.-এর স্বহস্তে লিখিত মাসহাফে ওসমানীর চারটি পৃষ্ঠা এতে সংযুক্ত আছে এবং তাতে তার শাহাদাতকালীন রক্তচিহ্নও আছে। প্রতিদিন সকালে মাসহাফটি উক্ত কক্ষ থেকে বের করা হয়। মসজিদের নির্ধারিত দায়িত্বশীলগণ মাসহাফ বহনের দায়িত্ব পালন করেন। মাসহাফটির আচ্ছাদন ও আবরণ দুর্লভ কারুকার্য-খচিত। বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত একটি রেহেলে মাসহাফটি রাখা হয় এবং ইমাম সাহেব তা দেখে দৈনিক আধা পারা তেলাওয়াত করেন। এরপর তা যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয়।

মেহরাব ও মিম্বরের ডান দিকে আছে একটি প্রবেশদ্বার। এখান থেকে একটি পথ রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। পুরো পথটি ধনুকাকৃতির চালা (shed) দ্বারা আচ্ছাদিত। এই পথে মোট আটটি দরজা আছে; চারটি প্রাসাদের দিকে, আর চারটি মসজিদের দিকে।

Scanned with CamScanner

মসজিদের দরজার সংখ্যা বিশটি, যা তামার পাত ও তামার পেরেক দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রতিটি দরজায় অত্যন্ত নিপুণ কারিগরিতে তৈরি দু'টি করে কড়া লাগানো আছে। দরজাগুলোর উপরদেশের দেয়ালে আছে মসৃণ লাল বর্ণের ইট দ্বারা তৈরি নানা ধরনের সুন্দর কাঠামো। মসজিদের উত্তর পাশে আছে বিরল ও বিস্ময়কর স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত অপূর্ব একটি মিনার। শূন্যে (মাটির উপরে) এর উচ্চতা রাশাশী যিরা'[৫১৩] হিসেবে এক শ' যিরা', এর মধ্যে আশি যিরা' মুয়াজ্জিনের দাঁড়ানোর স্থান পর্যন্ত আর সেখান থেকে শীর্ষ চূড়া পর্যন্ত বাকি বিশ যিরা'। মিনারের পূর্ব ও পশ্চিম দু' দিক থেকে দু'টি সিঁড়ি উপর দিকে উঠে গেছে। দু'জন আরোহণকারী যদি মিনারের নিম্নাংশ থেকে পৃথক হয়ে যায়, একেবারে শীর্ষে পৌঁছার পূর্বে তারা আর একত্রিত হবে না। মিনারটির উপরাংশ সুমসৃণ পাথর দ্বারা আচ্ছাদিত। পুরো মিনারটি নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত বিচিত্র আঙ্গনা ও হস্তলিপিতে অলঙ্কৃত।

মিনারের চারপাশের দেয়ালে মর্মর পাথরের স্তম্ভের উপর প্রলম্বিত দু'টি করে খিলানের সারি আছে। মিনারের সঙ্গেই আছে চার দরজাবিশিষ্ট একটি কামরা; প্রতি রাতে দু'জন মুয়াজ্জিন এতে অবস্থান করেন। কামরাটির উপরে সানুসি পুষ্পপত্র আচ্ছাদিত তিনটি স্বর্ণের ও দু'টি রূপার আপেল-আকৃতির ট্যাঙ্ক আছে; এর সবচে' বড়টিতে ষাট রিতল তেল ধরে। পুরো মসজিদের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন ষাটজন খাদেম, যারা একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে কাজ করে থাকেন।[৫১৪]

ঐতিহাসিক ইবনুল ওয়ারদী তার 'খরীদাতুল আ'জাইব ওয়া ফারীদাতুল গারাইব' (خريدة العجائب وفريدة الغرائب) গ্রন্থে কর্ডোভা মসজিদের যে বিবরণ তুলে ধরেছেন, তাও অনেকটা এমনই।

মসজিদের উদ্যানে ছিল প্রচুর কমলা ও ডালিম গাছ। দেশের বিভিন্ন ভূখণ্ড থেকে কর্ডোভায় আগত মুসাফিররা এগুলোর ফল খেয়ে তৃপ্ত হত।

---

[৫১৩] রাশাশী যিরা'-এর দৈর্ঘ্য ছিল তিন শিবর। দেখুন : হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার ফী খবারিল আকতার*, ১/৫৫।

[৫১৪] হিময়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, ১/৪৫৬-৪৫৭।

Scanned with CamScanner

আজ যে দৃশ্যটি প্রতিটি মুসলিম-নয়নকে অশ্রুসিক্ত করে আর হৃদয়কে করে বেদনাহত, তা হল সুমহান ও সুবিশাল কর্ডোভা মসজিদকে আন্দালুস পতনের পরপরই ক্যাথিড্রালে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং একটি গির্জার অধীনস্থ করে দেওয়া হয়েছে। কর্ডোভা মসজিদের সুউচ্চ মিনারটিকে টাওয়ারে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং এর ইসলামী পরিচয় আড়াল করতে শীর্ষদেশে গির্জার ঘন্টা স্থাপন করা হয়েছে। কালের শত ধাবার পরও মিনারটির মজবুত দেয়ালের গায়ে আজও বিভিন্ন কোরআনী লিপির অলঙ্করণ অক্ষত থেকে সে যুগের বিরল হস্তশিল্প দক্ষতার প্রতিনিধিত্ব করছে। বর্তমানে কর্ডোভা মসজিদ পুরো বিশ্বের বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর একটি।

৩. কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্ডোভা মসজিদের ভূমিকা শুধু ইবাদতগাহেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মসজিদের পাশাপাশি এটি ছিল একটি ইলমী জামিয়া বা আন্তর্জাতিক শিক্ষাঙ্গন, যাকে সমকালীন বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউরোপের সবচে' বৃহৎ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপে গণ্য করা হত। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে এ কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহে স্থানান্তরিত হয়েছে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল শাস্ত্রের পাঠদান করা হত। এখানে অধ্যাপনার জন্য খ্যাতনামা সব অধ্যাপকবৃন্দকে নির্বাচন করা হত। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দূর-দূরান্তের এলাকা থেকে ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করতে আসত। পুরো মসজিদের অর্ধেকেরও বেশি অংশ জুড়ে ইলমী 'হালাকা', পাঠচক্র ও দরস হত। শিক্ষকগণ যেন কেবল শিক্ষাদান ও সংকলনের কাজেই নিমগ্ন থাকতে পারেন, তাই তাদের জন্য সরকারীভাবে উচ্চহারের ভাতা নির্ধারিত ছিল। ছাত্রদের জন্যও ছিল বিশেষ ভাতা, অভাবী ছাত্রদের জন্য ছিল আলাদা ভাতা ও মঞ্জুরী। এসব বিষয় সমকালীন যুগ ও পরিবেশের বিচারে ইলমী অঙ্গনকে লক্ষণীয় মাত্রায় প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

কর্ডোভা মুসলিম জাতিকে বরং সমকালীন বিশ্বকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তৃত নানা অঙ্গনে নামকরা ও সুদক্ষ অনেক ব্যক্তিত্ব উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের মহান শাস্ত্রজ্ঞ যাহরাবী (৩২৫-৪০৪ হি./৯৩৬-১০১৩ খৃ.), ইবনে বাজ্জা, ইবনে

Scanned with CamScanner

তুফাইল, মুহাম্মাদ আলগাফিকী (চক্ষু চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ), ইবনে আবদুল যায়, ইবনে রুশদ, ইদরীসী, আবু বকর ইয়াইইয়া বিন সাদুন বিন তামাম আলআযদী, কাযী কুরতুবী আননাহবী, হাফিয কুরতুবী, আবু জাফর কুরতুবী প্রমুখ।

কর্ডোভা ... এক অত্যাধুনিক নগরী

নগর-সভ্যতার যে বিবরণ এবং জীবনযাত্রার যে মানের কথা আমরা উল্লেখ করে এসেছি, তার ভিত্তিতে যদি দাবি করা হয় যে, (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী বা খৃস্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগের আধুনিকতম নগরী) কর্ডোভা চলমান তৃতীয় সহস্রাব্দের আন্তর্জাতিক নগরীগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপযুক্ত, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

বিস্মিত হবেনই-বা কেন? কর্ডোভায় জনসাধারণের জ্ঞানার্জনের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছিল বিশেষ গ্রন্থাগার ও গণপাঠাগার। কর্ডোভাকে গণ্য করা হত পৃথিবীর সবচে' গ্রন্থসমৃদ্ধ শহর হিসেবে। সেখানে কর্ডোভা পরিণত হয়েছিল একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং একাডেমিক সকল অঙ্গনের বুদ্ধিবৃত্তিক সমাবেশস্থলে। স্বয়ং খলীফা ও প্রশাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় দরিদ্র শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনা খরচে পড়াশোনা করত। সুতরাং এ তথ্যেও বিস্ময়ের কিছু নেই যে, কর্ডোভাবাসী সকলেই লেখাপড়া জানত এবং পুরো কর্ডোভায় একজন নিরক্ষর ব্যক্তিও খুঁজে পাওয়া যেত না।[৫১৫] অথচ এটি সে যুগের কথা, যখন ইউরোপে (অতি সীমিত কয়েকজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বাদে) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও লিখতে-পড়তে জানত না।

তৎকালীন কর্ডোভার এই নাগরিক ও একাডেমিক রেনেসাঁর সঙ্গী হয়েছিল প্রশাসনিক জাগরণও। প্রশাসনব্যবস্থার আধুনিকায়তনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রশাসনিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বাস্তবায়িত হয়েছিল আদর্শ আইন-কানুন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইমারত ও ওয়াযারাত (গভর্নর ও মন্ত্রণালয়) ব্যবস্থা। বিচারব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাব্যবস্থা ও আদালতব্যবস্থাও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিল। এর পাশাপাশি ছিল বিশাল শিল্প জাগরণ। এ সময় কর্ডোভার শিল্পায়ন সমুন্নত স্তরে উন্নীত হয়েছিল। কর্ডোভায় যেসব শিল্প

---

[৫১৫] মুহাম্মাদ মাহির হামাদা, *আলমাকতাবাতু ফিল ইসলাম*, পৃ : ৯৯।

Scanned with CamScanner

বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, চামড়া শিল্প, জাহাজ-নির্মাণ শিল্প, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ শিল্প, ঔষধ শিল্প ইত্যাদি। স্বর্ণ-রূপা-তামা আহরণ ও উৎপাদনেও কর্ডোভা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল।[৫১৬]

নাগরিক জীবনধারার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, কর্ডোভা তখন পাঁচটি উপশহরের বিভক্ত ছিল। মাক্কারী লিখেছেন,

> প্রত্যেক দুই উপশহরের মাঝে আছে বিশাল, সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর; আর প্রতিটি উপশহরই স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিটিতেই আছে সরকারী স্নানাগার, বাজার, শিল্পক্ষেত্রসহ নাগরিক চাহিদা পূরণের সবকিছু।[৫১৭]

'*মু'জামুল বুলদান*' গ্রন্থে ইয়াকুত হামাবী রহ. উল্লেখ করেছেন,

> কর্ডোভার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, তাতে সবধরণের পণ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাজার ছিল। আবার প্রতিটি উপশহরের জন্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন বাজার।[৫১৮]

ঐতিহাসিক মাক্কারীর বরাতে আমরা এখানে কর্ডোভার আবাসিক এলাকার কিছু তথ্য উল্লেখ করছি।

১. মসজিদ: আবদুর রহমান আদদাখিলের শাসনামলে কর্ডোভা নগরীতে মসজিদের সংখ্যা ছিল ৪৯০টি। এরপর বৃদ্ধি পেতে পেতে মসজিদের সংখ্যা ৩,৮৩৭-তে পৌঁছয়।

২. জনসাধারণের বাসগৃহ: ২,১৩,০৭৭টি।

৩. বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাসভবন: ৬০,৩০০টি।

৪. বিপনী বিতান ও দোকানপাট: ৮০,৪৫৫টি।

৫. স্নানাগার: ৯০০টি।

৬. উপকণ্ঠ: ২৮টি।[৫১৯]

রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং ঐতিহাসিকদের বর্ণনার ভিন্নতার কারণে এ সংখ্যায় কিছুটা কম-বেশি দেখা যেতে পারে। তবে তা কর্ডোভার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৌন্দর্য ও জৌলুসের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা নিয়ে

---

[৫১৬] আহমাদ বিন আলী ক্বালক্বাশান্দী, *সুবহুল আ'শা*, ৫/২১৮।

[৫১৭] মাক্কারী, *নাফহুত তীব মিন গুছনিল আন্দালুসির রাতীব*, ১/৫৫৮।

[৫১৮] ইয়াকুত আলহামাবী, *মু'জামুল বুলদান*, ৪/৩২৪।

[৫১৯] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৫৪০।

Scanned with CamScanner

মতবিরোধ নয়; বরং শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার স্তর নিয়ে মতানৈক্য।
ইসলামী শাসনামলে কর্ডোভার জনসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ।[৫২০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে কর্ডোভার জনসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ দশ হাজার।[৫২১]

আলিমসমাজ ও কবি-সাহিত্যিকদের চোখে কর্ডোভা

(বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত) মসুলের বিখ্যাত বণিক ও পর্যটক ইবনে হাওকাল (Ibn Hawqal) ৩৫০ হিজরীতে (৯৬১ খৃস্টাব্দে) কর্ডোভায় আগমন করেছিলেন। তিনি তৎকালীন কর্ডোভার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন,

> আন্দালুসের সবচে' বড় নগরী হল কর্ডোভা। পুরো মুসলিম প্রতীচ্যে জনসংখ্যার আধিক্য ও আয়তনের বিস্তৃতিতে এর সমতুল্য কোন নগরী নেই। বলা হয়ে থাকে, এটি বাগদাদের দু' অংশের একটির সমান। বাস্তবে তেমন না হলেও তার কাছাকাছি তো অবশ্যই। প্রস্তর-নির্মিত নগরপ্রাচীর দ্বারা নগরীটি সুরক্ষিত। নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য নগরপ্রাচীরের মধ্যে দু'টি প্রবেশদ্বার আছে, যা উপত্যকা হয়ে রুসাফার দিকে চলে গেছে। রুসাফা হল শহরের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের আবাসস্থল, যা সাধারণ জনগণের আবাসস্থল উপশহরের সঙ্গে সবুজ বৃক্ষ-উদ্যান দ্বারা সংযুক্ত। নগরীর ভবনগুলো পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ চতুর্দিকে উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। কর্ডোভায় আছে প্রচুর দোকান-পাট এবং কেনা-বেচার জন্য বিখ্যাত বাঁধানো প্লাটফর্ম। সাধারণ জনসাধারণ নগরীর উপকণ্ঠে বসবাস করে। কর্ডোভার জনগণ অত্যন্ত অবস্থাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত।[৫২২]

বরং কর্ডোভাবাসীর এদিক থেকেও স্বাতন্ত্র ছিল যে, কর্ডোভায় বাস করতেন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আলিমসমাজ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ। এ সম্পর্কে ইদরীসী লিখেছেন,

> কর্ডোভা কখনোই বিশিষ্ট আলিমসমাজ এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের সংস্পর্শ-বঞ্চিত ছিল না। নগরীর ব্যবসায়ীগণ ছিলেন

---

[৫২০] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *আলআছারুল আন্দালুসিয়াতুল বাকিয়া ফী ইসবানিয়া ওয়াল বুরতুগাল*, পৃ : ১৯।
[৫২১] দেখুন : উইকিপিডিয়া: *http://ar.wikipedia.org*।
[৫২২] দেখুন : ইয়াকুত আলহামাবী, *মু'জামুল বুলদান*, ৪/৩২৪।

Scanned with CamScanner

স্বচ্ছল, প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক ও প্রাচুর্যপূর্ণ জীবনের অধিকারী। তাদের ছিল উন্নত বাহন ও সমুন্নত মনোবল।[৫২৩]

ঐতিহাসিক হিময়ারী লিখেছেন,

> কর্ডোভা হল আন্দালুসের মূল ভিত্তি, নগরসমূহের কেন্দ্রস্থল এবং আন্দালুস-কেন্দ্রিক উমাইয়া খেলাফতের সদর দফতর। কর্ডোভায় উমাইয়াদের ছাপ ও প্রভাব সুস্পষ্ট। কর্ডোভার শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্ডোভার খলীফাগণের কৃতিত্ব সর্বজনজ্ঞাত। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজের কর্ণধারগণ হলেন কর্ডোভার অধিবাসী। ধর্মপালনে একনিষ্ঠতা, উপার্জনে নিষ্কলুষতা, পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা, মনোবল ও সংকল্পের দৃঢ়তা এবং আচরণের কোমলতা ইত্যাদি হল কর্ডোভাবাসীর অনন্য বৈশিষ্ট্য। কর্ডোভাতেই বাস করেন বিশিষ্ট আলিমগণ এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ।[৫২৪]

কর্ডোভার বর্ণনায় ইয়াকুত হামাবী রহ. লিখেছেন,

> এটি আন্দালুসের মহান নগরী, আন্দালুস-শাসকদের রাজধানী। কর্ডোভাই ছিল বনু উমাইয়ার খলীফা ও প্রশাসকগণের আবাসস্থল, সমাজ ও রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম মেধাবী সন্তানদের উৎসস্থল।[৫২৫]

আবুল হাসান ইবনে বাস্সাম রহ. কর্ডোভা সম্পর্কে লিখেছেন,

> কর্ডোভা হল গন্তব্যের শেষ সীমা, শাসন-পতাকার কেন্দ্রস্থল, শ্রেষ্ঠতম জনপদ, জ্ঞানী-গুণী ও সৎ লোকদের আবাসস্থল, আলিমসমাজ ও বিরল প্রতিভাবানদের জন্মভূমি, বিশ্ব-ভূখণ্ডের কেন্দ্রভূমি, জ্ঞান-প্রসবনের উৎসস্থল, ইসলামের গম্বুজ। কর্ডোভা ছিল মেধা-মননের বিকাশ-ঘর, গবেষণা-ফলে সমৃদ্ধ উপবন ও অসংখ্য বিরল মেধা-রত্নাকর। কর্ডোভার দিগন্ত থেকেই উদিত হয়েছে মর্তভূমির ভাস্করকারাজি, অমর কীর্তি-কর্মে ভাস্বর মনীষীগণ এবং সাহিত্যাঙ্গনের চৌকস যোদ্ধৃসওয়ারগণ। এখানেই রচিত হয়েছে কালজয়ী হাজারো গ্রন্থ।
>
> কর্ডোভার এই শ্রেষ্ঠত্বের এবং প্রাচীন ও আধুনিক সকল যুগে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানকার অধিবাসীদের খ্যাতি ও কৃতিত্বের কারণ

---

[৫২৩] ইদরীসী, নুযহাতুল মুশতাক ফী ইখতিরাকিল আফাক, ২/৫৭৫।

[৫২৪] হিময়ারী, আররাওযুল মি'তার, পৃ. ৪৫৬।

[৫২৫] ইয়াকুত ইবনে আবদুল্লাহ, মু'জামুল বুলদান, ৪/৩২৪।

Scanned with CamScanner

> হল কর্ডোভা সর্বদাই জ্ঞানী-গুণী, বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রের গবেষক ও জ্ঞানান্বেষীদের পদভারে মুখরিত ছিল।
>
> সারকথা, ব্যাপকভাবে আন্দালুসের এবং বিশেষ করে কর্ডোভার অধিকাংশ জনগণ হলেন প্রাচ্যের বিশিষ্ট আরব ব্যক্তিবর্গ; যারা এ দেশ জয় করেছিলেন এবং শাম ও ইরাকের বিশিষ্ট সেনাপতি ও সৈনিকগণ, যারা এ দেশে অবতরণ করেছিলেন। তাদের বংশধারাই এ সকল অঞ্চলে সকল সম্ভ্রান্ত বংশধারায় টিকে ছিল। আর তাই আন্দালুসের কোন অঞ্চল প্রাজ্ঞ লেখক ও সুদক্ষ কবি-সাহিত্যিকশূন্য নয়।[৫২৬]

সবশেষে আমরা উল্লেখ করছি ঐতিহাসিক ইবনুল ওয়ারদী রহ.-এর মন্তব্য। কর্ডোভা ও কর্ডোভাবাসীর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

> দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হলেন কর্ডোভার নাগরিক। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাহন-আবাসন এবং সর্বোপরি সমুন্নত মনোবল– সর্বক্ষেত্রেই কর্ডোভাবাসী বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এখানেই বাস করেন শ্রেষ্ঠ ও জগদ্বিখ্যাত আলিমসমাজ, মহান ও বিখ্যাত যোদ্ধাগণ।

এরপর তিনি কর্ডোভার মসজিদ ও সেতুর বিবরণ উল্লেখ করার পর লিখেছেন,

> এ নগরীর সৌন্দর্য ও দর্শনীয় স্থানের বিবরণ বর্ণনা করে শেষ করবার নয়![৫২৭]

কর্ডোভা ছিল ইসলামী সভ্যতার স্পর্শধন্য সেসব মহান নগরীর একটি, মানবতার অগ্রযাত্রায় যারা অবদান রেখেছে, অংশগ্রহণ করেছে এবং সভ্যতার চাকা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছে। আর বাস্তবতা হল, ইসলামী সভ্যতার এ অবদান কেবল কর্ডোভাতেই সীমাবদ্ধ নয়। আমরা যদি আলোচনা করি বাগদাদ, দামেশক, কায়রো, বসরা বা অন্যান্য আরও অনেক ইসলামী নগরীর কথা; তাহলে তাও আমাদের একই ধরনের বা আরও বেশি বিস্ময় ও মুগ্ধতা উপহার দেবে। আর এতে বিস্ময়েরই-বা কী আছে! এ যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ইসলামী সভ্যতার অবদান! এ যে সুদীর্ঘ মানব ইতিহাসের ললাট-রত্ন!

---

[৫২৬] আবুল হাসান ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা ফী মাহাসিনি আহলিল জাযিরা*, ১/৩৩।

[৫২৭] ইবনুল ওয়ারদী, *খরীদাতুল আ'জাইব ওয়া ফরীদাতুল গারাইব*, পৃ : ১২।

Scanned with CamScanner

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিভক্ত রাষ্ট্র-শাসকদের যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ
বিভক্ত রাষ্ট্র-শাসকদের পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকবর্গের
পারস্পরিক বিভেদ ও হানাহানি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
খৃস্টান আন্দালুস দৃশ্যপট
খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিস্থিতির ক্রমবিবর্তন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ষষ্ঠ আলফোন্সো ও পুনরুদ্ধার যুদ্ধ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
টলেডোর পতন

Scanned with CamScanner

মুসলিম আন্দালুস ইতিহাসের অন্যতম দুর্যোগপূর্ণ যুগ এটি। এ আমলের অধিকাংশ ঘটনাপ্রবাহ অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য। এক শতাব্দীরও কম সময় ব্যাপ্ত সংক্ষিপ্ত এ সময়কাল ধারাবাহিক ঘটনা-দুর্ঘটনা, সীমাহীন লিপ্সা-লালসা ও কঠিন বিভক্তি-বিবাদের বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। এ সময় আন্দালুসের অবস্থা ছিল সুতা-ছেঁড়া মালার বিক্ষিপ্ত দানার মতো; কোন বংশীয় বা ধর্মীয় চেতনার বন্ধন যাকে এক সুতোয় গাঁথতে পারেনি।

এসব ঘটনাপ্রবাহের কারণে হিজরী পঞ্চম শতাব্দী পরিণত হয়েছিল পুরো আন্দালুস ইতিহাসের সবচে' অন্ধকার শতাব্দীতে। প্রকৃতপক্ষে (আলী বিন হামুদ কর্তৃক) উমাইয়া খেলাফত বাতিল ঘোষণার পর থেকেই আন্দালুস বংশ ও গোত্র-পরিচয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হতে শুরু করে। আর তাই এ সময়কালকে অভিহিত করা হয় 'গোষ্ঠীভিত্তিক বিভক্ত রাষ্ট্রযুগ' বা 'বিভক্ত রাষ্ট্র-শাসকদের যুগ' নামে।

Scanned with CamScanner

প্রথম পরিচ্ছেদ
বিভক্ত রাষ্ট্র-শাসকদের পরিচয়

গোষ্ঠীভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে যে মুসলিম আন্দালুস ছিল গোত্র-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে এক সুতোয় গাঁথা একটি একক রাষ্ট্র, হঠাৎ করেই যেন সে সুতা ছিঁড়ে যায়। আন্দালুস পরিণত হয় একই শরীরের খণ্ড-বিখণ্ড অঙ্গে, বিক্ষিপ্ত ভূখণ্ডে এবং পরস্পর বিবাদমান নগরভিত্তিক কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে। প্রতিটি অংশের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন সেখানকার সাবেক প্রশাসক বা গভর্নরগণ। অবক্ষয় ও অধঃপতনের এই সর্বগ্রাসী প্লাবনের মুখেও তারা নিজেদের আঞ্চলিক ক্ষমতা রক্ষা করতে সক্ষম হন। অবশ্য কোন কোন অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে প্রভাবশালী সাকলাবী পরিচারকগণ, অধুনা বিলুপ্ত খেলাফতব্যবস্থায় বিভিন্ন দায়িত্ব পালনকারী প্রভাবশালী নেতাগণ কিংবা প্রভাব-মর্যাদা ও বংশীয় প্রতিপত্তির অধিকারী স্থানীয় গোত্রপতিগণ।

বার্বাররা দক্ষিণ আন্দালুসের ত্রিভুজ আকৃতির একটি বিস্তৃত অঞ্চলে এবং সেসব অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, যেখানে হামুদিয়া সালতানাতের প্রভাব ছিল। তারা সেসব অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে; আর একে কেন্দ্র করে এতদঅঞ্চলে এক ব্যাপক সংঘাতের পথ উন্মুক্ত হয়।

এভাবে মুসলিম আন্দালুসের সুবিশাল রাষ্ট্রের ভগ্নাবশেষের ওপর গড়ে ওঠা ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোই হল গোষ্ঠীভিত্তিক রাষ্ট্র। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ থেকে মুরাবিতী বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সত্তর বছর। পুরো সময়কাল ধরে এ অঞ্চলে চলতে থাকে ছোট-বড় সংঘাত, আঞ্চলিক গৃহযুদ্ধের এক অনিঃশেষ ধারা। প্রকৃতপক্ষে এসব বিবাদ-বিভেদ ও পারস্পরিক লড়াই-ই ধীরে ধীরে আন্দালুসের চূড়ান্ত পতনের পথ উন্মুক্ত করেছিল।[৫২৮]

---

[৫২৮] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/৬৭৬-৬৭৭।

Scanned with CamScanner

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মুসলিম আন্দালুস এ সময় বাইশটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছিল। আন্দালুসের মুসলমানগণ এমন বিভক্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন, যার দৃষ্টান্ত তাদের অতীত ইতিহাসে নেই। প্রকৃতপক্ষে এই বিভক্তি কেড়ে নিয়েছিল তাদের শক্তি ও প্রভাবের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটিকে-ই; যার নাম একতা ও ঐক্যবদ্ধতা। আর তাই অধঃপতন ও পতনও ছিল বড় ভয়াবহ।

বিভক্ত রাষ্ট্র-শাসকদের ইতিহাস

এ আমলে আন্দালুস মৌলিকভাবে সাতটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। নিম্নে তার বিবরণ উল্লেখ করা হল।

১. **বনু আব্বাদ:** এরা আরব গোত্র বনু লাখ্‌ম-এর প্রতি সম্বন্ধিত। বনু আব্বাদ সেভিল অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল।

২. **বনু যীরী:** এরা বার্বার গোত্র। গ্রানাডায় ছিল এদের শাসনক্ষমতা। সেভিল ও গ্রানাডা উভয় অঞ্চল আন্দালুসের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত।

৩. **বনু জাহওয়ার:** পূর্বে বর্ণিত মজলিসে শুরার প্রধান আবুল হাযম বিন জাহওয়ার এ বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বনু জাহওয়ার আন্দালুসের কেন্দ্রস্থল কর্ডোভা অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছিল।

৪. **বনু আফতাস:** এরাও বার্বার গোত্র। আন্দালুসের পশ্চিম অঞ্চলে এরা বসতি স্থাপন করেছিল এবং সেখানে নিম্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে 'বাতালইয়ুস (Badajoz)[৫২৯] রাষ্ট্র' নামে স্বতন্ত্র প্রশাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল।

৫. **বনু যিননূন:** এরাও বার্বার গোত্র। টলেডো ও তার উত্তরের মধ্যবর্তী সীমান্ত অঞ্চলসহ উত্তর আন্দালুসের এলাকাগুলোতে বনু যিননূন কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল।

৬. **বনু আমির:** এরা সাবেক ক্ষমতাধর পরিবার আমিরিয়াদের অধস্তন পুরুষ। ইয়ামেনী আরব গোত্র মুআ'ফিরী বংশোদ্ভূত বনু আমির রাষ্ট্র কায়েম করেছিল আন্দালুসের পূর্বাঞ্চলে। তাদের রাজধানী ছিল ভ্যালেন্সিয়া।

৭. **বনু হূদ:** এরা দখল করেছিল উচ্চ সীমান্তবর্তী অঞ্চল জারাগোযা, যা উত্তর-পূর্ব আন্দালুসে অবস্থিত।

---

[৫২৯] বাতালইয়ুস: কর্ডোভার পশ্চিমে আনা নদীর তীরে মেরিডা প্রদেশে অবস্থিত আন্দালুসের একটি বৃহৎ নগরী। দেখুন: ইয়াকুত আলহামাবী, *মু'জামুল বুলদান*, ১/৪৪৭।

Scanned with CamScanner

এভাবে আন্দালুস প্রায় সমান সাতটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছিল কোন বংশ, বার্বার কোন গোত্র বা কোন আরব গোত্র। বরং উল্লিখিত প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি অঞ্চলও অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল, যার ফলে পুরো আন্দালুসের অভ্যন্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের সংখ্যা হয়েছিল বাইশটি। অথচ মুসলমানরা তখন পুরো আন্দালুসের অধিকারী ছিল না; আন্দালুসের উত্তর সীমান্তের প্রায় ২৫ শতাংশ এলাকা তখন খৃস্টানদের দখলে ছিল।

সামনে আমরা এসব বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ হতে উল্লেখযোগ্য কিছু দিক আলোচনা করব।

এক. কর্ডোভায় বনু জাহওয়ারের শাসনামল

স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

৪১৭ হিজরীর মুহাররম মাসে খলীফা-দাবিদার ইয়াহইয়া বিন আলী আলহামুদী যখন কর্ডোভা ত্যাগ করে মালাগায় চলে গেলেন আর তার মূল শক্তি বার্বার সৈন্যদের ফেলে গেলেন কর্ডোভায়, কর্ডোভাবাসী তখন বার্বার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং প্রায় এক হাজার সৈন্যকে হত্যা করল। এরপর কর্ডোভাবাসী আবারও বনু উমাইয়াকে শাসনক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে একমত হল। এ সময় কর্ডোভাবাসীর নেতৃত্বে ছিলেন উযীর আবুল হাযম জাহওয়ার বিন মুহাম্মাদ। তিনি সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর অধিবাসী এবং সেসব অঞ্চল নিয়ন্ত্রণকারী নেতৃবৃন্দের কাছে বার্তা পাঠিয়ে এ বিষয়ে জনমত যাচাই করলেন। সকলেই তার প্রস্তাবে সম্মত হল এবং হিশাম বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবদুর রহমান আননাসিরের খেলাফতের পক্ষে বাইআত গ্রহণে একমত হল। হিশাম তখন নির্বাসিত অবস্থায় ভ্যালেন্সিয়ার 'বুনাত' দুর্গে সেখানকার নিয়ন্ত্রক আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন কাসিম আলফিহরীর আশ্রয়ে ছিলেন। ৪১৮ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সকলে হিশামের নামে বাইআত গ্রহণ করল। কর্ডোভায় জুমার খোতবায় খলীফা হিসেবে তার নাম পাঠ করা শুরু হল। হিশাম 'মু'তাদ বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করলেন। খলীফা হলেও তখনও তিনি ছিলেন ভ্যালেন্সিয়ায় নির্বাসিত!

বাইআতের দু' বছর পর হিশাম বিন মুহাম্মাদ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ

Scanned with CamScanner

করতে কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তনের মনস্থ করলেন। ৪২০ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে তিনি কর্ডোভায় ফিরলেন। কিন্তু ফিরে এসেই তিনি অত্যন্ত কঠোর আচরণ করতে লাগলেন। তার উযীরগণ জনগণের ওপর জুলুম-নির্যাতন করতে লাগল। ফলে কিছুদিন পরই কর্ডোভাবাসী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে পদচ্যুত করল। তিনি তার পরিবার ও ভৃত্যদের নিয়ে ৪২২ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে কর্ডোভা ছাড়লেন।

ত্যক্ত-বিরক্ত কর্ডোভাবাসী এবার একমত হল যে, উমাইয়া খেলাফত আর নয়। সকলে উমাইয়া খেলাফতের বাতিলকরণ, বনু উমাইয়া থেকে চূড়ান্ত নিষ্কৃতি ও তাদেরকে কর্ডোভা থেকে নির্বাসনের ব্যাপারে একমত হল। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও কর্ডোভাবাসীর নেতৃত্বে ছিলেন উযীর আবুল হাযম জাহওয়ার বিন মুহাম্মাদ। আন্দালুস-ভূমিতে চিরদিনের জন্য পরিসমাপ্তি ঘটল উমাইয়া খেলাফতের। কর্ডোভা হয়ে পড়ল খলীফাশূন্য, কর্ডোভা হারিয়ে ফেলল খেলাফতব্যবস্থা।

একজন খলীফাই পারেন রাষ্ট্রকে এক সুতোয় বেঁধে রাখতে, খেলাফতব্যবস্থাই পারে একটি রাষ্ট্রকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে। আর তাই প্রকৃতপক্ষে খেলাফতব্যবস্থার বিলোপ কেবল একটি নীতি ও শাসনব্যবস্থার বিলোপ নয়; বরং মুসলিম জাতির একতা ও ঐক্যের বিলুপ্তি। খেলাফতব্যবস্থা বাতিল ঘোষণার মাধ্যমে সে সময় থেকেই মূলত আন্দালুসের একতার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল।

বনু উমাইয়ার খেলাফত বাতিল ঘোষণার পর এবার প্রশাসন পরিচালনার জন্য কর্ডোভাবাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সুদক্ষ পরিচালনদক্ষতা ও সচ্চরিত্রের জন্য সকলের কাছে সুপ্রসিদ্ধ বিচক্ষণ উযীর আবুল হাযমের প্রতি। কর্ডোভা থেকে উমাইয়া ও হামুদীদের বিতাড়নের পর কর্ডোভার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সবাই আবুল হাযমকেই উপযুক্ত বিবেচনা করল। ৪২২ হিজরীর যিলহজ্ব মাসের মধ্যভাগে এই সঙ্গীন ও জটিল পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালনের জন্য শরয়ী শুরার নির্বাচনের মাধ্যমে উযীর আবুল হাযম বিন জাহওয়ার প্রশাসন পরিচালনাকারী শুরার প্রধান ও কর্ডোভার প্রধান নেতা নির্বাচিত হলেন।

হিশাম আলমু'তাদ বিল্লাহর খেলাফতগ্রহণ ও অপসারণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ইবনে আ'যারী মন্তব্য করেছেন,

Scanned with CamScanner

তার বাইআতের পথ উন্মুক্ত হল সকলের মতৈক্যে আর শেষ হল বিভেদ ও অনৈক্যে; ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হল সন্তুষ্টচিত্তে আর অপসারণ হল অসন্তোষে।[৫৩০]

৪২২ হিজরীর যিলহজ্ব মাস থেকেই শুরু হল কর্ডোভায় বনু জাহওয়ারের শাসন।

১. উযীর আবুল হায্ম বিন জাহওয়ার

আবুল হায্ম বিন জাহওয়ারের বংশ পরিচয় আন্দালুসের এক সুপ্রাচীন পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যারা 'কুরাইশী ঈগল' নামে খ্যাত উমাইয়া প্রশাসক আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া যখন আন্দালুসে প্রবেশ করেন, তখন থেকেই অর্থাৎ মুসলিম আন্দালুসের প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই আন্দালুসে একটি সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবার হিসেবে বিবেচিত ছিল এবং তখন থেকেই প্রশাসনে মন্ত্রিত্বের (ওয়াযারাতের) দায়িত্ব পালন করে আসছিল। আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া, তার পরবর্তী সকল প্রশাসক ও খলীফাদের প্রশাসনেই এ বংশের লোকেরা গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিল। আবুল হায্মের পুরো বংশ পরিচয় হল, আবুল হায্ম জাহওয়ার বিন মুহাম্মাদ বিন জাহওয়ার বিন উবাইদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আলগামর বিন ইয়াহইয়া বিন আবদুল গাফির বিন ইউসুফ বিন বখ্ত বিন আবু উবাইদা আলফারিসী। তার পূর্বতন পুরুষ ইউসুফ বিন বখ্ত বিন আবু উবাইদা ছিলেন পারসিক বংশোদ্ভূত এবং খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের মাওলা (মুক্ত ক্রীতদাস)। তিনি বালজ বিন বিশ্রের অগ্রবর্তী বাহিনীর সঙ্গে আন্দালুসে প্রবেশ করেছিলেন। আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার আন্দালুসে প্রবেশের পূর্বে তিনি ছিলেন কর্ডোভায় বনু উমাইয়ার বিশিষ্ট মাওয়ালীদের একজন। আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া আন্দালুসে আগমনের পর তিনি তার অন্যতম সহযোগী হয়ে ওঠেন এবং তার উযীর ও একান্ত নিরাপত্তারক্ষীর দায়িত্ব পালন করেন।

ইউসুফ বিন বখ্ত ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক; সৎ গুণ ও কল্যাণের অধিকারী।

---

[৫৩০] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন : ইবনে হায্ম, *রাসাইলু ইবনি হায্ম*, ২/২০৩, হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুক্তাবাস*, ১/২৭, ইবনে বাস্সাম, *আয্যাখীরা*, ২/৬০২, ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৩০-৩১, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৪৫-১৫২, লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৩৮-১৩৯ ও মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/২০-২১।

Scanned with CamScanner

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তিনি আবদুর রহমানের পুত্র হিশাম ও হিশাম-পুত্র হাকামের যুগেও মন্ত্রিত্ব ও রাজকীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন।[৫৩১] ইউসুফ বিন বখ্তের মৃত্যুর পর তার পরবর্তী বংশধরগণও মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করেন। তার পৌত্র আবদুল মালিক বিন জাহওয়ার ছিলেন প্রথমে আমীর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদের এবং পরবর্তীতে আমীরুল মুমিনীন আবদুর রহমান আননাসিরের উযীর।[৫৩২] এরপর আবদুল মালিকের পুত্র জাহওয়ার বিন আবদুল মালিক আবদুর রহমান আননাসিরের আমলেই উযীর নিযুক্ত হন।[৫৩৩] পাশাপাশি আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ বিন জাহওয়ার বিন আবদুল মালিক আবদুর রহমান আননাসিরের আমলে রাষ্ট্রীয় ট্রেজারির সচিবের[৫৩৪] এবং আলমানসুর বিন আবু আমিরের আমলে উযীরের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর আবুল হায্ম জাহওয়ার বিন মুহাম্মাদ বিন জাহওয়ার আমিরিয়া সাম্রাজ্যের সর্বশেষ প্রতিনিধি শানজুল নামে প্রসিদ্ধ আবদুর রহমান আলমানসুরের আমলে সরকারী কেরানীর দায়িত্ব পালন করেন।

আমাদের আলোচিত ব্যক্তিত্ব আবুল হায্ম জাহওয়ার সেই আবদুর রহমান আলমানসুরের শাসনামল থেকেই প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আর তাই একেবারে নিকট থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বিভিন্ন ফিতনা, বিদ্রোহ ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাপ্রবাহ, যার মুখোমুখি হয়ে কর্ডোভার খেলাফতব্যবস্থা ধ্বংসগহ্বরে নিপতিত হয়েছিল। যে আলী বিন হামুদ তাকে উযীর পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন, তিনি দেখেছেন তার পরিণতি। দেখেছেন ইয়াহইয়া বিন আলী বিন হামুদ ও তার পিতৃব্য কাসিম বিন হামুদের সংঘাত এবং উভয়ের মধ্যকার বিরল খেলাফত-কন্টন। এরপর প্রত্যক্ষ করেছেন ইয়াহইয়া বিন আলীর কর্ডোভা ছেড়ে মালাগায় পলায়ন। বনু হামুদের বিরুদ্ধে কর্ডোভাবাসীর বিদ্রোহে তিনিই ছিলেন নেতৃত্বে, তার নেতৃত্বেই কর্ডোভাবাসী বিদ্রোহ করেছে হিশাম আলমু'তাদ বিল্লাহর বিরুদ্ধে এবং হিশামসহ বনু উমাইয়া ও সকল মারওয়ানীকে তাড়িয়েছে কর্ডোভা

---

[৫৩১] দেখুন : হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুক্তাবাস*, ৫/১৮৮, ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৩০, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৮৫-১৮৬ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৪৫।

[৫৩২] হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুক্তাবাস*, ৭/২৮২ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৩৫৬।

[৫৩৩] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৫৯।

[৫৩৪] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৯৭।

Scanned with CamScanner

থেকে। ফলে কর্ডোভা হয়ে পড়েছে প্রশাসক ও খলীফাশূন্য। আর এ সময় কর্ডোভার বোদ্ধামহল ও শুরা-সদস্যদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে জাতীয় দায়িত্ব ও প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সুচারুভাবে দায়িত্বপালনকারী আবুল হায্ম বিন জাহওয়ার বিন মুহাম্মাদের উপর, যিনি তখন ছিলেন মজলিসে শুরার প্রধান এবং কর্ডোভাবাসীর প্রধান নেতা। সকল শুরাসদস্য ও কর্ডোভাবাসীর সর্বসম্মতিতে এবার তিনি কর্ডোভা-প্রশাসনের প্রধান নির্বাচিত হলেন।

আবুল হায্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার বংশের সমুন্নত মর্যাদার বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও উযীর ফাত্হ বিন খাক্বান। গদ্যছন্দের চমৎকারিত্ব ও প্রকাশভঙ্গির সৌন্দর্যের কারণে আমরা এখানে তা উল্লেখ করছি। তিনি লিখেছেন,

> বনু জাহওয়ার বংশানুক্রমেই উযীর-পরিবার। এক্ষেত্রে তাদের প্রসিদ্ধি তেমনই, যেমন প্রসিদ্ধি ফাযারা বংশের উযীর ইবনে হুবাইরার। আর বনু জাহওয়ারের (সদস্যদের মাঝে) আবুল হায্ম হলেন গুণের আধার; জাতীয় দুর্যোগে সর্বশ্রেষ্ঠ রাহবার। ফিতনাকে যদি বলি হিংস্র দুর্বিনীত, তিনি তাকে বশ করেন আশ্চর্য সাবলীলতায়; যদি বলি উত্তাল সাগর, তিনি তা পাড়ি দেন নির্দ্বিধায়। তার আচরণে-উচ্চারণে আছে উদ্ভাস ও প্রফুল্লতা; নেই কোন দ্বিধা-সংকীর্ণতা। ভাষায় ও উচ্চারণে তিনি নন অস্থির বা নিয়ন্ত্রণহীন, প্রকম্পিত বা সিদ্ধান্তহীন। আমিরিয়া শাসনামলেও তিনি ছিলেন মন্ত্রিত্বের পদে আসীন। তখন তার মর্যাদাগুণে সালতানাত মর্যাদাশীল হয়েছে, সবাই তার কর্মসম্পাদন গুণের স্বীকৃতি দিয়েছে। এরপর যখন আমিরিয়া সালতানাত বিলুপ্ত হল, নানামুখী ফিতনা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হল, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রশাসন থেকে তিনি দূরে রইলেন এবং ফিতনার বিরোধিতায় খেলাফতের অর্পিত দায়িত্ব ত্যাগ করলেন। তারপর তিনি না একাকী কর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করলেন, না পশ্চাদ্ধাবন করে ময়দান ত্যাগ করলেন; বরং অন্যান্য উযীরদের নিয়ে সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হলেন।
>
> ফিতনা যখন চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হল, সর্বগ্রাসী থাবা যখন বিস্তৃত হল, গত হয়ে গেলেন নেতৃত্বদানে সক্ষম ও ফিতনা দমনে প্রচেষ্টারত ব্যক্তিগণ, বৃদ্ধি পেল ফিতনার ভয়াবহ প্রজ্বলন, তখনও তিনি (হতোদ্যম হলেন না; বরং বার্তা পাঠিয়ে) যোগাযোগ করলেন মুত্তাকী

Scanned with CamScanner

ও খোদাভীরুদের দরবারে, তাদের সাহায্য কামনা করে এবং (প্রয়োজনে) কারও কারও ক্ষেত্রে কৃত্রিম নির্ভরতার ভান করে। সবার কাছে প্রস্তাব রাখলেন হিশাম মু'তাদকে খলীফা নির্বাচনের। ফিতনার দ্রুত জটিলতার পর এবং দ্রুত ভাঙনের পর চাতক কর্ডোভাবাসীর সামনে (হিশাম-চরিত্র) উদ্ভাসিত হল বৃষ্টিহীন গর্জনকারী মেঘের ন্যায়। সকলে আবুল হায্মের আহ্বানে সাড়া দিল এবং তাকে উযীর ও হাজিবের পদ গ্রহণের অনুরোধ জানাল। সকলে এবার নতুন খলীফা-অভিমুখী হল, কর্ডোভা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাল। ফিতনার ক্লান্তিহীন অবস্থানের পর এবং সংঘাতের বিক্ষিপ্ত গমনাগমনের পর নতুন খলীফা কর্ডোভায় প্রবেশ করলেন। দেশ তখন খরাগ্রস্ত, ধ্বংসস্তূপের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। কিছুদিন না যেতেই তিনি (হিশাম) পদচ্যুত হলেন, খলীফা পদ থেকে হলেন অপসারিত। উমাইয়া খেলাফত বিলুপ্ত হল, আলাভী খেলাফতের উত্থান ঘটল। আর তখনই কর্ডোভার দায়িত্ব নিলেন আবুল হায্ম। প্রত্যয় ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি দায়িত্ব পালন করলেন, আর সবকিছু সুচারুভাবে নিয়ন্ত্রণ করলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত জনগণ পেল নিরাপত্তার আশ্বাস, শেষ হল ক্লান্তিহীন ফিতনার নাভিশ্বাস। কর্ডোভা আবারও সমুন্নত অবস্থানে উন্নীত হল, মর্যাদা ও গৌরবের তারকা উদ্ভাসিত হল। ৪৩৫ হিজরীতে আবুল হায্মের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ তারকা উজ্জ্বলই রইল, প্রত্যাশা ও স্বপ্নের ডালপালা পত্রপল্লবিত রইল।[৫৩৫]

সকলের ঐকমত্যে আবুল হায্ম শাসনভার গ্রহণ করলেন। দায়িত্বের দাবিতে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, খেলাফতের কোন দাবিদারও নেই। এই যখন পরিস্থিতি, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জানার আগ্রহ হয়ে, শাসক হিসেবে কেমন ছিলেন আবুল হায্ম? কী ছিল তার রাষ্ট্রপরিচালনা ও প্রশাসন ব্যবস্থাপনা-নীতি? সামনে আমরা সে আলোচনাই করব।

---

[৫৩৫] ফাত্হ বিন খাক্বান ইশবীলী, *মাতমাহুল আনফুস ওয়া মাসরাহুত তাআম্মুস ফী মিলাহি আহলিল আন্দালুস*, ১/৩৪-৩৬।

Scanned with CamScanner

আবুল হাযম বিন জাহওয়ারের শাসনামল

উমাইয়া খেলাফত বাতিল ঘোষণার পর আন্দালুস যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তৎকালীন সময়ে কর্ডোভার প্রশাসন ছিল অন্যান্য রাষ্ট্র-প্রশাসনের তুলনায় ব্যতিক্রমধর্মী ও অনন্য। কর্ডোভার প্রশাসক নির্বাচিত হওয়ার পর আবুল হাযম যে নীতি অবলম্বন করেন, তা তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে। প্রশাসন-নীতির বিবেচনায় আবুল হাযমের প্রশাসন ছিল বিগত সময়ের যে কোন প্রশাসনের তুলনায় ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ধরনের। কেননা, আবুল হাযম এমন এক রাষ্ট্রের পরিচালনভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, যা উমাইয়া খেলাফতের ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে ওঠেছিল। কর্ডোভা রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ছিল আন্দালুসের কেন্দ্রবর্তী ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ। এর সীমা বিস্তৃত ছিল উত্তরে শারাত (সিয়েরা মোরেনা) পর্বত পর্যন্ত, পুবে ওয়াদিল কাবীর নদীর উৎসমুখ পর্যন্ত, পশ্চিমে ইসেজা নগরীর সীমানা পর্যন্ত এবং দক্ষিণে গ্রানাডা রাষ্ট্রের সীমানা পর্যন্ত। কর্ডোভা নগরী ছাড়াও এ রাষ্ট্রের অধীনে ছিল জাইয়ান (Jaén), উব্‌বাদা (Úbeda), বাইয়াসা (Baeza), মুদূর, আরজোনা (Arjona), আনদুজার (Andújar) ইত্যাদি শহর।[৫৩৬]

ইতঃপূর্বে বিভিন্ন খলীফা ও খেলাফতের পদ দখলকারী ব্যক্তিদের প্রশাসনে মন্ত্রিত্ব, সাচিবিক পদ ও অন্যান্য পদে দায়িত্ব পালন করায় আবুল হাযম রাজনীতি ও প্রশাসন পরিচালনা নীতিতে যথেষ্ট বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। অভিজ্ঞতাবলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রভাব বিস্তার কেবল আসন্ন পতনের পথই উন্মুক্ত করে। তাই তিনি অনেকটা আমাদের বর্তমান সময়ের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কাছাকাছি শুরাভিত্তিক শাসনব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন। প্রশাসন ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা একক্ভাবে নিজের হাতে না রেখে কর্ডোভার সাবেক মন্ত্রিবর্গ ও নীতিনির্ধারণে সক্ষম ব্যক্তিদের সমন্বয়ে মন্ত্রিপরিষদ্ পর্যায়ের একটি মজলিসে শুরা প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এ শুরার অধীনে রাখেন। মজলিসে শুরার অনুমোদন ব্যতীত তিনি কোন

---

[৫৩৬] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/২১-২২। (লেখক)

বর্তমানে কর্ডোভা যাসে এই সবগুলো নগরী স্পেনের প্রশাসনিক অঞ্চল (প্রদেশ) province of Jaén-এর অন্তর্ভুক্ত। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

বিধান জারী করতেন না এবং প্রশাসনিক কোন সিদ্ধান্তও নিতেন না। পাশাপাশি তিনি নিজের জন্য খলীফা বা সুলতান উপাধি গ্রহণ না করে আমীনুল জামাআ'হ বা 'মজলিসে শুরার পরিচালক' পরিচিতি পছন্দ করেন। আবুল হায্মের কাছে কোন কিছুর দরখাস্ত করা হলে তিনি উত্তর দিতেন, প্রদান ও বাধাদানের ক্ষমতা মজলিসে শুরার; আমার নয়। আমি তো কেবল তাদের তত্ত্বাবধায়ক। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সংশয়ে পড়লে কিংবা কোন কিছু করার মনস্থ করলে তিনি মজলিসে শুরার সদস্যদের আহ্বান করে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতেন। আর মজলিসে শুরার সদস্যগণও কোন বিষয়ে তার আগ্রহ জানতে পারলে তা সম্পাদনের দায়িত্বভার তার কাঁধেই সোপর্দ করত। বহিঃরাষ্ট্র থেকে কোন বার্তা এলে তাতে যদি তাকে (খলীফার পরিবর্তে) 'উযীর' সম্বোধন করা হত, কেবল তাহলেই তিনি তা পাঠ করতেন।

এছাড়া অন্যান্য নীতি ও কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রেও আবুল হায্ম অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দেন। প্রশাসনপ্রধান হওয়ার পরও তিনি মন্ত্রিত্বের রীতি ত্যাগ করেননি এবং মন্ত্রিনিবাস ছেড়ে খলীফার জন্য নির্ধারিত প্রাসাদে ওঠেননি। এক্ষেত্রে তিনি এক অভূতপূর্ব নীতি অবলম্বন করেছিলেন। খেলাফতের সর্বসম্মত কোন দাবিদার আগমন করলে তার কাছে প্রাসাদ সোপর্দ করবেন বলে নিজেকে তিনি আপন পূর্ববর্তী স্থানেই আবদ্ধ রাখেন আর প্রাসাদসমূহের দ্বাররক্ষী ও ভৃত্যদেরকে খেলাফত আমলের মতো প্রাসাদপ্রহরার দায়িত্বেই নিযুক্ত রাখেন। তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ নিজের কাছে না রেখে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে রাখেন আর নিজে তার তদারকি করতে থাকেন।[৫৩৭]

রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পাশাপাশি আবুল হায্ম বিন জাহওয়ার অত্যন্ত বিনয়ী, সংযমশীল ও সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও আচরণগত সৌন্দর্য– উভয় গুণেই তিনি অনন্য ছিলেন। এককথায়, ভেতরে-বাইরে, শুরু-শেষে কোন ভিন্নতা তার মধ্যে ছিল না। যৌবন থেকে বার্ধক্য কোন সময়েই এর অন্যথা ঘটেনি। কখনো তার আচরণে-উচ্চারণে এমন

---

[৫৩৭] হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুক্তাবাস*, ১/২৮, ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/৬০২-৬০৩, ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইরা*, ২/৩০-৩১, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৮৬, মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/২২-২৩ ও মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ৪৩৩।

Scanned with CamScanner

কিছু প্রকাশিত হয়নি, যার ভিত্তিতে তাকে সন্দেহ করা যায়। অভ্যস্ত হওয়ার পর থেকে গ্রন্থই ছিল তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী, বোধশক্তি হওয়ার পর থেকে গ্রন্থই ছিল তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সাধারণ মুসল্লিদের সঙ্গে মসজিদে জামাতে শরীক হতেন, কোরআনের হাফিয ছিলেন, প্রকাশ্যে-গোপনে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, তেলাওয়াতও ছিল চমৎকার ও বিশুদ্ধ। জনগণের সুখ-দুঃখে অংশীদার হতেন। অসুস্থদের দেখতে যেতেন, মৃতদের জানাযায় শরীক হতেন।[৫৩৮]

উমীর ইবনে জাহওয়ার যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, তাতে তার দূরদৃষ্টি, সুপ্রশাসননীতি ও অপূর্ব রাষ্ট্রপরিচালন দক্ষতার পরিচয় মেলে। ইবনে জাহওয়ারের প্রতিষ্ঠিত এ শাসনব্যবস্থা দল ও শুরানির্ভর শাসনব্যবস্থা নামে পরিচিত। এ ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পেছনে কার্যকারণ কী ছিল তা অবশ্য সুস্পষ্ট নয়। হতে পারে এটি ছিল একান্তই তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও মেধানিঃসৃত সিদ্ধান্ত, যার মাধ্যমে তিনি সাধারণ জনগণ ও নীতিনির্ধারকদের মতামত তার পাশে সমবেত করেছিলেন; এর মাধ্যমে তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের অশুভ প্রচেষ্টা থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন এবং তারা তার সহযোগীতে পরিণত হয়েছিল। আবার এর কারণ এও হতে পারে যে, তিনি শুরাভিত্তিক ব্যবস্থা, ন্যায় ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম জামাতকে একতাবদ্ধ রাখাকে পছন্দ করতেন বিধায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; বিশেষত তখন খেলাফতব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল এবং তারই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় পুরো আন্দালুসের ঐক্যের বাঁধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

কার্যকারণ যাই হোক, নিঃসন্দেহে এ শাসনব্যবস্থা ছিল একক ও সর্বময় ক্ষমতাভিত্তিক শাসনের প্রবল যুগে শুরাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা বা সীমিত অভিজাত-ব্যক্তিনির্ভর শাসনব্যবস্থার একটি অভূতপূর্ব নমুনা। এ শাসনব্যবস্থার অন্যতম উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ছিল এতে রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি দায়ভার থেকে মুক্ত থাকতে পারতেন, কোন সিদ্ধান্তের ফলাফল ভালো হলে প্রশংসা ও সুখ্যাতি লাভ করতেন; আবার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দল ও শুরার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারতেন।[৫৩৯]

---

[৫৩৮] ইবনে হাযম, *রাসাইলু ইবনি হাযম*, ২/২০৪, হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুক্তাবাস*, ১/২৯, ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা*, ২/৬০৩, ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৩১ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৮৬।

[৫৩৯] মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/২২।

Scanned with CamScanner

আবুল হাযমের স্বরাষ্ট্রনীতি

আবুল হাযম এমন এক পরিস্থিতিতে কর্ডোভার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, যখন কর্ডোভার নিরাপত্তাব্যবস্থার চরম অবনতি ঘটেছিল। দেশ তখন এমন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল যে, শাসনকারী কোন খলীফা নেই; এমন কোন খলীফা নেই, মানুষ যার পাশে জড়ো হবে। রাষ্ট্র হয়ে পড়েছিল লুটেরা ও ছিনতাইকারীদের অভয়ারণ্য। অধিকন্তু কর্ডোভায় তখন বিরাজ করছিল অর্থনৈতিক নৈরাজ্য; পণ্যের মূল্যস্ফীতি ঘটেছিল, রাষ্ট্রের বাণিজ্যব্যবস্থার অবনতি ঘটেছিল, সুবিধাভোগীদের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল, কর ও শুল্কের পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎকারীদের মাধ্যমে জনসম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছিল। তদুপরি কর্ডোভা তখন দিনাতিপাত করছিল বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত নৈরাজ্যের মাঝেও। কারণ, আলিমসমাজ, কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করার মতো কোন সরকার তখন দেশে ছিল না, ছিল না তাদের উদ্ভাবনী সাহিত্যকর্ম ও একাডেমিক গবেষণায় অর্থ-ব্যয় করার মতো কেউ। আর তাই আবুল হাযম তার নবগঠিত নতুন ধারার প্রশাসন নিয়ে শুরুতেই একই সঙ্গে বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।

এসব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আবুল হাযম একজন সংস্কারক প্রশাসকের নীতি অবলম্বন করে কর্ডোভা রাষ্ট্রে সংস্কারমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সম্ভবত এর প্রথমটি ছিল রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্টকারী দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নিরাপত্তাবিঘ্নিতকারী ঘটনাবলি দমন করা, শান্তি-নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার ভিত্তিমূল মজবুত করা। তিনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী বার্বারদের সঙ্গে কোমল আচরণ করেন এবং তাদের আনুগত্য ও হৃদ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হন। আবাদি এলাকার বাড়ি-ঘরের অধিবাসীদের আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র প্রদান করেন, যেন রাত-দিন যে কোন সময় কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে প্রত্যেকেই আপন আপন নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে। তিনি বাজারের ব্যবসায়ীদেরকেও সৈনিকে পরিণত করেন। তার এই নীতির ফলে কর্ডোভা রাষ্ট্র নিরাপত্তা ও শান্তির নিশ্চয়তা লাভ করে; বরং কর্ডোভা পরিণত হয় আশেপাশের খণ্ডিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পদচ্যুত, নির্বাসিত বা পলাতক

Scanned with CamScanner

নেতৃবৃন্দের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে। বাইরের যে কোন ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি নিশ্চিন্তে তখন কর্ডোভায় আশ্রয় নিতে পারত।[৫৪০]

অর্থনৈতিক অরাজকতার সংস্কারেও আবুল হায্‌ম উদ্যোগী ছিলেন। তিনি সবধরণের বিলাসিতা ও শৌখিনতার প্রথা, আয়োজন ও বিলাস-সামগ্রী বন্ধ করে দেন। জনসম্পদ ও বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট বন্ধ করতে পদক্ষেপ নেন এবং যাদের দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার ওপর নির্ভর করা যায়, তাদেরকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেন; আর তদারকি ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব রাখেন নিজের হাতে।[৫৪১] কর ও শুল্কের হার হ্রাস করতেও তিনি ভূমিকা রাখেন। জনগণ ও ব্যবসায়ীদেরকে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি এক যুগান্তকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসায়ীদের মাঝে এই শর্তে (বিনা সুদে) অর্থ বণ্টন করেন যে, এ অর্থ তাদের কাছে ঋণ হিসেবে থাকবে এবং তা ব্যবসায় খাটিয়ে তারা লাভবান হতে থাকবে। মূল পুঁজির মালিক সরকার থাকবে এবং তা ব্যবসায়ীদের কাছেই থাকবে। মাঝে মধ্যে তাদের মূলধন ও ব্যবসায়িক অবস্থার হিসাব-নিকাশ নেওয়া হয়ে। তার এই অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক প্রণোদনার ফলে অল্প ক'দিনের মধ্যেই কর্ডোভায় ব্যাপক প্রাচুর্য ফিরে আসে, হাট-বাজার ও বাণিজ্যব্যবস্থায় সমৃদ্ধি তৈরি হয়, পণ্যের মূল্যে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয় এবং মন্দাভাব কেটে প্রবৃদ্ধি ফিরে আসে।[৫৪২]

আবুল হায্‌মের এই প্রজ্ঞাপূর্ণ রাজনীতির ফলে কর্ডোভা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মুখ দেখতে শুরু করে। এর পাশাপাশি একদিকে তিনি বিচারব্যবস্থার সংস্কারে উদ্যোগ নেন, ফলে মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ ব্যাপক হয় এবং মানুষ নিজেদের অধিকার রক্ষায় নিশ্চিন্ত হয়; অপরদিকে তার এই নীতি সাংস্কৃতিক ও চিন্তাগত সমৃদ্ধি আনয়নেও ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

আবুল হায্‌ম বিন জাহওয়ারের শাসনামলের এই ইতিবাচক বিপ্লব ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়ানকেও বিস্ময়ে অভিভূত করে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন এ বিস্ময়কর রূপান্তরের অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী। বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন,

---

[৫৪০] হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুক্‌তাবাস*, ১/২৯, ইবনে বাস্‌সাম, *আয্‌যাখীরা*, ২/৬০৩-৬০৪, ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইরা*, ২/৩২-৩৩ ও ইবনে আ'ষারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৮৬-১৮৭।

[৫৪১] হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুক্‌তাবাস*, ১/২৮-২৯ ও ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইরা*, ২/৩২।

[৫৪২] হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুক্‌তাবাস*, ১/২৮-২৯, ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইরা*, ২/৩২-৩৩, ও মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/২৩।

Scanned with CamScanner

তার রাষ্ট্রে আশ্রয়গ্রহণকারী সচেতন ব্যক্তিগণ তার সাফল্যে বিমুগ্ধ হয়েছেন। সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে কী করে এভাবে নাগরিক জীবনব্যবস্থার উন্নয়ন, রাষ্ট্র পরিস্থিতিতে ভারসাম্য আনয়ন, শত্রুদের দমন এবং রাজস্বব্যবস্থা দৃঢ়করণ সম্ভব হল?! অথচ, আল্লাহর ফয়সালা তো কেবল 'কাফ' ও 'নূন'-এর (كُنْ) মাঝে।[৫৪৩]

স্বয়ং ইবনে হাইয়ানই অন্যত্র উল্লেখ করেছেন,

কর্ডোভায় এই সমৃদ্ধির সময় ইবনে জাহওয়ার নিজের ব্যাপারে বিস্মৃত হননি। জনসাধারণের উন্নয়নের পাশাপাশি তিনি নিজের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার প্রতিও লক্ষ রেখেছেন। ফলে তার সম্পদও বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তিনি এমন স্তরে উপনীত হয়েছেন যে, তার চোখে তার চেয়ে সম্পদশালী কেউ ছিল না। আর এ সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তার অত্যন্ত মিতব্যয়িতা ও নির্ভেজাল নিবারণের ফলে। যদি এ দু'টি স্বভাব-দুর্বলতা (!) তার না থাকত, তাহলে তার ত্রুটি অন্বেষণকারীগণ অভিযোগের কোন বিষয়ই খুঁজে পেত না এবং তিনি হতেন একজন পূর্ণাঙ্গতর মানুষ; যদি কোন মানুষ পূর্ণাঙ্গতর হয়ে থাকে![৫৪৪]

আবুল হায্মের পররাষ্ট্রনীতি

সেভিলে হিশাম আলমুআইয়াদ বিল্লাহর আত্মপ্রকাশের দাবির ক্ষেত্রে আবুল হায্মের অবস্থান

৪২৬ হিজরীতে (১০৩৫ খৃস্টাব্দে) সেভিলের প্রশাসক কাযী আবুল কাসিম বিন আব্বাদ যখন সেভিলে খলীফা হিশাম আলমুআইয়াদের আত্মপ্রকাশের দাবি তোলেন, তখন এ বিষয়ে উযীর আবুল হায্ম বিন জাহওয়ারের স্বতন্ত্র অবস্থান ছিল।[৫৪৫] আবুল হায্মের উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে দুই পাখি শিকার

---

[৫৪৩] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/৬০৪ ও ইবনে আ'ষারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৮৭।

[৫৪৪] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/৬০৩, ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৩১ ও ইবনে আ'ষারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৮৬।

[৫৪৫] ইবনে আ'ষারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯৭-২০০ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৫৩-১৫৪।

Scanned with CamScanner

করা। কেননা, এতে একদিকে ইয়াহইয়া বিন আলী আলহামুদীর খেলাফতের দাবি নাকচ হয়ে যাবে, অপরদিকে রাষ্ট্রশাসনে তার রাজনৈতিক বৈধতা অর্জিত হবে। কাযী ইবনে আব্বাদ সেভিলের জনগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে হিশামের পক্ষে বাইআত গ্রহণ করার পর আন্দালুসের বিভিন্ন প্রান্তে রাষ্ট্রের শরয়ী খলীফা হিশামের পক্ষে বাইআত গ্রহণের জন্য বার্তা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ভ্যালেন্সিয়ার প্রশাসক আবদুল আযীয বিন আবু আমির, দানিয়া ও পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপসমূহ নিয়ন্ত্রণকারী মুওয়াফফাক আলআমিরী এবং তুরতুশার প্রশাসক ব্যতীত অন্য কেউ-ই তার এই দাবি বিশ্বাস করেননি এবং তার আহ্বানে সাড়া দেননি।[৫৪৬]

উযীর আবুল হাযম এ সময় বাস্তবতা যাচাইয়ের জন্য সেভিলে কয়েকজন দূত প্রেরণ করেন। দূতদের তদন্তে যখন দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তখন তিনিও এ দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু কর্ডোভাবাসী একে সত্য মনে করে খলীফা হিশামের খেলাফতের পক্ষে ঝুঁকে পড়ে এবং একপর্যায়ে ইবনে জাহওয়ারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয়। বাধ্য হয়ে ইবনে জাহওয়ার দূতদের প্রত্যয়নকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেন। তিনি কর্ডোভায় হিশামের নামে বাইআত গ্রহণ করেন এবং তার নামে খোতবা পাঠ করতে শুরু করেন। তবে তার এই বাইআত ছিল একান্তই পার্থিব স্বার্থে অর্থাৎ হামুদীদের খেলাফত দাবি প্রত্যাখ্যান, তাদের কর্ডোভা দখলের আকাঙ্ক্ষা দমন এবং কাযী ইবনে আব্বাদের কর্ডোভার শাসনক্ষমতা দখলের স্বপ্ন ভণ্ডুল করার উদ্দেশ্যে।

অবশ্য কিছুদিন পরই ইবনে জাহওয়ার তার এই বাইআত ও আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করেন। বিশেষত কাযী ইবনে আব্বাদ যখন ইবনে জাহওয়ারকে জানান যে, খলীফা হিশাম ইবনে জাহওয়ারকে ইবনে আব্বাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিতে আদেশ করেছেন, তখন ইবনে জাহওয়ার তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার আহ্বান থেকে নিজের দায়মুক্তি ঘোষণা করেন।[৫৪৭]

বহিঃরাষ্ট্রসমূহের প্রশাসকদের দ্বন্দ্ব নিরসন এবং শান্তির আহ্বান

মূলত আবুল হাযমের সুপ্রশাসননীতিই ছিল সমকালীন কর্ডোভায় শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং বিরাজমান সমৃদ্ধির প্রত্যক্ষ কারণ। আর এ কারণেই

---

[৫৪৬] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯০ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৫৫।
[৫৪৭] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯৮-২০১।

Scanned with CamScanner

তিনি আন্দালুসের অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর প্রশাসকবর্গেরও আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া তার উল্লেখযোগ্য দু'টি বিশেষ গুণ ছিল জনপ্রভাব ও বিচক্ষণতা। ফলে তিনি পরিণত হয়েছিলেন বিবাদমান প্রশাসকদের সংঘাত ও বিবাদ নিরসনের ক্ষেত্রে ন্যায়বান মধ্যস্থতাকারীতে। সেভিল-প্রশাসক মু'তাযিদ বিন আব্বাদ ও বাতালইয়ুস-প্রশাসক মুযাফফার বিন আফতাসের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হলে ইবনে আব্বাদ সেভিলের পশ্চিমে অবস্থিত নিয়েব্লা (Niebla) শহরে হামলা করেন। নিয়েব্লা-প্রশাসক ইবনে ইয়াহইয়া তখন সাহায্যের জন্য মুযাফফার বিন আফতাসের দারস্থ হন। মুযাফফার তার আবেদনে সাড়া দিয়ে একদল বার্বারকে সেভিল আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। এ সময় ইবনে জাহওয়ার উপলব্ধি করেন যে, সেভিল-বাতালইয়ুসের চলমান এই সংঘাত মুসলিম আন্দালুসকেই ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আসন্ন ফিতনার করাল গ্রাস থেকে বিবাদমান পক্ষগুলোকে উদ্ধার করতে তিনি উদ্যোগী হন এবং সকলের কাছে দূত পাঠিয়ে সংঘাত পরিহার ও শান্তির পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান। পরবর্তীতে এই একই নীতি তার পুত্র আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ বিন জাহওয়ারও অবলম্বন করেছিলেন, যখন মু'তাযিদ বিন আব্বাদ ও মুযাফফার বিন আফতাস পুনরায় সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন; যেমনটি আমরা আবুল ওয়ালিদের আলোচনায় যথাস্থানে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

উযীর ইবনে জাহওয়ার এবং তার পুত্র আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদের এই অব্যাহত কল্যাণকামিতা ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা-প্রচেষ্টা প্রবল ও সর্বগ্রাসী ফিতনা থেকে মুসলিম আন্দালুসকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।[৫৪৮]

উযীর আবুল হাযম ইবনে জাহওয়ারের মৃত্যু

আবুল হাযম পরিচালিত ওয়াজিহিক প্রশাসনের অধীনে কর্ডোভা কাটাচ্ছিল ফিতনা ও কলহমুক্ত নিরাপদ জীবন; পাশাপাশি লাভ করেছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা। এরই মধ্যে ৪৩৫ হিজরীর সফর মাস মতান্তরে মুহাররম মাসে ইবনে জাহওয়ারের কাছে উপস্থিত হয় পরপারের ডাক। তার মৃত্যুর পর কর্ডোভাবাসী তারই সুযোগ্য পুত্র আবুল ওয়ালিদ

---

[৫৪৮] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৩/৩৩-৩৬ ও ইবনে আ'বারী, *আলহুল্লাতুস সিয়ারা*, ৩/২০৯-২১৩।

Scanned with CamScanner

মুহাম্মাদ ইবনে জাহওয়ারকে নিজেদের প্রশাসক হিসেবে বরণ করে নিতে একমত হয়।[৫৪৯]

আবুল হাযমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এবং নতুন প্রশাসক আবুল ওয়ালিদ ইবনে জাহওয়ারের যোগ্যতা ও নেতৃত্বগুণের প্রশংসা করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়ান যে কাব্যপঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন, এখানে তা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। তিনি লিখেছেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ ضَمَّهَا الْقَبْرُ ... وَأَنْ قَدْ كَفَانَا فَقْدَهَا الْقَمَرُ الْبَدْرُ

وَأَنَّ الْحَيَا إِنْ كَانَ أَقْلَعَ صَوْبُهُ ... فَقَدْ فَاضَ لِلْآمَالِ فِي إِثْرِهِ الْبَحْرُ

তুমি কি দেখনি, সূর্যকে ঢেকে নিয়েছে সমাধি আর আমাদের জন্য তার বিচ্ছেদ বেদনায় প্রলেপ হয়ে উদিত হয়েছে পূর্ণিমার চন্দ্র!
বৃষ্টির কল্যাণধারা যদি থেমে গিয়ে থাকে, তো (কী হয়েছে?) অব্যবহিত পরেই তো উথলে উঠেছে প্রত্যাশা ও স্বপ্নের সাগর-তরঙ্গ।

إِسَاءَةُ دَهْرٍ أَحْسَنَ الْفِعْلَ بَعْدَهَا ... وَذَنْبُ زَمَانٍ جَاءَ يَتْبَعُهُ الْعُذْرُ

فَلَا يَشْمَتَنَّ الْكَاشِحُونَ فَمَا دَجَا ... لَنَا اللَّيْلُ إِلَّا رَيْثَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ

কালের দুর্যোগ নির্দয়তার পরেই করেছে সদাচরণ, যুগের অন্যায়ের পরেই এসেছে যামানার ওযরখাহী।
দুশমন ও শত্রুদলের আনন্দিত হওয়ার কিছুই নেই; যতক্ষণ না উষার উদয় হবে, আমাদের রাতও ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে না।

وَإِنْ يَكُ وَلَّى جَهْوَرٌ فَمُحَمَّدٌ ... خَلِيفَتُهُ الْعَدْلُ الرِّضَا وَابْنُهُ الْبَرُّ

لَعَمْرِي لَنِعْمَ الْمِلْقُ أَنْتَ لَقَّهُ ... فَبَانَ وَنِعْمَ الْمِلْقُ أَخْلَقَهُ الدَّهْرُ

জাহওয়ার যদি প্রস্থান করে থাকেন, মুহাম্মাদ তো তারই উত্তরাধিকারী, যিনি ন্যায়ের প্রতিচ্ছবি এবং তারই পুণ্যবান পুত্র।
আমার জীবনের শপথ! কালের পরিক্রমা যাকে কেড়ে নিয়েছে আর

---

[৫৪৯] ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৩৩, ইবনে সাঈদ মাগরিবী, *আলমুগরিব ফী হুলাল মাগরিব*, ১/৫৬, ইবনে আবারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৮৭ ও লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আলাম*, পৃ : ১৪৮।

Scanned with CamScanner

যাকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছে, উভয়ে কতই না চমৎকার ব্যক্তিত্ব![৫৫০]

২. আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ বিন জাহওয়ার[৫৫১]

পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ বিন জাহওয়ার রাজনীতি ও প্রশাসননীতির ক্ষেত্রে আপন পিতার আদর্শ অনুসরণ করেন। তার পিতার আমলে যেসব কর্মকর্তা ও পদধারীগণ যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি তাদেরকে আপন আপন পদে বহাল রাখেন এবং পিতার মতই বিচক্ষণ রাষ্ট্রপরিচালন-নীতি গ্রহণ করে দেশে শান্তি-নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন।[৫৫২]

তার শাসনামলের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল তিনি আন্দালুসের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আবু মারওয়ান ইবনে হাইয়ানকে একান্তভাজন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে দিওয়ানে সুলতান বা রাজদফতরের বিশেষ লিপিকারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ইবনে হাইয়ান নিজেই বলেছেন,

> মহান শাসক আবুল ওয়ালিদের উদার বদান্যতায় যারা ধন্য হয়েছেন, আমি নিজে তাদের একজন। শাসনামলের শুরুতেই তিনি আবেদন ও প্রার্থনা ছাড়াই আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমার অযোগ্যতা ও স্বভাব-দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাকে তার একান্ত ও বিশিষ্টজনদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আমাকে তার হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের সম্মানে ভূষিত করেছেন। কালের পরিক্রমা হয়তো আমার দোষ-ত্রুটিকে ঢেকে নিয়েছিল। তাই তিনি আমার সাহিত্য-রুচি ও সাহিত্য-প্রীতির কথা বিবেচনা করে প্রচুর বেতন ধার্য করে আমাকে দিওয়ানে সুলতানে (রাজকীয় দফতরে) রাষ্ট্রীয় লিপিকারের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আমার প্রতি তিনি যে অনুগ্রহ-আচরণ করেছেন, তা প্রকাশ করলে তিনি যদি অসন্তুষ্ট না হতেন, তাহলে আমি তার আরও

---

[৫৫০] ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা*, ১/৩৯২।

[৫৫১] আরবীতে ব্যক্তির নামের সঙ্গে 'ইবন' (ابن/بن) শব্দ সহকারে সাধারণত পিতার (বা মাতার) নাম উল্লেখ করা হয়। তবে অনেকের ক্ষেত্রেই ইবন শব্দ উল্লেখ করা হয় বংশের পূর্বতন কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম সহকারে। এ তথ্যটি মনে রাখলে অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বোধ্যতায় শিকার হতে হবে না। (অনুবাদক)

[৫৫২] ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা*, ২/৬০৫।

Scanned with CamScanner

প্রশংসা করতাম। মহান আল্লাহ তাআ'লার দয়া ও রহমতের দুয়ারে এই আশাই করি যে, তিনি তাকে আমার পক্ষ হতে সর্বোত্তম প্রতিদান দেবেন।[৫৫৩]

তার শাসনামলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল তিনি আন্দালুসের বিশিষ্ট কবি ও সুসাহিত্যিক আবুল ওয়ালিদ বিন যাইদুনকেও নিকটভাজন করেছিলেন এবং তাকে মন্ত্রিপরিষদে স্থান দিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য বিন্মীদের ওপর নযর রাখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি তাকে রাষ্ট্রের মুখপাত্র ও রাষ্ট্রদূত হিসেবে আন্দালুসের অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রশাসকদের কাছে প্রেরণের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে অজ্ঞাত কোন কারণে তিনি ইবনে যাইদুনের প্রতি বিরাগভাজন হন এবং তাকে বন্দী করেন। ইবনে যাইদুন পরে কারাগার থেকে পালিয়ে সেভিলে মু'তাযিদ বিন আব্বাদের কাছে চলে গিয়েছিলেন এবং তার প্রধান উযীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[৫৫৪]

ভয়াবহ দুর্যোগ

আবুল ওয়ালিদের আমলের শুরুতেও পূর্বের ন্যায় স্থিতিশীলতা ও শান্তি-পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই আবুল ওয়ালিদ রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন; বরং বলা ভালো দায়িত্বের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আবুল ওয়ালিদের দু'জন পুত্র সন্তান ছিল; তাদের মধ্যে বড় ছিলেন আবদুর রহমান আর ছোট আবদুল মালিক। বয়সে ছোট হলেও আবদুল মালিক বিচক্ষণতা ও দুঃসাহসিকতায় তার বড় ভাইয়ের তুলনায় এগিয়ে ছিলেন। তাই রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ আবুল ওয়ালিদ রাষ্ট্রের দায়িত্বভার কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল মালিকের কাছে সোপর্দ করতে মনস্থ করেন। এ মনোবাসনার কথা তিনি নিজেই এক পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন,

وَإِذَا الْفَتَى فَقَدَ الشَّبَابَ سَمَا لَهُ حُبُّ الْبَنِيْنَ وَلَا كَحُبِّ الْأَصْغَرِ

কোন যুবক যখন যৌবনকাল অতিক্রান্ত করে ফেলে, তখন সন্তানদের ভালোবাসা তার হৃদয়ে বারবার দোলা দিয়ে যায়; আর কনিষ্ঠ

---

[৫৫৩] ইবনে বাস্‌সাম, *আযযাখীরা*, ২/৬০৫।

[৫৫৪] ইবনে সাঈদ আলমাগারিবী, *আলমুগরিব*, ১/৬৩-৬৪ ও ইবনে বাস্‌সাম, *আযযাখীরা*, ১-৩৩৭-৩৩৮।

Scanned with CamScanner

সন্তানের ভালোবাসার মতো তো অন্য কিছুই নয় ।

আবুল ওয়ালিদের প্রশাসনের একান্তজনদের কেউ কেউ তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বড় পুত্র আবদুর রহমানকেই দায়িত্ব দেওয়ার জন্য; কিন্তু তিনি আপন সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং আবদুল মালিককেই জনগণের সামনে উপস্থাপন করে তার নামে বাইআত গ্রহণ করেন ।

কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের পরই আবদুল মালিক শুরু করেন জুলুম-নির্যাতন। শুরাব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণ শুরু করেন। তিনি মুসলমানদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেন, সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের প্রশ্রয় দিয়ে জনগণের ওপর তাদের সর্বময় ক্ষমতা দান করেন, শরীয়তের বিধি-বিধানকে অবজ্ঞা করতে থাকেন এবং বিভিন্ন অন্যায়-পাপাচার ও গর্হিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ফলে পুরো কর্ডোভায় শান্তি ও নিরাপত্তার স্থলে ভীতি ও আশঙ্কার রাজত্ব কায়েম হয়। অবশ্য স্বেচ্ছাচারিতা ও ঔদ্ধত্যের বলে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি 'মানসুর বিল্লাহ' ও 'যাফির বি ফাযলিল্লাহ' দুই উপাধি ধারণ করেন। এরপর তার নামে খোতবা পাঠের নির্দেশ জারী করা হয়। মোটকথা, তিনি সম্পূর্ণই তার পিতা ও পিতামহের বিপরীত নীতি ও আদর্শের পরিচয় দেন ।

৪৪০ হিজরীতে আবদুল মালিক তার পিতার উযীর 'ইবনুস সাক্কা' নামে খ্যাত আবুল হাসান ইবরাহীম বিন ইয়াহইয়ার কাছে দায়িত্ব অর্পণ করেন। দায়িত্ব পেয়েই ইবনুস সাক্কা নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং সমাজে ন্যায়-নীতি ও ভারসাম্য ফিরিয়ে আনেন ।

সেভিলের প্রশাসক মু'তাযিদ বিন আব্বাদ কাছে থেকেই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং দীর্ঘদিন যাবৎ কর্ডোভা আক্রমণের সুবর্ণ কোন সুযোগের প্রহর গুনছিলেন। তিনি যখন দেখলেন, উযীর ইবনুস সাক্কার সুদক্ষ নেতৃত্বে কর্ডোভায় স্থিতিশীলতা ফিরে আসছে এবং তার কর্ডোভা দখলের স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ হতে চলেছে, তখন তিনি আবদুল মালিক বিন জাহওয়ার ও উযীর ইবনুস সাক্কার মাঝে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ সৃষ্টিতে তৎপর হলেন। লোক মারফত তিনি আবদুল মালিক বিন জাহওয়ারকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, ইবনুস সাক্কা আবদুল মালিককে সরিয়ে দিয়ে এককভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্র করছে। অপরদিকে ইবনুস সাক্কার নিকট অন্য ব্যক্তিকে পাঠিয়ে তার অন্তরে একক রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের লালসা সৃষ্টি করতে তৎপর হলেন ।

Scanned with CamScanner

আবদুল মালিক ছিলেন দুর্বল মেধাসম্পন্ন অপরিণামদর্শী একজন প্রশাসক। ইবনে আব্বাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে তিনি ৪৫৫ হিজরীতে (১০৬৩ খৃস্টাব্দে) উযীর ইবনুস সাক্কাকে হত্যা করেন।[৫৫৫]

ইবনুস সাক্কাকে হত্যা করার পর আবদুল মালিক রাষ্ট্র পরিচালনক্ষমতা এককভাবে নিজের হাতে নিয়ে নেন এবং জুলুম-নির্যাতন অব্যাহত রাখেন। এ অবস্থা দেখে তার বড় ভাই আবদুর রহমান ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করেন এবং দাবি করেন যে, ছোট ভাইয়ের তুলনায় তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের অধিক উপযুক্ত। বিরাজমান পরিস্থিতিতে উভয়ে সেনাবাহিনীর একেক অংশের আস্থা অর্জন এবং জনগণের নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হন। কর্ডোভা জুড়ে আবারও নৈরাজ্য ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়। এ অবস্থা দেখে স্বেচ্ছায় পদত্যাগকারী শাসক আবুল ওয়ালিদ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং নিজের ও সন্তানদ্বয়ের পরিণতি-আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি উভয় সন্তানের মাঝে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়ার ইচ্ছা করেন।

৪৫৬ হিজরীতে (১০৬৪ খৃস্টাব্দে) আবুল ওয়ালিদ তার এই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেন। তিনি বড় পুত্র আবদুর রহমানকে প্রদান করেন কর ও শুল্ক বিভাগের তদারকি, রাষ্ট্রের সেবকদের তত্ত্বাবধান, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করা এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় ব্যয়খাতের তদারকির দায়িত্ব; আর কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল মালিককে দান করেন সেনাবাহিনীর তদারকি, তাদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধার তত্ত্বাবধান, বিভিন্ন অভিযানে সেনাবাহিনী প্রেরণসহ সামরিক যাবতীয় দায়িত্ব। পিতার বণ্টন উভয় ভাই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেন।

কিন্তু কিছুদিন না যেতেই আবদুল মালিক বড় ভাই আবদুর রহমানকে কাবু করে বন্দী করে ফেলেন এবং তাকে নিজ গৃহে গৃহবন্দিত্বের নির্দেশ জারী করেন। এরপর আবদুল মালিক আবারও শুরু করেন একক ক্ষমতার একচ্ছত্র ও লাগামহীন ব্যবহার এবং অন্যায়-জুলুম-নিপীড়নের শাসন। সন্ত্রাসীদের আধিপত্যের পাশাপাশি তিনি নিজেও জনজীবন অস্থির করে

---

[৫৫৫] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/৬০৮-৬০৯, ৭/২৪১-২৪৫ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৩২-২৩৩।

Scanned with CamScanner

তোলেন। অবস্থাদৃষ্টে কর্ডোভাবাসী জাহওয়ার-পরিবারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৫৫৬]

কর্ডোভায় আবদুল মালিকের এই স্বেচ্ছাচারী নীতি তার শাসনক্ষমতার পতন ঘটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। বিশেষত তার ভৃত্য ও পরিচারকগণ পুরো কর্ডোভায় লুটপাট-রাহাজানি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করছিল। এসব বিষয় কর্ডোভাবাসীকে উত্তেজিত করে তোলে। কর্ডোভা জুড়ে শুরু হয় বনু জাহওয়ারের শাসনব্যবস্থার চিরস্থায়ী অবসানের দাবিতে গণ আন্দোলন।

পূর্বেও বলেছি, কর্ডোভা ছিল সেভিলের বনু আব্বাদ, টলেডোর বনু যিননূনসহ আশেপাশের সকল রাষ্ট্র-শাসকদের লক্ষ্যবস্তু। ৪৬২ হিজরীতে এই বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই টলেডোর শাসক আলমামুন ইয়াহইয়া বিন যুননূন কর্ডোভায় আক্রমণ করেন। অসহায় কর্ডোভা-শাসক আবদুল মালিক তখন সেভিলের মু'তামিদ বিন আব্বাদের সাহায্য কামনা করেন। এটাই ছিল বনু জাহওয়ারের শেষ সাহায্য কামনা।[৫৫৭] এর পরেই কর্ডোভায় চিরদিনের জন্য পতন ঘটে বনু জাহওয়ারের শাসনব্যবস্থার; যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা সামনে যথাস্থানে পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

কর্ডোভা রাজদরবারের বিখ্যাত কয়েকজন আলিম

প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে মুসলিম আন্দালুসের সর্বত্র চরম রাজনৈতিক অরাজকতা বিরাজ করলেও সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গন ও সাহিত্যাঙ্গনের জাগরণ পুরো আন্দালুস জুড়ে একটি সাংস্কৃতিক দূরবর্তিতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এ কারণে বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের বিচ্ছিন্ন প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজ ভূখণ্ডে এমন একটি নগরী নির্ধারণ করেছিল, যেখানে তাত্ত্বিক ও গবেষণামূলক শাস্ত্রসমূহের গবেষণার জন্য আলিম ও ফকীহগণ সমবেত হবেন।

নিকট অতীতে বিলুপ্ত হওয়া খেলাফতে উমাইয়ার রাজধানী কর্ডোভা তখন কেবল আন্দালুসে নয়; বরং পুরো বিশ্বদরবারেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের নগরী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছিল। কর্ডোভার গ্রন্থাগার ছিল জ্ঞানের এক দীপ্ত

---

[৫৫৬] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/৬০৬-৬০৭, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৫৮-২৫৯ ও লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ: ১৪৯।

[৫৫৭] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/৬০৯-৬১১, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৬০-২৬১ ও লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ: ১৪৯-১৫২।

Scanned with CamScanner

দীপাধার। শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে ইউরোপ যে মূর্খতার ঘোর অমানিশা-অন্ধকারে ছেয়ে ছিল, তা থেকে মুক্তি পেয়ে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে পাশ্চাত্যের জ্ঞানসন্ধানী অভিযাত্রী দল ছুটে আসত কর্ডোভার গ্রন্থাগারে।

কর্ডোভা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রাজ্ঞ ও বিখ্যাত অসংখ্য আলিম, জ্ঞানী-গুণী ও কবি-সাহিত্যিক উপহার দিয়েছিল, যারা একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় অঙ্গনে যুগপৎ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমকালীন কর্ডোভার সক্রিয় আলিমসমাজের শীর্ষে ছিলেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ফকীহ ও দার্শনিক ইমাম ইবনে হায্ম আন্দালুসী, আন্দালুসের প্রধান বিচারপতি ইউনুস বিন আবদুল্লাহ বিন মুগীস, আন্দালুসের প্রবাদতুল্য ঐতিহাসিক আবু মারওয়ান ইবনে হাইয়ান, তার শিষ্য আবু আবদুল্লাহ আলহুমাইদী ও অন্যান্য সুবিখ্যাত আলিমগণ। সামনে আমরা এই মহান ইলমী কাফেলার দু'জন সদস্যের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করব।

১. ইবনে হায্ম আন্দালুসী রহ.

বিখ্যাত ইমাম ইবনে হায্মের পুরো নাম আবু আহমাদ আলী বিন আহমদ বিন সাঈদ বিন হায্ম ফারিসী (অর্থাৎ মূলগত দিক থেকে পারসিক), (জন্মগত দিক থেকে) আন্দালুসী (তথা) কুরতুবী, (ওয়ালা সূত্রে) ইয়াযিদী (অর্থাৎ আমীর ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান বিন হারবের মাওলা বংশ), উমাবী, যাহিরী (মাযহাবগত দিক থেকে)। ইবনে হায্মের ঊর্ধ্বতন পুরুষ খালফ বিন মা'দান আবদুর রহমান আদদাখিলের সঙ্গী হয়ে আন্দালুসে প্রবেশ করেছিলেন এবং তিনিই ছিলেন আন্দালুসে প্রবেশকারী এ বংশের প্রথম পুরুষ।

৩৮৪ হিজরী মোতাবেক ৯৯৪ খৃস্টাব্দে ইবনে হায্ম কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন এবং কর্ডোভার সমকালীন বিদগ্ধ আলিমসমাজের কাছেই তার শিক্ষা-দীক্ষার পাঠ সমাপ্ত হয়। ফিকহের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তার গবেষণা তাকে জলী-খফী (সহজাত ও দুর্বোধ্য) সবধরণের কিয়াসের প্রামাণ্যতা অস্বীকার এবং কোরআন-সুন্নাহর প্রকাশ্য মর্মার্থ ও ব্যাপকার্থ গ্রহণের মতবাদ উদ্ভাবনে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি ছিলেন একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ঐতিহাসিক,

Scanned with CamScanner

কবি ও দীক্ষক। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও মাযহাবতত্ত্ব সম্পর্কেও তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। এ কারণে তাকে ফিকহ, ইলম ও রচনাবলির বিবেচনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠতম আলিমদের কাতারে গণ্য করা হয়।

ইবনে হায্ম আন্দালুসী একজন দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ও সুদক্ষ উযীরও ছিলেন। তার জন্মই হয়েছিল উযীরপরিবারে। তার পিতা হাজিব আলমানসুরের আমলে উযীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ইবনে হায্ম কর্ডোভায় ফিতনার যুগ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং হামুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুরতাযী বিল্লাহ উমাবীকে সহায়তা করেছেন। কিন্তু ৪০৯ হিজরীর মাঝামাঝিতে তিনি বন্দী হন এবং পরবর্তী সময়ে মুক্তি পেয়ে কর্ডোভায় ফিরে আসেন। এরপর মুসতাযহিরের শাসনামলে উযীরের দায়িত্ব পালন করেন। মুসতাযহির নিহত হলে ইবনে হায্মকে বন্দী করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে তাকে ক্ষমা করে মুক্তিও দেওয়া হয়। এরপর তিনি হিশাম আলমুআইয়াদের শাসনামলেও ৪১৮ হতে ৪২২ হিজরী পর্যন্ত উযীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইবনে হায্ম আন্দালুসের সম্প্রদায়ভিত্তিক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র-শাসকদের সমসাময়িক ছিলেন এবং শাসকদের মধ্যকার চরম বিরোধ প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি সমকালীন আলিম ও ফকীহসমাজকে এসব প্রশাসকদের বিরুদ্ধে সমবেত করতেন এবং ক্ষেপিয়ে তুলতেন। এ কারণে সেভিলে মু'তাযিদ বিন আব্বাদের নির্দেশে তার গ্রন্থাদি পুড়িয়ে ফেলা হয়।

সমকালীন আলিমসমাজের যারা ইলমের অঙ্গনে ও রাজনীতির ময়দানে তার সংগ্রাম ও নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন, তারা অকুণ্ঠ চিত্তে তার দৃঢ় চরিত্র ও উচ্চাভিলাষের প্রশংসা করেছেন। আমীর আবু নাসর বিন মাকুলা তার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন,

> ইবনে হায্ম ছিলেন ফিকহের জগতে অনন্য, হাদীসের হাফিয। ফিকহ ও হাদীসের জগতে তার লেখনী খেদমত রয়েছে এবং তিনি হাদীসের আলোকে ফিকহ নিয়ে গবেষণা করতেন। আন্দালুসের বহুসংখ্যক আলিম থেকে তিনি রেওয়ায়েত করেছেন। কাব্যশাস্ত্রেও তার দখল ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে তার বহু রাসায়িল রয়েছে।[৫৫৮]

হুমাইদী বলেছেন,

> তিনি ছিলেন হাফিয, হাদীস-ফিকহের আলিম, কোরআন-সুন্নাহ হতে

---

[৫৫৮] ইবনে মাকুলা, *আলইকমাল*, ২/৪৫১।

Scanned with CamScanner

বিধি-বিধান উৎসারক, বিভিন্ন শাস্ত্রের শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি আপন ইলম অনুযায়ী আমল করতেন; প্রথমে তার পিতা এবং পরে তিনি নিজে প্রশাসনিক বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার পরও তিনি ছিলেন দুনিয়াবিরাগী, বিনয়ী এবং অন্যান্য আরও অনেক সৎ গুণের অধিকারী।[৫৫৯]

হাফিয যাহাবী রহ. লিখেছেন,

ইবনে হায্ম বিরল জ্ঞানসমুদ্র, ইলমের বিভিন্ন অঙ্গনে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তার রচিত অনেক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ কয়েকটি হল,

- তূকুল হামামাহ (طوق الحمامة)
- আলমুহাল্লা ফিল ফিক্বহ (المحلّى في الفقه)
- আলফাস্‌ল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (الفصل في الملل والأهواء والنحل)
- আননাসিখ ওয়াল মানসূখ (الناسخ والمنسوخ)
- রিসালাতুন ফিত তিব্বিন নাবাবী (رسالة في الطب النبوي)
- কিতাবু হাদ্দিত তিব (كتاب حد الطب)
- কিতাবু ইখতিসারি কালামি জালীনুস ফিল আমরাযিল হাদ্দাহ (كتاب اختصار كلام جالينوس في الأمراض الحادّة)
- কিতাবুন ফিল আদইয়াতিল মুফরাদাহ (كتاب في الأدوية المفردة)

অবশ্য সম্প্রদায়ভিত্তিক রাষ্ট্রসমূহের নৃপতিদের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক ও সংগ্রামমুখর ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাদের পক্ষ থেকে নানামুখী নির্যাতন-নিপীড়ন ও বিতাড়নের শিকার হয়েছেন এবং তাদের অত্যাচারের কারণে বারবার স্থান পরিবর্তন করতে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন। সবশেষে তিনি তার আদি স্থান নিয়েব্‌লায় গিয়ে স্থির হন এবং ৪৫৬ হিজরীতে (১০৬৪ খৃস্টাব্দে) সেখানেই ইন্তেকাল করেন।[৫৬০]

---

[৫৫৯] হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুক্বতাবাস*, ৮/৩০৮।

[৫৬০] ইবনে হায্ম-এর জীবনী বিস্তারিত দেখুন : যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৮/১৮৪-২১২।

Scanned with CamScanner

২. আবু মারওয়ান ইবনে হাইয়ান রহ.

ইতিহাস ও ঘটনাপঞ্জি সংকলন-শাস্ত্রের ইমাম ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়ানের পুরো নাম আবু মারওয়ান হাইয়ান বিন খালফ বিন হুসাইন বিন হাইয়ান কুরতুবী। জন্ম ৩৭৭ হিজরীতে (৯৮৭ খৃস্টাব্দে)। তিনি ওয়ালা সূত্রে উমাবী ছিলেন। তার পিতা ছিলেন হাজিব আলমানসুরের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য। ইবনে হাইয়ান বিভক্ত রাষ্ট্রযুগের সমসাময়িক ছিলেন এবং সে সময়কার ঘটনাপ্রবাহ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর তাই তিনি সে সময়কার অনেক ঘটনার বিবরণ আপন রচনায় উল্লেখ করেছেন।

তিনি কর্ডোভায় আবুল ওয়ালিদ বিন জাহওয়ারের উযীর ও একান্তজনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বনু জাহওয়ারের শাসনব্যবস্থার পতনও প্রত্যক্ষ করেছেন।

ইবনে হাইয়ান একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাকে আন্দালুসের ইতিহাস রচনাকারীদের পথিকৃৎ ও এক্ষেত্রে সবচে' বিশুদ্ধভাষী হিসেবে গণ্য করা হয়। ঘটনাপ্রবাহ বিবরণীতে তিনি জ্ঞাতসারে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেননি। তার রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,

- আলমুক্বতাবাস ফী তারীখিল আন্দালুস (المقتبس في تاريخ الأندلس)
- আলমাতীন ফী তারীখিল আন্দালুস (المتين في تاريخ الأندلس) ইত্যাদি।[৫৬]

এই সুমহান ঐতিহাসিক ৪৬৯ হিজরীতে (১০৭৬ খৃস্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন।

দুই. সেভিলে বনু আব্বাদের শাসনামল

গোষ্ঠীভিত্তিক বিভক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রতিপত্তি, মর্যাদা ও সামরিক শক্তির বিচারে সেভিল রাষ্ট্রকে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হত। সেভিল সামরিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানগত শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি জ্ঞান-সাহিত্য ও জ্ঞানী-সাহিত্যিকদের মর্যাদার বিচারেও শ্রেষ্ঠত্বের কাতারে শামিল ছিল। এভাবে বহুমুখী শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার সম্মিলন সেভিলের শাসকবর্গকে দান করেছিল সুপ্রসিদ্ধ শাসনকর্তার মর্যাদা আর কবি-সাহিত্যিকদের প্রদান করেছিল দা-জাওয়াব কাব্যমর্যাদার আসন।

---

[৫৬] ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা*, ২/৬০৫ ও যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৮/৩৭০-৩৭২।

Scanned with CamScanner

সামনে যেহেতু আমরা সেভিল রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা করব, তাই তার পূর্বে এখানে বনু আব্বাদের আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। কারণ, বনু আব্বাদই সেভিলে শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল এবং আন্দালুসের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় সেভিলকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি কর্ডোভার কর্তৃত্ব দখল করতে এবং কর্ডোভায় হামুদী সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদায় বনু আব্বাদ এমন অবস্থানে উন্নীত হয়েছিল যে, মুসলিম আন্দালুসের অন্যান্য অংশের প্রশাসক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাদের হৃদ্যতা কামনা করতেন।

বনু আব্বাদের বংশ-পরিচিতি

বনু আব্বাদ আন্দালুসের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তারা আন্দালুসে বসতি স্থাপনকারী আরব বংশোদ্ভূত। বংশগত দিক থেকে বনু আব্বাদ আরবের লাখম গোত্রের প্রতি সম্বন্ধিত। আন্দালুসে একদল লাখমী আরব প্রবেশ করেছিল, যাদের মধ্যে বনু আব্বাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ ইতাফ বিন নুআ'ইমও ছিলেন। তিনি বালজ বিন বিশ্‌র আলকুশাইরীর অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে আন্দালুসে এসেছিলেন। বংশগত দিক থেকে তিনি সরাসরি লাখমী ছিলেন। তার পূর্বপুরুষগণ ছিল শাম দেশের হিম্‌স অঞ্চলীয় আরব। আন্দালুসে অবতরণের পর ইতাফ বিন নুআ'ইম সেভিলের নিকটবর্তী একটি গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তার পরবর্তী বংশধরগণও দীর্ঘদিন সেখানেই বসবাস করেন। পরবর্তীতে তারা হিম্‌সে (অর্থাৎ সেভিলে) চলে যান। উল্লেখ্য, শাম থেকে আগত মুসলিম অভিযাত্রীগণ প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে শামের হিম্‌স অঞ্চলের সঙ্গে সেভিলের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায় সেভিলকে হিম্‌স নামে ডাকতেন।[৫৬২]

ভিন্ন মতানুসারে বনু আব্বাদ নোমান বিন মুনযির বিন মাউস সামা-এর প্রতি সম্বন্ধিত। এ হিসেবে তারা মূলগতভাবেই লাখমী বংশীয়। বনু আব্বাদ তাদের এই বংশীয় পরিচয়ের কারণে অন্যদের সঙ্গে গর্ব করত। তাদের কবিগণ নিজেদের কবিতায়ও বংশীয় গৌরবের স্তুতি গেয়েছেন। যেমন বনু আব্বাদের কবি ইবনুল লাব্‌বানাহ বলেছেন,

---

[৫৬২] ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৩৪-৩৫, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯৩, লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৫২ ও মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ২/২৩-৩৩।

Scanned with CamScanner

مِنْ بَنِي الْمُنْذِرِيْنَ وَهُوَ انْتِسَابٌ زَادَ فِي فَخْرِهِ بَنُوْ عَبَّادِ
فِتْيَةٌ لَمْ تَلِدْ سِوَاهَا الْمَعَالِي وَالْمَعَالِي قَلِيْلَةُ الْأَوْلَادِ

বনু উমাইয়ার খলীফা ও প্রশাসকবৃন্দ বিশেষত হাকাম আলমুসতানসির, তার পুত্র হিশাম আলমুআইয়াদ ও হিশামের হাজিবুস সালতানাত আলমানসুর মুহাম্মাদ বিন আবু আমিরের দরবারে বনু আব্বাদ পরিবারের যথেষ্ট কদর ও মর্যাদা ছিল। তাদের শাসনামলে বনু আব্বাদের অনেককেই ইমামত, জুমার খতীব পদ ও বিচারকের পদসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল।[৫৬৩]

যেসব ঐতিহাসিক বনু আব্বাসের পরিচিতি ও অবস্থার বিশদ বিবরণ উল্লেখ করেছেন, তাদের একজন হলেন উযীর ও লেখক আলফাত্হ বিন খাক্বান আলইশবীলী। তিনি লিখেছেন,

> বনু আব্বাদ লাখমের প্রতি সম্বন্ধিত এবং বংশীয় গৌরব ও আভিজাত্যের অধিকারী পরিবার। তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ হলেন মুনযির বিন মাউস সামা (ماء السماء); আর তাই তাদের উদয় ও উৎপত্তি যেন দূর আকাশের অন্তরীক্ষ হতে! বনু আব্বাদ এমন এক শাসক-পরিবার, যারা লাভ করেছেন কালের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য এবং পুষ্প-সুরভিত মৃদু মন্দ বায়ু। তারা রাজত্ব ও বসতির বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন জীবনের জন্য এবং ধ্বংসের জন্যও! বনু আব্বাদের শাসকবর্গের মধ্যে মু'তাযিদ হলেন তাদের একজন, যারা প্রতিষ্ঠা করতে জানেন, জানেন অক্ষম করে দিতেও। সন্ত্রাস ও আতঙ্কবাদের স্কন্ধমূলে তিনি আবাস স্থাপন করেছেন এবং সন্ত্রাসকেই নিজের উপবেশনস্থল নির্ধারণ করেছেন। সন্ত্রাসবৃক্ষের ছায়াতলে তিনি শয্যা পেতেছেন এবং ছলে-বলে কৌশলে শিকারকে হত্যা করেছেন। তিনি চতুরতার সাহায্যে সুউচ্চ পর্বতকেও কাঁপিয়ে দিয়েছেন। রাজকীয় প্রতীক ও পদবীধারী অসংখ্য ব্যক্তিকে তিনি অবহেলার শিকার বানিয়ে অখ্যাত করে দিয়েছেন এবং আদেশে ও ইঙ্গিতে বহু মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলেছেন। বনু আব্বাদের আরেক শাসক মু'তামিদ; তিনি ছিলেন উদার ও বদান্য এক প্রশাসক এবং বনু আব্বাদ নামক অন্তরীক্ষের উজ্জ্বলতম তারকা।[৫৬৪]

---

[৫৬৩] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯৩-১৯৪ ও লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ: ১৫২।

[৫৬৪] আলফাত্হ বিন খাক্বান আলইশবীলী, *মাতমাহুল আনফুস*, ১/২২-২৩।

Scanned with CamScanner

১. কাযী আবুল ওয়ালিদ ইসমাঈল বিন আব্বাদ

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষাংশে ও পঞ্চম শতাব্দীর শুরুভাগে যখন আমিরিয়া সালতানাতের পতন ঘটেছিল এবং তারই ধারাবাহিকতায় উমাইয়া খেলাফত রুগ্নতা ও পতনের শিকার হয়েছিল, মূলত তখন থেকেই সেভিলে বনু আব্বাদের ভাগ্যতারকা চমকিত হয়েছিল। বিশেষ করে খেলাফতে উমাইয়ার পতনের ফলে যে ধারাবাহিক ফিতনা ও বিদ্রোহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার অব্যবহিত পরে বনু আব্বাদের অন্যতম ঊর্ধ্বতন পুরুষ আবুল ওয়ালিদ ইসমাঈল বিন আব্বাদের হাত ধরে বনু আব্বাদের ভাগ্যতারকা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে আবুল ওয়ালিদ রাজনীতির নাটাই নিজের হাতে তুলে নিতে পেরেছিলেন এবং সেভিলবাসীর অন্তরে তার মর্যাদাপূর্ণ আসন থাকায় সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তার পাশে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেননা, পূর্বে তিনি সেভিলে খলীফা হিশাম আলমুআইয়াদের পুলিশ-প্রশাসনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর সেভিলের কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমামত ও জুমার খতীবের দায়িত্ব পালন করেছেন। আলমানসুর বিন আবু আমির তাকে সেভিলের বিচারকের দায়িত্বও প্রদান করেছিলেন। এর ফলে সেভিলে অবস্থান করে অতি নিকট থেকে তিনি ফিতনাকালের ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এমন এক দিনের প্রত্যাশায় কাজ করে গেছেন, যেদিন অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর প্রশাসকদের মতো তিনি ও পরবর্তী সময়ে তার সন্তানগণ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হবেন এবং আন্দালুসের অন্যতম বড় শহর সেভিলের একচেটিয়া ক্ষমতা লাভ করবেন।[৫৬৫]

আবুল ওয়ালিদ ইসমাঈল বিন আব্বাদ ছিলেন আব্বাদ পরিবারের অন্যতম প্রধান ও প্রবীণ পুরুষ। তিনি স্বভাবজাত নেতৃত্ব ও পরিচালন দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। জনগণের কল্যাণে তিনি অকাতরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ার কারণে যারা কর্ডোভা থেকে পালিয়ে আসত, তাদের অনেককে আশ্রয় দিতেন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গভীরতা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার গুণেও তিনি সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।[৫৬৬] আপন সুপ্রশাসন রীতি, বিচক্ষণতা ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে দূরদর্শিতার মাধ্যমে তিনি সেভিলের

---

[৫৬৫] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯৪।

[৫৬৬] ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৩৫-৩৬।

Scanned with CamScanner

আশেপাশে প্রতিপত্তি বিস্তারকারী বার্বারদের হাত থেকে সেভিল নগরীকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫৬৭]

মূলত কাযী আবুল ওয়ালিদ ইসমাঈল বিন আব্বাদের হাতেই সেভিলে বনু আব্বাদের ক্ষমতা সুসংহত হয়। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার অবর্তমানে বিচারকের দায়িত্ব পালনের জন্য নিজ পুত্র আবুল কাসিমকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন এবং নিজেকে সেভিলের উন্নয়ন পরিকল্পনার দায়িত্বে সীমাবদ্ধ রাখেন। ৪১৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৫৬৮]

২. কাযী আবুল কাসিম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন আব্বাদ

প্রকৃতপক্ষে তিনিই বনু আব্বাদের শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা। তার পুরো নাম আবুল কাসিম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন কুরাইশ বিন আব্বাদ বিন আমর বিন আসলাম বিন আমর বিন ইতাফ।[৫৬৯]

এটা সে সময়ের কথা, যখন হামুদীসের সুলতান কর্ডোভা ও সেভিলে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। ৪০৮ হিজরীর শেষদিকে যখন হামুদী সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা আলী বিন হামুদ নিহত হন, তখন তার ভাই কাসিম বিন হামুদ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর বেশ কিছুদিন চলে কাসিম বিন হামুদ ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়াহইয়া বিন আলীর মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাত, যার ফলশ্রুতিতে কাসিম বিন হামুদ ৪১২ হিজরীতে কর্ডোভা ছেড়ে সেভিলে চলে আসেন। সেভিলে খলীফা হিসেবে তার নামে বাইআত গ্রহণ করা হয় এবং তিনি আলমুসতা'লী উপাধি ধারণ করেন। ৪১৩ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে তিনি পুনরায় কর্ডোভায় ফিরে যান এবং সেখানে তার বাইআতের নবায়ন করা হয়।

সেভিলে থাকাকালে কাসিম বিন হামুদ কাযী ইবনে আব্বাদকে সেভিলের কাযী পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।[৫৭০] কাযী ইবনে আব্বাদ অনুভব করছিলেন যে, হামুদীসের ক্ষমতার দীর্ঘস্থায়িত্বের অর্থ হচ্ছে বনু আব্বাদের নেতৃত্ব ও

---

[৫৬৭] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯৪ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৫২।

[৫৬৮] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯৪ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৫২।

[৫৬৯] ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৩৪, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯৮ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৫৩।

[৫৭০] ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৩৬, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯৫ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৫৩।

Scanned with CamScanner

অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হওয়া। আলমুসতা'ঈন যখন দ্বিতীয়বার কর্ডোভায় খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার দাবি করলেন, তখন সেভিলবাসী নিজেদের নেতা হিসেবে তিনজন ব্যক্তিকে বেছে নেয়। তারা হলেন, কাযী আবুল কাসিম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল, ফকীহ আবু আবদুল্লাহ যুবাইদী ও উযীর আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মারইয়াম। দিনে তারা তিনজনই প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে প্রশাসন পরিচালনা করতেন এবং রাষ্ট্রীয় চিঠি-পত্র তিনজনের সিলমোহরের মাধ্যমে কার্যকর হত। তবে কিছুদিনের মধ্যেই কাযী ইবনে আব্বাদ এককভাবে ক্ষমতার অধিকারী হতে সক্ষম হন।

এর কিছুদিন পর কর্ডোভাবাসী কাসিম বিন হামুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তিনি পালিয়ে সেভিলে চলে আসেন এবং তার জন্য নগরপ্রাচীরের দরজা খুলে দিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু কাযী আবুল কাসিমের নেতৃত্বে শহরের নেতৃবৃন্দ প্রাচীর-দ্বার বন্ধ রাখতে একমত হন এবং কাসিম মুসতা'লির সন্তান ও পরিবারের যারা সেভিলে ছিল, তাদেরকে বের করে দেন। ভবিষ্যতে কাসিম মুসতা'লির শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেভিলবাসী তাকে কিছু অর্থ প্রদান করতে একমত হয় এবং তাকে সেখান থেকে ফিরে যেতে বলে। তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়, খোতবায় তার নাম পাঠ করা হবে, তার জন্য দোয়া করা হবে; তবে তিনি সেভিলে প্রবেশ করবেন না; বরং রাষ্ট্রশাসন ও বিচারাদির মীমাংসার জন্য তার পক্ষ থেকে কাউকে নির্ধারণ করে দেবেন। কাসিম মুসতা'লী তাদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে কাযী ইবনে আব্বাদকেই তাদের প্রশাসক হিসেবে নির্দিষ্ট করেন। ফলে ইবনে আব্বাদ সেভিলের একক ক্ষমতার অধিকারী হতে সক্ষম হন এবং আইনগত ও কার্যক্ষেত্র উভয় দিক থেকে সেভিলের ওপর তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৭১]

এভাবে সেভিল কাযী আবুল কাসিম ইবনে আব্বাদের শরয়ী শাসনভুক্ত হওয়ার পর তিনি এখন একই সঙ্গে সেভিলের বিচারক ও প্রশাসক উভয় দায়িত্বের অধিকারী হলেন এবং আপন শাসনক্ষমতা সুদৃঢ়করণের পাশাপাশি রাষ্ট্রের বিস্তৃতিতে সচেষ্ট হলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ক্ষমতা সুসংহত করা এবং রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তার– এ উভয় লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তার

---

[৫৭১] হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুক্তাবাস*, ১/২৪-৩২, ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা*, ১/৪৮১-৪৮৫, ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইরাহ*, ২/৩৬, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯৫-১৯৬, ৩১৪-৩১৫, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৩৩, ১৫৩, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ১/৪৩২ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৩৩-৩৪।

Scanned with CamScanner

প্রয়োজন নিবেদিতপ্রাণ একদল অনুচর এবং তার প্রতিরক্ষা ও সেবায় আত্মত্যাগী একদল সৈন্য। এজন্য তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ক্রীতদাস খরীদ করতে লাগলেন এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক শক্তিতে সমতা আনতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করলেন। তার এই প্রচেষ্টার ফলে সেভিল রাষ্ট্র সামরিক জনবল ও অস্ত্রবল এবং প্রশাসনশক্তিতে আন্দালুসের অধিকাংশ রাষ্ট্রকেই ছাড়িয়ে গেল।

কাযী ইবনে আব্বাদ তার বিরুদ্ধে হামুদী বংশ ও বার্বারদের পরিকল্পনা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। তিনি জানতেন, তারা উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় আছে এবং তিনি যেমন তার রাজত্বকে কেবল সেভিলের সীমানায় সীমাবদ্ধ না রেখে পশ্চিম দিকে তার রাষ্ট্রের সীমানার বাইরেও রাষ্ট্রক্ষমতা বিস্তৃত করে সেভিল ও পশ্চিম আন্দালুসের মাঝে আঞ্চলিক সংযোগের স্বপ্ন দেখছেন এবং এতদঅঞ্চলে শক্তিশালী কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকার আশা করছেন, হামুদী ও বার্বাররাও তেমনই পুনরায় সেভিলের কর্তৃত্ব লাভের প্রত্যাশা করছে।[৫৭২]

নিজ শাসনামলে কাযী আবুল কাসিম বিন আব্বাদের সুপ্রসিদ্ধ একটি উদ্যোগ ছিল খলীফা হিশাম আলমুআইয়াদের আত্মপ্রকাশের ঘোষণা করা এবং সেভিলের খলীফা হিসেবে তার বাইআতের নবায়ন করা। তিনি ৪২৬ হিজরীতে (১০৩৫ খৃস্টাব্দে) খলীফা হিশামকে জীবিত অবস্থায় আবিষ্কার (!) করেছিলেন।

কাযী ইবনে আব্বাদের এই পদক্ষেপ ও উদ্যোগ একেবারেই নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন ছিল না। এর মাধ্যমে তিনি এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করতে চেয়েছিলেন। কেননা, হিশামের বেঁচে থাকার অর্থ হল একদিকে আইনগত দিক থেকে হামুদীদের খেলাফতের দাবি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে, অপরদিকে তার নিজের শাসনক্ষমতা, রাষ্ট্র পরিচালনা, সেভিল সীমানার বাইরে রাষ্ট্রসীমা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা– সবই আইনগত বৈধতা লাভ করবে। কারণ এ সবকিছুই তিনি করছেন পুরো আন্দালুসের প্রকৃত ও বিধানসম্মত খলীফার (!) আদেশে।

হিশাম আলমুআইয়াদের জীবনকাহিনী অত্যন্ত রহস্যাবৃত ও জটিলতায়

---

[৫৭২] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৩/১৫-১৬, ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৩৭-৩৮, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯৬-১৯৭, ৩১৪-৩১৫, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৫৩, ১৫৩ ও ইমান, *মাওসূআতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৩৫।

Scanned with CamScanner

ঘেরা। ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে তার বিষয়ে যথেষ্ট অসঙ্গতি এবং তার পরিণতি নির্ধারণে প্রচুর মতবিরোধ পাওয়া যায়। আন্দালুসী বর্ণনাসমূহের ভাষ্যমতে, কাযী ইবনে আব্বাদ এমন একজন ব্যক্তিকে জনসম্মুখে পেশ করেছিলেন, যাকে দেখতে হিশাম আলমুআইয়াদের মতো মনে হয়। বর্ণনাকারীদের বক্তব্য অনুযায়ী হিশাম আলমুআইয়াদের সঙ্গে উক্ত ব্যক্তির গঠন ও অবয়বগত যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল এবং এই মিথ্যা দাবিদার লোকটির নাম ছিল খালফ আলহিস্‌রী। আবার কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী খলীফা হিশাম আলমুআইয়াদ দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হলে আত্মগোপন করেছিলেন এবং পরিচয় গোপন করে সেভিলের একটি গ্রামে আশ্রয় নিয়ে সেখানকার একটি মসজিদে মুয়াযযিনের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার বিষয়ে অবগত হয়ে কাযী ইবনে আব্বাদ তার সন্তান, একান্তজন, ভৃত্য ও পরিচারকগণ ও তার ক্রীতদাসদের সমবেত করেন, সম্মান প্রদর্শন করে তার সামনে মাটিতে চুমু খান এবং তাকে খেলাফতের বিশেষ পোশাক পরিধান করিয়ে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের আবেদন করেন। জনগণ তার নামে বাইআত হয় এবং শহরে ঘোষণা করে দেওয়া হয়, হে সেভিলবাসী! মহান আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য তার শোকর আদায় কর। এই যে তোমাদের মুনিব আমীরুল মুমিনীন হিশাম, আল্লাহ তাকে তোমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিয়েছেন আর তিনি তোমাদের মাঝে অবস্থান করায় আল্লাহ তাআ'লা কর্ডোভা থেকে খেলাফত স্থানান্তর করে তোমাদের কাছে তোমাদের দেশে দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লার এ নেয়ামতের বেশি বেশি শোকর আদায় কর।[৫৭৩]

সেভিলে খলীফা হিশামের নামে বাইআত গ্রহণ করার পর কাযী ইবনে আব্বাদ খণ্ডিত মুসলিম আন্দালুসের অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রশাসকবৃন্দের কাছেও আন্দালুসের শরীয়তসম্মত খলীফার নামে বাইআত গ্রহণের জন্য বার্তা পাঠান। কিন্তু আমরা পূর্বেও যেমন উল্লেখ করেছি, (অনুল্লেখযোগ্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে) কর্ডোভার প্রশাসক উযীর আবুল হাযম বিন জাহওয়ার ব্যতীত সকল প্রশাসকই এ দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে প্রত্যাখ্যান করেন। আবুল হাযম জানতেন যে, এ দাবি সত্য নয়; তারপরও তিনি হিশামের নামে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন একান্তই পার্থিব উদ্দেশ্যে

---

[৫৭৩] ইবনে আ'যারী, আলবায়ানুল মুগরিব, ৩/১৯৭-২০০ ও ইবনুল খতীব, আ'মালুল আ'লাম, পৃ : ১৫৪।

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ হামুদীদের খেলাফতের দাবি খণ্ডন এবং কর্ডোভার প্রতি তাদের লোলুপ দৃষ্টি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে।[৫৭৪]

যাই হোক, এভাবে কাযী আবুল কাসিম বিন আব্বাদের শাসনামলে সেভিলে বনু আব্বাদের শাসনব্যবস্থা সুসংহত হয়। এ কারণে তাকেই বনু আব্বাদের শাসনব্যবস্থার প্রবর্তকরূপে গণ্য করা হয়। আন্দালুসের গোষ্ঠীভিত্তিক প্রশাসনগুলোর কাছে বনু আব্বাদ সরকারের যথেষ্ট মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও প্রভাব ছিল। ৪৩৩ হিজরীতে (১০৪২ খৃস্টাব্দে) কাযী ইবনে আব্বাদ ইন্তেকাল করেন।

কাযী ইবনে আব্বাদের স্বরচিত একটি কাব্যপঙ্‌ক্তি দ্বারা অনুমিত হয় যে, বহু পূর্ব থেকেই তার অন্তরে শাসনক্ষমতা অর্জনের স্বপ্ন ছিল। পঙ্‌ক্তিটি হল,

وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ أَسُوْدَ عَلَى الْوَرَى وَلَوْ رُدَّ عَنْهُ وَلِلزَّمَانِ وَعَامِرِ

فَمَا الْمَجْدُ إِلَّا فِي ضُلُوْعِيَ كَامِنٌ وَلَا الْجُوْدُ إِلَّا مِنْ يَمِيْنِيَ ثَائِرِ

فَجَيْشُ الْعُلَا مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ جَائِلٌ وَبَحْرُ النَّدَى مَا بَيْنَ كَتِفَيَّ زَاخِرِ

কালের পরিভ্রমণ যতই দীর্ঘ হোক আর জীবন আয়ুষ্কাল যতই সংকীর্ণ হোক; একদিন অবশ্যই আসবে, যেদিন আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নেতৃত্ব লাভ করব।

(কেননা,) গৌরব ও মর্যাদা তো আমার বাহু-পাঁজরেই সুপ্ত আর উদারতা ও বদান্যতা তো আমার দক্ষিণ হস্ত থেকেই উৎসারিত।

মহত্ত্ব ও আভিজাত্যের সেনাদল তো আমার দু' পার্শ্বদেশের মাঝেই পরিভ্রমণরত আর দয়াদ্রতার উত্তাল সাগর তো আমার দু' স্কন্ধের মাঝেই তরঙ্গায়িত।[৫৭৫]

৩. আলমু'তাযিদ বিল্লাহ ইবনে আব্বাদ

কাযী আবুল কাসিমের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবু আমর আব্বাদ বিন মুহাম্মাদ সেভিলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি ফখরুদ্দৌলা উপাধি ধারণ করেন; পরবর্তী সময়ে ধারণ করেন আলমু'তাযিদ বিল্লাহ

---

[৫৭৪] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯৮-২০১।

[৫৭৫] ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৩৮।

Scanned with CamScanner

উপাধি। মু'তাযিদ বিল্লাহ অত্যুচ্চ কূটনৈতিক মেধা ও সামরিক দক্ষতার অধিকারী ছিলেন।

সেভিলের ক্ষমতা লাভের পর প্রথম কিছুদিন তিনি তার পিতার আদর্শ অনুসরণ করে সংস্কার প্রচেষ্টা, সুপ্রশাসননীতি ও ন্যায়-ইনসাফের সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই তিনি একক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠেন। মু'তাযিদ বিল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি; পাশাপাশি তিনি ছিলেন নির্দয় ও কঠোর প্রকৃতির, চতুর ও দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তনকারী। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে বাস্সাম তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> তিনি এমন একজন মানুষ, যার মন-মেজাজের কোন মর্জি নেই। কাছের-দূরের কেউ-ই তার সামনে নিরাপদ নয়। একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক, পরস্পর অসঙ্গতিপূর্ণ অনেক কাজ করেন ও আদেশ করেন। সিংহের মতো ঘাপটি মেরে বসে থেকে প্রতিপক্ষের ঘাড় মটকে দিতে চান। তিনি হঠকারী ও অবিবেচক; অতি চতুর ব্যক্তিও তার থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে। এমন একগুঁয়ে ও স্বেচ্ছাচারী যে, দুঃসাহসী ব্যক্তিও তার সামনে নিরাপদ নয়। সীমাহীন অত্যাচারী ও ধ্বংসকারী, সবকিছু তছনছ করে ফেলেন; কিছুই বাকি রাখেন না। তার অত্যাচারে সকল মানুষ ক্রোধান্বিত, উত্তেজিত; সকলে তার বিরুদ্ধে একজোট। কিন্তু তার সহায়তায় আছে তার বহুসংখ্যক সহচর। তাদের বসে বলীয়ান হয়ে তিনি উত্তেজিত-নিষ্ক্রিয় সকলকে দমন করেন। এভাবেই তার ক্ষমতা দীর্ঘ হয়েছে, রাষ্ট্র বিস্তৃত হয়েছে, যোদ্ধা ও যুদ্ধাস্ত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবজাতির জঘন্যতম স্বেচ্ছাচারী তিনি; প্রতিপক্ষকে যিনি নির্মম শাস্তি দিয়ে অভ্যস্ত। তার হামলা মানে এমন বিষ, যার কার্যকারিতা বিলম্বিত নয়; এমন শর, যা লক্ষ্যভ্রষ্ট নয়। তার শান্তিচুক্তি মানে চতুরতা, অসততা এবং অল্প ক'দিনের মানসিক প্রশান্তি, যার কোন নিশ্চয়তা নেই।[৫৭৬]

আন্দালুসের আরেক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়ান তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> তিনি অসংখ্য নযীরবিহীন, ঘৃণ্য, জঘন্য ও ধ্বংসাত্মক ঘটনার

---

[৫৭৬] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/২৪ ও ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৩৯-৪০।

Scanned with CamScanner

জন্মদাতা। কঠিন উচ্চাভিলাষ, দুর্বিনীত ও উদ্ধত কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। কালের পরিক্রমায় তার চরিত্রে যুক্ত হয়েছে প্রচণ্ড কঠোরতা, সীমাহীন নির্দয়তা, নিহত ব্যক্তির অঙ্গহানি, সামান্য সন্দেহ ও অভিযোগে গ্রেফতার করা, চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইত্যাদি ঘৃণ্য আচরণ-নীতি। তার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে এমন সব নোংরা ও জঘন্য ঘটনা, যার অধিকাংশই বিশ্ববাসীকে বিশ্বাস করানোর জন্য হয়তো কোন প্রমাণ পেশ করা যাবে না, তাই কেবল বর্ণনাই তা সংরক্ষণ করতে পারবে। এসব ঘটনার পরিণতি থেকে যতই তিনি বেঁচে যান; এই কর্তৃত্বের হিংস্রতা, কঠোরতার ভয়াবহতা, আনুগত্যের জন্য অন্যায় দোষারোপ– এসব অপরাধের দায় থেকে তিনি কিছুতেই মুক্ত হতে পারেননি।[৫৭৭]

মু'তাযিদ শক্তি প্রয়োগ ও কঠোরতা-অনমনীয়তার মাধ্যমে তার শাসনামলের নবসূচনা করেন। তিনি তার পিতার নিয়োগকৃত উযীরদেরকে কঠোরভাবে শায়েস্তা করেন। এরপর পশ্চিম আন্দালুসের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো দখল করতে সামরিক অভিযানে বের হন। আপন সামরিক শক্তি ও দক্ষতাবলে তিনি এসব রাষ্ট্রের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিজ সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত করতে সক্ষম হন।

৪৪৫ হিজরীতে (১০৫৩ খৃস্টাব্দে) ইবনে ইয়াহইয়া আলইয়াহসাবীর কাছ থেকে তিনি নিয়েব্লা নগরী কেড়ে নেন এবং তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটান।[৫৭৮] ৪৪৩ হিজরীতে (১০৫১ খৃস্টাব্দে) বনু বিকরীর কাছ থেকে কেড়ে নেন শালতিশ (Saltes Island) ও ওয়েলবা (Huelva Island) উপদ্বীপ এবং বনু বিকরীর সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটান।[৫৭৯] একই বছর বনু হারুনের কাছ থেকে তিনি পশ্চিম সান্তামারিয়া নগরীর কর্তৃত্ব কেড়ে নেন এবং বনু হারুনের সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটান।[৫৮০] এরপর তিনি কাসিম বিন হামুদকে জাযিরাতুল খাযরা থেকে বের করে দেন।[৫৮১] পরাজিত-পরাভূত রাষ্ট্রগুলো যুক্ত হওয়ায় সেভিল রাষ্ট্রের আয়তন ও পরিসর বহু গুণ বৃদ্ধি পায়।

---

[৫৭৭] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/২৪-২৫ ও ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৪০।
[৫৭৮] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৪০, ৩০০-৩০১।
[৫৭৯] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৩/২৩৩-২৩৫।
[৫৮০] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৯৮-২৯৯।
[৫৮১] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৩/৩৬ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৪০-২৪৩।

Scanned with CamScanner

পশ্চিমের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর দফা-রফা করে মু'তাযিদ মনোযোগী হন দক্ষিণের বার্বার-শাসিত রাষ্ট্রগুলোর প্রতি। তিনি মনস্থ করেন, দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলো দখল করার পর উত্তর ও পূর্বের রাষ্ট্রগুলোতেও অভিযান পরিচালনা করবেন। দক্ষিণ আন্দালুসে তখন ছিল রুন্দার বনু ইয়াফ্রানের রাষ্ট্র, মুর্সিয়ার-এ বনু দাম্মারের রাষ্ট্র, সিডোনিয়া ও আরকিশে বনু খাযরূনের রাষ্ট্র এবং কারামোনায় বনু বিরযালের রাষ্ট্র। আপন চতুরতা ও প্রতারণার মাধ্যমে তিনি দক্ষিণের এসব রাষ্ট্রও দখল করে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। কূট-কৌশলের মাধ্যমে তিনি এসব রাষ্ট্রের প্রশাসকদেরকে হত্যা করেন।

৪৪৫ হিজরীতে (১০৫৩ খৃস্টাব্দে) মু'তাযিদ এসব রাষ্ট্রের প্রশাসকদের জন্য একটি ফাঁদ পাতেন এবং তাদের সকলকে সেভিলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আমন্ত্রণ জানান। রুন্দা, মুর্সিয়ার ও আরকাশ এই তিন অঞ্চলের প্রশাসক তার দাওয়াত গ্রহণ করে সেভিলে উপস্থিত হন। মু'তাযিদ প্রথমে তাদেরকে উষ্ণ সংবর্ধনা দিলেন, এরপর সকলকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের সঙ্গে থাকা যাবতীয় সম্পদ ও আত্মরক্ষার অস্ত্র কেড়ে নিলেন। এরপর তাদের স্নানাগারে ঢোকানোর নির্দেশ দিলেন এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। ফলে সকলে আগুনে পুড়ে মারা গেলেন। অবশ্য কোন কোন বর্ণনামতে, বাকি দু'জন মারা গেলেও রুন্দার প্রশাসক আলী বিন আবি কার্‌রাহ বেঁচে গিয়েছিলেন।

এর মাধ্যমে মু'তাযিদের যুগে সেভিলের আয়তন দক্ষিণেও বৃদ্ধি পায় এবং দক্ষিণ আন্দালুসের ত্রিভুজ আকৃতির সুবিশাল অঞ্চল সেভিল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৫৮২]

কারামোনার প্রশাসক-পরিবার বনু বিরযালের সঙ্গেও মু'তাযিদ বিগ্রাহর সংঘাতের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। মু'তাযিদ তার সাবেক মিত্র মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আলবিরযালীর শাসনামল থেকেই বারবার হামলা চালিয়ে কারামোনা রাষ্ট্র দখলের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিরযালী ৪৩৪ হিজরীতে মারা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মু'তাযিদের প্রতিরোধে অটল ছিলেন। তার মৃত্যুর পর কারামোনায় তার পুত্র আলমুসতাযহির আযীয বিন মুহাম্মাদের নামে বাইআত গ্রহণ করা হয়। তিনিও দক্ষ হাতে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। ফলে রাষ্ট্রে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়

---

[৫৮২] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৩/৩৮-৪০, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৯৪-৩০১ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৪৫-৪৮।

Scanned with CamScanner

মু'তাযিদ আবারও কারামোনায় নতুন করে হামলা চালান। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ যখন চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছয়, নিরুপায় হয়ে মুসতাযহির মু'তাযিদের দাপটের সামনে আত্মসমর্পণ করেন এবং কারামোনা থেকে বেরিয়ে সেভিলে চলে যান। এভাবে মু'তাযিদ ৪৫৯ হিজরীতে (১০৬৭ খৃস্টাব্দে) কারামোনাও দখল করে নেন।[৫৮৩]

মু'তাযিদের শাসনামলেই আন্দালুসের বিশৃঙ্খল যুগের সবচে' ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক ফিতনাটি সংঘটিত হয়। যদি মহান আল্লাহ তাআ'লা মুসলমানদের রক্ষা না করতেন, কাযী জাহওয়ার ও তার পুত্র আবুল ওয়ালিদ এ ফিতনা প্রতিরোধ, সংঘাত নিরসন ও এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সতর্ক না করতেন, তাহলে মু'তাযিদ ও বাতালইয়ুসের শাসক-পরিবার বনু আফতাসের মধ্যকার এই ফিতনা হয়তো আন্দালুসের মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়াত। যথাস্থানে আমরা এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

মু'তাযিদ বিন আব্বাদ তার শাসনামলে দুঃখজনক ও ধ্বংসাত্মক অনেক ঘটনারও মুখোমুখি হয়েছেন। বিশেষ করে ৪৫০ হিজরীতে (১০৫৮ খৃস্টাব্দে) তিনি এমন এক ষড়যন্ত্রের শিকার হন, যা তাকে ও তার রাজত্বকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। এ ষড়যন্ত্র যতটা ভয়াবহ ছিল, ততোধিক নিষ্ঠুর ছিল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় তার গৃহীত পদক্ষেপ। তার পুত্র ও ওলিয়ে আ'হদ (ঘোষিত যুবরাজ) ইসমাঈল ও তার উযীর আলবিয্লিয়ানী ব্যক্তিগত বিভিন্ন কারণে এবং পিতার প্রতি সন্তানের ও শাসকের প্রতি উযীরের অন্তরে সুপ্ত ক্ষোভের কারণে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু মু'তাযিদ তার চারপাশের লোকজন সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধান থাকতেন। সন্তান ও উযীরের ষড়যন্ত্র তার কাছে প্রকাশ পেয়ে যায় এবং তিনি সামান্য দ্বিধা না করে উভয়কে হত্যা করেন।[৫৮৪]

মু'তাযিদ বিন আব্বাদ অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, আত্মঅহংকারী ছিলেন। কাউকে মেনে চলা বা নিজেকে কোন বাধ্যবাধকতার অধীনে মনে করা তার ধাতে ছিল না। এ কারণেই ৪৫১ হিজরীতে (১০৫৯ খৃস্টাব্দে) তিনি হিশাম আলমুআইয়াদ দাবিদার ব্যক্তির নামে খোতবা পাঠ বন্ধ করে দেন এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সামনে হিশামের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করেন।

---

[৫৮৩] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৩১১-৩১২।

[৫৮৪] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৪৪-২৪৯।

Scanned with CamScanner

মু'তাযিদ কর্তৃক হিশামের মৃত্যুঘোষণার আলোচনায় আন্দালুসী ঐতিহাসিকগণ একই সঙ্গে শোক ও আনন্দ প্রকাশ করেছেন। কারও মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ তো স্বাভাবিক ও বোধগম্য বিষয়; কিন্তু আনন্দ প্রকাশের বিষয়টি হয়তো পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে! ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন,

> এ নামধারী ব্যক্তির এটি হল তৃতীয় মৃত্যু! আশা করা যায়, ইনশাআল্লাহ, এবারের মৃত্যুটি সত্য মৃত্যু হবে! তিনি তো কতবারই নিহত হলেন! কতবারই মারা গেলেন! তারপর কবরের মাটি ভেঙে গেল আর ...![৫৮৫]

জনৈক ঐতিহাসিক তো এ সম্পর্কে পঙ্‌ক্তিই রচনা করেছেন,

ذَالِكَ الَّذِيْ مَاتَ مِرَارًا وَدُفِنْ فَانْتَفَضَ التُّرْبُ وَمُزِّقَ الْكَفَنْ

> এ তো সেই খলীফা, যিনি বহুবার মারা গেছেন, সমাধিস্থ হয়েছেন কতবার! কিন্তু হায়! ভূমি ফেটে যায় আর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় জীর্ণ কাফন-কসন![৫৮৬]

সর্বপ্রথম হিশাম আলমুআইয়াদের মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন মুহাম্মাদ বিন হিশাম আলমাহদী উমাবী ৩৯৯ হিজরীর শাবান মাসে (১০০৯ খৃস্টাব্দে)। তখন আলিম-উলামা ও ফকীহদের উপস্থিতিতে তাকে দাফন করা হয়েছিল। একবছর পর পরিচারক ওয়াযিহের হাতে পুনরায় তার আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এরপর তিনি সুলাইমান আলমুসতাঈন বা তার পুত্র মুহাম্মাদ বিন সুলাইমানের হাতে ৪০৩ হিজরীতে (১০১২-১৩ খৃস্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন এবং গোপনে সমাধিস্থ হন। আলী বিন হামুদ যখন কর্ডোভায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি হিশামের অনুসন্ধান করেন এবং সন্ধান না পেয়ে তার মৃত্যু ঘোষণা করে (অসিয়ত-সূত্রে) নিজে খলীফা হওয়ার দাবি করেন। এটি ৪০৭ হিজরীর (১০১৬ খৃস্টাব্দের) ঘটনা। এরপর আসে কাযী ইবনে আব্বাদের পালা। ৪২৬ হিজরীতে (১০৩৫ খৃস্টাব্দে) তিনি হিশামের (তৃতীয়) আত্মপ্রকাশের দাবি করেন এবং তার জন্য দোয়া ও খোতবায় নামোল্লেখের পাশাপাশি তার নামে বাইআত গ্রহণ করেন। মূলত এর

---

[৫৮৫] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৫২।

[৫৮৬] পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা 'আন্দালুসের মুতানাব্বী' নামে খ্যাত আবু আমির আবদুল আজিজ। দেখুন : ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা ফী মাহাসিনি আহলিল জাযীরাহ*, ১/৯৪০।

Scanned with CamScanner

মাধ্যমে তিনি ইবনে হামুদের খেলাফত দাবি খণ্ডন এবং নিজের ক্ষমতার শরয়ী (!) বৈধতা সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলেন, যেমনটি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করে এসেছি।[৫৮৭]

মু'তাযিদ বিন আব্বাদ তার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও সামরিক কুশলতার পাশাপাশি রাষ্ট্রের বিস্তৃত বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকেও উপভোগ করতেন। তার প্রাসাদ ছিল আলিম-উলামা ও ফকীহদের পদভারে মুখরিত। তার আমলে সেভিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্যচর্চা ও বিভিন্ন শাস্ত্র চর্চার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল। কবিগণ আন্দালুসের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেভিলে আগমন করতেন। তার রাজপ্রাসাদ পুরো আন্দালুসের শ্রেষ্ঠতম কবি-সাহিত্যিক ও জ্ঞানীদের উপস্থিতিতে সুশোভিত থাকত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক উযীর ইবনে যাইদুন; যিনি বনু জাহওয়ারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার পর কর্ডোভা থেকে পালিয়ে সেভিলে মু'তাযিদের কাছে চলে এসেছিলেন। মু'তাযিদ তাকে সসম্মানে নিজের একান্তজন বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাকে সেভিল রাষ্ট্রের উযীর ও মুখপাত্র হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এছাড়াও আছেন মু'তাযিদের আরেক উযীর ও লিপিকার বিযলিয়ানী, যিনি ছিলেন লেখক ও সাহিত্যিকগণের শিরোমণি ও যোগ্য সাহিত্যসমালোচক।[৫৮৮] অধিকন্তু মু'তাযিদ নিজেও একজন কবি ছিলেন।[৫৮৯]

সুবিস্তৃত রাষ্ট্র-পরিসর ও রাষ্ট্রীয় প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়ার পর ৪৬১ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে (১০৬৯ খৃস্টাব্দে) ৫৭ বছর বয়সে মু'তাযিদ ইন্তেকাল করেন। তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনুল ক্বাত্তান মন্তব্য করেছেন,

> সেভিলের মু'তাযিদ ছিলেন বাগদাদের আব্বাসী খলীফা মু'তাযিদের মতোই কঠোর প্রকৃতির। তিনি দক্ষ রাজনীতিবিদ ছিলেন। রাজপ্রাসাদে থেকেই তিনি তার রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। (অবশ্য) বদান্যতা ও দানশীলতার গুণ তার মাঝে প্রবল ছিল। তার সমসাময়িকদের মাঝে তারচে' অধিক উদারহস্ত কারও কথা জানা যায় না।[৫৯০]

---

[৫৮৭] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৪৯ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৫২।

[৫৮৮] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/৬২৪।

[৫৮৯] হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুক্বতাবাস*, ২৮৬ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৮৫।

[৫৯০] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৮৪।

Scanned with CamScanner

৪. আলমু'তামিদ বিন আব্বাদ

মু'তাযিদের মৃত্যুর পর সেভিলের ক্ষমতা গ্রহণ করেন তার পুত্র আবুল কাসিম মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ। তিনি যাফির বি হাওলিল্লাহ, মুআইয়াদ বিল্লাহ ও মু'তামিদ আ'লাল্লাহ উপাধি ধারণ করেন। মু'তামিদ সেভিলের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন তারুণ্যের টগবগে বয়সে। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৪৩১ বা ৪৩২ হিজরীতে। সুতরাং ক্ষমতাগ্রহণের সময় তার বয়স ছিল ত্রিশ বছরের মতো।[৫৯১]

মু'তামিদ ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা ও সাহসী বীর, স্বভাব কবি ও প্রজাদের প্রতি সদয়। 'ই'তিমাদ' নামীয় জনৈকা ক্রীতদাসীকে তিনি অত্যধিক ভালোবাসতেন বলে 'আলমু'তামিদ' উপাধি ধারণ করেছিলেন।[৫৯২] তিনি ছিলেন যোগ্য শাসক, জ্ঞানী ও সাহসী, উদার ও বদান্য, অস্ত্রের ব্যবহার ও যৌনাচারের ক্ষেত্রে সংযমশীল। তিনি তার পিতার মতো কঠোর, রক্তপিপাসু ও সামান্য সন্দেহে পাকড়াওকারী ছিলেন না। তার পিতা যাদেরকে নির্বাসিত করেছিলেন, তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে আনেন এবং তাদের প্রতি সদাচরণ করেন। তবে এসব সৎ গুণের পাশাপাশি মু'তামিদের মাঝে নিন্দনীয় ও গর্হিত কিছু অভ্যাসেরও সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি ছিলেন মদাসক্ত, আমোদ-প্রমোদে নিমজ্জিত, কর্মবিমুখ ও নিত্য আরামপ্রিয়। পরিশেষে এসব চারিত্রিক ত্রুটিই তার ধ্বংস ও পতনের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।[৫৯৩] তিনি বিস্ময়কর কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী ছিলেন।[৫৯৪]

মু'তামিদের শাসনামলকে পুরো আন্দালুসের সম্প্রদায়ভিত্তিক শাসনামলের অন্যতম স্মরণীয় ও প্রসিদ্ধ যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়।

মু'তামিদ বিন আব্বাদ তার শাসনামলে সর্বপ্রথম যে সফলতা অর্জন করেন তা হল, তিনি ৪৬২ হিজরীতে (১০৭০ খৃস্টাব্দে) কর্ডোভার বিরোধ মীমাংসা ও তার পিতার কর্ডোভায় কর্তৃত্ব বিস্তারের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরাসরি কর্ডোভার অভ্যন্তরীণ সমস্যা-সমাধানে হস্তক্ষেপ করেন।

এছাড়াও টলেডো-শাসক আলমামুন বিন যিননূন ও মু'তামিদের মধ্যে পর্দার

---

[৫৯১] ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৫৩।

[৫৯২] ইবনুল খতীব, *আলই'হাতা ফী আখবারি গারনাতা*, ২/১০৯।

[৫৯৩] ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৫৪।

[৫৯৪] আবদুল ওয়াহিদ আলমারাকিশী, *আলমু'জিব ফী তালখীসি আখবারিল মাগরিব*, পৃ : ১৫৮।

Scanned with CamScanner

অন্তরালে যে ক্ষমতার স্নায়ুযুদ্ধ ও রাজনৈতিক খেলা চলছিল; তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা সামনে যথাস্থানে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

সেভিলের সঙ্গে দুর্বিনীত সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত আন্দালুসের বার্বার সম্প্রদায়, বিশেষ করে গ্রানাডার বার্বারগণ মু'তামিদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য যে গোপনে শক্তি সঞ্চয় করছিল, তা সম্পর্কে মু'তামিদ সম্যক অবগত ছিলেন। আর তাই গ্রানাডার নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে নিজ রাষ্ট্রসীমা বিস্তৃতির লক্ষ্যে ৪৬৬ হিজরীতে (১০৭৪ খৃস্টাব্দে) তিনি তার বাহিনী নিয়ে গ্রানাডা অভিমুখে অভিযানে বের হন। এ অভিযানে তিনি গ্রানাডার উত্তরাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি জাইয়ান দখল করতে সক্ষম হন। পাশাপাশি তিনি পূর্বে মা'দিন থেকে নিয়ে কুনিকা পর্যন্ত টলেডোর দক্ষিণ-পূর্ব এলাকার বিস্তৃত অংশের উপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। এছাড়াও তিনি ইয়াহইয়া আলকাদির বিন যিননূনের কাছ থেকে মুর্সিয়া ও ভ্যালেন্সিয়ার কর্তৃত্ব কেড়ে নেন।[৫৯৫]

এসব অভিযানে অর্জিত ভূখণ্ডের মালিক হয়েই মু'তামিদ তুষ্ট হননি। তিনি মূল গ্রানাডা দখলেরও স্বপ্ন দেখছিলেন। একে কেন্দ্র করে গ্রানাডা-শাসক আবদুল্লাহ বিন বুলুক্কীনের সঙ্গে তার চরম সংঘাত তৈরি হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে ধারাবাহিক যুদ্ধ ও বিরোধ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মু'তামিদ আন্দালুসের খৃস্টানশক্তির সাহায্য নিয়ে তার মুসলিম ভাইদের পরাজিত করেন এবং নিজের কাঁধে ও অন্যান্য মুসলিম ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর প্রশাসকদের স্কন্ধে খৃস্টশক্তির বিশাল করের বোঝা চাপানোর বিনিময়ে বিজয়ের মুখ দেখেন। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা সামনে 'সেভিল ও গ্রানাডার মধ্যে সংঘাত' শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

এছাড়াও মু'তামিদ বিন আব্বাদ টলেডোর অধিকারী বনু যিননূনের সঙ্গেও সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। এ সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটে খৃস্টান শাসক ষষ্ঠ আলফোন্সোর হাতে টলেডোর পতনের মাধ্যমে। বিশ্বাসঘাতকতা, ইসলাম ও মুসলমানদের রক্তকে অবজ্ঞা করার মূল্য চুকিয়ে এবং ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে খৃস্টানশক্তিকে সাহায্য করে মু'তামিদ টলেডোর পতনের পথ উন্মুক্ত করেন। তার এই আত্মঘাতী ভুলের মাসুল ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। একে কেন্দ্র করেই তার ওপর বরং পুরো মুসলিম আন্দালুসের ওপর নেমে

---

[৫৯৫] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ: ১৬০ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৭১।

Scanned with CamScanner

আসে অপরিসীম দুর্যোগ। খৃস্টানরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর হামলা করার দুঃসাহস দেখাতে শুরু করে। আর নিয়তির কী নির্মম পরিহাস! বন্ধুত্বের নির্দশনরূপে খৃস্টান বাহিনী সর্বপ্রথম সেভিলকেই বেছে নেয় এবং সেভিল অবরোধ করে। এ দুর্যোগের সমাপ্তি ঘটে পশ্চিমের মাগরেব থেকে মুরাবিতীদের আন্দালুসে আগমনের মাধ্যমে।

মু'তামিদ বিন আব্বাদ সমকালীন আন্দালুসে সবচে' বিস্তৃত রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার রাষ্ট্র-সীমা আন্দালুস উপদ্বীপের দক্ষিণ অর্ধেকের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার আমলে পশ্চিমে টাডমির (Tudmir) প্রদেশ থেকে পুবে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত এবং ইয়ানা উপত্যকার তীর থেকে দক্ষিণে ফ্রন্টিরা (Frontera) ভূমি পর্যন্ত সেভিল রাষ্ট্র বিস্তৃত ছিল।[৫৯৬]

মু'তামিদের সাহিত্য ও কাব্যপ্রতিভার খ্যাতি তার প্রশাসক ও রাজনৈতিক খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সাহিত্যে তার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তিনি গদ্য ও পদ্যে সমান দক্ষ ছিলেন। তার আমলে কবি-সাহিত্যিকদের বাজার সরগরম ছিল। তারা পরস্পর কাব্য ও সাহিত্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। স্বয়ং মু'তামিদের রচিত কাব্যমালা ছাপা হয়েছে এবং বর্তমানে তা সহজলভ্য। আন্দালুসের শাসকদের মধ্যে তার পূর্বে তার চেয়ে কাব্য প্রতিভায় দক্ষ কোন শাসকের আগমন ঘটেনি। কাব্যসাহিত্যে মু'তামিদের রচিত অনন্য কবিতার সংখ্যা অনেক। বিশেষত পুত্রদের বিয়োগ বেদনায় এবং ক্ষমতা হারানোর শোকে তিনি যেসব কবিতা রচনা করেছিলেন, তা সাহিত্যের মানদণ্ডে অত্যন্ত উঁচু মানের।[৫৯৭] তার তেমনই একটি কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ,

قَالُوا الْخُضُوعُ سِيَاسَةٌ ... فَلْيَبْدُ مِنْكَ لَهُمْ خُضُوعُ

وَأَلَذُّ مِنْ طَعْمِ الْخُضُوْ ... عِ عَلَى فَمِي السُّمُّ النَّقِيعُ

মানুষ (আমায়) বলে, বিনয় ও নতিস্বীকারও নাকি এক ধরনের রাজনীতি! কাজেই তাদের সামনে আপনার নতি স্বীকার করা উচিত। কিন্তু আমার মুখে তো বশ্যতা স্বীকারের চেয়ে তরল গরলের স্বাদও সুমিষ্ট মনে হয়!

---

[৫৯৬] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৭১।

[৫৯৭] ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৫৫।

Scanned with CamScanner

إِنْ تَسْتَلِبْ عَنِّي الدُّنَا مُلْكِي وَتُسْلِمُنِي الْجُمُوْعُ
فَالْقَلْبُ بَيْنَ ضُلُوْعِهِ لَمْ تُسْلِمِ الْقَلْبَ الضُّلُوْعُ
لَمْ أُسْتَلَبْ شَرَفَ الطِّبَا ع، أَيُسْلَبُ الشَّرَفُ الرَّفِيْعُ؟

জগত যদি কেড়ে নেয় আমার শক্তি ও ক্ষমতা; সাথী-সঙ্গী ও দলবল ত্যাগ করে আমায়;
(কী আসে যায়) আমার হৃদয় তো আছে পাঁজরের মাঝে, পাঁজর-সঙ্গ ত্যাগ করবে না হৃদয় ।
আমার স্বভাব-আভিজাত্যকে যখন কেড়ে নেওয়া যায়নি, আমার সমুন্নত মর্যাদাকে কি আর কেড়ে নেওয়া যাবে?।

قَدْ رُمْتُ يَوْمَ نِزَالِهِمْ أَلَّا تُحَصِّنَنِي الدُّرُوْعُ
وَبَرَزْتُ لَيْسَ سِوَى الْقَمِيْ صِ عَلَى الْحَشَا شَيْءٌ دَفُوْعُ

শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের দিনও আমি কামনা করেছি, বর্ম ও ঢাল যেন আমায় সুরক্ষিত না করে ।
যুদ্ধক্ষেত্রে আমি যখন অগ্রসর হয়েছি, বুকের ওপর আচকান ছাড়া ছিল না কোন আঘাতরোধক ।

وَبَذَلْتُ نَفْسِيْ كَيْ تَسِيْ لَ إِذَا يَسِيْلُ بِهَا النَّجِيْعُ
أَجَلِيْ تَأَخَّرَ لَمْ يَكُنْ بِهَوَايَ ذُلِّيْ وَالْخُشُوْعُ

আপন প্রাণের মায়া আমি বিসর্জন দিয়েছি; রক্ত যখন প্রবাহিত হবে, প্রাণপাখিকে সঙ্গে করে যেন প্রবাহিত হয় ।
আমার চূড়ান্ত সময় বড় বিলম্ব করেছে; কারণ আমার প্রবৃত্তিতে নেই বশ্যতা ও নতি স্বীকার!

مَا سِرْتُ قَطُّ إِلَى الْقِتَا لِ وَكَانَ مِنْ أَمَلِيْ الرُّجُوْعُ
شِيَمُ الْأُلَى أَنَا مِنْهُمُ وَالْأَصْلُ تَتْبَعُهُ الْفُرُوْعُ

প্রত্যাবর্তনের আশা নিয়ে আমি কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিনি ।
এটাই হল মহৎহৃদয়দের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য এবং আমি তো তাদেরই

Scanned with CamScanner

একজন; আর স্বতঃসিদ্ধ যে, শাখা মূলেরই অনুসরণ করবে।[৫৯৮]

মুরাবিতীদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর ইউসুফ বিন তাশফীনের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের সহায়তা করার শাস্তি হিসেবে মু'তামিদকে মাগরেবে নির্বাসিত করা হয় এবং সেখানেই তিনি আগ্‌মাত নামক স্থানে ৪৮৮ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে (১০৯৫ খৃস্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে নিজের জন্য তিনি একটি শোকগাথা রচনা করেছিলেন এবং তার কবরের ওপর তা লিখে রাখার অসিয়ত করেছিলেন। শোকগাথাটি হল,

قَبْرُ الْغَرِيْبِ سَقَاكَ الرَّائِحُ الْغَادِيْ حَقًّا ظَفِرْتَ بِأَشْلَاءِ ابْنِ عَبَّادِ

بِالْحِلْمِ بِالْعِلْمِ بِالنُّعْمَى إِذَا اتَّصَلَتْ بِالْخِصْبِ إِنْ أَجْدَبُوْا بِالرِّيِّ لِلصَّادِيْ

ওহে প্রবাসীর সমাধি! সত্যিই তুমি ধন্য হয়েছ ইবনে আব্বাদের দেহাবশেষ ধারণ করে;

(শুধু কি তাই!) ধারণ করেছ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আর প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে। তোমার বুকে ধারণ করা এরা যদি খরাপীড়িত হয়, পথিক যেন তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করে।

بِالطَّاعِنِ الضَّارِبِ الرَّامِيْ إِذَا بِالْمَوْتِ أَحْمَرَ بِالضَّرْغَامَةِ الْعَادِيْ

بِالدَّهْرِ فِيْ يَقَمٍ بِالْبَحْرِ فِيْ نِعَمٍ بِالْبَدْرِ فِيْ ظُلَمٍ بِالصَّدْرِ فِي النَّادِيْ

(শুধু কি এই!) তুমি যে ধারণ করেছ যুদ্ধ-ময়দানের প্রবল প্রতাপশালী ও বর্শা, তরবারি, তীরের ঝানু খেলোয়াড়কে; ধারণ করেছ রক্তিম মৃত্যু ও ধাবমান সিংহকে।

ধারণ করেছ প্রতিশোধের বিজয়ীকে, অনুগ্রহের সমুদ্রকে, অন্ধকারের পূর্ণিমা চন্দ্রকে এবং সভা-মজলিসের মধ্যমণিকে।

نَعَمْ هُوَ الْحَقُّ فَاجَانِيْ عَلَى قَدَرٍ مِنَ السَّمَاءِ وَوَافَانِيْ لِمِيْعَادِ

وَلَمْ أَكُنْ قَبْلَ ذَاكَ النَّعْشِ أَعْلَمُهُ أَنَّ الْجِبَالَ تَهَادَى فَوْقَ أَعْوَادِ

---

[৫৯৮] ইবনে বাস্‌সাম, *আযযাখীরা*, ২/৫৩, ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইরা*, ২/৬৫-৬৬ ও যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৩৩/২৭১-২৭২।

Scanned with CamScanner

فَلَا تَـزَلْ صَلَوَاتُ اللهِ نَـازِلَـةً عَلَى دَفِيْنِكَ لَا تُحْصَى بِـتَعْدَادِ

হ্যাঁ, এটাই সত্য; আকাশ থেকে আকস্মিক নেমে এসেছে তাকদীরের লিখন আর হঠাৎ উপস্থিত হয়েছে আমার প্রতিশ্রুত সময়।
ঐ শবাধারের কঠিন স্পর্শ পাবার পূর্বে আমি জানতামই না যে, পর্বতমালা কয়েকটি কাষ্ঠখণ্ডের ওপর ভর দিয়ে চলতে পারে!
সুতরাং হে সমাধি! তোমার মাঝে সমাধিস্থের তরে বর্ষিত হোক আল্লাহর পাকের করুণা-ধারা চিরদিন, সবসময়।[৫৯৯]

এভাবেই শেষ হয় গোষ্ঠীনির্ভর বিভক্ত রাষ্ট্রযুগের অন্যতম প্রভাবশালী শাসকের জীবন এবং শেষ হয় স্বাধীন সেভিল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, চিরদিনের জন্য।

সেভিল রাজপ্রাসাদের আলিমসমাজ

রাজনৈতিক ও সামরিক সুদৃঢ় অবস্থানের ন্যায় সেভিল সুবিস্তৃত ইলমী অবস্থানেরও অধিকারী ছিল। কেননা, আন্দালুসের বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকবর্গের মধ্যে বনু আব্বাদ ছিল রাজনীতির পাশাপাশি সাহিত্যাঙ্গনে সমান মনোযোগ প্রদানকারী শাসকবর্গের মধ্যে সবার শীর্ষে। সেভিল রাজপ্রাসাদ ছিল কবি-সাহিত্যিক ও ফকীহদের পরম আকাঙ্ক্ষিত বিচরণক্ষেত্র। স্বয়ং মু'তামিদ ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক; অধিকন্তু মু'তামিদের কাব্যখ্যাতি কখনো কখনো তার রাজনৈতিক খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে যেত। বনু আব্বাদের রাষ্ট্রে পুরো আন্দালুসের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ও উঁচু মানের কবিগণ সমবেত হতেন আর তিনিও তাদের গুরুত্ব দিতেন এবং তাদের মূল্যায়ন করে নিজের সভাসদ ও মন্ত্রিপরিষদে স্থান দিতেন। সম্ভবত এসব কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচে' বিখ্যাত ছিলেন ইবনে যাইদুন, ইবনে লাব্বানা, উযীর ও যোদ্ধা ইবনে আম্মার প্রমুখ। আর সেভিল রাষ্ট্রের অন্যতম বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন মু'তামিদের একান্ত লিপিকার বিযলিয়ানী; যার সম্পর্কে ইবনে বাস্সাম মন্তব্য করেছেন, তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ সাহিত্য সমালোচক এবং সাহিত্যজগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব।[৬০০]

---

[৫৯৯] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/৫৭, আবদুল ওয়াহিদ আলমায়য়াকিশী, *আলমু'জিব ফী তালখীছি আখবারিল মাগরিব*, পৃ: ২২২, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ: ১৬৪ ও *আলইহাতা ফী আখবারি গারনাতা*, ২/১১৯-১২০।

[৬০০] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/৬২৪।

Scanned with CamScanner

তিন. বাতালইয়ুসে বনু আফতাসের শাসনামল

আন্দালুসের নিম্ন সীমান্ত এলাকায় গড়ে ওঠেছিল বাতালইয়ুস রাষ্ট্র। ভৌগোলিক অবস্থানগত বিশেষ গুরুত্বের কারণে বিভক্ত রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সংঘাতের ক্ষেত্রে বাতালইয়ুস রাষ্ট্রের ছিল গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। কেননা, একদিকে তা সেভিল রাষ্ট্রের উত্তরে অবস্থিত ছিল এবং উভয় রাষ্ট্রের মাঝে প্রাচীররূপে ছিল কেবল শারাত (সিয়েরা মোরিনা) পর্বতমালা; অপরদিকে তা এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকারী ছিল, যা টলেডো রাষ্ট্রের পশ্চিম দিক থেকে ইয়ানা উপত্যকার ত্রিভুজ কোণ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এছাড়াও এ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল বাতালইয়ুস (Badajoz) নগরী, যা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নগরী বরং রাজধানী ছিল এবং রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী অঞ্চল হিসেবে গণ্য হত। আন্দালুসের পশ্চিমাঞ্চলও এ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, অর্থাৎ বর্তমান পর্তুগালের পুরো অংশ এমনকি দক্ষিণের বাজা (Beja) নগরী পর্যন্ত বাতালইয়ুস রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেসব গুরুত্বপূর্ণ নগরী এ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার কয়েকটি হল, লিসবন (Lisbon), সান্তারিন (Santarem), কুলুমরিয়া (Coimbra) ইত্যাদি।

বনু আফতাসের শাসনের সূচনা

গোষ্ঠীভিত্তিক বিভক্ত রাষ্ট্রযুগে বাতালইয়ুস রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ও প্রকৃত পরিবর্তন মূলত সূচিত হয় বনু মাসলামার হাত ধরে। আন্দালুসী ইতিহাস-গ্রন্থগুলোতে মাসলামা গোত্র 'বনু আফতাস' নামে প্রসিদ্ধ। কেননা, সত্তর বছরেরও অধিক সময় ধরে বনু আফতাসই ছিল বনু মাসলামার নেতৃত্বের আসনে।

বাতালইয়ুস রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপট মূলত শুরু হয় হাকাম আলমুসতানসিরের আমলের শেষ দিকে সৃষ্ট ফিতনার সময় থেকে। সে সময় আন্দালুসের পশ্চিম অঞ্চলের (পর্তুগাল) প্রশাসক ছিলেন সাবুর আলআমিরী (অথবা ফারিসী) নামক জনৈক পরিচারক। তিনি ছিলেন হাকাম আলমুসতানসিরের মুক্ত ক্রীতদাস। তের বছর তিনি উক্ত অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন। যখন পুরো মুসলিম আন্দালুস জুড়ে গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রত্যেক গভর্নরই আপন আপন অধীনস্থ এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন, সাবুরও তখন এ অঞ্চলে একক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি

Scanned with CamScanner

প্রতিষ্ঠা করেন এবং কর্ডোভা থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন।

সাবুর যদিও একজন জাত যোদ্ধা ও সাহসী বীর ছিলেন; কিন্তু শাসন ও প্রশাসন পরিচালন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা তার ছিল না। তাই তিনি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আলআফতাসকে তার উযীর নিযুক্ত করেন এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন দায়িত্ব তার কাছে অর্পণ করেন। সুদক্ষ প্রশাসনিক পরিচালনার মাধ্যমে কিছুদিনের মধ্যে আফতাসই রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনকর্তায় পরিণত হন।

৪১৩ হিজরীতে (১০২২ খৃস্টাব্দে) সাবুর মৃত্যুবরণ করেন এবং উত্তরাধিকারী হিসেবে তার অপ্রাপ্তবয়স্ক দুই পুত্র আবদুল মালিক ও আবুদল আযীযকে রেখে যান। এ সময় আলআফতাস তার একক ক্ষমতার কথা ঘোষণা করেন এবং সাবুরের দুই বালক পুত্রকে কোন প্রকার সুযোগ না দিয়ে নিজে একচ্ছত্র শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। প্রশাসনের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে তিনি আলমানসুর উপাধি ধারণ করেন। এখান থেকেই শুরু হয় তার ও তার পরবর্তী প্রজন্মের শাসন-ইতিহাস।

১. আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলআফতাস

আবদুল্লাহ বিন মাসলামা, প্রসিদ্ধ 'ইবনুল আফতাস' নামে। তার বংশধারা মাগরেবের মিক্‌নাসা বংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মিক্‌নাসা গোত্র একটি অখ্যাত গোত্র হলেও ইবনুল আফতাস ছিলেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, সমরনীতি ও কুটনীতিতে সমৃদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। আর তাই তিনি যখন বাতালইয়ুস রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুতকরণ, প্রশাসন সুবিন্যস্তকরণ, সেনাবাহিনী শক্তিশালীকরণ এবং যেকোন ধরনের বহিঃশত্রুর হাত থেকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নগরপ্রাচীর নির্মাণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বিশেষত তাকদীর তাকে এমন দুই প্রবল প্রতিপক্ষের মধ্যবর্তী অবস্থানে উপবিষ্ট করেছিল, যারা উভয়ে প্রতি মুহূর্তে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকত; অর্থাৎ সেভিলের বনু আব্বাদ ও টলেডোর বনু যিননূন।

ইবনে আফতাস পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে সেভিল-শাসক কাযী আবুল কাসিম বিন আব্বাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন। পূর্বেও উল্লেখ করেছি, ইবনে আব্বাদের দক্ষ নেতৃত্বে সেভিল রাষ্ট্র যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ফলে

Scanned with CamScanner

তাদের দিক থেকে আশঙ্কাও ছিল বেশি। আর এ আশঙ্কা বাস্তবে রূপ নিল, যখন ৪২১ হিজরীতে বাতালইয়ুস রাষ্ট্রের বাজা নগরীতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার পরপরই কাযী ইবনে আব্বাদ সেখানে হামলা চালালেন। যুদ্ধে ইবনুল আফতাস বন্দী হন। অবশ্য কিছুদিন পরই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ৪২৫ হিজরীতে (১০৩৪ খৃস্টাব্দে) আবার উভয়ের মধ্যে সংঘাত বাঁধলে এবার বাতালইয়ুস বাহিনী জয়লাভ করে আর বনু আব্বাদ বরণ করে শোচনীয় পরাজয়।

পরবর্তী সময়ে অবশ্য উভয় পক্ষের মধ্যকার এই যুদ্ধের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। এর কারণ হল, উভয় পক্ষই এ সময় ভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভিন্ন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিল। বনু আব্বাদ বার্বারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, যে যুদ্ধে তাদেরকে বনু আফতাসের কাছে দেওয়া মূল্যের চেয়েও বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল এবং ৪৩১ হিজরীতে শোচনীয় পরাজয় ও দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বার্বাররা গ্রানাডা, কারামোনা ও মালাগায় সমবেত হয়ে ইবনে আব্বাদের বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল এবং তৎকালীন সেভিল-শাসক ইসমাঈল বিন কাযী আবুল কাসিম বিন আব্বাদ যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে যথাস্থানে পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।[৬০১]

অন্যদিকে আবদুল্লাহ বিন আফতাস লিসবনে সাবুরের দু' পুত্র আবদুল আযীয ও আবদুল মালিকের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আবদুল আযীয তার পিতার রাজত্ব পুনরুদ্ধারের আশায় লিসবনে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি ইন্তেকাল করেন।

এরপর তার ভাই আবদুল মালিক তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিদ্রোহের ডাক দেন। কিন্তু আবদুল মালিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দক্ষতার অধিকারী ছিলেন না। তাই লিসবনবাসীও তার প্রতি আস্থা রাখতে পারেনি। তারা গোপনে ইবনুল আফতাসের সঙ্গে পত্র-যোগাযোগ করে তার পক্ষ থেকে লিসবনে কোন গভর্নর পাঠাতে বলে। ইবনুল আফতাস তার পুত্র মুহাম্মাদের নেতৃত্বে লিসবনে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। বাহিনী উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিরোধ ছাড়াই শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। কেননা, শহরবাসী আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে ইবনুল আফতাসের বাহিনীকেই সহযোগিতা

---

[৬০১] ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা*, ৩/২০-২২ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২০১-২০৩।

Scanned with CamScanner

করছিল। নিঃসঙ্গ আবদুল মালিক এ সময় অনুভব করলেন, তিনি ইবনুল আফতাসের বাহিনীর মাঝে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছেন। বাধ্য হয়ে তিনি আনুগত্যের ঘোষণা দেন এবং তার, তার পরিবার ও অর্থসম্পদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। তার আবেদন মঞ্জুর করে ইবনুল আফতাসের বাহিনী তাকে যেখানে ইচ্ছা চলে যাওয়ার সুযোগ দেন। আবদুল মালিক লিসবন ছেড়ে কর্ডোভার পথ ধরেন এবং কর্ডোভার নিকটে পৌঁছে কর্ডোভা-শাসক উমীর ইবনে জাহওয়ারের কাছে কর্ডোভায় প্রবেশের অনুমতি চান। অনুমতি পাওয়ার পর তিনি কর্ডোভাতেই তার পিতা সাবুরের প্রাচীন বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই ইন্তেকাল করেন।[৬০২]

এভাবে আবদুল্লাহ বিন আফতাস তার রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি, পরিসর বৃদ্ধি ও রাষ্ট্রের ওপর নিজের কর্তৃত্ব মজবুত করার প্রচেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত অবস্থায় ৪৩৭ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে (১০৪৫ খৃস্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মাদ 'আলমুযাফফার' উপাধি ধারণ করে শাসনভার গ্রহণ করেন।[৬০৩]

২. আলমুযাফফার মুহাম্মাদ বিন আফতাস

পুরো নাম আলমুযাফফার সাইফুদ্দৌলাহ আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা। তিনিও 'ইবনুল আফতাস' নামে প্রসিদ্ধ। ৪৩৭ হিজরীতে পিতার মৃত্যুর পর তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন। মুযাফফার তার পিতার মতই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ ছিলেন। দায়িত্বগ্রহণের পর তিনিও বাতালইয়ুস ও আশেপাশের অঞ্চলে ক্ষমতা মজবুতকরণ এবং রাষ্ট্রের সকল প্রান্তে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সচেষ্ট হন, যেন প্রথমে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নিশ্চিত থেকে অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে নিয়তি তার জন্য যা লুকিয়ে রেখেছে বা উত্তর সীমান্তের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, বাইরের সেসব পরিস্থিতির ওপর সার্বিক নজর রাখা যায়। ইবনুল আফতাস তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার মাধ্যমে সেভিলের বনু আব্বাদ ও টলেডোর বনু যিননূনের রাষ্ট্রের সমকক্ষ একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল বনু আব্বাদের সঙ্গে যুদ্ধে তার

---

[৬০২] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৩৭।

[৬০৩] ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইরা*, ২/৯৭, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৩৬ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৮৩।

Scanned with CamScanner

সৈন্যদের অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ ও রক্তদানের মাধ্যমে। বিশেষত সেভিল ও বাতালইয়ুস রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্য সীমান্তে অবস্থিত নিয়েব্‌লা ও ইয়াব্‌রা অঞ্চলের আশেপাশে যেসব তীব্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তাতে জয়-পরাজয় বারবার উভয় পক্ষের মাঝে দোদুল্যমান ছিল। কর্ডোভার প্রশাসক উযীর আবুল হাযম বিন জাহওয়ার ও তার পুত্র আবুল ওয়ালিদ বিন জাহওয়ার যদি উভয় পক্ষের সংঘাত নিরসনে হস্তক্ষেপ না করতেন, উভয় পক্ষই হয়তো অপর পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়ত। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে শীঘ্রই আসবে ইনশাআল্লাহ।[৬০৪]

কিন্তু মুযাফফার তার পরম শত্রু মু'তামিদ বিন আব্বাদের সঙ্গে সংঘাত থেকে মুক্ত হতে না হতেই টলেডোর শাসক মামুন বিন যিননূনের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বেঁধে যায়।[৬০৫]

মুসলিম আন্দালুসের উত্তর সীমান্তের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার চলমান এই দুঃখজনক ভ্রাতৃঘাতী ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অনবগত ছিল না। তারা তো প্রতিমুহূর্তে আন্দালুসে ইসলামের অস্তিত্ব ধ্বংস করার সুযোগের অপেক্ষায়ই থাকত। ক্যাস্টোলা ও লিওনের নৃপতি স্যাঞ্চো-পুত্র প্রথম ফার্ডিনান্ড যখন দেখতে পান যে, মুসলিম আন্দালুস এখন শতধা বিভক্ত এবং পরস্পর আত্মঘাতী হানাহানিতে লিপ্ত, তখন তিনি একে সুবর্ণ সুযোগ ও অনুকূল পরিস্থিতি মনে করে বাতালইয়ুস রাষ্ট্রের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে (বর্তমান পর্তুগালের উত্তরাঞ্চলে) হামলা চালান। ধারাবাহিক যুদ্ধের পর খৃস্টান বাহিনী জয়লাভ করে এবং আন্দালুসের পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ফার্ডিনান্ডের দখলে চলে যায়। এর মধ্যে সবচে' বিশাল ও বেদনাদায়ক ক্ষতি ছিল ৪৫৬ হিজরীতে (১০৬৪ খৃস্টাব্দে) কুলুমরিয়া (Coimbra) নগরীর পতন এবং ইবনুল আফতাস কর্তৃক খৃস্টানদেরকে কর প্রদান;[৬০৬] যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে 'খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিস্থিতির ক্রমবিবর্তন' শিরোনামের অধীনে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এভাবে মুযাফফার বিন আফতাস তার শাসনামলে একের পর এক সঙ্গীন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে থাকেন। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম কোন দিক থেকেই তিনি এক মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি সরাতে পারেননি। চারিদিকে শত্রু,

---

[৬০৪] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২১০-২১২।

[৬০৫] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৮৩।

[৬০৬] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৩৮-২৩৯ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৮৪।

Scanned with CamScanner

সবদিকে হুমকি। এ দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই তিনি ৪৬০ হিজরীতে (১০৬৭ খৃস্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র ইয়াহইয়া। তিনি 'আলমানসুর' উপাধি ধারণ করেন।[৬০৭]

ইয়াহইয়া আলমানসুর ও তার ভাই ওমর আলমুতাওয়াক্কিলের শাসনামলের আলোচনা করার পূর্বে এখানে কিছুক্ষণের জন্য থেমে প্রয়াত শাসক আলমুযাফফারের জীবনের একটি উজ্জ্বলতম দিক নিয়ে আলোচনা করা সঙ্গত মনে হচ্ছে। আর সে দিকটি হল, আলমুযাফফারের বাতালইয়ুসে রেখে যাওয়া বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান ও চিন্তাগত জাগরণ।

আলমুযাফফার যদিও যুদ্ধক্ষেত্র ও সংঘাতের ময়দানে যথেষ্ট কঠোর ও প্রভাব বিস্তারকারী ছিলেন; কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি সমসাময়িক আমলের অন্যতম সুসাহিত্যিক শাসকও ছিলেন। তিনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আলিমসমাজের সাহচর্য ও ইলমী আলোচনা-পর্যালোচনা, গ্রন্থ ক্রয় ও সংগ্রহ করা ইত্যাদির স্বভাব অনুরাগী। ইলমের অঙ্গনে তিনি কালের আলোচনায় পরিণত হয়েছিলেন। তিনি ইলমী আলোচনার জন্য আলিমদের উপস্থিত করতেন এবং ইফাদা-ইসতিফাদা করতেন।[৬০৮] তিনি একটি চমৎকার ও অতি উন্নত মানের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যা 'কিতাবুল মুযাফফার' নামে সুপরিচিত এবং 'আততায্কিরাহ' নামে অনূদিত। গ্রন্থটি এক শ' খণ্ড, মতান্তরে পঞ্চাশ খণ্ড, মতান্তরে দশ খণ্ডে রচিত। ইলমুল মাগাযী (যুদ্ধ-ইতিহাস-শাস্ত্র), ইলমুস সিয়ার (জীবনেতিহাস-শাস্ত্র), ইলমুল আমছাল (প্রবচনশাস্ত্র), ইলমুল আখবার (ঐতিহাসিক বিবরণ-শাস্ত্র)-সহ সাহিত্যের সকল অঙ্গনের আলোচনাসমৃদ্ধ এ গ্রন্থটি জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের এক সুবিশাল জ্ঞানকোষ। গ্রন্থটিতে নির্বাচিত সাহিত্যসম্ভার, সূক্ষ্ম ও মনোহর বিভিন্ন দুর্লভ তত্ত্ব, ভাষা-অলঙ্কারসমৃদ্ধ রসকথা, রাষ্ট্রসংক্রান্ত বিরল আলোচনা ও ভাষাতত্ত্বের দুর্লভ আলোচনার সন্নিবেশ ঘটেছে। এ জ্ঞানকোষটি

---

[৬০৭] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৬০ ও ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৯৭। অবশ্য ডক্টর হুসাইন মু'নিস *'আলহুল্লাতুস সাইয়ারা'* গ্রন্থের সম্পাদনা করতে গিয়ে লিখেছেন, মুযাফফার বিন আফতাস ৪৫৬ হিজরীতে (১০৬৩ খৃস্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৭ পৃষ্ঠার টীকায় বনু আফতাসের শাসকবর্গের ধারাবাহিকতা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বিষয়টি পুনরায় উল্লেখ করেছেন। এই তথ্যের ক্ষেত্রে তার প্রমাণ হল স্প্যানিশ গবেষক ব্রেটোকিস-এর আবিষ্কৃত একটি মুদ্রা, যাতে মুযাফফার-পুত্র ও পরবর্তী শাসক ইয়াহইয়া আলমানসুরের নাম অঙ্কিত ছিল এবং তাতে তারিখ উল্লেখ ছিল ৪৫৬ হিজরী।

[৬০৮] মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/৩৮০-৩৮১।

Scanned with CamScanner

আলমুযাফফার নিজে রচনা করেছেন এবং একমাত্র (তার লিপিকার) আবু উসমান সাঈদ বিন খাইরা ব্যতীত অন্য কোন আলিমের সহায়তা গ্রহণ করেননি।[৬০৯]

ভাবতে অবাক লাগে মুযাফফার বিন আফতাস কোথায় পেয়েছিলেন এত জ্ঞান ও নৈপুণ্য! এই সমুন্নত মনোবল ও সংকল্পের অধিকারী কীভাবে হয়েছিলেন তিনি! এ সুবিশাল গ্রন্থ রচনা করার মতো অবসর কোথায় পেয়েছিলেন তিনি! আন্দালুসের প্রথিতযশা আলিম ইবনে হায্ম রহ.-ও মুযাফফারের এই অনন্য কীর্তি দেখে তার প্রতি মুগ্ধতা লুকিয়ে রাখতে পারেননি। তিনি একে নিয়ে পুরো আন্দালুসের রাজন্যবর্গের ওপর গৌরব করেছেন এবং একে ইতিহাসের পরিক্রমায় আন্দালুসের অন্যতম শ্রেষ্ঠকর্ম বলে অভিহিত করেছেন। গর্বভরে তিনি লিখেছেন,

> তোমাদের আছে এমন কোন শাসক, যিনি সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে বাতালইয়ুস-শাসক মুযাফফারের মতো এক শ' খণ্ডবিশিষ্ট একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন? অব্যাহত যুদ্ধ ও সংঘাত এবং প্রশাসন-ব্যস্ততা তার সাহিত্য স্পৃহা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণবন্ততাকে কেড়ে নিতে পারেনি।[৬১০]

মুযাফফারের একটি চিত্তাকর্ষক কাব্যপঙ্‌ক্তি হল,

أَنِفْتُ مِنَ الْمُدَامِ لِأَنَّ عَقْلِي ... أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْ أُنْسِ الْمُدَامِ

وَلَمْ أَرْتَحْ إِلَى رَوْضٍ وَزَهْرٍ ... وَلَكِنْ لِلْخَمَائِلِ وَالْحُسَامِ

إِذَا لَمْ أَمْلِكِ الشَّهَوَاتِ قَهْرًا ... فَلِمَ أَبْغِي الشُّفُوفَ عَلَى الْأَنَامِ

> সুরাপাত্র আমায় টানে না; আমার মেধা ও প্রতিভা যে আমার কাছে মদের প্রফুল্লতার চেয়ে বেশি প্রিয়।
>
> তরবারি ও তরবারি-খাপের প্রয়োজন ছাড়া কখনো আমি উপভোগ করিনি উদ্যান ও পুষ্প-সৌন্দর্য।
>
> প্রবৃত্তি-বাসনাকেই যখন আমি জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, তাহলে কী করে কামনা করব সৃষ্টিজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা?

---

[৬০৯] আবদুল ওয়াহিদ আলমাররাকিশী, *আলমু'জিব ফী তালখীছি আখবারিল মাগরিব*, পৃ : ১২৮, ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/৬০, ৪/৬৪০-৬৪১, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৩৬-২৩৭ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৮৩-১৮৪।

[৬১০] ইবনে হায্ম ও ইবনে সাঈদ, *জাবারিলুল আন্দালুস ওয়া আহলিহা*, পৃ : ৩৫।

Scanned with CamScanner

আলমুযাফফার বলতেন,

> যার কবিতা মুতানাব্বী ও মাআ'ররীর মানের নয়, সে যেন কাব্যচর্চা হতে বিরত থাকে।[৬১১]

৩. আলমানসুর ইয়াহইয়া বিন আফতাস

৪৬০ হিজরীতে মুযাফফার বিন আফতাস-এর ইন্তেকালের পর তার স্থলাভিষিক্ত হন তার দু' পুত্র ইয়াহইয়া ও ওমর। ইয়াহইয়া তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ৪৬০ হিজরীতে বাতালইয়ুস ও তার প্রদেশসমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আলমানসুর উপাধি ধারণ করেন। আর তার ভাই ওমর ইভোরা (Evora) নগরী (বর্তমান পর্তুগালের দক্ষিণাঞ্চলের একটি শহর) ও সংশ্লিষ্ট গ্রামাঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলোর প্রশাসক নিযুক্ত হন।

ইয়াহইয়া তার পিতার রেখে যাওয়া সুবিস্তৃত রাষ্ট্রক্ষমতা উপভোগ করতে না করতেই তার ভাই ওমর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। উভয়ের মধ্যে বিরোধ ও সংঘাত প্রচণ্ড আকার ধারণ করে এবং ৪৬১ হিজরীতে (১০৬৮ খৃস্টাব্দে) তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। এ গৃহসংঘাত ছিল ক্যাস্টোলা-শাসক (ফার্ডিনান্ড-পুত্র) আলফোন্সোর জন্য মুসলিম ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে ধন-সম্পদ, ঘর-বাড়ি কেড়ে নেওয়ার পরম সুযোগ। বাতালইয়ুস রাষ্ট্রের এই গৃহসংঘাত একসময় যুদ্ধে রূপ নেয় এবং সংঘাত চরমে পৌঁছলে ওমর সেভিল-শাসক মু'তামিদ বিন আব্বাদের কাছে আশ্রয় নেন; আর তার ভাই ইয়াহইয়া আলমানসুর আশ্রয় নেন টলেডো-শাসক আলমামুন বিন যিননূনের কাছে। সর্বগ্রাসী এই সংঘাতের আগুন যখন সবকিছু গ্রাস করে নিতে উদ্যত হয়, তখন ৪৬১ হিজরীতেই ইয়াহইয়ার আকস্মিক মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহ তাআ'লা মুসলমানদের এর ভয়াবহতা হতে রক্ষা করেন। প্রতিদ্বন্দ্বীহীন রাষ্ট্রে ওমর পরিণত হন একক ক্ষমতার অধিকারী শাসনকর্তায়। তিনি নিজে বাতালইয়ুসে প্রবেশ করে পুত্র আব্বাসকে ইভোরার দায়িত্ব প্রদান করেন। শাসনভার গ্রহণ করে তিনি ধারণ করেন 'মুতাওয়াককিল আ'লাল্লাহ' উপাধি।[৬১২]

---

[৬১১] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৮৪।

[৬১২] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৪/৬৫০-৬৫১, ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৯৭-৯৮ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৮৪।

Scanned with CamScanner

৪. মুতাওয়াক্কিল আ'লাল্লাহ বিন আফতাস

মুতাওয়াক্কিল ছিলেন উচ্চাভিলাষী, গুণী, প্রবাদতুল্য মহত্ত্ব ও প্রফুল্লের অধিকারী, সুবিবেচক ও সুসাহিত্যিক। তার শাসনামলে বাতালইয়ুস ছিল কাব্য, সাহিত্য, ভাষা-ব্যাকরণ ও অন্যান্য জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র।[৬১৩] অবশ্য মুতাওয়াক্কিলের খ্যাতি রাজনৈতিক দক্ষতা বা সামরিক শৌর্য-বির্যের কারণে ছিল না; তার সুখ্যাতি ছিল একজন কবি, সাহিত্যিক ও সুভাষী হিসেবে। তিনি তার বীরত্বের চেয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ভাষার শ্রেষ্ঠত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বাতালইয়ুসের জ্ঞান-নগরীতে মুতাওয়াক্কিলের অবস্থান ছিল সেভিলের জ্ঞান-নগরীতে মু'তামিদের অবস্থানের ন্যায়। উভয়ের নগরীতে না জানি কত সাহিত্য-স্বপ্ন জীবন্ত হয়েছে! কত স্বপ্ন ডানা মেলে বিচরণ করেছে![৬১৪]

ঐতিহাসিক মাররাকিশী মুতাওয়াক্কিলের পিতা মুযাফফারের প্রশংসা করার পর মুতাওয়াক্কিলের প্রশংসায় লিখেছেন,

> আর তার পুত্র মুতাওয়াক্কিলের ছিল যুদ্ধ-বীরত্ব ও সাহসিকতার পাশাপাশি গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে সুদৃঢ় পদচারণা। রাষ্ট্রের সকল যুদ্ধে তিনি স্বশরীরে উপস্থিত থাকতেন; কোন কিছুই তাকে তা থেকে বিরত রাখতে পারত না।[৬১৫]

ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থগুলোতে তার রচিত বিভিন্ন কাব্যপঙ্ক্তি ও ঘটনা বিবৃত হয়েছে, যা দ্বারা তার জ্ঞানের প্রসারতা, সাহিত্য মনন এবং গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পাশাপাশি এসব পঙ্ক্তি ও ঘটনাবলির মাধ্যমে তার আচরণে-উচ্চারণে সার্বক্ষণিক বিরাজমান ধর্মীয় চেতনার বিষয়টিও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। মুতাওয়াক্কিলের গদ্য সাহিত্য ছিল পদ্য সাহিত্যের চেয়েও প্রাঞ্জল ও ছন্দবদ্ধ। গদ্য সাহিত্যে তার রচনাসম্ভার অতি উচ্চ স্তরের। অত্যুচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন লেখক-সাহিত্যিকগণও এ স্তরের সাহিত্য রচনায় অক্ষম।[৬১৬]

---

[৬১৩] ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৯৬ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৮৫।

[৬১৪] ইবনে সাঈদ আলমাগরিবী, *আলমুগরিব ফী হুলাল মাগরিব*, ১/৩৬৪।

[৬১৫] আবদুল ওয়াহিদ আলমাররাকিশী, *আলমু'জিব*, পৃ : ১২৮।

[৬১৬] আলফাতহ বিন খাক্বান, *ক্বালাইদুল ই'ক্বয়ান*, পৃ : ৪৫-৪৬ ও ইবনুল খতীব, *আলই'হাতা ফী আখবারি গারনাতা*, ৪/৪৫-৪৬।

Scanned with CamScanner

বিভক্ত আন্দালুসের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় মুতাওয়াক্কিল বিন আফতাসের রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং জনসাধারণের মাঝে সাম্য, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, আপন কর্মকাণ্ডে শরীয়তের চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া, আলিমসমাজকে অগ্রবর্তী কাতারে রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও মুতাওয়াক্কিল ছিলেন অনন্য।

মুতাওয়াক্কিল বিন আফতাসের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বলতে হয়, সম্ভবত তার আমলের সবচে' প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ঘটনা হল, ৪৭২ হিজরীতে (১০৭৯ খৃস্টাব্দে) তার টলেডোতে প্রবেশের ঘটনা। এ সময় টলেডোর তৎকালীন শাসনকর্তা আলকাদির বিল্লাহ ইয়াহইয়া বিন যিননূনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হলে তিনি পালিয়ে যান এবং মুতাওয়াক্কিল টলেডোর প্রশাসনব্যবস্থা কব্জা করে সেখানকার প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় কার্যাদি পরিচালনা করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে খৃস্টানদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় 'আলকাদির বিল্লাহ' পুনরায় টলেডোতে ফিরে এলে তিনি সেখান থেকে বাতালাইয়ুস ফিরে আসেন এবং ফেরার সময় ইয়াহইয়ার কোষাগার ও ধন-সম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। অবশ্য 'আলকাদির বিল্লাহ' এরপর বেশিদিন টলেডোর শাসনক্ষমতা উপভোগ করতে পারেননি। 'আল্লাহ তাআ'লার অনুগ্রহে শক্তিমান' উপাধিধারী আলকাদির বিল্লাহ আপন ত্রাতা মনে করেছিলেন যে খৃস্টানশক্তিকে সেই খৃস্টানশক্তির হাতেই ৪৮৭ হিজরীতে (১০৮৫ খৃস্টাব্দে) টলেডোর পতন ঘটে। এর বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে প্রদান করা হবে ইনশাআল্লাহ।

টলেডো পতনের পর ক্যাস্টোলা-শাসক আলফোন্সো একের পর এক অন্যান্য বিভক্ত রাষ্ট্রগুলো ধ্বংস করার জন্য সামরিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। মুসলিম আন্দালুসের দিগন্তে পুঞ্জীভূত হতে থাকে দুর্যোগের ঘনঘটা। আর তখনই স্পন্দিত হয়ে ওঠে ধর্মীয় চেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধ। মুতাওয়াক্কিল তার প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের প্রধান কাযী আবুল ওয়ালিদ বাজীকে খণ্ডিত আন্দালুসের সকল রাষ্ট্রের শাসকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে একতাবদ্ধ হওয়ার, বিভেদ পরিহার ও শত্রুর মোকাবেলায় অগ্রসর হওয়ার আহ্বানের জন্য নির্বাচিত করেন। কিন্তু কেউ যখন তার আহ্বানে সাড়া দিল না এবং তার সাহায্যার্থে এগিয়ে এল না, তখন বিষয়টি সেই গুরুত্বপূর্ণ

Scanned with CamScanner

সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, যাকে তাকদীর আন্দালুস-ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছিল। আর তা হল মুসলিম আন্দালুসের পক্ষ হতে মাগরেবের মুরাবিতী সরকারের কাছে সাহায্য চেয়ে আবেদন।[৬১৭] এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা সামনে 'খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিস্থিতি ও বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকবর্গের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক' শীর্ষক আলোচনায় পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

বনু আফতাসের দুর্যোগ

মুতাওয়াককিলের শাসনামল আন্দালুসে মুরাবিতীদের আগমন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়েছিল। মুরাবিতী সেনাপতি সায়র বিন আবু বকর রহ. ৪৮৪ হিজরীতে (১০৯১ খৃস্টাব্দে) যখন সেভিল অবরোধ করেন এবং তার হাতে মুতাওয়াককিলের সেভিলের পতন ঘটে, তখন মুতাওয়াককিল এমন এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যা তার মতো সুশাসকের কাছ থেকে কল্পনারও ঊর্ধ্বে ছিল। তিনি ষষ্ঠ আলফোন্সোর কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে লিসবন, সান্তারিন ও সান্তারা দখলের সুযোগ করে দেন, যেন এর বিনিময়ে আলফোন্সো তাকে মুরাবিতীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন।

বাতালইয়ুসের জনগণ মুতাওয়াককিলের এই আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ৪৮৮ হিজরীর শুরুতে (১০৫৯ খৃস্টাব্দে) মুরাবিতী সেনাপতি সায়র বিন আবু বকরের কাছে দূত পাঠিয়ে মুতাওয়াককিলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করে। সায়র বিন আবু বকর বাতালইয়ুসে প্রবেশ করে নগরী অবরোধ করেন। মুতাওয়াককিল তার সহচরদের নিয়ে বাতালইয়ুসের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেন। আলফোন্সো কিন্তু এ সময় তার মুসলিম মিত্র মুতাওয়াককিলের সাহায্যার্থে অগ্রসর হননি। মুরাবিতী বাহিনী অতি সহজে নগরীতে প্রবেশ করে এবং তরবারি-শক্তি প্রয়োগ করে। সায়র বিন আবু বকর মুতাওয়াককিল ও তার দু' পুত্র আব্বাস ও ফযলকে বন্দী করেন। এরপর তাদেরকে সেভিলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেভিলের কাছাকাছি পৌঁছে মুতাওয়াককিলকে বলা হয়, আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। তিনি তার পূর্বে তার পুত্রদ্বয়কে হত্যা করতে অনুরোধ করেন, যেন

[৬১৭] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৯১।

Scanned with CamScanner

তাদের মৃত্যুদৃশ্য দেখার সবরের কারণে আল্লাহর দরবারে আজর লাভ করতে পারেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে তার পূর্বে তার পুত্রদ্বয়কে হত্যা করা হয়। এরপর তিনি দু' রাকাত নামায পড়ার জন্য দাঁড়ান। তখন মুরাবিতী সৈন্যরা তাকে বর্শা দ্বারা আঘাত করে। ফলে নামাযের মধ্যে তার উচ্চারণ জড়িয়ে আসে এবং তার জীবনাবসান ঘটে; অস্তমিত হয় এক প্রতাপশালী শাসন-সূর্য।[৬১৮]

মুতাওয়াক্কিলের এক পুত্রের নাম ছিল মানসুর; নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে তাকে তিনি ক্যাস্টোলার সীমান্তের কাছে মান্টানজেশ দুর্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পিতা ও ভাইদের পরিণতি জানতে পেরে সে আত্মরক্ষার জন্য পরিবার-পরিজন নিয়ে খৃস্টান রাষ্ট্র ক্যাস্টোলায় চলে যায় এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকে। কোন কোন বর্ণনামতে, সে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।[৬১৯]

ইতিহাস এভাবেই আমাদের শিক্ষা দিয়ে যায়, শিক্ষা নিতে বলে। এভাবেই শেষ হয় বনু আফতাসের দুর্যোগ ও অবনমন, এভাবেই ঘটে মুতাওয়াক্কিল আ'লাল্লাহর বিয়োগান্ত পতন এবং এভাবেই পশ্চিম আন্দালুসে প্রতিষ্ঠিত হয় মুরাবিতীদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ। মুমিনদের পরিবর্তে খৃস্টানদের সঙ্গে হৃদ্যতা ও চুক্তি করে মুতাওয়াক্কিল যে অমার্জনীয় অপরাধ করেছিলেন, তার মূল্য তাকে এভাবেই চুকাতে হয়েছিল। যদিও তিনি ছিলেন সদাচারী, জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষক ও ন্যায়-ইনসাফের প্রতিষ্ঠাতা; কিন্তু তার এই চরম স্খলনের কারণে ইতিহাস তাকে ক্ষমা করেনি। পার্থিব মোহ আর ক্ষমতার লিপ্সাই ছিল এ স্খলনের মূল কারণ। আর মহান আল্লাহ তাআ'লার এ নির্দেশনা তো শাশ্বত ও চিরন্তন সত্য যে,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

---

[৬১৮] ইবনে দাহইয়া আলকালবী, *আলমুতরিব মিন আশআ'রি আহলিল মাগরিব*, পৃ : ২৬, আবদুল ওয়াহিদ আলমারাকিশী, *আলমু'জিব ফী তালখীসি আখবারিল মাগরিব*, পৃ : ১২৮, ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/১০২, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৮৫-১৮৬ ও *আলই'হাতা ফী আখবারি গারনাতা*, ৪/৪৬-৪৭।

[৬১৯] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৮৬ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৩৬৯।

Scanned with CamScanner

> হে মুমিনগণ! ইহুদি ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না । তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না । [সূরা মায়িদা : ৫১]

বাতালইয়ুস রাজদরবারের বিখ্যাত কয়েকজন আলিম

বনু আফতাসের পৃষ্ঠপোষকতায় বাতালইয়ুস ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-ফিকহ ইত্যাদির বিচারে খণ্ডিত আন্দালুসযুগের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ নগরী। দূর-দূরান্ত থেকে আলিম-উলামা ও কবি-সাহিত্যিকগণ বাতালইয়ুসে ছুটে আসতেন এবং এখানকার শাসকদের, বিশেষ করে মুযাফফার ও মুতাওয়াক্কিলের বদান্যতা লাভ করতেন। বনু আফতাস কাব্য ও সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিল। বনু আফতাসের রাজদরবারের কবিদের মধ্যে সম্ভবত সবচে' বিখ্যাত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক উযীর ইবনে আবদুন, যাকে বিভক্ত আন্দালুস আমলের প্রসিদ্ধতম উযীর ও কবি হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি বনু আফতাসের প্রশাসনের প্রধান উযীর ও রাষ্ট্রীয় কবি ছিলেন। বনু আফতাসের শাসনব্যবস্থার পতন নিয়ে তিনি একটি শোকগাথা রচনা করেছিলেন, যাতে নিহত প্রত্যেক শাসকের আলোচনা ছিল এবং যারা প্রতারণা ও প্রবঞ্চণার শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। হৃদয়কাড়া সেই শোকগাথা কর্ণকুহরে দোলা দিয়ে যায় আর শ্রোতাকে দান করে অনন্য উপদেশ ও শিক্ষা।[৮২০]

এছাড়াও বাতালইয়ুস রাজদরবারে মহান আলিম-ফকীহগণের এক জামাতেরও উপস্থিতি ছিল, যারা সর্বদা ন্যায়ের কথা বলেছেন, রাজদরবারে নির্ভীক স্বরে সত্য উচ্চারণ করেছেন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক ভাঙন ও সংঘাত রোধ করে খণ্ডিত আন্দালুসের মুসলিম শাসকদের মাঝে মীমাংসা ও সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন। এদের শীর্ষে ছিলেন আবুল ওয়ালিদ আলবাজী, বিখ্যাত ফকীহ ইবনু আবদিল বার মালিকী (যিনি মূলত কর্ডোভা-

---

[৮২০] আলফাতহ বিন খাক্বান, *কালাইদুল ই'ক্বয়ান*, পৃ : ৩৭-৪০, ইবনে দাহইয়া আলকালবী, *আলমুতরিব মিন আশআ'রি আহলিল মাগরিব*, পৃ : ২৭-৩৩, আবদুল ওয়াহিদ আলমারাকিশী, *আলমু'জিব ফী তালখীছি আখবারিল মাগরিব*, পৃ : ১২৯-১৪০, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৮৬-১৮৯ ও *আলই'হাতা ফী আখবারি গারনাতা*, ৪/৪৭-৫১।

Scanned with CamScanner

নিবাসী ছিলেন) ও অন্যান্য আরও অনেকে। এ ছাড়া স্বয়ং মুযাফফার বিন আফতাসও সমকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের একজন ছিলেন। এর প্রমাণ হিসেবে তার রচিত 'কিতাবুল মুযাফফার'ই যথেষ্ট, যাকে ইবনে হায্ম আন্দালুসের অন্যতম গৌরব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তেমনই তার পুত্র মুতাওয়াক্কিল বিন আফতাসও একজন কবি, সাহিত্যিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তার আমলে বাতালইয়ুস নগরী ছিল কাব্য, সাহিত্য, আরবী-ব্যাকরণ ও ইলমের অন্যান্য বিস্তৃত অঙ্গনের আবাসভূমি।[৬১]

১. আবুল ওয়ালিদ আলবাজী রহ.

তার পুরো নাম আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান বিন খালফ বিন সা'দ বিন আইয়ুব বিন ওয়ারিস আন্দালুসী আলবাজী। বংশগত দিক থেকে তিনি ছিলেন বাতালইয়ুস অঞ্চলের। জন্ম ৪০৩ হিজরীতে (১০১২ খৃস্টাব্দে) বাজা নগরীতে। ইলম ও ফিকহের অন্বেষণে তিনি হেজায, বাগদাদ, দামেশক, মুসিল, ইস্পাহান প্রভৃতি অঞ্চলে সফর করেন এবং হাদীস, ফিকহ ও কালাম-শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। প্রচণ্ড দরিদ্রতা সত্ত্বেও অল্পে তুষ্টির 'তালিবে ইল্মানা' বৈশিষ্ট্যবলে ইলমী রিহলা সমাপ্ত করে জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ হয়ে তের বছর পর তিনি আন্দালুসে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তার থেকে ইবনু আবদিল বার, ইবনে হায্ম, হুমাইদী, তুরতুশী এবং তার পুত্র আবুল কাসিম বিন সুলাইমান প্রমুখ রেওয়ায়েত করেছেন। ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত হল, তিনি ছিলেন মাশরিক ও মাগরিব তথা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অন্যতম মুসলিম ইমাম। আবুল ওয়ালিদ আলবাজী মুতাওয়াক্কিল বিন আফতাসের নিকটভাজন ছিলেন। তিনি তাকে নসীহত ও সতর্ক করতেন। তিনি ছিলেন সেসব মহান ও সংগ্রামী আলিমদের একজন, যারা দাওয়াত ও দ্বীনের ধারক-বাহক ও প্রচারক ছিলেন। খণ্ডিত আন্দালুসের বিরাজমান পরিস্থিতি, মুসলিম শাসকদের পারস্পরিক বিবাদ-বিভক্তি ও খৃস্টানদের কাছে তাদের সহায়তা কামনা– এসব বিষয় তাকে সর্বদা অস্থির ও উদ্বিগ্ন করে রাখত। ষষ্ঠ আলফোন্সো তখন মুসলিম ভূখণ্ডের ওপর ধারাবাহিক তীব্রতর হামলা

---

[৬১] ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৯৬ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৮৫।

Scanned with CamScanner

চালাচ্ছিলেন এবং মুসলিম প্রশাসকদের ওপর নিষ্কৃতির শামে কঠিন করের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছিলেন। এই অবমাননাকর দুঃসহ পরিস্থিতি অবলোকন করে আবুল ওয়ালিদ আলবাজী তার ঈমানী শক্তিকে সঙ্গী করে মুসলিম প্রশাসকদের দরবারে হক কথা বলার সংকল্প করেন। তিনি নিজে প্রতিটি ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রে ঘুরে ঘুরে প্রশাসকদের একতাবদ্ধ হওয়ার, বিভেদ ও বিদ্বেষ পরিহারের এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণের আহ্বান জানান। কিন্তু উদাসীন প্রশাসকগণ কেউ-ই তার আহ্বানে কর্ণপাত করেনি। আন্দালুসের মুসলিম সমাজের এক-একক ইসলামী আদর্শ ও অভিন্ন পতাকাতলে সমবেত হওয়ার স্বপ্নের বাস্তবায়ন না দেখেই ৪৭৪ হিজরীতে (১০৮১ খৃ.) আলবাজী ইন্তেকাল করেন।

আবুল ওয়ালিদ আলবাজী অনেক গ্রন্থ সংকলন করেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল,

- কিতাবুল মুনতাক্বা (كتاب المنتقى)
- ইহকামুল ফুসূল ফী আহকামিল উসূল (إحكام الفصول في أحكام الأصول)
- আততা'দীল ওয়াত তারজীহ ফী মান রওয়া আনহুল বুখারী ফিস সহীহ (التعديل والترجيح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح) ইত্যাদি।[৬২২]

২. ইবনু আবদিল বার রহ.

তার পুরো নাম আবু ওমর ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল বার আননামিরী কুরতুবী মালিকী। ৩৬৮ হিজরীতে (৯৭৮ খৃস্টাব্দে) কর্ডোভায় জন্মগ্রহণকারী এই মহান ইমাম কর্ডোভাতেই তৎকালীন নামকরা আলিম ও ফকীহগণের নিকট ইলম অর্জন করেন। হাফিযুল মাগরিব ইবনু আবদিল বার সম্পর্কে তার সমসাময়িক ইমাম আবুল ওয়ালিদ আলবাজী মন্তব্য করেছেন, আন্দালুসে হাদীসের ক্ষেত্রে আবু ওমর ইবনু আবদিল বারের সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি আরও বলেছেন, আবু ওমর প্রতীচ্যের সবচে' বড় 'হাফিযুল হাদীস'। ইবনু আবদিল বার কর্ডোভা ত্যাগ করে দীর্ঘ সময় আন্দালুসের পশ্চিমাঞ্চলে সফর করেন। এরপর দেশের পূর্বাঞ্চলে গমন করেন এবং সেখানে দীর্ঘ সফরের পর পুনরায় পশ্চিমাঞ্চলে ফিরে এসে

---

[৬২২] ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/৯৮, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ২/৪০৮-৪০৯ ও সাফাদী, *আলওয়াফী বিল ওয়াফাইয়াত*, ১৫/২২৯-২৩০।

Scanned with CamScanner

বাতালইয়ুসকে অবস্থানস্থল হিসেবে গ্রহণ করেন। মুযাফফার বিন আফতাসের আমলে তিনি লিসবন ও সান্তারিনের বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি শাতিবা (Xàtiva) সফর করেন এবং ৪৬৯ হিজরীতে (১০৭১ খৃস্টাব্দে) শাতিবাতেই মৃত্যুবরণ করেন।
তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হল,

- আদদুরার ফী ইখতিসারিল মাগাযী ওয়াস সিয়ার (الدرر في اختصار المغازي والسير)
- আলআ'কলু ওয়াল উ'কালা (العقل والعقلاء)
- আলইসতীআ'ব (الاستيعاب)
- বাহজাতুল মাজালিস ওয়া উনুসুল মাজালিস (بهجة المجالس وأنس المجالس)
- আততামহীদ (التمهيد) ইত্যাদি।[৬২৩]

চার. টলেডোতে বনু যিননূনের রাজত্ব

টলেডোর (ভৌগোলিক) গুরুত্ব

মুসলিম বাহিনীর হাতে আন্দালুস বিজিত হওয়ার পর থেকেই মুসলিম প্রশাসক ও খলীফাগণের কাছে টলেডো কেন্দ্রীয় গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। টলেডো পরিচিত ছিল আসসাগরুল আওসাত বা মধ্য সীমান্ত অঞ্চল নামে। রাষ্ট্র-নিরাপত্তা ও যুদ্ধ-বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় এ নামকরণের যথার্থতা পুরোপুরি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। প্রতিবেশী খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর হামলা-আক্রমণ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে টলেডো সবসময় আন্দালুসের মুসলিম সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তের মাঝামাঝি অঞ্চলের প্রাচীরের ভূমিকা পালন করত। দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে টলেডো ছিল সবিশেষ গুরুত্বের দাবিদার।

১. গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান

টলেডো ছিল সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত স্থানে অবস্থিত। ফলে আন্দালুসী মুসলিম শক্তি ও ঈসায়ী শক্তি উভয়ের কাছেই টলেডোর অবস্থানগত গুরুত্ব ছিল।

---

[৬২৩] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৮/১৫৩-১৫৬।

Scanned with CamScanner

২. বিস্তৃত সুবিশাল ভূখণ্ড

আন্দালুসের প্রাণকেন্দ্রে টলেডো নগরী এবং সংলগ্ন অনেকগুলো গ্রামপুঞ্জ ও নগর-সমৃদ্ধ সুবিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ড নিয়ে টলেডো রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। পূর্বেও বলেছি, টলেডো ছিল মুসলিম আন্দালুসের মধ্য সীমান্ত অঞ্চল। পশ্চিমে টলেডো রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ছিল বাতালইয়ুস সাম্রাজ্যের (নিম্ন সীমান্ত অঞ্চল) পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত; অর্থাৎ কুরিয়া (Coria) ও ট্রুজিলো (Trujillo) নগরী পর্যন্ত। উত্তর-পূর্ব দিকে এর সীমানা ছিল আইয়ুব দুর্গ (Calatayud) ও পূর্ব সান্তামারিয়া (Santa Maria) পর্যন্ত। অর্থাৎ টলেডো জারাগোযার (উচ্চ সীমান্ত অঞ্চল) বনু হুদের সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত হিসেবে বিবেচিত হত। দক্ষিণ-পশ্চিমে টলেডোর বিস্তৃতি ছিল কর্ডোভা রাষ্ট্রের সীমানা পর্যন্ত। আর উত্তর থেকে পূর্বে ক্যাস্টোলা সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী টাজু নদীর (The Tagus) অপর পার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল টলেডোর সীমারেখা।[৬২৪] এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারণে একদিকে টলেডো ছিল বিশেষ করে বাতালইয়ুসের বনু আফতাস ও জারাগোযার বনু হুদসহ নিজেদের রাষ্ট্রীয় পরিসর বৃদ্ধির লালসায় বিভোর বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের শক্তিশালী শাসকবর্গের সামরিক আগ্রাসনের লক্ষ্যবস্তু; কেননা, টলেডো ছিল বাতালইয়ুসের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত আর জারাগোযার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত, অপরদিকে টলেডো ছিল খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর সার্বক্ষণিক শত্রুতা ও ধারাবাহিক হামলার লক্ষ্যবস্তু। কেননা, মুসলিম আন্দালুসের বিভক্ত রাষ্ট্রগুলোকে খৃস্টান-ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনায় টলেডোকে গণ্য করা হত প্রথম ও সবচে' গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে এবং বাস্তবেও তা-ই ঘটেছিল, যেমনটি আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

বনু যিননুনের মূলধারা ও ইতিহাস

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, বনু যিননুন ছিল হুওয়ারার (Houara) গোত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি বার্বার পরিবার। তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষের নাম ছিল যুনূন। কালের পরিক্রমায় এ নামটিই বিকৃত হয়ে যুননূন হয়ে যায়, যা বার্বার গোত্রসমূহের মাঝে অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম। ইবনে আ'যারী

---

[৬২৪] দেখুন : ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৯৫।

Scanned with CamScanner

মাররাকিশী ও ইবনুল খতীবের ধারণামতে আমিরিয়া সাম্রাজ্যের পূর্বে এ বংশের উল্লেখযোগ্য কোন খ্যাতি-মর্যাদা বা নেতৃত্ব ছিল না। আলমানসুর বিন আবু আমির ও পরবর্তী সময়ে তার পুত্রের শাসনামলে যিননূন বংশ নেতৃত্বের বিভিন্ন পদে আসীন হতে থাকে, যা ফিতনার কাল ও খেলাফতের দুর্যোগকাল পর্যন্ত বজায় ছিল।[৬২৫]

অপরদিকে অন্য অনেক ঐতিহাসিকের মতে উমাইয়া খেলাফত আমল বরং তারও পূর্বে উমাইয়া প্রশাসন আমল থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে এ বংশের ভূমিকা ও অবদান ছিল। আর আমিরিয়া সালতানাত ও পরবর্তী ফিতনার যমানায় তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আরও সুদৃঢ় ও মজবুত হয়েছিল। যেমন ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়ান আমীর মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আলআওসাতের শাসনামলে যিননূন বংশের পূর্বতন পুরুষ যিননূনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখেছেন যে, মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান উকলিশ (Ucles) দুর্গে যিননূনের কাছে জনৈক নপুংশক ব্যক্তিকে রেখে এসেছিলেন। যিননূনের চিকিৎসায় লোকটি একসময় সুস্থ হয়ে যায়। এর ফলে উভয়ের (আমীর মুহাম্মাদ ও যিননূনের) মাঝে এক দৃঢ় ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আমীর মুহাম্মাদ তাকে উকলিশ ও সান্তামারিয়া অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করেন।[৬২৬] এখান থেকেই আন্দালুসের ঘটনাপ্রবাহে বনু যিননূনের সম্পৃক্তি শুরু হয়। পরবর্তীতে হাকাম আলমুসতানসিরের শাসনামলে তাদের ভাগ্যতারকা চমকে ওঠে। বনু যিননূন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন পূর্ব থেকেই লালন করত এবং এ জন্য তারা বেশ কয়েকবার চেষ্টাও চালিয়েছে। যেমন ৩০০ হিজরীতে খলীফা আননাসির লি দীনিল্লাহর শাসনামলে ফাত্হ বিন মুসা বিন যিননূন রাবাহ দুর্গের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহের চেষ্টা করেছিলেন। তখন খলীফা আননাসির রহ. আব্বাস বিন আবদুল আযীযের নেতৃত্বে সেখানে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন এবং বিদ্রোহ দমন করেন।[৬২৭]

এরপর বিশেষ করে আলমানসুর ও পরবর্তী সময়ে তার পুত্রের শাসনামলে

---

[৬২৫] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৭৬, ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৬১, ৬/১৪১ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৭৬-১৭৭।

[৬২৬] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৭/১৪২ ও ইবনে সাঈদ আলমাগরিবী, *আলমুগরিব ফী হুলাল মাগরিব*, ২/১১-১২।

[৬২৭] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/১৫৯।

Scanned with CamScanner

বনু যিননূনের অবস্থান আরও উজ্জ্বল হয়। এ সময় এ বংশের অনেকেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক বিভিন্ন পদ লাভ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল বিন যিননূন। তিনি পুরো সান্তামারিয়ার প্রশাসক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তার পুত্র ইসমাঈলও সান্তামারিয়ার প্রশাসক হন। আমিরিয়া সালতানাতের পতনকে কেন্দ্র করে যখন উমাইয়া খেলাফতেরও পতন ঘটে এবং বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়, ইসমাঈল তখন সীমান্ত এলাকায় চলে যান এবং পিতৃব্য বংশের লোকদের সেখানে সমবেত করেন। তিনি সেখানে 'আযযাফির' উপাধিধারী সুলাইমান আলমুসতাঈনের নামে খোতবা পাঠ শুরু করেন। সংবাদ পেয়ে সুলাইমান তাকে উকলিশ অঞ্চলের গভর্নর-পদ প্রদান করেন। ইসমাঈল ধীরে ধীরে আশেপাশের অঞ্চলগুলোও দখল করে তার ক্ষমতার পরিসর বৃদ্ধি করতে থাকেন। দিনে দিনে তার ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলের সেনাপতিগণ তার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। একসময় পুরো অঞ্চলে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলাইমান খুশি হয়ে তাকে উযীর পদ প্রদান করেন এবং নাসিরুদ্দৌলা উপাধি দান করেন। পরবর্তী সময়ে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি পেলে ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান তার নিয়ন্ত্রিত এলাকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনিই ছিলেন একক মুসলিম আন্দালুস রাষ্ট্রের একতা ভঙ্গ করে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকারী প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণাকারী। এরপর তিনি ধীরে ধীরে তার রাষ্ট্র পরিসর বিস্তৃত করতে সচেষ্ট হন এবং অর্থ-সম্পদ জমা করতে থাকেন। ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়ান তাকে 'কৃপণ' বলে আখ্যায়িত করে মন্তব্য করেছেন,

> তিনি অত্যন্ত কৃপণ প্রকৃতির ছিলেন। সম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখতে ভালোবাসতেন, খরচে বেশ কার্পণ্য করতেন। তার সমসাময়িক কোন শাসক এক্ষেত্রে তার ধারেকাছেও নেই। ব্যয়মূলক কোন কর্মকাণ্ডে আগ্রহী ছিলেন না, দানের খাতের দিকে পারতপক্ষে অগ্রসর হতেন না। সাহায্য বা বদান্যতাপ্রত্যাশী কোন ব্যক্তির বাহন ভুলেও তার পথ মাড়াত না! কবি-সাহিত্যিকগণ তার দরবার অভিমুখী হতেন না। গদ্যকার ও পদ্যকারগণ তার প্রশংসায় কোন শব্দ খরচ করতেন না। ন্যায়-অন্যায় কোন ক্ষেত্রেই তার হাত থেকে একটি দিরহামও বের হয়নি। কেউ কোনদিন তার কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু লাভ করেনি। এই স্বভাবকার্পণ্য সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সৌভাগ্যের বর-পুত্র।

Scanned with CamScanner

দুনিয়া তার বশ্যতা স্বীকার করেছিল, সৌভাগ্য তাকে সঙ্গ দিয়েছিল। ফলে অনেক কঠিন থেকে কঠিনতর বিষয়ও অতি সামান্য চেষ্টাতেই তিনি অর্জন করেছেন। বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি ছড়িয়ে দিতে শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা অগ্রণী। তার পরবর্তীগণ এক্ষেত্রে তারই অনুসরণ করেছে। ... ফলে তিনি পরিণত হয়েছিলেন কপটতার জীবাণুতে। অবাধ্যতা ও ভাঙনের রীতি তিনিই প্রথম চালু করেছেন আর তার থেকেই প্রবাহিত হয়েছে ফিতনা ও দুর্যোগের অবিরাম স্রোতধারা। কত পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি তাকে পার্থিব জীবনে অবকাশ ও ঢিল দিয়েছেন এবং তার কৃতকর্মের বদলা হিসেবে পার্থিব শাস্তিকে অপছন্দ করেছেন।[৬২৮]

টলেডোতে বনু যিননূনের শাসন

১. আযযাফির ইসমাঈল বিন যিননূন

উমাইয়া খেলাফতের পতনের কিছুদিন পর যখন ফিতনা ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং আন্দালুসের কেন্দ্রীয় সরকার-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, টলেডোতে তখন এমন কোন প্রশাসক ছিলেন না, যিনি সেখানকার প্রশাসন পরিচালনা করবেন এবং আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করবেন। ফলে নগরীর প্রশাসনিক দায়িত্ব সেখানকার বিচারক আবু বকর ইয়াইশ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াইশ আলআসাদীর কাঁধে অর্পিত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি এ পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে আইয়ুব দুর্গে চলে যান। ৪১৮ হিজরীতে তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করেন।[৬২৯]

তার বরখাস্তের ঘটনার পর টলেডোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন আবদুর রহমান বিন মিতীওয়াহ। কিন্তু শুরু থেকেই তিনি জনসাধারণের সঙ্গে অসদাচরণ করতে শুরু করেন। ফলে পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে এবং ব্যাপক নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ে। টলেডোর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নেতৃবৃন্দ একমত হয়ে সান্তামারিয়ার প্রশাসক আবদুর রহমান বিন যিননূনের কাছে দূত প্রেরণ

---

[৬২৮] ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা*, ৭/১৪২-১৪৩।

[৬২৯] ইবনে বাশকুওয়াল, *আসসিলাহ*, ৩/৯৮৭ ও ইবনে খালদুন, *তারীখে ইবনে খালদুন*, ৪/১৬১।

Scanned with CamScanner

করেন। আবদুর রহমান তখন তার পুত্র ইসমাঈলকে সান্তামারিয়ার শাসনভার গ্রহণের উপযুক্ত করে গড়ে তুলছিলেন। টলেডো থেকে আগত এ প্রস্তাব ছিল ইবনে যিননূনের জন্য এক অপূর্ব সুযোগ। কালবিলম্ব না করে তিনি তার পুত্র ইসমাঈল বিন যিননূনকে টলেডোতে প্রেরণ করেন।

ইসমাঈল বিন যিননূন ৪২৭ হিজরীতে (১০৩৬ খৃস্টাব্দে) টলেডোতে প্রবেশ করে টলেডোর শাসনভার গ্রহণ করেন এবং আযযাফির উপাধি ধারণ করেন। নতুন রাষ্ট্রে আপন অবস্থান দৃঢ়করণ এবং নির্বিঘ্নে প্রশাসন পরিচালনার জন্য তিনি টলেডোর তৎকালীন মান্যবর ও প্রবীণতম ব্যক্তিত্ব আবু বকর ইবনুল হাদীদীর সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। আবু বকর ইবনুল হাদীদী ছিলেন টলেডোর অন্যতম শায়খ এবং আলিম-উলামা, জ্ঞানী-গুণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিকনির্দেশক। পাশাপাশি তিনি টলেডোর সাধারণ জনগণের কাছেও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাই আযযাফির ইসমাঈল তার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজের সিদ্ধান্ত নিতেন না। রাষ্ট্রের ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে তিনি সর্বদা ইবনুল হাদীদীর সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

আযযাফির ইসমাঈলের শাসনামল তেমন দীর্ঘ হয়নি। ৪৩৫ হিজরীতে (১০৪৩ খৃস্টাব্দে) তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তার পুত্র ইয়াহইয়া বিন ইসমাঈল 'আলমামুন' উপাধি ধারণ করে তার স্থলাভিষিক্ত হন।[৬৩০]

২. আলমামুন ইয়াহইয়া বিন ইসমাঈল

আযযাফির ইসমাঈলের মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াহইয়া 'আলমামুন' উপাধি ধারণ করে ৪৩৫ হিজরীতে (১০৪৩ খৃস্টাব্দে) টলেডোর শাসনভার গ্রহণ করেন। সুবিশাল টলেডো রাষ্ট্রের শাসনকার্যে তিনি তার পিতার আদর্শ গ্রহণ করেন এবং জনগণের মাঝে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। আলমামুন তার শাসনামলের শুরুতে যে রাজনৈতিক আদর্শ অবলম্বন করেছিলেন, তা তার রাষ্ট্রের বিস্তৃতিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল।

অবশ্য আলমামুনের শাসনামল শান্তি ও স্থিতিশীলতার আমল ছিল না; বরং পুরো সময় তিনি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর শাসকদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে

---

[৬৩০] বিস্তারিত জানতে : ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/৯৪৫, ইবনে সাঈদ আলমাগরিবী, *আলমুগরিব ফী হুলাল মাগরিব*, ২/১১, ইবনে আ'আরী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৭৬-২৭৭, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৭৭ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৬১। অবশ্য ইবনে খালদূনের ভাষ্যমতে আযযাফির ইসমাঈল ৪২৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

Scanned with CamScanner

ছিলেন। এই প্রচণ্ড সংঘাত ও বিভক্তিকে কেন্দ্র করেই প্রকাশ পেয়েছিল চরম নিকৃষ্ট ও হীন এক বিষয়। বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের শাসকবর্গ একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খৃস্টানদের সাহায্য কামনা করেছিলেন। বিবাদমান পক্ষগুলো সামরিক শক্তিতে দুর্বল হয়ে পড়েছিল; যা স্বাভাবিকভাবেই পার্শ্ববর্তী খৃস্টশক্তিকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর হামলা চালাতে প্ররোচিত করেছিল। তাদের প্রতিরোধ করার মতো কোন শাসক তখন বিভক্ত রাষ্ট্রগুলোতে ছিল না, ছিল না তাদের প্রবল বাধাপ্রদান ও বিতাড়ন করার মতো কোন শক্তি। ফলে যা হওয়ার, তা-ই হল। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে লুণ্ঠন চলল, ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা হল, নারীদেরকে বন্দী করা হল, শিশু ও পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করা হল আর বিভক্ত শাসকবর্গ ব্যস্ত রইলেন নশ্বর ও তুচ্ছ ক্ষমতার মোহে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদে। তারা নষ্ট করলেন নিজেদের দ্বীন-দুনিয়া সবকিছু। হায়! কত মিল যুগের সঙ্গে যুগের! কত সাদৃশ্য আজ রাত ও গত রাতের!

আলমামুন বিন যিননূনের রাজত্ব যদিও বিস্তৃত ও দীর্ঘমেয়াদী ছিল; কিন্তু তার দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের শাসনামলের পুরোটা সময়ই তিনি অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর শাসকদের সঙ্গে; বিশেষত তার পরম শত্রু জারাগোযার শাসক সুলাইমান বিন হুদের সঙ্গে, সেভিলের শাসক মু'তাযিদ বিন আব্বাদ ও পরবর্তী সময়ে তার পুত্র মু'তামিদের সঙ্গে এবং বাতালইয়ুসের অধিপতি ইবনে আফতাসের সঙ্গে সংঘাত ও লড়াইয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।

তবে মামুনের তীব্রতর ও ভয়াবহ যুদ্ধগুলো হয়েছিল সুলাইমান বিন হুদের সঙ্গে। এ যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছিল টলেডো ও জারাগোযার মধ্যবর্তী সীমান্ত অঞ্চলগুলোর অধিকার ও দখল নিয়ে। প্রতিটি লড়াই ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য ভয়াবহ হুমকি। কেননা, উভয় পক্ষই তার মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে ক্যাস্টোলার অধিপতি খৃস্টান শাসকের সহায়তা কামনা করেছিল আর তারা মুসলমান শাসকদের সন্তুষ্টচিত্তে মুসলিম ভূখণ্ডে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

মামুন বিন যিননূনের উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হল, তিনি মু'তাযিদ বিন আব্বাদের আহ্বানে হিশাম আলমুআইয়াদ বিল্লাহর (বা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিবেচনা করলে হিশামের সদৃশ এক ব্যক্তির) আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে শত্রু সুলাইমান বিন হুদের বিরুদ্ধে মু'তাযিদের সাহায্য লাভ করা। বাস্তবেও মু'তাযিদ বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন এবং

Scanned with CamScanner

প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আলমামুনকে সাহায্য-সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। চুক্তিমতো টলেডোতে তথাকথিত হিশাম আলমুআইয়াদের নামে বাইআত গ্রহণ করা হয় এবং জুমার মিম্বরে তার জন্য দোয়া করার নির্বাহী আদেশ জারী করা হয়। কিন্তু বাস্তবে মামুন দু' কূলই হারালেন! তার আশা তার সঙ্গে প্রতারণা করল, তিনি অলীক স্বপ্নের পেছনে ঘুরপাক খেতে লাগলেন। ইবনুল আফতাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মু'তাযিদ তার দিকে ফিরেও তাকাননি আর আলমামুনও ইবনে আব্বাদের কাছ থেকে পাননি প্রতিশ্রুত 'সাহায্য-সহযোগিতা'। বাধ্য হয়ে গোপন স্বার্থের বাইআত হতে তিনি অতি সঙ্গোপনে ফিরে আসেন![৬৩১]

মামুনের উল্লেখযোগ্য একটি অর্জন ছিল ৪৫৭ হিজরীতে (১০৬৫ খৃস্টাব্দে) ভ্যালেন্সিয়া ও তার অধিভুক্ত প্রদেশসমূহের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। এ অঞ্চলটি ছিল আলমানসুর বিন আবু আমিরের পৌত্র আবদুল মালিক বিন আবদুল আযীযের শাসনভুক্ত। আবদুল মালিক সম্পর্কে আলমামুনের জামাতা ছিলেন। মামুন তার কন্যাকে প্রথমে আবদুল মালিকের ভাইয়ের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর তার ভাই আবদুল মালিক তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু দুশ্চরিত্র, মদাসক্ত এবং লম্পট প্রকৃতির আবদুল মালিক দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত অসদাচরণ করেন এবং তাকে অবজ্ঞা করতে থাকেন। অধিকন্তু আবদুল মালিকের মধ্যে অবৈধ আনন্দ-প্রমোদে ডুবে থাকার অভ্যাসের পাশাপাশি মানবতাবোধেরও অভাব ছিল। নিজের এসব চারিত্রিক স্খলন ও কৃতকর্মই তার পতনের পথ উন্মুক্ত করেছিল। আলমামুন তার মেয়ের সঙ্গে আবদুল মালিকের অসদাচরণের কথা জানতে পেরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং তার অনিষ্ট সাধনের মনস্থ করেন।

মামুনের ভ্যালেন্সিয়া দখল সম্পর্কে দু' ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনামতে, মামুন আবদুল মালিকের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য টলেডো থেকে ভ্যালেন্সিয়ায় গমন করেন। ভ্যালেন্সিয়া-প্রশাসক তার শ্বশুর টলেডো-শাসকের জন্য রাজপ্রাসাদের খাদেম-অনুচরসহ নিজে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে উষ্ণ সংবর্ধনার আয়োজন করেন। মামুন সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এরপর সুযোগ বুঝে এক রাতে আবদুল মালিকের জন্য ফাঁদ পাতেন এবং তাকে তার পুত্রসহ আটক করে রাতের অন্ধকারেই সান্তামারিয়া,

[৬৩১] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৭৮-২৭৯।

Scanned with CamScanner

মতান্তরে উকলিশ দুর্গে পাঠিয়ে দেন। এভাবে মামুন কোন প্রকার সংঘাত ও রক্তপাত ছাড়াই বলতে গেলে বিনা বাধায় আন্দালুসের পূর্বাঞ্চলের অধিকার লাভ করেন।

অন্য বর্ণনামতে মামুন তার জামাতা ভ্যালেন্সিয়ার শাসকের বিরুদ্ধে ক্যাস্টোলার শাসকের সহায়তা গ্রহণ করেন এবং ভ্যালেন্সিয়া দখল করে আবদুল মালিক ও তার পুত্রকে বন্দী করেন। এটি ৪৫৭ হিজরীর যিলহজ্ব মাসের (১০৬৫ খৃস্টাব্দের) ঘটনা।[৬৩২]

দীর্ঘকাল ধরেই মামুনের রাষ্ট্রসম্প্রসারণ নীতিতে কর্ডোভা ছিল প্রধান লক্ষ্য। তিনি কর্ডোভা আক্রমণের উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তার এ স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয় যখন কর্ডোভায় আবদুল মালিক বিন জাহওয়ার দায়িত্ব গ্রহণের পর জনগণের ওপর নিপীড়ন চালানোর কারণে কর্ডোভার পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। ৪৬২ হিজরীতে এই অশান্ত পরিবেশের সুযোগ নিয়ে মামুন কর্ডোভা আক্রমণ করেন। কর্ডোভা-প্রশাসক আবদুল মালিক বিন জাহওয়ার তখন সেভিল-শাসক মু'তামিদের সহায়তা কামনা করেন। এটাই ছিল কর্ডোভাতে বনু জাহওয়ারের পতনের কারণ,[৬৩৩] যা আমরা বিস্তারিতভাবে 'বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকবর্গের পারস্পরিক বিভেদ-হানাহানি' শীর্ষক পরিচ্ছেদে শীঘ্রই আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

পুরো শাসনামল জুড়ে অব্যাহত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংঘাত-বিসংবাদে ব্যতিব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আলমামুন ছিলেন বিভক্ত আন্দালুস-যুগের সবচে' দীর্ঘমেয়াদী শাসক। তার শাসনামলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের দিক থেকেও টলেডো উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। তেত্রিশ বছর স্থায়ী আলমামুনের শাসনামলে টলেডো রাষ্ট্রের পরিধি বৃদ্ধি পেয়ে পূর্বে সুদূর ভ্যালেন্সিয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। আর এসব কারণে আলমামুনের দরবার সবসময় কবি-সাহিত্যিক এবং আলিম ও ফকীহগণের পদচারণায় মুখরিত থাকত।

আলমামুন তার শাসনামলে বেশ কয়েকটি বিলাসবহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন; নির্মাণ করেছিলেন চোখ-ধাঁধানো কয়েকটি দরবারকক্ষ। এর মধ্যে সবচে' বিখ্যাত ও জৌলুসপূর্ণ ছিল 'আলমুকাররাম'

---

[৬৩২] ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/১২৯, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৬৬-২৬৭, ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/১০১-১০২।

[৬৩৩] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/৬০৯-৬১১, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৬০-২৬১ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ: ১৪৯-১৫২।

Scanned with CamScanner

দরবারকক্ষ। আমরা এই সুপ্রসিদ্ধ দরবারকক্ষটির সামান্য বিবরণ সামনে তুলে ধরব, যেন পাঠক কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারেন যে, বিভক্ত আন্দালুসের শাসকবর্গ উত্তরাধিকার-সূত্রে তাদের পূর্বতন (গৌরব ও সমৃদ্ধির যুগের) শাসকবর্গের কাছ থেকে কী প্রচুর পরিমাণ সম্পদ লাভ করেছিলেন। বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকগণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ আরও বৃদ্ধি করেছেন এবং ন্যায়-অন্যায় ও প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন খাতে ব্যয় করেছেন। সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছেন বিলাসী জীবনে; ভুলে গেছেন আপন রব ও প্রতিপালককে, রাব্বে কারীমের বিধিবিধানকে; বরং প্রকৃতপক্ষে আত্মপরিচয়ই ভুলে গেছেন। এ সম্পদই তখন তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অগাধ সম্পদ খৃস্টশক্তিকে প্রলুব্ধ করেছে আর মুসলমানদের পারস্পরিক বিবাদ-বিচ্ছেদ ও হানাহানির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তারা তা কুক্ষিগত করে নিয়েছে। বরং বলা ভালো, কষ্ট করে কুক্ষিগত করতেও হয়নি; খণ্ডিত মুসলিম আন্দালুসের শাসকবর্গ কর প্রদানের নামে নিজ হাতে মুসলমানদের সম্পদ তুলে দিয়েছেন খৃস্টান নৃপতিদের হাতে![৬৩৪]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়ান নিজে 'আলমুকাররাম' দরবারকক্ষের শোভা-সৌন্দর্য উপভোগ করেননি! তবে স্বচক্ষে দেখেছেন এমন জনৈক পরিদর্শক ইবনে জাবির-এর মুখে শুনে তিনি এর বিবরণ ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষণ করেছেন। সেই দর্শনার্থীর ভাষ্যে এবার উপভোগ করুন আলমামুনের 'আলমুকাররাম' দরবার-সৌন্দর্য!

> (আলমামুনের) দরবারকক্ষের শৈল্পিক সৌন্দর্য যাদেরকে মুগ্ধ করেছিল, আমিও তাদের একজন। দরবারকক্ষে প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম যে বস্তুটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল কক্ষের মূল দেয়ালের একেবারে গা ঘেঁষে তৈরি প্রাচীরগাত্র[৬৩৫]। স্থাপত্য-শিল্পের এক অপূর্ব বিস্ময়! আমার দৃষ্টিশক্তি যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল! অতি উন্নত সুমসৃণ শ্বেতমর্মর দ্বারা তৈরি প্রাচীরগাত্রটির মসৃণতা ও বর্ণ-বৈচিত্র্য এত নিখাদ ও অকৃত্রিম যে, শুভ্র গজদন্তও এর কাছে হার মানবে। পুরো প্রাচীরগাত্রে খাঁজ কেটে বিভিন্ন জীবজন্তু, পাখি ও কাঁচা-পাকা ফল-ফলাদিতে পূর্ণ গাছপালার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। জীবজন্তুর চিত্র এত জীবন্ত যে, কোমল দৃষ্টিতে তাকালে মনে হবে, সেগুলো

---

[৬৩৪] বাসক শাসমিতা, *সুয়াতুন তাকরীবিয়্যাতুন লিল ইকতিসাদিল আন্দালুসী*।

[৬৩৫] মূল দেয়ালকে মজবুত করার জন্য তৈরি ছোট পার্শ্ব-দেয়াল। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

দর্শকের দিকে এগিয়ে আসছে বা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। কিছু জীবজন্তু যেন গাছের শাখা-প্রশাখায় দোল খাচ্ছে, ঝুলে আছে! প্রতিটি চিত্রের ধরন ও অঙ্কন স্বতন্ত্র, প্রতিটির আকর্ষণ ও আবেদন ভিন্ন। এত হৃদয়কাড়া যে, তা থেকে দৃষ্টি ফেরানোই দায়।

(আপাতত প্রাচীরগাত্রের বিবরণ রেখে মূল প্রাচীরের বিবরণ দিই।)

এর ঠিক উপরে পুরো সভাকক্ষের ভেতরের দিকের দেয়ালে আছে নয়নজুড়ানো হস্তলিপি। চতুর্দিকের দেয়ালে বৃত্তাকারে নিপুণ লিপি-শৈলিতে হৃদয়গ্রাহী বিভিন্ন কাব্যপঙ্‌ক্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শ্লোক সুগঠিত, পরিচ্ছন্ন ও নান্দনিক দূরত্ব-মাপে বিন্যস্ত। আলমামুনের শানে কবি-সাহিত্যিকদের রচিত নির্বাচিত বিভিন্ন পঙ্‌ক্তি-ই এখানে স্থান পেয়েছে।

হস্তলিপির ঠিক উপরেই নির্ভেজাল স্বর্ণে আবৃত বর্ণিল কাঁচ ও স্ফটিক দিয়ে সুবিন্যস্ত সাগরদৃশ্য তৈরি করা হয়েছে। এখানেও শিল্পের ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি ও গাছ-পালার মনকাড়া চিত্র। এত চমৎকার যে, দৃষ্টি ফেরানো দায়! মেধা-মস্তিষ্ক নিশ্চল-বিমূঢ় হয়ে যায়! সাগরের তলদেশের চিত্রে বিছানো খাঁটি স্বর্ণের পত্র-পল্লব। সেখানেও অপূর্ব ও নিপুণ শিল্পরুচির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে বিভিন্ন জীবজন্তু ও গাছ-পালার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।

এরপর ইবনে হাইয়ান লিখেছেন,

সভাকক্ষটিতে দু'টি কৃত্রিম ফোয়ারা আছে। ফোয়ারাদু'টির স্তম্ভ জড়িয়ে আছে নিখুঁত শৈল্পিক দক্ষতায় তৈরি খাঁটি স্বর্ণের কয়েকটি সর্পমূর্তি। দর্শক মনে করবেন, সাপগুলো যেন ব্যাদান মুখে তার দিকেই তাকিয়ে আছে! সাপের মুখ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা বা রূপার (চূর্ণ) কণার মতো পানির ধারা ধীরে ধীরে ফোয়ারার দিকে চলে যায়। উভয় ফোয়ারার তলদেশে পানি জমা হওয়ার জন্য উন্নত মানের মার্বেল পাথর দিয়ে ছোট ছোট চৌবাচ্চা তৈরি করা হয়েছে। শৈল্পিক কারুকার্যখচিত চৌবাচ্চাগুলোর নাম রাখা হয়েছে 'মাযবাহ'! হাউজগুলোর চারপাশেও খোদাই করে বিভিন্ন পশু-পাখি ও গাছ-পালার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।

হাউজদু'টির ঠিক মধ্যখানে রোপণ করা হয়েছে আঙ্গুর ও কারুকার্য

Scanned with CamScanner

খচিত রূপার তৈরি দু'টি খেজুর বৃক্ষ। বৃক্ষদু'টির কাণ্ড উঁচু করে বাঁধানো। প্রবাহিত পানি চৌবাচ্চার মধ্যে পড়ে বৃক্ষকাণ্ডের কাছে জমা হয়। এরপর বৃক্ষদু'টির ভেতর দিয়ে উত্থিত হয়ে শাখা-প্রশাখা থেকে বৃষ্টির ছিটা বা শিশির-রেণুর মতো উড়তে থাকে। পানি বের হওয়ার সময় সৃষ্টি হয় বিচিত্র ধরনের হৃদয়কাড়া মধুর ধ্বনি। আবার বৃক্ষদু'টির শীর্ষদেশ থেকে পানির বিশাল ক্ষিপ্রধারা স্তম্ভের মতো উত্থিত হয়ে ফোয়ারার নিম্নদেশে পতিত হয়। এ সময় ছিটকে পড়া পানির ধারা আশেপাশের জীবজন্তু, গাছপালাকে ভিজিয়ে দেয়। সবকিছু এত জীবন্ত ও মনকাড়া যে, এর সৌন্দর্যের মায়াজালে হৃদয়-মন বন্দী হয়ে যায়; সুতীক্ষ্ণ ও শাণিত মেধাশক্তিও নিশ্চল-ধারহীন হয়ে যায়।[৬৩৬]

তবে প্রকৃত বাস্তবতা হল মামুনের রাজদরবারে সেভিল ও বাতালইয়ুসের সঙ্গে তুল্য সাহিত্য ও কাব্যচর্চার উজ্জ্বল পরিবেশ ছিল না। তারপরও আমরা দেখতে পাই, মুসলিম আন্দালুসের তৎকালীন নামকরা কবি-সাহিত্যিক ও শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ আলমামুনেরই পৃষ্ঠপোষকতাই গ্রহণ করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মামুনের বিশেষ কবি সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতের উদ্ভাবক ইবনে আরফা' রা'সাহ,[৬৩৭] 'তাবাক্বাতুল উমাম' নামক শাস্ত্রীয় ইতিহাসগ্রন্থের সংকলক বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ আল্লামা ইবনে সাঈদ (যিনি টলেডো মসজিদে দরস প্রদান করতেন) ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী আল্লামা ইবনে বাস্সাল তুলাইতিলী।[৬৩৮]

আমরা এখন মামুন বিন যিননূনের জীবনালেখ্যের একেবারে শেষ প্রান্তে আছি। এখানে এ তথ্যটি উল্লেখ করাও সঙ্গত হয়ে যে, আন্দালুসের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়ান তার কালজয়ী গ্রন্থ 'আততারীখুল কাবীর' উপহার দেওয়ার জন্য পুরো আন্দালুসে আলমামুন ব্যতীত অন্য কাউকে পাননি। তিনি তার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন,

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে, আমার এই (অমূল্য) গ্রন্থটির স্বত্ব

---

[৬৩৬] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৭/১৩২-১৩৪।

[৬৩৭] তার পুরো নাম আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আরফা' রা'সাহ তুলাইতিলী। তিনি আলমামুনের দরবারের কবি ছিলেন। মাগরেব অঞ্চলে বিখ্যাত অনেক সঙ্গীতের রচয়িতা তিনি। দেখুন : ইবনে সাঈদ আলমাগরিবী, *আলমুগরিব ফী হুলাল মাগরিব*, ২/১৮।

[৬৩৮] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/১০৬।

Scanned with CamScanner

একান্ত নিজের কাছেই রেখে দেব, রেখে যাব আমার পুত্রের জন্য গোপন সঞ্চয় হিসেবে এবং এতে গচ্ছিত জ্ঞান-সম্পদের ভাণ্ডার কাউকে নিতে দেব না। ... (কিন্তু) দূর দেশ থেকে এল পাণি-প্রার্থনা; (বেঁধে রাখি তারে কী করে!) আমার কাছে অতি উত্তম এক প্রস্তাব এল চিত্তে অটল ও দৃঢ় মনোবল, দীর্ঘস্থায়ী রাজত্বের অধিকারী, খ্যাতি ও গৌরবধারী আমীর আলমামুন ইয়াহইয়া বিন যিননূনের পক্ষ থেকে ...।[৬৩৯]

৩. আলমামুনের পৌত্র আলকাদির বিল্লাহ ইয়াহইয়া

৪৬৭ হিজরীতে (১০৭৫ খৃস্টাব্দে) আলমামুনকে কর্ডোভায় বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ অব্যবহিত পরেই প্রদান করা হবে ইনশাআল্লাহ। তার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পৌত্র ইয়াহইয়া বিন ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া বিন যিননূন। তিনি 'আলকাদির বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন। অবিবেচক ও অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও আলকাদির বিল্লাহ তার পিতামহের রেখে যাওয়া সুবিশাল রাষ্ট্রের শাসনভার কাঁধে তুলে নেন।

আলমামুন মৃত্যুর পূর্বে তার রাষ্ট্রের দায়িত্ব বণ্টন করে গিয়েছিলেন এবং তার দুই উযীর ইবনুল ফারজ ও ইবনুল হাদীদীকে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। ইবনুল ফারজকে দিয়েছিলেন সামরিক বিষয়ক দায়িত্ব আর ইবনুল হাদীদীকে দিয়েছিলেন প্রশাসনিক বিষয়ে পরামর্শ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের দায়িত্ব। তিনি উভয়ের কাছ থেকে সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে প্রশাসন পরিচালনা এবং জনগণের প্রতি কল্যাণমূলক আচরণ করার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কিন্তু

---

[৬৩৯] ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা*, ২/৫৭৮।

(আন্দালুসের ইতিহাস বিষয়ক প্রখ্যাত মিশরীয় গবেষক) ড. মাহমুদ মাক্কী (মৃত্যু: ১৪৩৪ হি./আগস্ট ২০১৩ খৃ.) লিখেছেন, প্রকৃতপক্ষে এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর বিষয়! এটা কী করে সম্ভব যে, ইবনে হাইয়ান তার এই অমূল্য জ্ঞান-সম্পদ উপহার দেওয়ার জন্য আলমামুনকে নির্বাচন করবেন?! অথচ তিনিই বহু স্থানে আলমামুনের পূর্বপুরুষদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন এবং তাদের শাসনামলের অন্যায়-অনাচারের কথা তুলে ধরেছেন। সুতরাং তিনি আলমামুনের আচরণে মুগ্ধ হবেন কিংবা তার সদাচার লাভ করবেন, এটা ভাবাই যায় না। এর চেয়েও বিস্ময়কর বিষয় হল, ইবনে বাসসাম রহ. ইবনে হাইয়ানের এমন কিছু ভাষ্য উদ্ধৃত করেছেন, যা দ্বারা অনুধাবন করা যায় যে, কর্ডোভা জয় করার এবং আলমামুনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় ইবনে হাইয়ান মু'তামিদ বিন আব্বাদকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। ... যে ইবনে হাইয়ান কঠোর ভাষায় আলমামুনকে অভিযুক্ত করেছেন, তিনিই তাকে নিজের অমূল্য ঐতিহাসিক জ্ঞানসম্পদ উপহার দেবেন এবং গ্রন্থের ভূমিকায় তাকে প্রশংসায় বন্যায় ভাসিয়ে দেবেন, এটা কেমন যেন অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। (দ্রষ্টব্য : ইবনে হাইয়ানের *আলমুকতাবাস* গ্রন্থের অংশবিশেষের সম্পাদনায় ড. মাক্কীর ভূমিকা, পৃ : ৩৯)।

Scanned with CamScanner

প্রাসাদের ভৃত্য-পরিচারক, অন্দরমহলের নারীদের প্ররোচনা ও একশ্রেণির দুষ্ট সঙ্গী ও অসৎ সুবিধাভোগী বন্ধুদের কুমন্ত্রণায় ইয়াহইয়া বিগড়ে যান। তারা ইয়াহইয়ার অন্তরে উযীর ইবনুল হাদীদীর প্রতি ক্রোধ ও বিদ্বেষের আগুন প্রজ্বলিত করে এবং তাকে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। কিন্তু সুস্পষ্ট কোন অভিযোগ কিংবা দায়িত্বে অবহেলা বা অসাধু আচরণের প্রকাশ্য কোন প্রমাণ ছাড়া ইয়াহইয়া তাকে হত্যা করেন কীভাবে? বিনা অজুহাতে জনপ্রিয় উযীর ইবনুল হাদীদীকে হত্যা করলে টলেডোবাসীর ক্ষেপে যাওয়ার ভয় ছিল। পথের কাঁটা (!) উপড়ে ফেলতে ইয়াহইয়া কূট-কৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি এমন কিছু লোকের সাহায্য গ্রহণ করেন, যাদেরকে তার পিতামহ আলমামুন ইতঃপূর্বে ইবনুল হাদীদীর পরামর্শে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে তার সভাকক্ষে আহ্বান করেন। ইবনুল হাদীদীকেও সভাকক্ষে ডাকা হয়। মজলিসে উপস্থিত হয়ে ইবনুল হাদীদী তাদেরকে দেখতে পেয়ে পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করেন এবং বাঁচার জন্য দ্রুত ইয়াহইয়ার দিকে অগ্রসর হন; কিন্তু ইয়াহইয়া মজলিস ছেড়ে চলে যান। জেল থেকে ছাড়া পাওয়া আসামীরা ইবনুল হাদীদীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরপর ইয়াহইয়া ইবনুল হাদীদীর ঘর-বাড়ি লুট করার নির্দেশ দেন। এটি ৪৬৮ হিজরীর যিলহজ্ব মাসের শুরুর দিকের ঘটনা।[৬৪০]

দুষ্ট সঙ্গীদের প্ররোচনায় আলকাদির বিল্লাহ ভেবেছিলেন, ইবনুল হাদীদীকে হত্যা করতে পারলেই নিশ্চিন্ত মনে রাষ্ট্রশাসন করতে পারবেন। কিন্তু অসৎ সঙ্গের পরিণতি কি কখনো কল্যাণকর হয়? গতকালের প্রাণপ্রিয় সঙ্গীরাই আজ তার শত্রুতে পরিণত হল। যারা তার বুকে ইবনুল হাদীদীর প্রতি বিদ্বেষের আগুন প্রজ্জলিত করেছিল, ইবনুল হাদীদীর মৃত্যুর পর এবার তারাই তার বিরুদ্ধে চলে গেল এবং বিভিন্ন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তারা কিছুতেই ভুলতে পারল না যে, এই আলকাদির বিল্লাহর পিতামহ আলমামুন তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, সমস্যা-বিপদ ও বিদ্রোহের কালো মেঘ আলকাদির বিল্লাহর রাষ্ট্রদিগন্তে পুঞ্জীভূত হতে শুরু করে। ভেতরে-বাইরে চতুর্দিকে শত্রুদের

---

[৬৪০] ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা*, ৭/১৫০-১৫৫, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৭৯ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/১০৭।

Scanned with CamScanner

ষড়যন্ত্র, আগ্রাসন ও হামলা। একদিকে বাইরের শত্রু জারাগোযার শাসক ইবনে হুদ একের পর এক হামলা চালিয়ে তাকে বিপদে ফেলছেন, ভ্যালেন্সিয়ার প্রশাসক আবু বকর বিন আবদুল আযীয অরাজকতার সুবিধা নিয়ে সেখানে একক প্রতিপত্তি কায়েম করেছেন এবং বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন, উত্তরের খৃস্টানরা তার রাষ্ট্রে হামলা চালিয়ে কুয়েনকা (Cuenca) নগরী কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে, প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তিনি তাদেরকে নিবৃত্ত করেছেন; অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে তার বিগত দিনের বন্ধুরাই তাকে বশে আনতে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ঘোষণা দিয়েছে।

দিশেহারা আলকাদির ৪৭২ হিজরীতে (১০৭৯ খৃস্টাব্দে) টলেডো থেকে পালিয়ে ওয়াবষা (Huete) দুর্গে চলে যান। টলেডোবাসী হঠাৎ আবিষ্কার করে, তারা প্রশাসক ও নেতৃত্বশূন্য! বাধ্য হয়ে তারা মুতাওয়াক্কিল বিন আফতাসকে তাদের দেশের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানায়। বাতালইয়ুস-শাসক মুতাওয়াক্কিল এবার টলেডোরও শাসনভার গ্রহণ করেন। অবশ্য কিছুদিন পরই ক্যাস্টোলা-শাসক আলফোন্সোর সহায়তা নিয়ে আলকাদির পুনরায় টলেডোয় ফিরে আসেন। খৃস্টান বাহিনী টলেডো অবরোধ করলে মুতাওয়াক্কিল সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন। তবে যাওয়ার পূর্বে তিনি আলকাদিরের কোষাগার ও সম্পদভাণ্ডার থেকে প্রচুর সম্পদ নিয়ে যান। আলফোন্সোর খৃস্টান বাহিনী টলেডোতে প্রবেশ করে আলকাদিরকে ক্ষমতা ফিরে পেতে সহায়তা করে এবং খৃস্টান সৈন্যদের পাহারায় আলকাদির টলেডোতে প্রবেশ করেন। খৃস্টানদের সঙ্গে তার এই অসৎ ও অশুভ সম্পর্কই শেষ পর্যন্ত টলেডো পতনের কারণ হয়েছিল।

হায়! আজকের মুসলিম শাসকবর্গ যদি ইতিহাসের এসব পাঠ ও শিক্ষা স্মরণ রাখতেন! দুশমনের ওপর নির্ভরতা ও আস্থা রাখার পরিবর্তে যদি ভরসা করতেন আপন প্রতিপালকের উপর! প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক যারা, ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যারা, যুগে যুগে এমনই ছিল তাদের শাস্তি। মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى

Scanned with CamScanner

اللهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۝
وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۭ
حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

হে মুমিনগণ! ইহুদি ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না। সুতরাং যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) ব্যাধি আছে, তুমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছ যে, তারা অতি দ্রুত তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তারা বলছে, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা কোন মসিবতের পাকে পড়ে যাব। (কিন্তু) এটা দূরে নয় যে, আল্লাহ (মুসলিমদেরকে) বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে অন্য কিছু ঘটাবেন, ফলে তখন তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল, তজ্জন্য অনুতপ্ত হয়ে। এবং তখন মুমিনগণ (পরস্পরে) বলবে, এরাই কি তারা, যারা জোরদারভাবে আল্লাহর নামে কসম করে বলত যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে। তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং তারা অকৃতকার্য হয়েছে। [সূরা মায়িদা : ৫১-৫৩]

টলেডো রাজদরবারের বিখ্যাত আলিমগণ

আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, টলেডোর রাজপ্রাসাদে সেভিল বা বাতালইয়ুসের ন্যায় কবিতা ও সাহিত্যের মুকুলিত গুঞ্জরন ছিল না। তবে জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন শাস্ত্র যেমন গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও কৃষিবিদ্যা– টলেডোতে ইত্যাদি বিষয়ের চর্চার উজ্জ্বল পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। এতৎসত্ত্বেও আলমামুন তার রাজদরবার কবিদের উপস্থিতিতে সরগরম রাখতে উন্মুখ থাকতেন। তার রাজদরবারের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মামুনের দরবারী কবি বিখ্যাত সঙ্গীতের উদ্ভাবক ইবনে আরফা' রা'সাহ। মামুনের এই কাব্যপ্রীতি কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে টলেডোকে সেভিল ও বাতালইয়ুসের মতো উচ্চস্থানে পৌঁছতে সহায়তা করেছিল। তৎকালীন

Scanned with CamScanner

টলেডোর সুবিখ্যাত আলিমদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইবনে বাস্‌সাল, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনে ওয়াফিদ, গণিতশাস্ত্রের অন্যতম পথিকৃৎ ও 'তাবাক্বাতুল উমাম' নামক শাস্ত্রীয় ইতিহাসগ্রন্থের সংকলক ইবনে সাঈদ, যারকালী, 'টলেডোর আল্লামা' খ্যাত ছয়িদ আন্দালুসী তুলাইতিলী প্রমুখ।

১. ছয়িদ আন্দালুসী রহ.

পুরো নাম কাযী আবুল কাসিম ছয়িদ বিন আহমাদ বিন আবদুর রহমান বিন ছয়িদ আন্দালুসী তাগলুবী কুরতুবী তুলাইতিলী মালিকী। জন্ম ৪২০ হিজরীতে (১০২৯ খৃস্টাব্দে) আলমারিয়ায়। অবশ্য বংশগত দিক থেকে তিনি কুরতুবী ছিলেন। তাকে ইতিহাস বিষয়ে সমকালীন মুসলিম বিশ্বের আল্লামা বলে গণ্য করা হত। তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞান ও মেধার অধিকারী, রেওয়ায়েত-দেরায়েত উভয় ক্ষেত্রে সমান দক্ষ। তিনি ইমাম ইবনে হাযমের ছাত্র ছিলেন। তিনিই প্রথম আরবী চিন্তাবিদ, যিনি আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ভিত্তিতে মানব-প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। আলমামুনের আমলে তিনি টলেডোর বিচারক ছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন।

তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল 'তাবাক্বাতুল উমাম' (طبقات الأمم), যা তিনি ৪৬০ হিজরীতে (১০৬৭ খৃস্টাব্দে) রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি তার উসতায ইবনে হাযম যাহিরীর গবেষণার বিষয় 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ও বিকাশে আন্দালুসের ভূমিকা ও ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি'-কে পূর্ণতা দানের চেষ্টা করেছেন। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্তরবিন্যাস সম্পর্কে ইবনে হাযমের রিসালার তুলনায় তার গবেষণার ধারা ব্যতিক্রমধর্মী ছিল। তিনি কেবল লেখকদের ঘটনা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং প্রতিটি লেখকের সময়কাল, পরিবেশ-পরিস্থিতি, পরিবার ইত্যাদির পরিচয়ও তুলে ধরেছেন। গ্রন্থের এই ব্যাপক পরিব্যাপ্তির কারণে তিনি তার গ্রন্থের শুরুতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ইতিহাস, চিন্তাধারার বিকাশ, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক সংযোগ এবং আন্দালুস ও তার সময়কাল সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক একটি মুকাদ্দিমা (ভূমিকা) লিখেছেন। ইতিহাসসংশ্লিষ্ট এই গবেষণার মাধ্যমে তিনি দু'টি বিষয়কে সুস্পষ্ট করতে চেয়েছেন। ১. সভ্যতার বিকাশের গতিধারা ২. বিকাশের ধারাগুলোর পারস্পরিক সংযোগ।

Scanned with CamScanner

অবশ্য সমালোচকদের মতে আলোচ্য বিষয়ের গবেষণাকে আপন বৈশিষ্ট্য ও রূপরেখায় আরও সুস্পষ্ট করার জন্য হুমিদের কর্তব্য ছিল আন্দালুসের সীমা অতিক্রম করে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরও দূরে গমন করা এবং আসমানী ধর্মগুলোর আত্মপ্রকাশেরও পূর্বের সময়কালের গভীরে অবগাহন করা। (অবশ্য স্বীকার করতেই হবে) ক্রমপরিবর্তনশীল পরিস্থিতি ও গ্রন্থের পরিকল্পনার পরিবর্তনের কারণে তিনি বাধ্য হয়েছেন চিন্তাগত বিবর্তনের আন্তর্জাতিক দর্শনকে সামনে রেখে শাস্ত্রসমূহের বিশ্বজনীন স্তরবিন্যাসের পাঠ পুনরাবৃত্তিতে এবং এর ধারা আরব, ইসলামের আত্মপ্রকাশ ও বিভিন্ন বড় বড় বিজয়াভিযানের ইতিহাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে।

এ ধরনের সুবিশাল ও সুগভীর গ্রন্থের সংকলন পরিকল্পনা করতে গিয়ে হুমিদকে অবশ্যই চিন্তাসমূহের ইতিহাস, চিন্তাধারা ও মতাদর্শের বিনির্মাণে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ভূমিকা, এসব মতাদর্শের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে ত্বরিত ও পরিব্যাপ্ত অধ্যয়ন করতে হয়েছে। পাশাপাশি তিনি জাতিসমূহের পরিচিতি, তাদের চিন্তা ও মতাদর্শ পরিচিতি, প্রতিটি জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি যথাসম্ভব তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন, যেন এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত কালপ্রবাহে বিবর্তন ও বিকাশের বৃত্তাংশগুলো পরস্পর বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

তার রচিত উল্লেখযোগ্য আরও কিছু গ্রন্থ হল,

- জাওয়ামিউ' আখবারিল উমাম মিনাল আরব ওয়াল আ'জম (جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم)
- ছিওয়ানুল হিকাম (صوان الحكم)
- মাক্বালাতু আহলিল মিলাল ওয়ান নিহাল (مقالات أهل الملل والنحل)
- ইসলাহু হারাকাতিন নুজূম (إصلاح حركات النجوم)
- তারীখুল আন্দালুস (تاريخ الأندلس)
- তারীখুল ইসলাম (تاريخ الإسلام) ইত্যাদি।[৬৫]

হুমিদ আন্দালুসী রহ. ৪৬২ হিজরীতে (১০৭০ খৃস্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন।

---

[৬৫] ইবনে বাশকুয়াল, *আসসিলাহ*, ১/৩৭০, মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৩/১৮২, যিরিকলী, *আলআ'লাম*, ৩/১৮৬ ও *www.marefa.org* নামক ওয়েবসাইট।

Scanned with CamScanner

২. ইবনে ওয়াফিদ রহ.

তার পুরো নাম উযীর আবুল মুতাররিফ আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল কাবীর বিন ওয়াফিদ বিন মুহাম্মাদ লাখ্মী তুলাইতিলী। তিনি ৩৮৭ হিজরীতে (৯৯৬ খৃস্টাব্দে) টলেডোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই প্রতিপালিত হন। তিনি বনু যিননূনের তত্ত্বাবধানে টলেডোতেই বসবাস করেন। ইবনে ওয়াফিদ ছিলেন আন্দালুসের অন্যতম সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যক্তিত্ব, সুমহান অতীতের অধিকারী, জ্ঞানে-গুণে অনন্য এক মহান পুরুষ। চিকিৎসা ও বিযুক্ত ঔষধ বিজ্ঞানে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। 'আলআদবিয়াতুল মুফরাদা' (الأدوية المفردة) কেমিস্ট্রিশাস্ত্রে তার রচিত কালজয়ী গ্রন্থ।

কাযী ছয়িদ আন্দালুসী 'আলআদবিয়াতুল মুফরাদা' ও তার লেখক ইবনে ওয়াফিদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, বিযুক্ত ঔষধ-শাস্ত্রে তিনি সুদক্ষ ছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি এমন সব সূত্র ও নীতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন, যা তার সমকালীন কেউ পারেননি। এ বিষয়ে তিনি অনন্য ও অনবদ্য একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন; যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সুপরিচিত দুই গ্রন্থ ডিওসকোরিডাস (dioscoridis) ও জালীনুসের গ্রন্থদ্বয়ের সকল তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয়েছে এবং চমৎকার ধারায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে ইবনু ওয়াফিদের একটি ঐতিহাসিক দর্শন হয়েছে। তিনি মনে করতেন, যতক্ষণ খাদ্য ও পথ্যের মাধ্যমে চিকিৎসা সম্ভব, ততক্ষণ কিছুতেই ঔষধের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। আর ঔষধ যদি দিতেই হয়, তাহলে যতক্ষণ বিযুক্ত ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা সম্ভব, ততক্ষণ তিনি কিছুতেই কম্পোজিট (মিশ্রিত) ঔষধ দিতেন না। মিশ্রিত ঔষধ দিতে বাধ্য হলে অধিক মিশ্রণ করতেন না; বরং যথাসম্ভব অল্প সংমিশ্রণে সচেষ্ট হতেন।

ইবনু ওয়াফিদের মৃত্যু ৪৬৭ হিজরীতে (১০৭৪ খৃস্টাব্দে)। তার গুরুত্বপূর্ণ ও অনবদ্য আরও কিছু রচনা হল,

- আলবিসাদ ফিত তিব (الوساد في الطب)
- মুজাররাবাতুন ফিত তিব (مجربات في الطب)
- তাদক্বীক্বুন নযর ফী ই'লালি হাস্সাতিল বাছার (تدقيق النظر في علل حاسة البصر)
- কিতাবুল মুগীছ (كتاب المغيث) ইত্যাদি।[৩৪২]

---

[৩৪২] ইবনে আবি উসাইবিআ', *উয়ূনুল আম্বা ফী তাবাক্বাতিল আতিব্বা*, ৩/২৩১-৩২৩।

Scanned with CamScanner

পাঁচ. জারাগোযায় বনু হুদের রাজত্ব

জারাগোযার ভৌগোলিক অবস্থান ও সামরিক গুরুত্ব

জারাগোযাকে মুসলিম আন্দালুসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হত। বিশেষত খণ্ডিত আন্দালুস আমলে জারাগোযার গুরুত্ব বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দু'টি বিশেষ কারণে জারাগোযা ছিল সবিশেষ গুরুত্বের দাবিদার।

১. জারাগোযার সুবিস্তৃত ভৌগোলিক পরিধি

তৎকালীন জারাগোযা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল জারাগোযা (Zaragoza) নগরী ও তার প্রদেশসমূহ, টাডেলা (Tudela), হুয়েস্কা (Huesca), বারবাস্ট্রো (Barbastro), লারেডা (Lareda), ইব্রেডা (Braga), টারাজোনা (Tarragona), টরটোযা (Tortosa) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ নগরী। আইবেরিয়ান উপদ্বীপের বিখ্যাত নদী এব্রো (Ebro River)-এর টরটোযা সংলগ্ন মোহনামুখ হতে শুরু করে নাফার রাষ্ট্রের কালাহুর্‌রা (Calahorra) নগরী-সংলগ্ন প্রবেশস্থল পর্যন্ত নদীর দু' পাশের বিধৌত উর্বর পলিভূমি জারাগোযার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও এব্রো নদীর উত্তর দিকের বড় শাখা সাজরী নদী এবং বারবাস্ট্রো ও হুয়েস্কা পর্যন্ত বিস্তৃত অন্যান্য ছোট ছোট শাখা নদী জারাগোযাকে অতিক্রম করেছে। এব্রোর আরেকটি শাখা ক্যালোন নদী দক্ষিণে জারাগোযা রাষ্ট্রের আইয়ুব দুর্গ (Calatayub) ও দারোকা (Daroca) পর্যন্ত বিস্তৃত। এ ধরনের খরস্রোতা বিভিন্ন নদী ও কৌশলগত অবস্থানভূমিতে সমৃদ্ধ নদীমাতৃক অঞ্চলে গড়ে ওঠেছিল জারাগোযা রাষ্ট্র।[৬৪৩]

২. ঝুঁকিপূর্ণ সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থান

আন্দালুসের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর আক্রমণ হতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর আত্মরক্ষার সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বপ্রথম প্রতিরক্ষা প্রাচীর ছিল জারাগোযা নগরী। তিন তিনটি খৃস্টান রাষ্ট্র জারাগোযার সীমানা সংশ্লিষ্ট ছিল। জারাগোযার পূর্ব দিকে

---

[৬৪৩] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/২৬৫।

Scanned with CamScanner

ছিল কাতালুনিয়া রাষ্ট্র, উত্তর-পশ্চিম দিকে নাফার রাষ্ট্র এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ক্যাস্টোলা রাষ্ট্র। মুসলমানদের আন্দালুস বিজয়ের পর থেকে আন্দালুসের ঈসায়ী শক্তি যেহেতু কখনোই ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত হয়নি, তাই জারাগোযা ছিল সার্বক্ষণিক সংঘাতের কেন্দ্রভূমি। এ কারণেই মুসলমানগণ জারাগোযার নামকরণ করেছিলেন 'আসসাগরুল আ'লা' বা উচ্চ সীমান্তবর্তী অঞ্চল।

জারাগোযায় বনু তুজাইব গোত্রের শাসন

বনু তুজাইব একটি আরব গোত্র। আলমানসুর বিন আবু আমিরের শাসনামলে ৩৯৭ হিজরী মোতাবেক ৯৮৯ খৃস্টাব্দে আলমানসুর যখন ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান তুজাইবীকে উচ্চ সীমান্ত অঞ্চলের দায়িত্বভার প্রদান করেন, তখন থেকেই মূলত এ অঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃত্যু অবধি ইয়াহইয়া এ দায়িত্ব পালন করেন। ৪০৮ হিজরীতে (১০১৭ খৃস্টাব্দে) ইয়াহইয়ার মৃত্যু হলে তার পুত্র মুনযির বিন ইয়াহইয়া আততুজাইবী তার স্থলাভিষিক্ত হন। মুনযিরকে গণ্য করা হয় আন্দালুসে বনু তুজাইবের সবচে' ক্ষমতাধর শাসক হিসেবে।

দায়িত্বগ্রহণের পর আপন দূরদৃষ্টিবলে মুনযির উপলব্ধি করেন যে, খৃস্টানশক্তিগুলোর সঙ্গে একটি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধি ও যুদ্ধবিরতি বজায় রাখাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এতে আন্দালুস-ভূমির ওপর খৃস্টশক্তির ধারাবাহিক আক্রমণ বন্ধ থাকবে। এ বিবেচনাবোধ থেকেই তিনি বার্সেলোনার প্রশাসক র‍্যামোন, নাফারের রাজা স্যাঞ্চো দ্যা গ্রেট, তার পুত্র ক্যাস্টোলার রাজা প্রথম ফার্ডিনান্ড এবং লিওনের নৃপতি পঞ্চম আলফোন্সোর সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

খৃস্টান নৃপতিদের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রাখতে মুনযির যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি ইসলাম ও খৃস্টধর্মের ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ তথা আলিমসমাজ ও পাদ্রীদের উপস্থিতিতে তার রাজপ্রাসাদে র‍্যামোন ও স্যাঞ্চোর আত্মীয়তার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। খৃস্টানদের সঙ্গে তার এই উষ্ণ সম্পর্ককে জনগণ ভালো চোখে দেখেনি। তারা তার প্রতি সংক্ষুব্ধ হয় এবং তাকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। প্রকৃতপক্ষে মুনযিরের মৃত্যুর পরই কেবল জনগণ তার এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কূটনীতির যথার্থতা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কেননা, তার মৃত্যুর পরপরই আন্দালুসের খৃস্টানশক্তি সাময়িক

Scanned with CamScanner

শান্তিকালীন পরিস্থিতি ত্যাগ করে পুনরায় জারাগোযায় হামলা শুরু করে।[৬৪৪] যুগে যুগে ক্ষুদ্র ও বিভক্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানগণ এই সমঝোতামূলক নতজানু রাষ্ট্রনীতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। বস্তুত ক্ষমতার মোহ-ই তাদেরকে এ ধরনের লাঞ্ছনাকর নীতি অবলম্বনে প্ররোচিত করে, রসদ যোগায়। ক্ষমতার মোহ মানুষের বোধ ও বিবেককে অন্ধ করে ফেলে। অন্যথায় বিভক্ত আন্দালুসের শাসকবর্গ যদি তাদের বিবেককে কাজে লাগাতেন এবং ক্ষমতার মোহ ও প্রবৃত্তি ত্যাগ করতে পারতেন, তাহলে তারা ঐক্য ও একতার পথে অগ্রসর হতে পারতেন এবং দুর্বলতা ডেকে আনা বিভেদের পরিবর্তে একতার দাবিকে প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু ক্ষমতার মোহে অন্ধ শাসকবর্গের সামনে গদি রক্ষার একটাই পথ ছিল, শত্রুদের জন্য মুসলিম রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং নিজেদের নীতি-আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে হলেও অমুসলিম শত্রুদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা, শত্রুর সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া এবং তাদের সাহায্য নিয়ে আপন দ্বীনী ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করা।

মুনযির বিন ইয়াহইয়া জারাগোযা ও তার প্রদেশসমূহকে নিয়ে উচ্চ সীমান্ত অঞ্চলে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর তিনি একটি বিভক্ত রাষ্ট্রের শাসক হয়েও 'আলমানসুর', 'হাজিব যির রিআসাতাইন' প্রভৃতি রাজকীয় উপাধি ধারণ করেন। ৪১৪ হিজরী পর্যন্ত তিনি জারাগোযা শাসন করেন। তার পর তার পুত্র আলমুযাফফার ইয়াহইয়া বিন মুনযির ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ৪২০ হিজরীতে (১০২৯ খৃস্টাব্দে) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। মুযাফফারের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় মুনযির বিন ইয়াহইয়া হাজিব মুইয্যুদ্দৌলা উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার মাধ্যমেই জারাগোযায় বনু তুজাইবের শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে। ৪৩০ হিজরীতে (১০৩৯ খৃস্টাব্দে) তিনি তার চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ বিন হাকীমের হাতে নিহত হন।

দ্বিতীয় মুনযিরের মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ বিন হাকীম নিজেকে শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন; কিন্তু জারাগোযাবাসী তার অসচ্চরিত্রের কারণে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে হত্যা করার মনস্থ করে। অবস্থা বেগতিক দেখে আবদুল্লাহ নিজেই পালিয়ে যান। শাসকশূন্য জারাগোযাবাসী লারেডা

---

[৬৪৪] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ১/১৮০-১৮৫ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৭৫-১৭৭।

Scanned with CamScanner

অঞ্চলের প্রশাসক সুলাইমান বিন হুদের কাছে দূত প্রেরণ করে তাকে পুরো রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণের অনুরোধ জানায়। তিনি জারাগোযায় আগমন করলে সকলে তাকে শাসক হিসেবে মেনে নেয়। ৪৩১ হিজরীর মুহাররম মাসে (১০৩৯ খৃস্টাব্দে) সংঘটিত এই ঘটনার মাধ্যমেই জারাগোযায় বনু তুজাইবের শাসনব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটে এবং বনু হুদের শাসনব্যবস্থার সূচনা হয়।[৬৫৫]

জারাগোযায় বনু হুদের শাসনামল

১. সুলাইমান আলমুসতাঈন বিন হুদ

জারাগোযাবাসী সুলাইমানকে শাসক হিসেবে বরণ করে নেওয়ার পর তিনি আলমুসতাঈন বিল্লাহ উপাধি ধারণ করে ৪৩১ হিজরীর মুহাররম মাসে শাসনভার গ্রহণ করেন। মূলত এ সময় থেকেই আন্দালুসের উচ্চ সীমান্ত অঞ্চলে বনু হুদ তাদের প্রতিপত্তি বিস্তার শুরু করে। সুলাইমান একমাত্র টরটোযা নগরী বাদে জারাগোযার অন্যান্য অঞ্চলসমূহের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। কারণ, টরটোযা তখন ছিল আমিরিয়া পরিচারকদের দখলে।
সম্ভবত সুলাইমান বিন হুদের আমলের সবচে' উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনা হল তার ও টলেডো-শাসক আলমামুন বিন যিননূনের মধ্যকার সংঘাত। তারা উভয়েই আপন মুসলিম ভাইয়ের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য খৃস্টানদের (নাকার ও ক্যাস্টোলার নৃপতিদের) সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। আর সুযোগ পেয়ে খৃস্টানশক্তি মুসলমানদের মাঝে ফিতনা ও বিভেদের আগুন উসকে দিচ্ছিল। এ ফিতনার আগুন মুসলিম রাষ্ট্রভূমিকেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু ৪৩৮ হিজরীতে (১০৪৬ খৃস্টাব্দে) সুলাইমানের মৃত্যুর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লা এ অশুভ ফিতনার অনিষ্টকর পরিণতি হতে মুসলমানদের রক্ষা করেন।[৬৫৬] এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা যথাস্থানে পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

---

[৬৫৫] বিস্তারিত জানতে : ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা*, ১/১৮৫-১৮৮, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৭৮-১৮, ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৬৩ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৭০-১৭১। অবশ্য ইবনুল খতীব উল্লেখ করেছেন যে, জারাগোযাবাসী মুনযির বিন ইয়াহইয়ার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিল এবং সুলাইমান বিন হুদের আনুগত্য গ্রহণ করেছিল।

[৬৫৬] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৭৭-২৮২ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৭৭-১৭৮।

Scanned with CamScanner

২. আলমুকতাদির বিল্লাহ আহমাদ বিন হুদ

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সুলাইমান বিন হুদ তার পাঁচ পুত্রের মাঝে আপন রাষ্ট্রের প্রদেশসমূহ বন্টন করে দেন। পুত্র আহমাদকে দেন জারাগোযার দায়িত্ব, ইউসুফকে লারেডার শাসনভার, মুহাম্মাদকে আইয়ুব দুর্গের ক্ষমতা, লুব্বকে হুয়েস্কা নগরীর শাসনক্ষমতা এবং মুনযিরকে টাডেলার দায়িত্বভার।[৬৪৭] কিন্তু সুলাইমানের এই বন্টননীতির ফলাফল ছিল অত্যন্ত নেতিবাচক। কেননা, এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তিনি তার সন্তানদের মাঝে ভ্রাতৃঘাতী শত্রুতা, বিভেদ ও হানাহানির বীজ রোপণ করে দিয়েছিলেন। আর তাই পিতার মৃত্যুর পরপরই প্রত্যেকে আপন আপন অধীনস্থ এলাকার স্বাধীনতার দাবি করতে শুরু করে। অবশ্য আহমাদ ছিলেন অন্যদের তুলনায় বিচক্ষণ, কৌশলী ও সৌভাগ্যবান। ফন্দি এঁটে তিনি সকলকে বন্দী করে ফেলেন এবং তাদের অধীনস্থ এলাকাকে নিজ শাসনের অধিভুক্ত করে নেন। একমাত্র লারেডার প্রশাসক ইউসুফ, যিনি হুসামুদ্দৌলা উপাধি ধারণ করেছিলেন, তিনিই আহমাদের শত কৌশলের সামনেও দৃঢ়-অটল থাকেন এবং লারেডাকে তার ভাইয়ের হাত থেকে মুক্ত রাখতে সমর্থ হন।

বিষয়টি এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আহমাদের অন্যায় আচরণ ও ভাইদের প্রতি তার কঠোরতা প্রত্যক্ষ করে কিছুদিন পর জনগণই তার বিপক্ষে চলে যায় এবং ইউসুফের পক্ষাবলম্বন করে। ইউসুফ নিজেকে জারাগোযা রাষ্ট্রের শাসক দাবি করে 'আলমুযাফফার' উপাধি ধারণ করেন। জারাগোযা রাষ্ট্র নিপতিত হয় আহমাদ আলমুকতাদির ও ইউসুফ আলমুযাফফার দু' ভাইয়ের মধ্যকার গৃহযুদ্ধের আগুনে। অবশেষে প্রতারণা ও শঠতার আশ্রয় নিয়ে এবং মুসলমানদের রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আহমাদ তার ভাই ইউসুফকে পরাভূত করতে সক্ষম হন।

ভাইদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে আহমাদ খৃস্টানশক্তির সাহায্য কামনা করেন এবং তাদের সহায়তায় লারেডা ও টাডেলাকে (জারাগোযার দু'টি প্রদেশ) আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। এর ফলে একদিকে তার সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে তার প্রভাব-প্রতিপত্তিও বেড়ে

---

[৬৪৭] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২২২ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৭১।

Scanned with CamScanner

যায়।[৬৫৮] এরপর ৪৫২ হিজরীতে (১০৬০ খৃস্টাব্দে) আমিরী পরিচারক নাবীলকে পরাজিত করে টরটোষাকেও তিনি জারাগোযা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।[৬৫৯] ৪৬৮ হিজরীতে (১০৭৬ খৃস্টাব্দে) তিনি দানিয়া (Dénia) অবরোধ করেন এবং প্রচণ্ড অবরোধের পর দানিয়া নগরীও আপন জামাতা আলী ইকবালুদ্দৌলার কাছ থেকে কেড়ে নেন।[৬৬০] এভাবে একের পর এক বিজয়ে তার আমলে জারাগোযা পরিণত হয় আয়তন বিবেচনায় বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের সবচে' বৃহৎ রাষ্ট্রে।

বারবাস্ট্রোর ট্রাজেডি

বারবাস্ট্রোতে মুসলমানদের ওপর যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল, তাকে আন্দালুসের মুসলিম ইতিহাসে কঠিনতম দুর্যোগ না বললেও অন্যতম কঠিন দুর্যোগ হিসেবে তো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। জারাগোযা সাম্রাজ্যের বারবাস্ট্রো নগরীর মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনে নেমে এসেছিল বর্ণনাতীত কঠিন পরিস্থিতি। নরম্যান নামক বর্বর খৃস্টান জনগোষ্ঠী (ইতিহাসে যারা ভাইকিং জলদস্যু নামে কুখ্যাত) ৪৫৬ হিজরীতে (১০৬৪ খৃস্টাব্দে) বারবাস্ট্রো নগরীতে আকস্মিক হামলা চালিয়ে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল এবং ইতিহাসের জঘন্য ও নির্মমতম পন্থায় নগরবাসী মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। জারাগোযার শাসক আলমুকতাদির আহমাদ বিন হুদ তার শাসনাধীন বারবাস্ট্রো নগরবাসীকে বাঁচাতে অগ্রসর হননি। কারণ, বারবাস্ট্রো তখন তার ভাই ইউসুফ আলমুযাফফারের দখলে ছিল। মুসলমানদের এ দুর্যোগের চিত্র বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়ান ব্যথাভরা শব্দমালায় উপস্থাপন করেছেন। আলমুকতাদিরের শিথিলতার কথা উল্লেখ করার পর তিনি লিখেছেন,

> শত্রুপক্ষ নগরীতে চল্লিশ দিন অবস্থান করেছিল। এ সময় খাদ্যস্বল্পতার কারণে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে নগর-প্রাচীরের মাঝে অবরুদ্ধ নগরবাসী পরস্পর হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ল। বিষয়টি জানতে পেরে শত্রুপক্ষ যুদ্ধ ও অবরোধ আরও জোরদার ও

---

[৬৫৮] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২২২-২২৩।

[৬৫৯] প্রাগুক্ত, ৩/২৫০।

[৬৬০] প্রাগুক্ত, ৩/২২৮।

Scanned with CamScanner

তীব্র করল। একপর্যায়ে বর্ম পরিহিত পাঁচ হাজার শত্রু-সৈন্য নগরীর প্রথম প্রাচীর পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। ভীত-সন্ত্রস্ত নগরবাসী নগরীর আরও ভেতরে সুরক্ষিত অংশে আশ্রয় নিল। সেখানে প্রচণ্ড লড়াই সংঘটিত হল এবং শত্রুপক্ষের পাঁচ শ' সৈনিক নিহত হল। এর পরপরই ঘটল এক আকস্মিক দুর্ঘটনা। ভূগর্ভস্থ যে সুগঠিত নালা দিয়ে বাইরের নদী থেকে শহরে পানি প্রবেশ করত, হঠাৎ করেই তা ভেঙে পড়ল। বিরাটাকৃতির একটি পাথর পতিত হয়ে পানি প্রবেশের পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। এর কারণে শহরের পানি সরবরাহ-ব্যবস্থা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

অবরোধে আটকা পড়া নগরবাসী জীবনের আশা ছেড়ে দিল। পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের চিন্তা বাদ দিয়ে শত্রুপক্ষের কাছে তারা কেবল নিজেদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে যখন সকলে বেরিয়ে এল, (খৃস্টানদের চিরাচরিত রূপ উন্মোচিত হল এবং) শত্রুপক্ষ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে প্রতারণার আশ্রয় নিল। সেনাপতি ইবনুত তুওয়াইল ও কাযী ইবনে ঈসাসহ বিশিষ্ট কিছু নাগরিক বাদে সকলকে হত্যা করা হল। শত্রুপক্ষ প্রচুর অর্থ-সম্পদ হস্তগত করল। এমনকি কেবল অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান রোমা তার অগ্রবর্তী বাহিনীর জন্য নিয়ে নিল প্রায় এক হাজার মুসলিম তরুণী যুদ্ধবন্দী এবং পাঁচ শ' উট বোঝাই অলঙ্কার, পণ্যসামগ্রী ও বস্ত্রসম্ভার। নিহত ও বন্দী মুসলমানদের সংখ্যা আনুমানিক এক লক্ষ। কেউ কেউ অবশ্য পঞ্চাশ হাজারের কথাও বলেছেন।

পরিস্থিতি কতটা সঙ্গীন ও ভয়াবহ ছিল, তা বোঝানোর জন্য সে সময় সংঘটিত একটি বিরল ঘটনা উল্লেখ করছি। পানির নালা বিধ্বস্ত হয়ে যখন পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল, তখন প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে জনৈক মহিলা নিকটবর্তী শত্রুসৈন্যের কাছে নিজের জন্য কিংবা তার সন্তানের জন্য এক ঢোক পানি চাইলেন। শত্রুসৈন্যটি সামান্য পানি প্রদানের বিনিময়ে মহিলার সঙ্গে থাকা সবকিছু দাবি করল। পিপাসা-কাতর মহিলাটি এক ঢোক পানির জন্য তার সঙ্গে থাকা কাপড়-চোপড়, অলঙ্কার ও অন্যান্য সবকিছু দিয়ে দিলেন।

ইবনে হাইয়ান এ সংক্রান্ত আলোচনার শেষে উল্লেখ করেছেন,

Scanned with CamScanner

এই ব্যাপক গণহত্যার কারণ এই ছিল যে, নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে বেরিয়ে আসা মানুষের সংখ্যাধিক্য দেখে তাদের উদ্ধারে যারা এসেছিল, তারা শঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গণহত্যা শুরু করে দিয়েছিল (আল্লাহ তাদেরকে অভিশম্পাত করুন)। অল্পক্ষণেই ছয় হাজারের অধিক মুসলমান নিহত হল। এরপর খৃস্টান বাহিনীর প্রধান বাকিদের জন্য নিরাপত্তা ঘোষণা করল এবং তাদের বের হতে আদেশ করল। দ্রুত বের হতে উদ্যত মানুষের ভীড়ে প্রাচীরদ্বারের কাছে যারা গেল বহু মানুষ। প্রাচীরদ্বারের ভীড়ের ভয়ে এবং দ্রুত পানি পানের আশায় অনেকে প্রাচীর হতে রশি বেয়ে নামতে লাগল। নগরীর একেবারে অভ্যন্তরে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাত শ'-জনের একটি দল সমবেত হয়েছিল। তারা 'করণীয়' সম্পর্কে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিল এবং বসে বসে পরিণতির অপেক্ষা করছিল। হত্যাযজ্ঞ, পাইকারী ধৃন্দী, নিরাপত্তার আশায় প্রাচীরদ্বারের কাছে ভীড় করে বহুজনের মৃত্যু ইত্যাদি পর্ব শেষ হওয়ার পর শত্রুপক্ষ ঘোষণা করল, যারা জীবিত আছে, তারা যেন আপন পরিবার-পরিজন নিয়ে দ্রুত নিজেদের ঘর-বাড়িতে চলে যায়; কেননা, তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। এরপর সবাইকে আপন আপন ঘরে ফিরতে বাধ্য করা হল। অভিশপ্ত খৃস্টান সৈন্যরা তাদের সেনাপতির আদেশে বাড়িগুলো বণ্টন করে নিল এবং প্রত্যেকে একটি একটি বাড়ি ভেতরের অধিবাসীসহ নিয়ে নিল। আল্লাহ তা'আলার কাছেই আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

নগরবাসীর ক্ষুদ্র একটি দল পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখানে বিভিন্ন সুরক্ষিত স্থানে আত্মগোপন করেছিল। পানির অভাবে তারা মৃত্যুর প্রহর গুনছিল। খৃস্টান সেনাপতি তাদেরকে নিরাপত্তা দিল। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মৃতপ্রায় কতগুলো দেহকাঠামো পর্বত-চূড়া থেকে নেমে এল। তাদের কাতর অবস্থা দেখে খৃস্টান সেনাপতি তাদেরকে ছেড়ে দিল। কিছু দূর যাওয়ার পরই পথিমধ্যে এ ঘটনা সম্পর্কে অনবগত কাফিরদের একটি অশ্বারোহী বাহিনী তাদের দেখতে পেয়ে হত্যা করে ফেলল। অল্প কয়েকজনই এই হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পেয়েছিল।

অভিশপ্ত ইউরোপীয় খৃস্টান বাহিনী নগরীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর

Scanned with CamScanner

শুরু করল নারকীয় তাণ্ডবের পরবর্তী অধ্যায়। তারা পিতার সামনে তার কুমারী কন্যাকে, স্বামী ও পরিবারের সামনে বিবাহিতা নারীকে ধর্ষণ করতে লাগল। মুসলমানগণ ইতঃপূর্বে কখনো এরূপ নারকীয় আচরণ প্রত্যক্ষ করেনি। মুসলিম নারীদের মাঝে যারা গৃহ-পরিচারিকা শ্রেণির ছিল, তাদের সম্ভ্রমহানি করতে তুলে দেওয়া হল খৃস্টান বাহিনীর সেবক ও পরিচারকদের হাতে।

কাফিররা সেদিন এতটা অসভ্য ও নির্মম আচরণ করেছিল, প্রকৃতপক্ষে তার বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব নয়। শত্রুবাহিনী যখন তাদের দেশে ফিরে যেতে মনস্থ করল, উপরন্থ কর্মকর্তাদের উপহার দেওয়ার জন্য বাছাই করে কয়েক হাজার সুন্দরী মুসলিম যুবতী ও সুদর্শন কিশোরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। বারবাস্ট্রোতে তারা রেখে গেল সেড় হাজার অশ্বারোহী সৈনিক এবং দু' হাজার পদাতিক সৈন্য।[৬৫১]

ফকীহ ইবনুল আ'সসাল মুসলমানদের এই দুর্যোগের চিত্র নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিমালায় চিত্রায়িত করেছেন,

هَتَكُوْا بِخَيْلِهِمْ قُصُوْرَ حَرِيْمِهَا لَمْ يَبْقَ لَا جَبَلٌ وَلَا بَطْحَاءُ

جَاسُوْا خِلَالَ دِيَارِهِمْ فَلَهُمْ بِهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ غَارَةٌ شَعْوَاءُ

তারা অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ধ্বংস করেছে নগরীর প্রাসাদ-ভবন, বাকি রাখেনি কোন জায়গা; না পাহাড়, না কোন উপত্যকা।

মুসলমানদের বাড়িতে বাড়িতে তারা তল্লাশী চালিয়েছে, প্রতিদিন চালিয়েছে দীর্ঘ হামলা।

بَاتَتْ قُلُوْبُ الْمُسْلِمِيْنَ بِرُعْبِهِمْ فَحُمَاتُنَا فِيْ حَرْبِهِمْ جُبَنَاءُ

كَمْ مَوْضِعٍ غَشِيُوْهُ لَمْ يُرْحَمْ بِهِ طِفْلٌ وَلَا شَيْخٌ وَلَا عَذْرَاءُ

তাদের ভয়ে মুসলমানদের (চির জাগ্রত) হৃদয় যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী যেন হয়ে

---

[৬৫১] আলমাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৪৪৯। বারবাস্ট্রোর ট্রাজেডি সম্বন্ধে আরও জানতে দেখুন : ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৫/১৮১ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২২৫-২২৭।

Scanned with CamScanner

পড়েছিল বুযদিল-কাপুরুষ ।

নগরীর কত এলাকা তারা বিনা বাধায় বিনা প্রতিরোধে জয় করে নিয়েছে! এরপর সামান্যও অনুকম্পা প্রদর্শন করা হয়নি কারও প্রতি; শিশু-বয়োবৃদ্ধ-অবলা তরুণীদের প্রতিও নয় ।

وَلَكَمْ رَضِيعٍ فَرَّقُوا مِنْ أُمِّهِ ... فَلَهُ إِلَيْهَا ضِجَّةٌ وَبُكَاءُ

وَلِرُبَّ مَوْلُودٍ أَبُوهُ مُجَدَّلٌ ... فَوْقَ التُّرَابِ وَفَرْشُهُ الْبَيْدَاءُ

হায়! দুগ্ধপোষ্য কত অবুঝ শিশুকে তারা মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে! বাতাসে তখন কেবল কোলহারা শিশুর চিৎকার আর ক্রন্দন-ধ্বনি!

কত সন্তানের সামনে পড়ে ছিল তার পিতার লাশ! মরুভূমির বালুকাময় বিছানায় ভূপাতিত অবস্থায়!

وَمَصُونَةٍ فِي خِدْرِهَا مَخْجُوبَةٍ ... قَدْ أَبْرَزُوهَا مَا لَهَا اسْتِخْفَاءُ

وَعَزِيزِ قَوْمٍ صَارَ فِي أَيْدِيهِمُ ... فَعَلَيْهِ بَعْدَ الْعِزَّةِ اسْتِخْذَاءُ

অন্দরমহলের সংরক্ষিত পর্দার আড়ালে সুরক্ষিত কত তরুণীকে ওরা টেনে হিঁচড়ে বের করেছে বাইরে! আত্মগোপনের কিংবা লুকানোর কোন জায়গা ছিল না সেদিন ।

জাতির প্রভাবশালী কত পুরুষ সেদিন ওদের হাতে পড়েছে! যাদের ছিল সম্মান-প্রতিপত্তি, তারা হয়ে গেছে হীনতা ও বশ্যতার শিকার!

لَوْلَا ذُنُوبُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّهُمْ ... رَكِبُوا الْكَبَائِرَ مَا لَهُنَّ خَفَاءُ

مَا كَانَ يُنْصَرُ لِلنَّصَارَى فَارِسٌ ... أَبَدًا عَلَيْهِمْ فَالذُّنُوبُ الدَّاءُ

فَشِرَارُهُمْ لَا يَخْتَفُونَ بِشَرِّهِمْ ... وَصَلَاحُ مُنْتَحِلِي الصَّلَاحِ رِيَاءُ

মুসলমানরা যদি না জড়াত অন্যায়-অপরাধে, না লিপ্ত হত এমন সব গর্হিত গোনাহের কাজে, যা গোপন থাকার নয়,

মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের সাহায্যার্থে কক্ষনো পাওয়া যেত না একজন অশ্বারোহীকেও। সুতরাং গোনাহই প্রকৃত ব্যাধি ।

Scanned with CamScanner

তাদের নিকৃষ্টতম ব্যক্তিরাও নিজেদের অন্যায়কে গোপন রাখে না; আর অন্যের সততাকে নিজের বলে দাবিকারীর সততাও এক ধরনের আত্মঅহঙ্কার।[৬৫২]

আমরা এ দুঃখজনক ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য পূর্বের ন্যায় অতীত ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাব না; বরং মুসলমানদের এই দুর্যোগ ও বিপদের পেছনে যেসব কারণ ও কার্যকারণ কার্যকর ছিল, তা বিশ্লেষণের দায়িত্বভার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়ানের স্কন্ধেই অর্পণ করব। ইবনে হাইয়ান লিখেছেন,

আমাদের এই কাল তার অধিবাসীদের যেন চালুনি দিয়ে চেলেছে এবং তাদের চারিত্রিক সব গুণাবলি চেলে ফেলে দিয়েছে। তাদের চেতনার শিকড় উপড়ে ফেলেছে; নির্বোধ বানিয়েছে তাদের আশা ও স্বপ্নকে; তাদের মন ও অন্তরজগতকে দুষ্ট প্রকৃতির বানিয়ে দিয়েছে। ফলে মূর্খতা ও অজ্ঞতা তাদের ঘিরে ধরেছে, মিথ্যা ও জালিয়াতি তাদের হৃদয়রাজ্য দখল করে নিয়েছে, অন্যায় ও পাপাচার তাদেরকে আমূল বদলে করে দিয়েছে, বিচ্যুতি ও স্খলন তাদেরকে কলুষিত করে ফেলেছে। তাই সততার পথে তারা আল্লাহভীরু নয়, ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে তারা সবল ও শক্তিশালী নয়।

নিজেদেরকে তারা আক্রান্ত করেছে অন্যায়ের ব্যাধিতে। নিজেদের দুরবস্থা সম্পর্কে তারা যে একেবারেই অজ্ঞ ও গাফিল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, কাল ও সময়ের স্রোতে তারা আত্মপ্রবঞ্চিত হয়ে আছে এবং আপন স্রষ্টার আনুগত্য হতে তারা দূরে সরে আছে। তারা প্রত্যাখ্যান করেছে আল্লাহর রাসূল ও তাদের নবীজীর অসিয়ত; নিজেদের কর্মপরিণতির প্রতি দৃষ্টিপাতের কথা তারা যেন ভুলেই গেছে। সীমান্ত রক্ষায় তারা একেবারেই উদাসীন। ফলে তাদের ঈমানী আলোকে নিভিয়ে দিতে সদা সচেষ্ট শত্রুদল এখন তাদের বসতির একেবারে সন্নিকটে স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছে এবং নিশ্চিন্তে তাদের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অভিযান চালাচ্ছে। প্রতিদিন তারা একের পর এক বিভিন্ন মুসলিম এলাকা অতিক্রম করছে এবং একেক জাতিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে; অথচ আমাদের কাছে ও চারপাশে

---

[৬৫২] হিময়ারী, *নিফাতু জাযীরাতিল আন্দালুস*, ১/৪০-৪১।

Scanned with CamScanner

একত্বের কালিমাবাহী যেসব মুসলমান আছেন, তারা ধ্বংসের শিকার সেসব জাতির বিষয়ে একেবারেই নিশ্চুপ, তাদের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্যোগ সম্পর্কে একেবারেই নির্লিপ্ত। আমাদের কোন মসজিদে, কোন মাহফিলে, কিংবা আলাপ-আলোচনায় নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর জন্য সহমর্মিতা প্রকাশ বা তাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ দূরে থাক, তাদের কথা স্মরণ করতে বা তাদের জন্য দোয়া করতেও কাউকে শোনা যায় না। যেন তারা আমাদের কেউ নয়; যেন তাদের এই পতন ও ভাঙনের ধারা আমাদের পর্যন্ত কখনোই পৌঁছবে না। আজ আমরা তাদের জন্য দোয়া করতেও কার্পণ্য করছি। প্রাচুর্য ও সম্পদের মোহ আমাদের বানিয়ে দিয়েছে স্বভাব-কৃপণ। আমাদের আচরণে-উচ্চারণে, কর্মে ও স্বভাবে এমন বিরল ও বিস্ময়কর সব বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে, যা অনুমান করাও দুষ্কর। যাবতীয় ভালো-মন্দ পরিণতি আল্লাহর হাতে আর তার কাছেই সকলের সুনিশ্চিত প্রত্যাবর্তন।[৪৫৩]

বারবাস্ট্রোর মুসলমানদের এই দুর্যোগের সংবাদ পুরো আন্দালুসে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সকলের হৃদয় প্রকম্পিত হয়, প্রত্যেকের দেহ-সত্তা ঝাঁকুনি খায়। ভাইয়ের শাসন অধিভুক্ত হওয়ায় যে আলমুকতাদির বিন হুদ বারবাস্ট্রোর দুর্যোগে কোন পদক্ষেপ নেননি, প্রচণ্ড লজ্জা ও অপমানবোধ তাকে ঘিরে ধরে। তিনি যুদ্ধের ডাক দেন এবং পুরো আন্দালুসে নাফীরে আমের আহ্বান জানান। বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাগণ দলে দলে সমবেত হতে শুরু করে। সেভিল থেকে আলমু'তামিদ বিন আব্বাদ প্রেরণ করেন পাঁচ শ' অশ্বারোহী।

৪৫৭ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে (১০৬৫ খৃস্টাব্দে) আলমুকতাদির অভিযানে রওয়ানা হন। মুসলিম বাহিনী খৃস্টানদের দখলে থাকা বারবাস্ট্রো নগরী অবরোধ করে। এরপর খৃস্টান বাহিনীর সঙ্গে সংঘটিত হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। যুদ্ধে খৃস্টান বাহিনীর এক হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচ শ' পদাতিক সৈন্য নিহত হয়; বন্দী হয় পাঁচ হাজার খৃস্টান সৈন্য। নয় মাস খৃস্টানদের দখলে থাকার পর বারবাস্ট্রো নগরী আবারও মুসলমানদের অধিকারে ফিরে আসে।[৪৫৪]

---

[৪৫৩] ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা*, ৫/১৮৮-১৮৯।

[৪৫৪] ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা*, ৫/১৮৯-১৯০, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২২৭-২২৮, হিমইয়ারী, *আররাওযুল মি'তার*, পৃ : ৯১, *সিকাতু আযীযাতিল আন্দালুস*, ১/৪১ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৪৫৪।

Scanned with CamScanner

খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আলমুকতাদিরের সম্পর্ক ছিল অকৃত্রিম ও আন্তরিক। অবশ্য তিনি কেবল সামরিক কর্মকাণ্ড ও সম্প্রসারণমূলক রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই তাদের সাহায্য কামনা করতেন এবং একে অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করতেন।

(আন্দালুসের ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণাকারী) প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ রেইনহার্ট ডোজির (Reinhart Pieter Anne Dozy) লেখা হতে উদ্ধৃত করে প্রফেসর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান লিখেছেন,

> আলমুকতাদির বিন হুদ ছিলেন আপন যুগে বিভক্ত আন্দালুসের শাসকবর্গের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী শাসক। নিজেকে তিনি ক্ষমতা ও আড়ম্বরতার আচ্ছাদনে পরিবেষ্টিত রেখেছিলেন। তার রাজপ্রাসাদ ছিল বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের বিশালাকার ও জাঁকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদগুলোর একটি। তিনি সবসময় সমকালীন প্রসিদ্ধ আলিম-উলামা ও কবি-সাহিত্যিকদের একটি দল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা আবুল ওয়ালিদ আলবাজী, তার উযীর আবুল মুতাররিফ ইবনুদ দাব্বাগ প্রমুখ। স্বয়ং আলমুকতাদিরও সে যুগের বিদ্বান আলিম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি দর্শন, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে আগ্রহ রাখতেন এবং দর্শন ও গণিত বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন।[৬৫৫]

এভাবেই আলমুকতাদির আহমাদ বিন হুদ একটি সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়তে সক্ষম হন এবং আপন ক্ষমতা সুসংহত করেন। ৩৫ বছরের সুদীর্ঘ শাসনের পর ৪৭৫ হিজরীতে (১০৮১ খৃস্টাব্দে) তিনি কুকুরের দংশনে[৬৫৬] জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

---

[৬৫৫] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম*, ৩/২৮৩।

[৬৫৬] ইবনে আ'ষারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২২৯ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৭১-১৭২।

ইবনে আ'ষারী ও ইবনুল খতীব উভয়ে উল্লেখ করেছেন, মুকতাদির এমন একজন সৎ ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন, যার 'অপরাধ' কেবল এই ছিল যে, তিনি মুকতাদিরকে সদুপদেশ দিতেন এবং আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। এই নিরপরাধ লোকটিকে হত্যা করার শাস্তি হিসেবে আল্লাহ পাক তার ওপর একটি কুকুর লেলিয়ে দেন এবং তাকে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত করেন। কুকুর দংশন করার পর মুকতাদির সবসময় কুকুরের ন্যায় চিৎকার করতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তার পরিস্থিতি এমনই ছিল। আমরা আল্লাহ পাকের কাছে যাবতীয় মন্দ ও অকল্যাণকর পরিস্থিতি হতে আশ্রয় কামনা করছি।

Scanned with CamScanner

৩. ইউসুফ আলমু'তামিন বিন হুদ

পিতা সুলাইমান বিন হুদ যে ভুল করেছিলেন, সেই একই ভুলের শিকার হন পুত্র আলমুকতাদিরও। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার সাম্রাজ্যের শাসনভার তার দুই ছেলের মাঝে বণ্টন করে দেন। বড় ছেলে ইউসুফ আলমু'তামিনকে প্রদান করেন জারাগোযা ও তৎসংলগ্ন প্রদেশসমূহের দায়িত্ব আর ছোট ছেলে মুনযিরকে লারেডা, টরটোযা, দানিয়া ও মনজোন (Monzón) অঞ্চলের দায়িত্ব। ইতঃপূর্বে সুলাইমানের পুত্রদের মাঝে সাম্রাজ্য নিয়ে যেরূপ বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল, আলমুকতাদিরের পুত্রদ্বয়ের মাঝেও এবার একই ধরনের বিবাদ সৃষ্টি হয়। উভয়েই তার ভাইয়ের অধিভুক্ত অঞ্চল নিজ করায়ত্তে আনতে সচেষ্ট হন এবং ভাইকে পরাজিত করতে আপন আপন খৃস্টান মিত্রদের সাহায্য কামনা করেন। ইউসুফ আলমু'তামিন সাহায্য চান ক্যাস্টোলার খৃস্টান সেনাপতি এলসিড কম্বেডোর (El Cid El Campeador) ও তার ভাড়াটে সেনাবাহিনীর আর মুনযির সহায়তা কামনা করেন অ্যারাগোন-নৃপতি স্যাঞ্চো ও বার্সেলোনার প্রশাসক র‍্যামোনের।

৪৭৫ হিজরীতে (১০৮২ খৃস্টাব্দে) মুনযির ও তার মিত্রগণ পরপর দু'টি যুদ্ধে কঠিন পরাজয়ের শিকার হন। প্রথমটি সংঘটিত হয় লারেডা নগরীর সন্নিকটে আলম্যানার (Almenar) দুর্গের কাছে; এতে বার্সেলোনা প্রশাসক র‍্যামোন বন্দী হন। অপরটি সংঘটিত হয় টরটোযার নিকটবর্তী মোরেলা (Morella) অঞ্চলে। উভয় যুদ্ধে কম্বেডোর ইউসুফ আলমু'তামিনের আন্তরিক মিত্র হিসেবে আবির্ভূত হন।[৪৫৭]

---

[৪৫৭] ইমাম, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/২৮৫-২৮৬।

এলসিড কম্বেডোরের মূল নাম রডারিক ডি ভিগার। তিনি বারগোসের (Burgos) নিকটবর্তী ভিগার অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তার নামের অংশ এলসিড হল আরবী 'আসসায়্যিদ' শব্দের বিকৃত রূপ। তিনি যেসব মুসলিম শাসকের পক্ষে ভাড়ায় যুদ্ধ করতেন এবং বিভিন্ন সামরিক সেবা আঞ্জাম দিতেন, তারা তাকে সায়্যিদ নামে ডাকতো। আর কম্বেডোর শব্দের অর্থ 'বীর যোদ্ধা'। যুদ্ধে তার উন্নত দক্ষতা ও বীরত্বের কারণের তাকে এ নামে ডাকা হত। ক্যাস্টোলার রূপকথায় কম্বেডোরকে একজন মহান যোদ্ধা ও স্পেনের জাতীয় বীর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তার বীরত্বের বিভিন্ন কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। কম্বেডোরের কোন নীতি-আদর্শ ছিল না, ছিল না কোন ধর্মীয় চেতনাবোধ। অর্থের বিনিময়ে কখনো তিনি মুসলিম শাসকদের পক্ষে যুদ্ধ করতেন, আবার কখনো খৃস্টান শাসকদের পক্ষে। (অর্থই ছিল তার নীতি-নির্ধারক!) তৎকালীন আন্দালুসের মুসলিম ও খৃস্টান উভয় অংশে সংঘটিত বিভিন্ন বিদ্রোহ ও যুদ্ধে তার সরাসরি ভূমিকা ও হস্তক্ষেপ ছিল। দেখুন : মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ৪৫৪।

Scanned with CamScanner

আলমু'তামিন ভৌগোলিক আকর্ষণীয় অবস্থানের কারণে ভ্যালেন্সিয়া নগরীও কেড়ে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভ্যালেন্সিয়ার প্রশাসক আবু বকর বিন আবদুল আযীয আলমু'তামিনের মনোভাব গভীরভাবে লক্ষ করছিলেন। তিনি দ্রুত আলমু'তামিনের এ আকাঙ্ক্ষা দমনের পথ খুঁজে বের করেন এবং নিজ কন্যাকে আলমু'তামিনের পুত্র আহমাদ আলমুসতাঈনের কাছে বিয়ে দিয়ে কন্যাকে তার স্বামী আহমাদের কাছে জারাগোযায় পাঠিয়ে দেন। এটি ৪৭৭ হিজরীর (১০৮৪ খৃস্টাব্দের) সাতাশ রমযানের ঘটনা।[৬৫৮]

ইউসুফ আলমু'তামিনের সুখ্যাতি কেবল তার সামরিক দক্ষতা ও রাষ্ট্র সম্প্রসারণ আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত অঙ্গনেও তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। পিতা আলমুকতাদিরের ন্যায় আলমু'তামিনও গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। এসব শাস্ত্রে তার রচনাও রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'রিসালাতুল ইসতিক্মাল ওয়াল মানাযির' (رسالة الاستكمال والمناظر)। তার এ গ্রন্থটি খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাত্ত্বিক ও একাডেমিক মান বিবেচনায় গ্রন্থটিকে গণিতশাস্ত্রের আকর গ্রন্থ ইউক্লিডের (Euclid) এলিমেন্টস ও ক্লডিয়াস টলেমির (Claudius Ptolemy) অ্যালমাজেস্টির (Almagest) চেয়ে উঁচু মানের বলে গণ্য করা হয়।[৬৫৯] অধিকন্তু আলমু'তামিন কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য-আসরপ্রেমীও ছিলেন।[৬৬০]

আলমু'তামিনের শাসনামল চার বছরের বেশি দীর্ঘ হয়নি। ৪৭৮ হিজরীতে (১০৮৫ খৃস্টাব্দে) তিনি ইন্তেকাল করেন। সে বছরই আলকাদির বিন যিননূনের হাত থেকে খৃস্টানরা টলেডো দখল করে নিয়েছিল। আলমু'তামিনের মৃত্যুর মাধ্যমে জারাগোযা রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ অভিযাত্রারও সমাপ্তি ঘটে। তার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র আহমাদ আলমুসতাঈন।[৬৬১]

---

[৬৫৮] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৩০৪ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/২৮৬।

[৬৫৯] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৬৩ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/২৮৬।

[৬৬০] ইবনে সাঈদ আলমাগরিবী, *আলমুগরিব ফী হুলাল মাগরিব*, ২/৪৩৭।

[৬৬১] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ। ১৭৮, ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইয়ারা*, ২/২৪৮ ও ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৬৩।

Scanned with CamScanner

৪. আহমাদ আলমুসতাঈন বিন হুদ

ইউসুফ আলমু'তামিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র আহমাদ আলমুসতাঈন জারাগোযার শাসনভার গ্রহণ করেন। ইতিহাসে তিনি 'মুসতাঈন আলআসগার' নামে সুপরিচিত।[৬৬২] ক্ষমতা গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই মুসতাঈন সর্বপ্রথম জড়িয়ে পড়েন খৃস্টানদের আক্রমণ প্রতিরোধ সংগ্রামে; নিপতিত হন আলফোন্সোর জারাগোযা কেড়ে নেওয়ার লালসার কক্ষপথে।

৪৭৮ হিজরীতে টলেডোর পতন ঘটানোর পরই আলফোন্সো তার সেনাবাহিনী নিয়ে আলমুসতাঈনের রাজধানী জারাগোযার উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং জারাগোযা পৌঁছে নগরী অবরোধ করেন। মুসতাঈন তার সর্বস্ব দিয়ে ক্যাস্টোলার খৃস্টান বাহিনীর হামলা থেকে নিজ রাজধানী ও সাম্রাজ্য রক্ষায় প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং প্রচুর অর্থ-সম্পদ প্রদানের প্রস্তাব দিয়ে আলফোন্সোকে নিবৃত্ত রাখার জন্য সম্ভাব্য সকল দরজায় কড়া নাড়েন। কিন্তু খৃস্টানশক্তি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তাদের লক্ষ্য ছিল জারাগোযা নগরীর নিয়ন্ত্রণ, অন্য কিছুই নয়। আলফোন্সো তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তার কর্মীগণ জারাগোযার বিভিন্ন প্রান্তে ঘোষণা করে বেড়ায় যে, তিনি কেবল জনস্বার্থে (!) এখানে এসেছেন এবং পবিত্র কোরআন ও তার সুমহান শিক্ষা বাস্তবায়নই তার উদ্দেশ্য! শরীয়ত যতটুকু কর আরোপের অনুমতি দেয়, তারচে সামান্য বেশি করও তিনি জারাগোযার জনগণের ওপর আরোপ করবেন না! আর টলেডোতে তাদের মুসলিম ভাইদের সঙ্গে যেরূপ ন্যায়সঙ্গত তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করা হয়েছে, তাদের সঙ্গেও তেমন আচরণই করা হবে।

কিন্তু দীর্ঘদিন ক্যাস্টোলার খৃস্টান বাহিনী জারাগোযা অবরোধ করে রাখার পরও উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এরই মধ্যে ৪৭৯ হিজরীতে সংবাদ পৌঁছয় যে, মুসলিম আন্দালুসকে উদ্ধারের জন্য আটলান্টিকের ওপার থেকে মুরাবিতী বাহিনী আগমন করছে। এ সংবাদ পাওয়ামাত্রই আলফোন্সো দ্রুত অবরুদ্ধ মুসতাঈনের কাছে বার্তাবাহক পাঠিয়ে জানিয়ে দেন যে, তিনি মুসতাঈনের পূর্বে প্রদত্ত জিযিয়া প্রদানের

---

[৬৬২] ইবনে সাঈদ আলমাগরিবী, *আলমুগরিব ফী হুলাল মাগরিব*, ২/৪৩৭।

Scanned with CamScanner

প্রস্তাব গ্রহণ করে নিয়েছেন। অবশ্য আলফোন্সো ভালো করেই জানতেন যে, মুসতাঈন তাকে কস্মিনকালেও এক দিরহাম জিযিয়াও দেবেন না।[৬৬৩]

৪৭৯ হিজরীর রজব মাসে (১০৮৬ খৃস্টাব্দের অক্টোবরে) যাল্লাকা প্রান্তরে আন্দালুসী-মুরাবিতী সম্মিলিত বাহিনী খৃস্টানদের পরাজিত করার পর ক্যাস্টোলার খৃস্টান বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জারাগোযার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ানোর মতো শক্তি হারিয়ে ফেলে। মুসতাঈন একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে একে কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং তার পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভ্যালেন্সিয়া আক্রমণের সুযোগ সন্ধান করতে থাকেন। এজন্য তিনি ভালো-মন্দ সবধরণের পথেই চেষ্টা অব্যাহত রাখেন; কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে তিনি নির্ভর করেন কম্বেডোরের নেতৃত্বাধীন ভাড়াটে খৃস্টান সৈন্যদের উপর। তাকদীরের লিখন ছিল ভ্যালেন্সিয়া চলে যাবে কম্বেডোরের দখলে। কম্বেডোর তার সৈন্যদের নিয়ে ভ্যালেন্সিয়া ঘেরাও করেন এবং মিনজানিকের মাধ্যমে গোলা নিক্ষেপ করতে শুরু করেন। অবরুদ্ধ শহরবাসী ক্ষুধার তাড়নায় কুকুর, শব-মড়া, ইঁদুর ইত্যাদি খেতে বাধ্য হয়। এমনকি তারা নিজেদের মৃত মুসলিম ভাইয়ের লাশও ভক্ষণ করে। দীর্ঘ অবরোধে বিপর্যস্ত ভ্যালেন্সিয়াবাসী তাদের উদ্ধার করার মতো কাউকে না পেয়ে বাধ্য হয়েই রণেভঙ্গ দেয় এবং ৪৮৮ হিজরীতে কম্বেডোরের হাতে ভ্যালেন্সিয়া নগরীর পতন ঘটে। এরপর থেকে ৪৯৫ হিজরীতে আফ্রিকান মুরাবিতী বাহিনী কর্তৃক পুনরুদ্ধারের পূর্ব পর্যন্ত ভ্যালেন্সিয়া খৃস্টানদের দখলেই ছিল।[৬৬৪]

এভাবেই মুসতাঈনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আকস্মিকভাবে চতুর্দিক থেকে বিপদ ও দুর্যোগের ক্রমাগত ধারা মুসতাঈনকে ঘিরে ধরে। হঠাৎ করেই তিনি এমন দু'টি বিপদের সম্মুখীন হন, যা তার স্বপ্নকেই শেষ করে দিচ্ছিল; বরং বলা ভালো, এক্ষেত্রে সামান্য ভুল করলেই তার সাম্রাজ্য ও জীবনই হুমকির মুখে পড়ে যেত। প্রথম বিপদটি আসে উত্তর দিক থেকে প্রতিবেশী খৃস্টানদের মাধ্যমে আর দ্বিতীয়টি আসে দক্ষিণ দিক থেকে মুরাবিতী নামক মুসলমানদের নব্য শক্তির মাধ্যমে, যাদের আগমনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল পুরো আন্দালুসকে পুনরায় এক মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করা।

---

[৬৬৩] সূত্র: ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/২৮৭।

[৬৬৪] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৩০৩-৩০৬।

Scanned with CamScanner

মুসতাঈন একেকবার একেকজনের সঙ্গে মিত্রতা করে টিকে থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এরই মাঝে ৪৮৯ হিজরীর যিলকদ মাসে (১০৯৬ খৃস্টাব্দে) অ্যারাগোন-এর প্রয়াত নৃপতি স্যাঞ্চো রামেরোর (Sancho Ramírez) পুত্র প্রথম পিটার (Peter I) হুয়েস্কা নগরী অবরোধ করেন এবং সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর হুয়েস্কা নগরী দখল করে নেন। যুদ্ধে ১২ হাজারেরও অধিক মুসলিম সৈন্য নিহত হয়।

এরপর ৫০৩ হিজরীর রজব মাসে (১১১০ খৃস্টাব্দে) পিটার-পরবর্তী অ্যারাগোন-এর নৃপতি প্রথম আলফোন্সোর সঙ্গে ব্যালটিরার (Valtierra) যুদ্ধে মুসতাঈন নিহত হন।[৬৬৫]

বনু হুদের সাম্রাজ্যের পতন

মুসতাঈন বিন হুদের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুল মালিক 'ইমাদুদ্দৌলা' উপাধি ধারণ করে তার স্থলাভিষিক্ত হন। জারাগোযাবাসী তার হাতে এই শর্তে বাইয়াত গ্রহণ করে যে, তিনি খৃস্টানদের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হবেন না এবং কখনো তাদের সহায়তা কামনা করবেন না। কিন্তু বাস্তবে জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীত প্রতিফলিত হয়। আবদুল মালিকও খৃস্টানদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলে আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ জনগণ তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায় এবং ইতঃপূর্বে আন্দালুসের ফকীহগণের প্রেরিত জাতীয় আবেদনের প্রেক্ষিতে আন্দালুসে আগমনকারী মুরাবিতীদের কাছে দূত পাঠিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানায়। ৫০৩ হিজরীতে মুরাবিতী বাহিনী তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জারাগোযায় প্রবেশ করে। এর মাধ্যমে জারাগোযায় বনু হুদের শাসনব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটে এবং শুরু হয় মুরাবিতী শাসন। অবশ্য পরবর্তীতে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে পড়লে ৫১২ হিজরীর রমযান মাসে (১১১২ খৃস্টাব্দে) খৃস্টানদের হাতে জারাগোযা রাষ্ট্রের পতন ঘটে।[৬৬৬]

---

[৬৬৫] ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইরা*, ২/২৪৮ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৪/৫৫। অবশ্য ইবনুল খতীব উল্লেখ করেছেন, মুসতাঈন ৫০১ হিজরীতে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযানে শহীদ হন। দেখুন: ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৭৪ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/২৯১।

[৬৬৬] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৭৫, ইবনুল আবার, *আলহুল্লাতুস সাইরা*, ২/২৪৮ ও ইবনে খালদুন, *তারীখে ইবনে খালদুন*, ৪/১৬৩।

Scanned with CamScanner

আরেকটি তথ্য উল্লেখ করে জারাগোযায় বনু হুদের শাসনব্যবস্থার আলোচনার ইতি টানছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে বাণিজ্যিক ও পেশাগত বিনিময় প্রথা চালু করার ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্র জারাগোযার যে অনন্যসাধারণ ভূমিকা রয়েছে, তা আমাদের কিছুতেই ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। জারাগোযার নিয়ন্ত্রণে ছিল ভূমধ্যসাগরের বড় একটি অংশ। জারাগোযার বড় দুই সমুদ্রবন্দর টারাজোনা ও টরটোযা আন্দালুসে আগত বিভিন্ন বাণিজ্যকাফেলার বড় একটি অংশকে স্বাগত জানাত এবং ফ্রান্স ও ইটালির সমুদ্রবন্দরগুলোর মাধ্যমে ইউরোপীয় জাতিবর্গের কাছে তাদেরকে পৌঁছিয়ে দেওয়ার কাজ করত। বনু হুদ শাসকগোষ্ঠী এর মাধ্যমে প্রভূত সুবিধা ও মুনাফা অর্জন করত এবং খৃস্টানদের আক্রমণ প্রতিহতের ক্ষেত্রে এর বড় ভূমিকা ছিল। এ খাতে অর্জিত প্রচুর অর্থ খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোকে প্রদান করে তারা দীর্ঘ সময় খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল।[৬৬৭]

জারাগোযা রাজদরবারের বিখ্যাত কয়েকজন আলিম

বনু হুদের আমলে জারাগোযা তৎকালীন আন্দালুসের অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্রগুলোর মতোই জ্ঞানচর্চায় অগ্রসর ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশে জারাগোযা তৎকালীন বনু আব্বাদের রাজধানী সেভিল, বনু আফতাসের রাজধানী বাতালইয়ুস ও বনু যিননূনের রাজধানী টলেডোর সমকক্ষ বিবেচিত হত। দার্শনিক ইবনে বাজা, ফকীহ তুরতুশী, ক্বারী ইসমাঈল বিন খালফের ন্যায় মহান আলিমগণ বনু হুদের আমলেই জারাগোযাকে আলোকিত করে রেখেছিলেন। তাছাড়া বনু হুদের দুই শাসক মুকতাদির আহমাদ বিন হুদ ও তার পুত্র মু'তামিন ইউসুফ নিজেরাও ছিলেন স্বতন্ত্র ইলমী মর্যাদার অধিকারী। তারা উভয়েই দর্শন, গণিতবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

[৬৬৭] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/২৯৬।

Scanned with CamScanner

ফকীহ তুরতুশী রহ.

তার পুরো নাম আবু বকর মুহাম্মাদ বিন ওয়ালিদ বিন মুহাম্মাদ বিন খাল্‌ফ বিন সুলাইমান বিন আইয়ুব আলফিহরী তুরতুশী আন্দালুসী। মালেকী মাযহাবের এই বিখ্যাত ফকীহ তার আমলে 'ইবনে আবি রান্‌দাকাহ' নামে সুপরিচিত ছিলেন।[৬৬৬]

ফকীহ তুরতুশীর জন্ম ৪৫১ হিজরীতে (১০৫৯ খৃস্টাব্দে) আন্দালুসের টরটোযা নগরীতে। প্রথমে তিনি জারাগোযায় কাযী আবুল ওয়ালিদ আলবাজীর দীর্ঘ শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তার কাছে মাসাইলুল খিলাফ-এর ইলম অর্জন করেন। এরপর তিনি হজ্বের উদ্দেশ্যে সফর করেন এবং সেখানে হেজাযের বিখ্যাত মাশায়েখে কেরামের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন। তারপর ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে ইরাকে গমন করেন এবং সেখানে বসরা ও বাগদাদের তৎকালীন স্বনামধন্য মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীসের রেওয়ায়েত শ্রবণ করেন। এরপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে গমন করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে আবাস গ্রহণ করেন।[৬৬৭]

তার সম্পর্কে তার শিষ্য ইবরাহীম বিন মাহদী বিন কাল্‌ইয়ুনা মন্তব্য করেছেন, আমাদের শায়খ আবু বকরের নির্মোহতা ও ইবাদতের গুণ তার ইলমের চেয়ে অধিক ছিল।[৬৭০]

ইবনে বাশকুওয়াল তার সম্পর্কে বলেছেন,

> তিনি ছিলেন একাধারে শাস্ত্রজ্ঞ ইমাম, দুনিয়াবিমুখ, পরহেযগার, ধার্মিক, স্বভাববিনয়ী, মিতব্যয়ী, দুনিয়ার প্রতি তুচ্ছতাপ্রদর্শনকারী ও অল্পে তুষ্ট। কাযী ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আলমুআ'ফিরী তার সূত্রে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার জ্ঞান-প্রজ্ঞা, নির্মোহতা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তৎপরতার গুণের কথা আমাদেরকে শুনিয়েছেন। কাযী আবু বকর বলেছেন, আল্লামা তুরতুশী প্রায়ই আমাদেরকে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করে শোনাতেন,

---

[৬৬৬] দেখুন : ইবনে বাশকুওয়াল, *আসসিলাহ*, ২/৮৩৮ ও যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৯/৪৯০।

[৬৬৭] যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৯/৪৯০।

[৬৭০] প্রাগুক্ত, ১৯/৪৯২।

Scanned with CamScanner

إِنَّ لِلهِ عِبَادًا فُطَنًا ... طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا
نَظَرُوْا فِيْهَا فَلَمَّا عَلِمُوْا ... أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنًا
جَعَلُوْهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوْا ... صَالِحَ الْأَعْمَالِ فِيْهَا سُفُنًا

নিঃসন্দেহে আল্লাহর এমন কিছু বিচক্ষণ বান্দা আছেন, যারা দুনিয়াকে পরিত্যাগ করেছেন এবং সম্পদ-ফিতনাকে ভয় করেছেন।
দুনিয়ার বাস্তবতা নিয়ে ভাবনার পরে যখন তাদের উপলব্ধি হয়েছে যে, দুনিয়া তো জীবিতদের আবাসস্থল নয়;
তখন তারা দুনিয়াকে অতল সমুদ্ররূপে গণ্য করেছেন আর সৎকর্ম ও নেক আমলকে দুনিয়া-সমুদ্রের জাহাজরূপে গ্রহণ করেছেন।[৬৭১]

ফকীহ তুরতুশীর উল্লেখযোগ্য ও সুবিখ্যাত রচনাবলির মধ্যে আছে রাষ্ট্রনীতি ও প্রজা-পরিচালন নীতি সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থ 'সিরাজুল মুলূক'। এছাড়াও তার বিখ্যাত রচনা হল,

- মুখতাসারু তাফসীরিছ ছাআ'লিবী (مختصر تفسير الثعالبي)
- আলকিতাবুল কাবীর ফী মাসাইলিল খিলাফ (الكتاب الكبير في مسائل الخلاف)
- কিতাবুল ফিতান (كتاب الفتن)
- কিতাবুল হাওয়াদিসি ওয়াল বিদা' (كتاب الحوادث والبدع أو بدع الأمور ومحدثاتها)
- কিতাবু বিররিল ওয়ালিদাইন (كتاب برّ الوالدين)
- রিসালাতুল উদ্দাহ ইনদাল কুরূবি ওয়াশ শিদ্দাহ (رسالة العدّة عند الكروب والشدّة)
- সিরাজুল হুদা (سراج الهدى)
- কিতাবুন ফী তাহরীমি জুবুনির রূম (كتاب في تحريم جبن الروم)
- আলমুখতাসার ফী ফুরূইল মালিকিয়্যাহ (المختصر في فروع المالكية)

ফিকহে মালেকী সম্পর্কে শায়খ ইবনে আবু যায়দ আলকায়রাওয়ানীর লিখিত রিসালার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন।।
ফকীহ তুরতুশী ৬৯ বছর জীবন লাভ করেন এবং ৫২০ হিজরীতে (১১২৬ খৃস্টাব্দে) আলেকজান্দ্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।[৬৭২]

---

[৬৭১] দেখুন : ইবনে বাশকুওয়াল, *আসসিলাহ*, ২/৮৩৮ ও মাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ২/৮৭।
[৬৭২] ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৪/২৬৪।

Scanned with CamScanner

ছয়. মুসলিম আন্দালুসের অন্যান্য বিভক্ত রাষ্ট্র

এতক্ষণ আমরা যে সকল রাষ্ট্রের কথা আলোচনা করলাম, মূলত সেগুলোই ছিল বিভক্ত ও খণ্ডিত রাষ্ট্র-যুগের শক্তিধর রাষ্ট্র; যদিও স্থান-কালের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির বিচারে এসব রাষ্ট্রের শক্তি ও ক্ষমতার মধ্যে তারতম্য ছিল। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বিভক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার যুগে মুসলিম আন্দালুস এই পাঁচটি ভাগেই বিভক্ত ছিল। এক শতাব্দীরও কম সময়কাল ব্যাপ্ত এই সংক্ষিপ্ত ও সাময়িক সময়কালে এই কয়েকটি রাষ্ট্র মিলেই আন্দালুস ইতিহাসের এই বৃত্তচক্রটিকে পূরণ করেনি; বরং মুসলিম আন্দালুসে তখন আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল। বস্তুত এসব রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন শহরে প্রাধান্য বিস্তারকারী কিছু বংশ ও গোষ্ঠীর মাধ্যমে। তাদের ক্ষমতা ও স্বার্থ-চিন্তা আপন আপন শহরকে ঘিরেই সীমাবদ্ধ ছিল; রাষ্ট্র-সম্প্রসারণের কোন চিন্তা বা পরিকল্পনা তাদের ছিল না। আবার চলমান ঘটনাপ্রবাহে তাদের বিশেষ কোন ভূমিকাও ছিল না। অবশ্য এসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ছিল শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর বিবাদ ও সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু। এমনই উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রাজপরিবারের তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

নং	শাসকবংশের নাম	শাসন এলাকা	শাসনকাল	
			হিজরী	খৃস্টাব্দ
০৬	বনু যীরী	গ্রানাডা	৪০৩-৪৮৩	১০১৩-১০৯০
০৭	বনু তাহির	মুরসিয়া	৪২৯-৪৭১	১০৩৮-১০৭৮
০৮	বনু বিরযাল	কারামোনা	৪০৪-৪৫৯	১০১৩-১০৬৭
০৯	বনু ইয়াকরান	রুন্দা	৪০৬-৪৫৭	১০১৫-১০৬৫
১০	বনু দাম্মার	মুরুর	৪০৩-৪৫৮	১০১৩-১০৬৬
১১	বনু খাযরূন	আরফিশ	৪০২-৪৬১	১০১১-১০৬৮
১২	আমিরী পরিচারক	আলমারিয়া	৪০৫-৪৩৩	১০১৪-১০৪১
	বনু ছামাদিহ		৪৩৩-৪৮৪	১০৪১-১০৯১

Scanned with CamScanner

১৩	আমিরী পরিচারক	দানিয়া ও জাযাইর	৪০০-৪৬৮	১০০৯-১০৭৬
	বনু হুদ		৪৬৮-৪৮৩	১০৭৬-১০৯১
১৪	আমিরী পরিচারক	ভ্যালেন্সিয়া	৪০০-৪৭৮	১০০৯-১০৮৫
১৫	বনু উযিন	পূর্ব সান্তামারিয়া	৪০৩-৪৯৭	১০১২-১১০৪
১৬	বনু হারূন	পশ্চিম সান্তামারিয়া	৪১৭-৪৪৩	১০২৬-১০৫১
১৭	বনু কাসিম	বুরনাত	৪০০-৪৯৫	১০০৯-১১০২
১৮	বনু ইয়াহইয়া	নিয়েব্লা	৪১৪-৪৪৫	১০২৩-১০৫৩
১৯	বনু মাযিন	বাজা ও শিল্ব	৪৩২-৪৫৫	১০৪১-১০৬৩
২০	বনুল বিকরী	ওয়েলবা	৪০৩-৪৪৩	১০১২-১০৫১

এসব শাসকগোষ্ঠীর আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সভ্যতাগত উন্নয়নে এসব রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করাও সমীচীন হবে। কেননা, এসব রাষ্ট্রব্যবস্থার তত্ত্বাবধানেও আন্দালুসে অসংখ্য আলিম-উলামা, ফকীহ ও কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দানিয়া ও আলজাযায়েরের বিশিষ্ট ভাষাবিদ আবুল হাসান বিন সায়িদাহ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ভাষা-সাহিত্যের শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। মুরসিয়ায় জন্মগ্রহণ করলেও পরবর্তী সময়ে তিনি দানিয়ায় চলে আসেন। মুজাহিদ আলআমিরীর সঙ্গে তার নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক ছিল। তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'আলমুখাস্সিস' ও 'আলমুহকাম ওয়াল মুহীতুল আ'যম'। দানিয়া ও আলজাযায়েরের প্রশাসক মুজাহিদ আলআমিরীও সমকালীন খ্যাতনামা আলিম ছিলেন। ভাষা-সাহিত্য ও উলূমুল কুরআনে তার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। ওলামায়ে কেরাম তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, তিনি ছিলেন সমকালীন শাসক ও প্রশাসকদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম বীর ও কুশলী সাহিত্যিক। মুরসিয়ার প্রশাসক আবু আবদুর রহমান বিন তাহিরও সমকালীন খ্যাতনামা

Scanned with CamScanner

আলিম ছিলেন। মাজুরকা (Majorca) অঞ্চলে শ্রেষ্ঠতম আলিম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন হাফিয আলহুমাইদী। তিনি ইবনে হাযমের শিষ্য ছিলেন এবং আন্দালুসের ইতিহাস সম্পর্কে তৎকালের অন্যতম নামকরা ইতিহাসবেত্তা ছিলেন। 'জাযওয়াতুল মুক্বতাবাস ফী যিকরি উলাতিল আন্দালুস' তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

মোটামুটি এই হল বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের খণ্ডিত রাষ্ট্রগুলোর বিবরণ। কেউ কখনো বিজয়ী, কেউ পরাভূত। এসব রাষ্ট্র সরকারের সার্বক্ষণিক কাজ ছিল দু'টি; খৃস্টান শাসকদের কর প্রদান এবং আপন মুসলিম ভাইদের ভূমি দখলের প্রচেষ্টা। এসব রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রকদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে এ মুহূর্তে বিশিষ্ট আলিম ও সাহিত্যিক উযীর লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীবের মন্তব্যের চেয়ে অধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ কোন মন্তব্য মনে পড়ছে না। ইবনুল খতীব লিখেছেন,

> ভাঙন, বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে আন্দালুস যে স্তরে অবনমিত হয়েছিল, পৃথিবীর অন্য অনেক ভূখণ্ডই ততটা নিম্নগামী হয়নি। অথচ বিভক্ত এসব রাষ্ট্র ও জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান ছিল ক্রুশ পূজারীদের একেবারেই সন্নিকটে এবং মর্যাদাহানিকর অবস্থানে। শাসকদের কারোরই ছিল না খেলাফতের উত্তরাধিকার, ছিল না শাসনক্ষমতা লাভের উপযুক্ত কোন কার্যকারণ, ছিল না অতীত বীরত্ব ও সাহসিকতার খ্যাতি, নেতৃত্ব-দক্ষতা কিংবা শাসন-যোগ্যতা। ব্যাস, একটি অঞ্চল দখল করে নিয়েছেন, বড় কোন শহর অধিকার করেছেন, কিছু অর্থ-সম্পদ ও ভূখণ্ডের মালিক হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী গঠন করেছেন, বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন লকব ও উপাধি ধারণ করেছেন। সাহিত্যিকগণ তাদের গুণকীর্তনে কালি-কলম খরচ করেছেন, কবিগণ কবিতা রচনা করেছেন, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তাদের নাম ও সুনাম এবং কীর্তি আলোচনায় ব্যয় করেছেন। তাদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় দাঁড়িয়ে গেছেন শত-সহস্র সাক্ষী, তাদের প্রাসাদদ্বারে ভীড় জমিয়েছেন অসংখ্য আলিম-উলামা, তাদের করুণা কৃপায় ধন্য (!) হয়েছেন অগণিত জ্ঞানী-গুণী। আর শাসকগোষ্ঠী ব্যতিব্যস্ত থেকেছেন বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা ও নিষ্ঠুর বর্বরতায়, অনাকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যে সৈন্য

Scanned with CamScanner

সমাবেশে। তারা কেউ-ই নিজেকে বিদ্রোহী বা ন্যায়বিচ্যুত মানতে রাজী নন। অথচ তাদের প্রত্যেকের সর্বোচ্চ এতটুকু বলার অধিকার ছিল যে, আমি আমার দখলকৃত অংশ ধরে রাখব; যতক্ষণ না অন্য কেউ তার দাবিদার হয়।

(ন্যায়ের প্রতিচ্ছবি) ওমর বিন আবদুল আযীযও যদি তাদের কাছে আগমন করতেন, তারা না তাকে সাদরে গ্রহণ করতেন এবং না কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আশ্চর্যের বিষয়, এমন অবস্থাতেই তারা কাটিয়ে দিয়েছেন বছরের পর বছর; বরং পাড়ি দিয়েছেন যিন্দেগীর সফর, আর জাতির সামনে রেখে গেছেন এক অশুভ প্রহর। অবশ্য আত্মঅহঙ্কারে তাদের সামান্যও দ্বিধা ছিল না। তাই তো তারা গ্রহণ করেছেন মু'তামিদ, মু'তাযিদ, মুরতাযা, মুওয়াফ্ফাক, মুসতাক্ফী, মুসতাযহির, মুসতাঈন, মানসুর, নাসির, মুতাওয়াক্কিল প্রভৃতি উপাধি। কবি বড় চমৎকার বলেছেন,

مِمَّا يُزَهِّدُنِي فِي أَرْضِ أَنْدَلُسٍ أَسْمَاءُ مُعْتَضِدٍ فِيهَا وَمُعْتَمِدِ

أَلْقَابُ مَمْلَكَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا كَالْهِرِّ يَحْكِي انْتِفَاخًا صَوْلَةَ الْأَسَدِ

যে বিষয়টি আমাকে আন্দালুস-ভূমির প্রতি নিরাসক্ত করে দিয়েছে তা হল সেখানকার মু'তাযিদ, মু'তামিদ প্রভৃতি নাম-উপাধি।

এসব তো খলীফা-নৃপতিদের উপাধি, যা এখন অপাত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে; বিড়াল যেমন পশম স্ফীত করে সিংহের ভাব অনুকরণ করে।[৬৭৩]

এখানে এসে বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের খণ্ডিত রাষ্ট্রসমূহ, সেগুলোর উদ্ভব, সে সময়ের বিখ্যাত শাসক-গোষ্ঠীগুলোর পরিচিতি ইত্যাদির বিবরণ শেষ হল। সামনের পরিচ্ছেদে আমরা তৎকালীন আন্দালুসের বিভক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক হানাহানি ও বিভেদের চিত্র তুলে ধরতে সচেষ্ট হব ইনশাআল্লাহ।

---

[৬৭৩] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৪৪।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকবর্গের পারস্পরিক বিভেদ-হানাহানি

পূর্বের পরিচ্ছেদের আলোচনায় আমরা দেখেছি, কীভাবে মুসলিম আন্দালুসে বিভক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে এবং কীভাবে সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে আন্দালুস শাসন করা খেলাফতের সুউচ্চ মহল একটি বিধ্বস্ত স্তম্ভবিশিষ্ট ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কাঠামোতে পরিণত হয়েছে।

যদি বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকগণ আপন আপন কর্তৃত্বাধীন অঞ্চল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন, লোভ-লালসা পরিহার করে নিজ এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিমগ্ন থাকতেন, ইসলামী আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উদার চেতনামণ্ডিত হতেন, তাহলে আমাদের জন্য বিষয়টি সহজ হত; এর ফলে মুসলিম আন্দালুসে যে পরিস্থিতি তৈরি হত, তাতে মানুষ আশ্বস্ত হত এবং শান্তি ও প্রশান্তি লাভ করত। কিন্তু এসব বিদ্রোহী শাসকগণ এবং তাদের সম-মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শান্তির পরিবর্তে অশান্তি, ফিতনা, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন; প্রবৃত্তি চরিতার্থের হীন স্বার্থে অতি তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে মুসলমানদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করেছিলেন; নিজেদের দ্বীন ও ধর্মকে বিক্রি করে দিয়ে অলীক পৃথিবীর পেছনে ছুটেছিলেন; কিন্তু হারিয়েছিলেন দ্বীন-দুনিয়া উভয়ই। এ সবকিছু তারা করেছিলেন আপন দ্বীনী ভাইদের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে; বরং কখনো কখনো আপন সহোদর ভাই, আপন পিতা-ভ্রাতা-পিতৃব্য ও পুরো পরিবারকে ঘায়েল করতে।

এভাবে ব্যক্তি-স্বার্থরক্ষা ও লালসা চরিতার্থের হীন প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল স্বার্থনির্ভর বিভিন্ন দল-উপদল, স্বার্থসংশ্লিষ্ট জোট-ঐক্যজোট; এবং আশ্চর্যের বিষয়, যত দ্রুত এসব দল-উপদল গড়ে ওঠেছে, তত দ্রুতই ভাঙনও ধরেছে! মুহূর্তকালে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে জোট-ঐক্যজোট! গতকালের পরম বন্ধু ডোল পাল্টে পরিণত হয়েছে আজকের-আগামীকালের ও ভবিষ্যতের চরম শত্রুতে!

আন্দালুসের ইসলামী ভূমিতে, শত শত বছরের ইসলামী ঐতিহ্যের দেশে শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী এসব শাসকবর্গ শরীয়তবহির্ভূত হীনতা ও নীচতার

Scanned with CamScanner

সকল পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছেন। তারা শঠতা-প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়েছেন; আপন মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে সহায়তা চেয়েছেন এবং সহায়তা নিয়েছেন খৃস্টান-নাসারাদের। আন্দালুস উপদ্বীপের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর সুদৃষ্টি লাভের আশায় তাদেরকে জিযিয়া ও কর প্রদানের মতো চরম লাঞ্ছনাকর ও অবমাননাকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও তারা দ্বিধা করেননি। এভাবে মুসলিম আন্দালুস পরিণত হয়েছে পরস্পর বিবাদমান ও বিচ্ছিন্ন শাসকবর্গের সংঘাতের চারণভূমিতে। এসব সংঘাত এমন সব বিয়োগান্ত ও বেদনাদায়ক ঘটনাপ্রবাহের জন্ম দিয়েছে, যার মাঝে মুসলিম উম্মাহ নিপতিত ছিল প্রায় শতাব্দীকাল।

এক. সেভিল ও বাতালইয়ুসের মধ্যে বিরোধ

এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যকার সংঘাত ও যুদ্ধ ঔদ্ধত্য ও শক্তিপ্রদর্শনীর চরম মহড়ায় রূপ নিয়েছিল। এক্ষেত্রে পরস্পর সংলগ্ন সীমান্তরেখা যেমন বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল, তেমনই রাষ্ট্রদ্বয়ের শাসকবর্গের রাষ্ট্রসীমা বিস্তৃতির নেশা ও উন্মাদনাও এর পেছনে বিশেষভাবে দায়ী ছিল। ফলে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের সংঘটনের পূর্বেই তার কারণ নির্ণয় করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে! সেভিল-শাসক কাযী আবুল কাসেম বিন আব্বাদ ও বাতালইয়ুস-শাসক আবদুল্লাহ বিন মাসলামা আলআফতাস উভয়ে আপন আপন রাষ্ট্রের সুরক্ষা, রাষ্ট্রপরিধি বিস্তৃতি ও সকল সুযোগের সম্ভাব্য দ্রুততম সদ্ব্যবহারে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে প্রতি মুহূর্তেই ছিল যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠার আশঙ্কা। আর এ আশঙ্কা বাস্তব হতেও বেশি সময় লাগেনি।

কাযী আবুল কাসেম বিন আব্বাদ সর্বপ্রথম যে সামরিক সংঘাতের সূচনা করেছিলেন, তা ছিল বাতালইয়ুস-শাসক আবদুল্লাহ বিন মাসলামা আলআফতাসের সঙ্গে 'বাজা' নগরীর দখল নিয়ে। মূলত খেলাফতের পতন ও অঞ্চলভিত্তিক বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ-চেষ্টার সময়কাল থেকেই বাজা নগরী বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার শিকার ছিল। আর ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বিচার করলে বাজা নগরী সেভিল রাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রতিনিধিত্ব করত। ইবনে আব্বাদ ও আফতাস উভয়েই আপন আপন যুদ্ধাভিযান ও রাষ্ট্র-সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়নে বার্বারদের সহায়তা গ্রহণ করতেন। এদিকে কারামোনা-প্রশাসক মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিরযালীর

Scanned with CamScanner

সঙ্গে কাযী ইবনে আব্বাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । এই বিরযালীর চরিত্র তুলে ধরতে গিয়ে ঐতিহাসিক ইবনে হাইয়ান মন্তব্য করেছেন,

> কারামোনা দুর্গের (অধিনায়ক) ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন চলমান ফিতনার মূল কেন্দ্রবিন্দু । বহুবার তিনি কাযী ইবনে আব্বাদকে ইবনুল আফতাসের সাম্রাজ্যে হামলা করতে এবং কর্ডোভায় যুদ্ধাভিযানে বের হতে প্ররোচিত করেছেন । তারা একই সঙ্গে চতুর্দিকের সব অঞ্চলকে বশীভূত করতে চেয়েছিলেন । যখনই কোন একদিক থেকে ফিরে আসতেন, কালবিলম্ব না করে অন্য দিকে লক্ষ্য নির্ধারণ করতেন । আর এভাবেই তারা উভয়ে (ইতিহাসের পাতায়) রেখে গেছেন কিছু নিন্দনীয় প্রভাব ।[৬৭৪]

বিরযালীর সঙ্গে কাযী ইবনে আব্বাদের এ সম্পর্ক পারস্পরিক স্বার্থ বিনিময়ের সম্পর্কের চেয়ে একটুও উর্ধ্বে ছিল না । আর স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, এ ধরনের স্বার্থনির্ভর সম্পর্ক মোটেই স্থায়ী হয় না । কেননা, এ সম্পর্কের ভিত্তিমূল তো কোরআন-সুন্নাহনির্ভর নয় । আর তাই তো কত দ্রুত পরম বন্ধু চরম শত্রুতে পরিণত হয়! ইবনে আব্বাদ-বিরযালীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এ চিরন্তন নীতিই সত্যে পরিণত হয় । ইবনে আব্বাদ তার মিত্র বিরযালীর কাছ থেকে কারামোনা নগরী কেড়ে নিতে তৎপর হন । তার এ প্রচেষ্টা সফলও হত, যদি না একই সময় বার্বাররা সেভিলভূমিতে অতর্কিতে প্রবেশ করে হামলা চালাত । ৪৩১ হিজরীতে (১০৩৯ খৃস্টাব্দে) সংঘটিত বার্বারদের এ হামলা প্রতিরোধে সেভিলে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় আর তাতে কাযী ইবনে আব্বাদের পুত্র ইসমাঈল নিহত হন ।[৬৭৫]

পূর্বের কথায় ফিরে আসি । কারামোনাকে সেভিলের উত্তর-পূর্ব দুর্গ হিসেবে গণ্য করা হত । তাই এই প্রতিবেশী এলাকার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার মাঝে ইবনে আব্বাদের ব্যাপক স্বার্থ ছিল । অপরদিকে কারামোনা-প্রশাসক বিরযালীর স্বার্থও জড়িয়ে ছিল ইবনে আব্বাদের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে । কেননা, এর ফলে তিনি বহু দিন ধরে কারামোনা দুর্গ দখলে আগ্রহী ইবনে হামুদের সঙ্গে যুদ্ধে ইবনে আব্বাদের ন্যায় শক্তিশালী পক্ষের সহায়তা লাভ করবেন । যাই হোক, এ সম্পর্কের দাবিতেই কাযী ইবনে আব্বাদ বাজা নগরী দখলে আনতে তার মিত্র বিরযালীর কাছে সহায়তা

---

[৬৭৪] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৩/২০ ।

[৬৭৫] হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুকতাবাস*, ৩/৩১ ।

Scanned with CamScanner

চেয়ে দূত পাঠান। ওদিকে আবদুল্লাহ আফতাস তার পুত্র মুহাম্মাদ আলমুযাফফারকে দ্রুত বাজা প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ প্রতিপক্ষের মিত্রদ্বয়ের তুলনায় দ্রুত বাজা পৌঁছে যান এবং নগরীর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন।

কাযী ইবনে আব্বাদ তার পুত্র ইসমাঈলের নেতৃত্বে একদল সৈন্যকে কারামোনা-প্রশাসক বিরযালীর সহায়ক বাহিনীসহ বাজার উদ্দেশে প্রেরণ করেন। গন্তব্যে পৌঁছে ইসমাঈল বিন আব্বাদ বাজা নগরী অবরোধ করেন। সংবাদ পেয়ে মিরতুলা নগরীর প্রশাসক ইবনে তাইফুর অবরুদ্ধ আফতাসপুত্রকে উদ্ধারে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে এবং ব্যাপক রক্তপাত ঘটে। ইবনুল আফতাসের বাহিনীর বহু সৈন্য নিহত হয়, বন্দীও হয় অনেকে। বন্দীদের মাঝে আফতাসের পুত্র সেনাপতি মুহাম্মাদ ও তার মিত্র ইবনে তাইফুরের জনৈক ভাইও ছিল। ইবনে তাইফুরের ভাইকে ৪২১ হিজরীতে সেভিলে শূলে চড়ানো হয় আর মুহাম্মাদ বিন আফতাসকে পাঠানো হয় কারামোনায় বিরযালীর কাছে। অবশ্য কিছুদিন পরই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ছেড়ে দেওয়ার সময় বিরযালী মুহাম্মাদকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন যাওয়ার সময় কাযী ইবনে আব্বাদের সঙ্গে দেখা করে যান, যেন তাকে ছেড়ে দেওয়ার অনুগ্রহে ইবনে আব্বাদও শরীক থাকেন। মুহাম্মাদ তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'ইবনে আব্বাদের অনুকম্পা গ্রহণের তুলনায় আপনার বন্দীশালায় আটক থাকাও আমার নিকট মর্যাদাকর। সুতরাং হয় আমাকে পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিন, আর না হয় আপন অবস্থায়ই রেখে দিন।' ইবনে আবদুল্লাহ বিরযালী মুহাম্মাদ বিন আফতাসের এই কথায় অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি তার এই উন্নত চারিত্রিক মনোবলের পরিচয় পেয়ে তার প্রতি যথেষ্ট সদাচরণ করেন এবং বাতালইয়ুস পাঠানোর ব্যবস্থা করে তাকে সম্মানের সঙ্গে বিদায় জানান।[৮৭৬]

এরপর কিছুদিন উভয় রাষ্ট্রের মধ্যকার পরিস্থিতি শান্ত থাকে। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন আফতাস তার সেই দুঃসহ পরাজয়ের কথা ভুলতে পারেননি, যাতে তার পুত্র মুহাম্মাদ বন্দী হয়েছিলেন এবং বলতে গেলে নিহত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন। তিনি অধীর আগ্রহে সেই দিনটির

---

[৮৭৬] ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা*, ৩/১৯-২২।

Scanned with CamScanner

প্রহর গুনছিলেন, যেদিন নিজের ও সন্তানের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারবেন। এভাবেই কেটে যায় আরও চারটি বছর। এরই মাঝে কাযী ইবনে আব্বাদ তার পুত্র ইসমাঈলের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, যারা ইবনে আফতাসের রাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে প্রবেশ করে অভিযান পরিচালনা করে। সুযোগ পেয়ে ইবনে আফতাস ইসমাঈল বিন আব্বাদের জন্য ফাঁদ পাতেন এবং তার ফেরার পথ রুদ্ধ করে দেন। প্রচণ্ড হত্যাযজ্ঞের সম্মুখীন সেভিল বাহিনীর অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যই প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছিল। ইসমাঈল বিন আব্বাদ পালিয়ে লিসবনে চলে যান এবং সেখানেই আশ্রয় নেন। ৪২৫ হিজরীতে (১০৩৪ খৃস্টাব্দে) বনু আব্বাদ এই ভয়াবহ দুর্যোগের শিকার হয়।[৬৭৭]

এরপর কেটে যায় আরও কয়েক বছর। ৪৩১ হিজরীতে (১০৩৯ খৃস্টাব্দে) বার্বারদের হামলা প্রতিরোধে সেভিলে নিহত হন কাযী ইবনে আব্বাদের পুত্র ইসমাঈল আর ৪৩৩ হিজরীতে (১০৪২ খৃস্টাব্দে) স্বয়ং কাযী ইবনে আব্বাদও মৃত্যুবরণ করেন। তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র আব্বাদ আলমু'তাযিদ বিল্লাহ। ওদিকে আবদুল্লাহ বিন মাসলামা মারা যান ৪৩৭ হিজরীতে (১০৪৫ খৃস্টাব্দে)। তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র মুহাম্মাদ আলমুযাফফার। এভাবেই ঘৃণ্য ও নোংরা বিবাদ-কলহকে সঙ্গী করে এবং মুসলিম উম্মাহর ওপর দুর্যোগ ও দুর্বিপাক টেনে এনে পিতারা বিদায় নেন। প্রশ্ন হল, তাদের সন্তানেরা পিতাদের বিদ্বেষ ও শত্রুতার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, নাকি পিতাদের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছিলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর বড় নির্মম। ইতিহাস যে তিক্ত বাস্তবতা সংরক্ষণ করেছে, তা হল– পুত্রদ্বয় তাদের পিতাদের শাসনামলের তুলনায় আরও কঠিন ও নির্দয় পথ অবলম্বন করেছিলেন। মু'তাযিদ বিন আব্বাদ তার পিতার ৪২৫ হিজরীর ট্রাজেডির কথা ভুলতে পারেননি; মুযাফফারও পারেননি সেভিলের শত্রুতার কথা ভুলে যেতে। উভয়ের শ্লোগান ও নীতি ছিল কোরআনে উল্লিখিত সেই জাহেলী যুগের শ্লোগান ও নীতি,

﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾

আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একটা মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরা তাদেরই পদছাপ অনুসরণ করে চলছি। [সূরা যুখরুফ : ২৩]

---

[৬৭৭] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৩/২২।

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘাত আরও তীব্রতর আকার ধারণ করে। মু'তামিদ ও মুযাফফার জড়িয়ে পড়েন পারস্পরিক কঠিন সংঘাতে। মু'তামিদ নিয়েব্লার প্রশাসক ইবনে ইয়াহইয়ার কাছ থেকে নিয়েব্লার নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিতে চেষ্টা করেন। সেভিলের এ আক্রমণ প্রতিরোধে অক্ষম ইবনে ইয়াহইয়া বাতালইয়ুস-শাসক মুযাফফারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত মুযাফফার বংশানুক্রমিক এ ফিতনা থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিলেন। ইবনে ইয়াহইয়ার সাহায্যের আবেদনে তিনি বের হন এবং সেভিলে মু'তামিদের অনুপস্থিতিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে বার্বারদের একটি দলকে সেভিলে প্রেরণ করেন। তারা সেভিলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এদিকে মু'তামিদও বাতালইয়ুস ও তার প্রদেশসমূহে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেন। উভয় পক্ষের এই উন্মত্ত আচরণে উভয় রাষ্ট্রে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্বই বিলীন হওয়ার সম্মুখীন হয়।

এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে পরিস্থিতির নিরসনে দ্রুত হস্তক্ষেপ করেন কর্ডোভা-শাসক উযীর আবুল ওয়ালিদ বিন জাহওয়ার। পবিত্র কোরআনের এই চিরন্তন আদেশ অনুযায়ী তিনি বিবাদমান দু' পক্ষের মাঝে সমঝোতা তৈরিতে অগ্রসর হন-

﴿ وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ﴾

> মুসলমানদের দু'টি দল আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তবে যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যাবৎ না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। [সূরা হুজুরাত : ০৯]

ইবনে জাহওয়ার উভয় পক্ষকে সংঘাত হতে নিবৃত্ত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের জনসাধারণকে সতর্ক করতে তিনি তার নির্ভরযোগ্য দূতদেরকে তাদের কাছে প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে অতীতের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দেন। সাবধান করেন এর অশুভ পরিণতি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে। নবী মুসা আলাইহিস সালামের যুগের সেই মুমিন ব্যক্তির ন্যায় সদুপদেশ ও কল্যাণকামিতার বাণী নিয়ে বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের মাঝে আবির্ভূত হন উযীর ইবনে জাহওয়ার।

Scanned with CamScanner

কিন্তু ইবনে জাহওয়ার অনুভব করেন, তিনি যেন অটল-অনড় কিছু পাহাড়কে বিগলিত করার বৃথা চেষ্টা করছেন; তিনি যেন বধিরের ভান ধরা কিছু সাপকে বৃথাই জাগিয়ে তুলতে চাইছেন। সেভিল ও বাতালইয়ুস উভয় জাতি ভ্রান্তির ময়দানে বল্গাহীন ছুটতে থাকে। সহিংসতা ও শক্তিপ্রয়োগের ভয়াবহতায় সংঘটিত হতে থাকে বিশাল হত্যাযজ্ঞ ও বর্বর ফিতনা। উভয় পক্ষ অপর পক্ষের ভূমিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। প্রথমবার ইবনুল আফতাস পরাজিত হন। কিন্তু তিনি শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় যুদ্ধ করেন এবং মু'তাযিদকে চরমভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হন। ৪৩৯ হিজরীর (১০৪৭ খৃস্টাব্দের) এ যুদ্ধে মু'তাযিদের পক্ষের প্রচুর সৈন্য নিহত হয়।[৬৮]

এরপর ৪৪২ হিজরীতে (১০৫০ খৃস্টাব্দে) বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির ভয়াবহতা আরও ঘনীভূত হয় এবং ঘটতে থাকে আরও গুরুতর সব ঘটনা। বিগত দিনের মিত্র ইবনে ইয়াহইয়ার সঙ্গে মুযাফফার বিন আফতাসের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মুযাফফার তার মিত্র ইবনে ইয়াহইয়ার সঙ্গে প্রতারণা করেন এবং ইবনে ইয়াহইয়া ইতঃপূর্বে মু'তাযিদ বিন আব্বাদের নিয়েব্‌লা হামলার সময় নিজের অর্থ-সম্পদের যে ভাণ্ডার মিত্র মুযাফফারের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন, এখন মুযাফফার তা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানান। একে কেন্দ্র করে উভয়ের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে মুযাফফার নিয়েব্‌লায় হামলা চালান। অসহায় ইবনে ইয়াহইয়া দ্রুত মু'তাযিদের সাহায্য কামনা করেন। সংবাদ পেয়ে মু'তাযিদ একটি শক্তিশালী বাহিনী মুযাফফারের বাহিনীর মোকাবেলায় প্রেরণ করেন। মু'তাযিদ-বাহিনী আকস্মিক আক্রমণ করে মুযাফফারের বাহিনীকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং বাতালইয়ুস-বাহিনীর নেতৃস্থানীয় প্রায় দেড় শ' সৈন্যকে হত্যা করার পাশাপাশি তাদের মূল প্রতিরক্ষাশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলে।

এরপর মু'তাযিদ সেভিল থেকে আরও একটি বাহিনী প্রস্তুত করে তার পুত্র ইসমাঈল ও উযীর ইবনে সালামের নেতৃত্বে বাতালইয়ুস ও তার প্রদেশসমূহের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। এ বাহিনী ইবনে আফতাসের শাসনভূমির উত্তর অংশে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ইয়াব্‌রা নগরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ওদিকে মুযাফফার বিন আফতাস নতুন করে সৈন্যসমাবেশ ঘটান এবং তার মিত্র ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিরযালীর কাছে সাহায্য তলব

---

[৬৮] ইবনে বাস্‌সাম, *আয-যাখীরা*, ৩/৩৩-৩৪, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২০৯-২১০ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৮৪।

Scanned with CamScanner

করেন। বিরযাণী তার পুত্র ইবনুল ইষ-এর নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। মিত্র বাহিনী নিয়ে মুযাফফার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও যথেষ্ট সরঞ্জাম ছাড়াই ইবনে আব্বাদের বাহিনীর মুখোমুখি হন। ফলাফল যা হওয়ার, তা-ই হয়; রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুযাফফারের বাহিনী পরাজিত হয় এবং ইবনুল ইষ বিন ইসহাক নিহত হন। তার ও মুযাফফারের জনৈক পিতৃব্যের কর্তিত মস্তক সেভিলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মুযাফফার বিন আফতাসের সামনে পলায়ন ব্যতীত আত্মরক্ষার কোন পথ খোলা না থাকায় তিনি পালিয়ে ইয়াব্‌রার গভর্নর আবদুল্লাহ বিন খাররাযের কাছে আশ্রয় নেন। এ যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ছিল কমপক্ষে তিন হাজার।[৬৭৯]

ইয়াব্‌রায় সংঘটিত এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নিহত মুসলমানদের রক্তের দাগ না শুকোতেই এবং ইবনুল আফতাস এ শোচনীয় পরাজয়ের ধাক্কা সামলে ওঠার পূর্বেই ৪৪২ হিজরীর শেষদিকে মু'তাযিদ বিন আব্বাদ পুনরায় সৈন্যসমাবেশ ঘটান এবং ইবনে আফতাসের ভূমিতে হত্যা-লুটপাট, গৃহ-উচ্ছেদ এবং ঘর-বাড়ি ও ক্ষেত-খামারে অগ্নি-সংযোগের মাধ্যমে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকেন। পুরো রাষ্ট্রে ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। মু'তাযিদ একের পর এক বাতালইয়ুসের বিভিন্ন নগরী ও দুর্গ জয় করতে থাকেন; কিন্তু মুযাফফার কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিবর্তে আত্মরক্ষার জন্য রাজধানী বাতালইয়ুসে দুর্গের অভ্যন্তরেই অবস্থান করেন। নিজ বাহিনীর একজন সৈন্যকেও আক্রান্ত জনগণের নিরাপত্তায় প্রেরণ না করে তিনি ব্যস্ত থাকেন মিত্রদের কাছে অভিযোগ-আবদার করার। কিন্তু তার সহযোগিতায় কেউ এগিয়ে আসেনি। নিদারুণ সংকটে নিপতিত মুযাফফার বিন আফতাস যেন তার শেষ ও পতন দেখতে পাচ্ছিলেন। এরই মাঝে কর্ডোভা-শাসক উযীর আবুল ওয়ালিদ বিন জাহওয়ার চলমান সংকট নিরসনে পুনরায় উদ্যোগী হন এবং তার চেষ্টা ও মধ্যস্থতায় ৪৪৩ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে (১০৫১ খৃস্টাব্দে) উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতি ও সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়।[৬৮০]

এভাবে পরিস্থিতিকে ধ্বংসের মুখে পৌঁছিয়ে দেওয়ার পর সেভিল ও বাতালইয়ুসের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী ও প্রাণঘাতী দীর্ঘ সংঘাত শেষ হয়। এরপর আর মু'তাযিদ ও মুযাফফার কেউ-ই পূর্বের ন্যায় একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সংঘাতে জড়াননি। বরং উভয়েই এমন কোন দুর্বল শত্রুকে খুঁজে ফিরছিলেন, যাকে সহজে পরাভূত করে তার রাষ্ট্র দখল করা সম্ভব হবে।

---

[৬৭৯] ইবনে বাস্‌সাম, *আযযাখীরা*, ৩/৩৪-৩৫ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৩৪-২৩৫।

[৬৮০] ইবনে বাস্‌সাম, *আযযাখীরা*, ৩/৩৫-৩৬ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২১১-২১৩।

Scanned with CamScanner

দুই. সেভিল ও গ্রানাডার মধ্যে বিরোধ

গ্রানাডা সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল ধরে সেভিলের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ লালসার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেভিলের রাজদরবার যদিও বনু আব্বাদের তত্ত্বাবধানে জ্ঞান ও সামরিক অঙ্গনে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিল; কিন্তু গ্রানাডা রাজদরবারও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না; বরং বনু যীরীর তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় তারাও যথেষ্ট সামরিক শক্তি অর্জন করেছিল। বার্বার গোত্র বনু যীরী আন্দালুস থেকে বার্বার গোত্রসমূহকে অপসারণ ও মূলোৎপাটন করার চলমান প্রবল প্রচেষ্টার মধ্যেও দৃঢ়তার সঙ্গে টিকে ছিল এবং আপন শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে দক্ষিণ আন্দালুসের প্রদেশসমূহে নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। যেহেতু সেভিলের বনু আব্বাদ ও গ্রানাডার বনু যীরী উভয় শাসকগোষ্ঠীই সম্প্রসারণ নীতিতে সচেষ্ট ছিল, আর ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে উভয় রাষ্ট্র একে অপরের সম্প্রসারণ লক্ষ্যের কেন্দ্রমুখে অবস্থিত ছিল, তাই উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠা ছিল সময়ের ব্যাপার।

আশ্চর্যের বিষয় হল, সেভিল ও গ্রানাডার মধ্যকার সংঘাতের সূচনা এ দু' দেশের অভ্যন্তরীণ কোন অঞ্চলে হয়নি। উভয়ের মধ্যকার সংঘাতের সূচনা হয় ইসেজায় (Ecija)। ৪৩১ হিজরীতে (১০৩৯ খৃস্টাব্দে) কাযী আবুল কাসেম বিন আব্বাদ তার পুত্র ইসমাঈলের নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে প্রেরণ করেছিলেন তার বিগত দিনের মিত্র মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিরযালীর কাছ থেকে কারামোনা নগরী কেড়ে নিতে। কারামোনা অবরোধ করার পর ইবনে আব্বাদ অ্যাশজোনা ও ইসেজা দুর্গ অবরোধ করতেও উদ্যোগী হন। নিরুপায় বিরযালী এ সময় তার বার্বার ভাইদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং ইদরীস আলমুতাআইয়িদ হামুদী ও সানহাজা গোত্রের কাছে বার্তা পাঠান। বার্তা পেয়ে ইদরীস তার উপদেষ্টা ইবনে বাকান্নাহ আহমাদ বিন মুসার নেতৃত্বে একটি সহায়তা বাহিনী প্রেরণ করেন। গ্রানাডা-অধিপতি বাদীস বিন হাবুসও যুদ্ধ করতে বেরিয়ে আসেন। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সেনাপতি ইসমাঈল বিন আব্বাদ নিহত হন। তার কর্তিত মস্তক পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইদরীস আলহামুদীর কাছে।[৬৮১]

---

[৬৮১] হুমাইদী, *জাযওয়াতুল মুক্তাবাস*, ১/৩০-৩১, আবদুল ওয়াহিদ আলমারাকিশী, *আলমু'জিব ফী তালখীসি আখবারিল মাগরিব*, পৃ : ১১৩-১১৪ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯৯।

Scanned with CamScanner

গ্রানাডার বাদীস বিন হাবুসের সঙ্গে সেভিলের শাসকগোষ্ঠী বনু আব্বাদের সম্পর্ক সবসময়ই বৈরিতাপূর্ণ ছিল। উভয় পক্ষই একে অপরের লালসার লক্ষ্যবস্তু ছিল, আবার একে অপরের লালসা বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধক হয়েও দাঁড়িয়ে ছিল। উভয় শাসকের সম্প্রসারণ লক্ষ্য একই ছিল, স্বার্থও এককেন্দ্রিক ছিল। আর তাই উভয়ের মাঝে সংঘাতও ছিল সদা বিরাজমান। বনু হামুদের নিয়ন্ত্রণাধীন মালাগা ও জাযিরাতুল খাযরা অঞ্চল কেড়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে মু'তাযিদ ও বাদীসের মাঝে বিদ্যমান এ দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছয়।

৪৪৬ হিজরীতে (১০৫৪ খৃস্টাব্দে) মু'তাযিদ জাযিরাতুল খাযরা দখল করতে সক্ষম হন[৬৬২] এবং এর মাধ্যমে জাযিরায় বনু হামুদের শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে। মু'তাযিদের পরবর্তী টার্গেট ছিল মালাগা, যা পরবর্তী সময়ে ৪৪৯ হিজরীতে (১০৫৭ খৃস্টাব্দে) বাদীস দখল করে নেন।[৬৬৩] কিন্তু মালাগাবাসী বার্বারদের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাই বার্বারদের শাসন থেকে নিষ্কৃতি পেতে উদ্যোগী হয়ে গোপনে তারা সেভিল-প্রশাসক মু'তাযিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাকে মালাগায় অভিযান চালাতে উদ্বুদ্ধ করে। মু'তাযিদ তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার দু' পুত্র জাবির ও মুহাম্মাদ আলমু'তামিদের নেতৃত্বে মালাগায় উদ্দেশে বাহিনী প্রেরণ করেন। সেভিল বাহিনীর অবরোধে মালাগা যখন পতনের উপক্রম হয়, ঠিক তখনই গ্রানাডার শাসক বাদীস দ্রুত অগ্রসর হন এবং সেভিল বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড হামলা চালান। একটু পূর্বেও যে সেভিল-বাহিনী বিজয়ের অতি সন্নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল, এই হঠাৎ আক্রমণে তারা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে এবং শোচনীয় পরাজয়ের শিকার হয়। মু'তাযিদের দু' পুত্র জাবির ও মু'তামিদ পরাজয়ের গ্লানি সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে রুন্দায় চলে যান। এটি ৪৫৮ হিজরীর (১০৬৬ খৃস্টাব্দের) ঘটনা।[৬৬৪]

মালাগা কেড়ে নেওয়ার এই প্রচেষ্টায় বাদীস বিন হাবুসের কাছে পরাজিত হয়েও মু'তাযিদ হতোদ্যম হননি। তিনি সেভিল থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত বার্বার গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণাধীন কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রদেশের উদ্দেশে বাহিনী

---

[৬৬২] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৪৩।

[৬৬৩] ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৫৫ ও ৬/১৮০।

[৬৬৪] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৩/৪৯-৫০, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৭৩-২৭৫ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/১৩২।

Scanned with CamScanner

প্রেরণ করেন। প্রদেশগুলো হল : রুন্দা, কারামোনা, আরকিশ, সিডোনিয়া ও মুরূর। সেভিলবাহিনী এগুলোর মধ্য থেকে কারামোনা, রুন্দা ও মুরূর এ তিনটি প্রদেশ জয় করতে সক্ষম হয়, যেমনটি আমরা পূর্বেও উল্লেখ করে এসেছি।

এখানে যে বিষয়টি আমরা উল্লেখ করতে চাচ্ছি তা হল, আরকিশ ও সিডোনিয়া প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ ছিল বনু ইয়ারনিয়ানের হাতে। আরকিশের আমীর মুহাম্মাদ বিন খাযরূন বাদীস বিন হাবুসের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব দেন যে, তিনি বাদীসকে আরকিশ দুর্গের অধিকার প্রদান করবেন, বিনিময়ে তাকে গ্রানাডায় একটি ভূমির জায়গীর প্রদান করতে হবে, যেখানে তিনি ও তার অনুসারীরা বসবাস করবেন আর তারা বাদীসের তত্ত্বাবধানে তার বশংবদ হয়ে থাকবেন। বাদীস বিন হাবুস সানন্দে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাকে তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, অর্থ-সম্পদ নিয়ে চলে আসতে বলেন। আরকিশের আমীর সবাইকে নিয়ে প্রায় পাঁচ শ' বাহনজন্তুর এক কাফেলাসহ গ্রানাডার উদ্দেশে রওয়ানা হন। তার কাফেলায় মু'তাযিদের ঘোর শত্রু বনু বিরযালের একদল লোকও ছিল। মু'তাযিদ নিকট থেকেই সকল গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি পথিমধ্যে ওৎ পেতে থাকেন এবং কাফেলা পৌঁছতেই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বার্বাররা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং আরকিশের আমীর মুহাম্মাদ বিন খাযরূন নিহত হন। এর মাধ্যমে মু'তাযিদ তার মালাগা-পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন এবং বাদীস বিন হাবুসের কাছ থেকে আরকিশ ও সিডোনিয়া নগরী কেড়ে নিতে সক্ষম হন।[৬৮৫]

মু'তাযিদ বিন আব্বাদ ৪৬১ হিজরীতে (১০৬৯ খৃস্টাব্দে) মারা গেলে তার পুত্র মু'তামিদ আ'লাল্লাহ্ মুহাম্মাদ তার স্থলাভিষিক্ত হন। মু'তামিদও তার পিতার মতই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বাদীসের সঙ্গে তার পিতার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কথাও তার অজানা ছিল না। তাই তিনিও পিতার মতোই প্রতি মুহূর্তে গ্রানাডা রাষ্ট্র থেকে যথাসম্ভব কোন না কোন এলাকা কেড়ে নেওয়ার সুযোগ খুঁজতেন এবং গ্রানাডা-পরিস্থিতির প্রতি নিকট থেকে নজর রাখতেন। মু'তামিদ বিন আব্বাদ তার পিতা ও পূর্বপুরুষদের মতই আন্দালুসে বার্বারদের ক্ষমতা ও ক্রমবর্ধমান শক্তির কারণে আশঙ্কা অনুভব করেছিলেন।

---

[৬৮৫] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৭১-২৭৩।

Scanned with CamScanner

বিশেষত বার্বারদের সবচে' শক্তিশালী ঘাঁটি গ্রানাডার প্রতি তার শঙ্কা ও আশঙ্কা ছিল সবচে' বেশি। কারণ, ওপারের মাগরেব থেকে সমুদ্রপথে যদি মাগরেবের বার্বাররা আন্দালুসে পা রাখে, তাহলে গ্রানাডাই হয়ে তাদের প্রথম অবতরণস্থল। অধিকন্তু ততদিনে সেভিল ও গ্রানাডার আরব-বার্বার গোত্রগত দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

গ্রানাডা-শাসক বাদীস বিন হাবুসের রাজনীতি ছিল সম্পূর্ণই বার্বার গোত্রবাদী সাম্প্রদায়িকতায় পূর্ণ। কেননা, বার্বাররাই ছিল আন্দালুসের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে তার লড়াইয়ের মূল চালিকাশক্তি। অপরদিকে বার্বাররাও তার মাধ্যমে তাদের অন্যান্য শত্রুকে প্রতিহত করত। কারামোনা, মালাগা, আরকিশ, জাইয়ানসহ আন্দালুসের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের বার্বার-শাসনাধীন বিভিন্ন রাষ্ট্রের ঘটনাপ্রবাহে আমরা এই পারস্পরিক স্বার্থ নির্ভরতার বিষয়টি লক্ষ করেছি। এই সাম্প্রদায়িক প্রবণতা বাদীস বিন হাবুসের অস্থি-মজ্জায় মিশে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে ন্যায়বিমুখ করে তুলেছিল।

৪৭৫ হিজরীতে ইবনে ইয়াকুব নামক জনৈক যোদ্ধা মু'তাযিদ বিন আব্বাদের পরিকল্পনায় রুন্দা অঞ্চলের বার্বার প্রশাসক আবু নাস্‌র বিন আবু নূরকে গুপ্ত হত্যা করে। এ খবর পেয়ে বাদীস বিন হাবুসের আপাত-শান্ত সাম্প্রদায়িক ব্যাধি নতুন করে জেগে ওঠে। সংবাদ শোনামাত্র চরম উত্তেজনায় তিনি তার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলেন এবং প্রিয় পানপাত্র ছুড়ে মারেন। প্রবল উন্মাদনাবশে তিনি গ্রানাডার সকল আরব জনগণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, গ্রানাডার কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমার দিন সকল আরবকে হত্যা করা হবে।

রাষ্ট্রীয় কোন বিষয়ে তিনি তার পরামর্শক ইহুদি উযীর ইউসুফ বিন ইসমাঈল বিন নাগ্‌রালার সঙ্গে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত নিতেন না। এ বিষয়ে পরামর্শ করলে উযীর তাকে এর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করলেন। সাম্প্রদায়িক ব্যাধিতে উন্মাদে পরিণত হওয়া বাদীস তার সার্বক্ষণিক পরামর্শকের এ সুপরামর্শে কর্ণপাত করলেন না; বরং আরব প্রজাদের হত্যা করার জন্য গোপনে সৈন্যদের প্রস্তুত করলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা তার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিলেন। পূর্বেই উযীর ইবনে নাগ্‌রালা কতক মহিলার মাধ্যমে গোপনে আরব জনগণের বাড়িতে সংবাদ পৌঁছিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে জুমার নামাযের সময় মসজিদে উপস্থিত হতে নিষেধ করলেন।

Scanned with CamScanner

ফলে বাদীসের এই প্রাণঘাতী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি তার সানহাজা গোত্রীয় উযীরবৃন্দের পরামর্শে এ সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন।[৬৬৬] এভাবেই মু'তাযিদ ও তার পুত্র মু'তামিদের নেতৃত্বাধীন সেভিলের আরব গোষ্ঠী (বনু আব্বাদ ছিল আরব লাখ্‌ম বংশোদ্ভূত) ও বাদীস বিন হাবুস ও তার সানাহাজী উযীরদের নেতৃত্বাধীন গ্রানাডা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের বার্বার গোষ্ঠীর মাঝে শত্রুতা বিনিময় চলছিল। এই চরম শত্রুতার কারণে প্রতি মুহূর্তেই ছিল উভয় রাষ্ট্রের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা। কেননা, এর উৎস ছিল চরম সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা। অধিকন্তু এভাবেই বার্বার ও আরবদের কাছে মুসলমানদের রক্তপাত বৈধ বলে বিবেচিত হতে থাকে। ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের কোন মূল্যই তাদের কাছে বাকি ছিল না।

৪৬৫ হিজরীতে বাদীস বিন হাবুস মৃত্যুবরণ করেন। তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পৌত্র আবদুল্লাহ বিন বুলুককীন। অপ্রাপ্তবয়স্ক আবদুল্লাহ রাষ্ট্র পরিচালনার উপযুক্ত ছিলেন না। তাই উযীর সামাজা সানহাজী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম দেখাশোনা করতে থাকেন। সামাজা ছিলেন প্রচণ্ড জেদী ও প্রতিশোধপরায়ণ। আবদুল্লাহ বিন বুলুককীন তার ভাই তামীমকে মালাগার প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন।[৬৬৭] সেভিল-শাসক মু'তামিদ বাদীসের মৃত্যু-পরবর্তী এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে তার গ্রানাডা দখলের উপযুক্ত সময় মনে করে সৈন্যসমাবেশ ঘটান এবং জাইয়ান নগরী অভিমুখে রওয়ানা হন। ৪৬৬ হিজরীর (১০৭৪ খৃস্টাব্দের) এ অভিযানে তিনি ইবনে বুলুককীনের হাত থেকে জাইয়ানের কর্তৃত্ব কেড়ে নিতে সক্ষম হন। গ্রানাডা-শাসক আবদুল্লাহ বিন বুলুককীনের জন্য এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন আঘাত। কেননা, জাইয়ান নগরীকে গ্রানাডা সাম্রাজ্যের উত্তর অঞ্চলীয় সবচে' গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হিসেবে বিবেচনা করা হত। এরপর মু'তামিদ তার বাহিনী নিয়ে গ্রানাডায় পৌঁছে শহর অবরোধ করেন। শহরবাসীকে হামলার ভয়ে ভীত-স্বন্ত্রস্ত করতে তিনি শহরের বাইরে দুর্গ নির্মাণ করতে শুরু করেন। কিন্তু উযীর সামাজা সানহাজীর দৃঢ়তা ও সাহসিকতা এবং নগরীর নিশ্ছিদ্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থার কারণে মু'তামিদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তিনি অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হন।[৬৬৮]

---

[৬৬৬] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৩১৩-৩১৪, ইবনুল খতীব, *আলইহাতা ফী আখবারি গারনাতা*, ১/৪৩৬-৪৩৮ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/১৪০।

[৬৬৭] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ২৩৩-২৩৪।

[৬৬৮] ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ২৩৪ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/১৪২।

Scanned with CamScanner

মু'তামিদের প্রত্যাবর্তনের পর গ্রানাডা-প্রশাসক আবদুল্লাহ বিন বুলুককীন ভেবে দেখলেন, মু'তামিদ যদি আবারও তার বাহিনী নিয়ে ফিরে আসেন এবং গ্রানাডা হামলা করেন, তাহলে তা প্রতিরোধ করার সামর্থ্য তার নেই। তাই তিনি চিন্তা করলেন এবং মনস্থির করলেন। তারপর আবারও চিন্তা, আবারও মনস্থির ...

﴿إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾

(তার অবস্থা তো এই যে,) সে চিন্তা-ভাবনা করল এবং (একটি কথা) ঠিক করল। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, কিভাবে সে (এমন কথা) ঠিক করল! [সূরা মুদ্দাছছির : ১৮-১৯]

চিন্তা-ভাবনা করার পর তিনি তার উযীর সামাজা সানহাজীকে সাহায্য আবেদন করার জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কার কাছে?

ইবনে বুলুককিন তার উযীরকে ক্যাস্টোলার খৃস্টান রাজা ষষ্ঠ আলফোন্সোর কাছে পাঠান এবং মু'তামিদ বিন আব্বাদের বিরুদ্ধে তার সাহায্য কামনা করেন। বিনিময়ে অঙ্গীকার করেন বিশ হাজার দীনার জিযিয়া প্রদানের। স্বাভাবিকভাবেই আলফোন্সো এতে সম্মত হন। সমঝোতা ও মিত্রতা স্থাপনের পর আবদুল্লাহ বিন বুলুককীন গ্রানাডা বাহিনী ও ক্যাস্টোলার খৃস্টান বাহিনী নিয়ে সেভিলে হামলা করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান এবং জাইয়ানের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কাব্‌রা দুর্গ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।[৪৮৯]

৪৬৭ হিজরীতে ক্যাস্টোলা-শাসক আলফোন্সো তার আরবী বিশেষজ্ঞ উযীর ও উপদেষ্টা কেন্ট স্যানান্ডোকে সঙ্গে নিয়ে আরোপিত কর উসুলের উদ্দেশ্যে সেভিল ও গ্রানাডায় সফর করেন। কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রানাডার আমীর আবদুল্লাহ বিন বুলুককীন আলফোন্সোর অনিষ্টের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। এদিকে মু'তামিদ বিন আব্বাদ তার কাব্‌রা দুর্গের পরাজয়ের কথা তখনও ভুলতে পারেননি। তিনি এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আবদুল্লাহ বিন বুলুককীনের বিরুদ্ধে আলফোন্সোকে ক্ষেপিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন এবং আপন উযীর ইবনে আম্মারকে আলফোন্সোর নিকট পাঠান। আলফোন্সোর সঙ্গে মু'তামিদের সমঝোতা ও

[৪৮৯] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৬৩ ও ১৪২-১৪৩।

Scanned with CamScanner

মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির সারমর্ম হল, গ্রানাডার মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেভিলের মুসলিম বাহিনী ও ক্যাস্টোলার খৃস্টান বাহিনী পরস্পর একে অপরকে সহায়তা করবে; গ্রানাডা জয়ের পর শহরের অধিকার ইবনে আব্বাদের থাকবে আর শহরের সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে ক্যাস্টোলা-শাসক এবং এ সবকিছুর পরও সেভিল-শাসক ইবনে আব্বাদ পঞ্চাশ হাজার দীনার কর ক্যাস্টোলা-শাসককে প্রদান করবেন। এ চুক্তির ফলাফল তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পেতে শুরু করে। খৃস্টান বাহিনী গ্রানাডার বিস্তৃত ভূমিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর মনস্থ করে। এদিকে ইবনে আব্বাদের উযীর ইবনে আম্মারও তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেন। তিনি গ্রানাডার সন্নিকটে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সেখান থেকে হামলার মাধ্যমে গ্রানাডাবাসীর ওপর ভীতি সৃষ্টিতে তৎপর হন। কিন্তু এ সময়ই ৪৬৭ হিজরীতে (১০৭৫ খৃস্টাব্দে) টলেডো-শাসক আলমামুন বিন যিননূন সেভিল-শাসক মু'তামিদের কাছ থেকে কর্ডোভার নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইবনে আম্মার বাধ্য হন তার নবনির্মিত দুর্গ ত্যাগ করতে, যা পরবর্তী সময়ে গ্রানাডার বাহিনী দখল করে নিয়েছিল।

এরপর ইবনে আম্মার আবারও আলফোন্সোকে গ্রানাডা হামলায় প্ররোচিত করেন এবং গ্রানাডার সেনাবাহিনীর দুর্বলতা ও গ্রানাডা জয়ের সহজতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তাকে আশান্বিত করেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রানাডার শাসক আবদুল্লাহ বিন বুলুককীন নিজেই আলফোন্সোর কাছে গমন করে তার সঙ্গে সমঝোতা করার সিদ্ধান্ত নেন। পারস্পরিক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় আবদুল্লাহ বিন বুলুককীন প্রতিবছর আলফোন্সোকে দশ হাজার মিসকাল স্বর্ণ জিযিয়া প্রদান করবেন এবং জাইয়ান নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত দুর্গগুলো তাকে অর্পণ করবেন। চুক্তি সম্পন্ন হতে না হতেই মু'তামিদের সঙ্গে পূর্ব-বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে আলফোন্সো সবগুলো দুর্গ তার কাছে বিক্রি করে দেন![৬৬০]

এরপর সেভিল ও গ্রানাডার মধ্যকার সংঘাতে কিছুটা হলেও শান্তভাব সৃষ্টি হয় এবং এভাবেই কেটে যায় আরও দশটি বছর।

৪৭৭ হিজরীতে (১০৮৪ খৃস্টাব্দে) মালাগার পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে।

---

[৬৬০] এ সময়কার বিস্তারিত ঘটনাবলি জানতে দেখুন : আমীর আবদুল্লাহ বিন বুলুককীন-এর *'আততিবইয়ান'* নামক ডায়েরী, পৃ : ৬৯। (সূত্র: ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/১৪২-১৪৩।)

Scanned with CamScanner

সেখানকার আমীর তামীম বিন বুলুককীন তার ভাই আবদুল্লাহ বিন বুলুককীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেকে সার্বভৌম রাষ্ট্র মালাগার শাসক দাবি করেন এবং 'আলমুনতাসির বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন। সংবাদ জানতে পেরে আবদুল্লাহ বিন বুলুককীন দ্রুত মালাগায় পৌঁছে ভাইকে বশীভূত করতে সক্ষম হন। কিন্তু আবদুল্লাহর মনে ভয় ছিল, ভাই তামীম হয়তো মু'তামিদের সঙ্গে মিত্রতা করতে পারেন। তাই তিনি তামীমের সঙ্গে সন্ধি করেন এবং তাকে মালাগা ও তৎপার্শ্ববর্তী পশ্চিমাঞ্চলের শাসনক্ষমতা প্রদান করেন। ঠিক একই সময় গ্রানাডার আরেক অংশে আরশাজোনা বা আনতাকেরার গভর্নর কুবাব বিন তামিতও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আমীর আবদুল্লাহ সে অঞ্চলে সফর করে তাকেও বশীভূত করতে সক্ষম হন। ৪৭৭ হিজরীর শেষদিকে (১০৮৪ খৃস্টাব্দে) মু'তামিদ বিন আব্বাদ ও আমীর আবদুল্লাহ বিন বুলুককীনের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং সীমান্ত ইস্যুসহ সব ধরনের চলমান সংঘাতের বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ মিটে সমতা স্থাপিত হয়।[৬৬১]

এর কিছুদিন পরই ৪৭৮ হিজরীর সফর মাসে (১০৮৫ ঈসায়ীর মে মাসে) ষষ্ঠ আলফোন্সোর হাতে টলেডোর পতন ঘটে। উপায়ন্তর না দেখে আবদুল্লাহ বিন বুলুককীন ও মু'তামিদ বিন আব্বাদ উভয়ে আপন আপন দূতকে মাগরেবের শাসক ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে প্রেরণ করেন এবং খৃস্টশক্তির এই আকস্মিক আক্রমণ ও আন্দালুসের মুসলিম ভূমির ওপর নেমে আসা সংকট থেকে উদ্ধার পেতে তার সাহায্য কামনা করেন। হায়! এতদিন যখন তারা নিজ হাতে মুসলমানদের রক্ত-প্রবাহকে বৈধ বিবেচনা করেছিলেন এবং আপন মুসলিম ভাইদের রক্ত ঝরিয়ে নিজেদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে খৃস্টানশক্তির সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, তখন কোথায় ছিল তাদের এই জাতিপ্রীতি!

---

[৬৬১] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/১৪৪-১৪৫।

Scanned with CamScanner

তিন. সেভিল ও কর্ডোভার মধ্যে সংঘাত

মুসলিম আন্দালুসে খেলাফত-পতন পরবর্তী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টির সময়ই সেভিল ও কর্ডোভার মধ্যকার বিবাদের সূচনা হয়েছিল। আমরা লক্ষ করেছি, সেভিলের শাসকগোষ্ঠী বনু আব্বাদ সর্বদাই আশেপাশের অন্যান্য অঞ্চলের শাসকদের হাত থেকে তাদের শাসিত বিভিন্ন দুর্গ ও ভূমি কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকত। আর কাযী আবুল কাসেম বিন আব্বাদ ৪১৪ হিজরীতে সেভিলের স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকেই কর্ডোভা ছিল বনু আব্বাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। কারণ, কর্ডোভাকে আন্দালুসের প্রধান নগরী হিসেবে গণ্য করা হত। পাশাপাশি কর্ডোভা ছিল সদ্য বিলুপ্ত খেলাফতেরও কেন্দ্রভূমি। আন্দালুসের সকল অঞ্চলের মানুষের মন-প্রাণ জুড়ে ছিল কর্ডোভা-প্রীতি ও অনুরাগ। কর্ডোভাবাসী এ সবকিছু সম্পর্কেই অবগত ছিল; অবগত ছিলেন তাদের শাসক উযীর ইবনুল জাহওয়ার-ও। ইবনে আব্বাদ ও অন্যান্য শাসকগোষ্ঠীর কর্ডোভার প্রতি লালসার কথা তার ও তাদের অজানা ছিল না।

কাযী বিন আব্বাদের শাসনামলের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, যা আমরা পূর্বের পরিচ্ছেদেও উল্লেখ করে এসেছি, ৪২৬ হিজরীতে (১০৩৫ খৃস্টাব্দে) খলীফা হিশাম আলমুআইয়াদের আত্মপ্রকাশের দাবি। এর পেছনে ইবনে আব্বাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, হামুদী গোষ্ঠীর খেলাফত দাবিকে বাতিল প্রতিপন্ন করা। কেননা, এ দাবি প্রতিষ্ঠিত হলে সবাই মেনে নেবে যে, বৈধ খলীফা সেভিলে আছেন আর এর ফলে একদিকে সেভিলে কাযী ইবনে আব্বাদের শাসন-বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হবে, অপরদিকে তিনি বৈধ খলীফার নামে পুরো মুসলিম আন্দালুসে নিজের কর্তৃত্ব পরিচালনা করতে পারবেন। খলীফা নামে একজন যদিও থাকবেন; কিন্তু ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সবই থাকবে ইবনে আব্বাদের হাতে। খলীফার নামে তিনি যা ইচ্ছা তা লিখিয়ে নেবেন। বাস্তবতা হল, এ সবকিছুই বিভক্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শাসকবর্গ বিশেষত কর্ডোভার শাসক উযীর ইবনুল জাহওয়ারের অজানা ছিল না।

হিশাম আলমুআইয়াদ দাবিদার ব্যক্তির নামে সেভিলে বাইআত গ্রহণ করার পর কাযী ইবনে আব্বাদ আন্দালুসের রাষ্ট্রসমূহের প্রশাসকবর্গের কাছে দূত প্রেরণ করে তাদেরকেও খলীফা হিশামের নামে বাইআত গ্রহণ করতে এবং বৈধ খলীফার শাসন-আনুগত্য মেনে নিতে বলেন। কিন্তু ভ্যালেন্সিয়া-শাসক আবদুল আযীয বিন আবু আমির, দানিয়া ও পূর্ব আলজাযায়েরের শাসক মুওয়াফফাক আলআমিরী ও তুরতুশার প্রশাসক ব্যতীত অন্য কেউ তার

Scanned with CamScanner

আহ্বানে সাড়া দেয়নি।[৯৯২] তবে আলোচ্য প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষণীয় বিষয় হল এ ক্ষেত্রে উযীর ইবনে জাহওয়ারের অবস্থান। কেননা, তার অবস্থান একদিকে যেমন ইবনে আব্বাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, অপরদিকে স্বয়ং ইবনে জাহওয়ারের জন্যও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মুসলিম আন্দালুসে কর্ডোভার গুরুত্ব এবং বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের প্রশাসকদের মাঝে ইবনে জাহওয়ারের গুরুত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে ইবনে আব্বাদ ভালো করেই অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন, কর্ডোভার ওপর কর্তৃত্ব বিস্তারে সক্ষম হওয়ার অর্থ পুরো আন্দালুসে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারের পথ সুগম হওয়া। অপরদিকে উযীর ইবনে জাহওয়ার যদিও জানতেন যে, খলীফা হিশামের আত্মপ্রকাশের এ দাবি মিথ্যা ও বানোয়াট; কিন্তু তিনি একে হামুদীদের খেলাফত-দাবি প্রত্যাখ্যান করার একটি ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, যারা কর্ডোভাকে নিজেদের তথাকথিত খেলাফতের কেন্দ্র দাবি করে ইবনে জাহওয়ারকে ভীত-সন্ত্রস্ত রেখেছিল। ইবনে আব্বাসের সমর্থন লাভকে তিনি এই দাবি প্রত্যাখ্যানের একটি পথ হিসেবে বিবেচনা করছিলেন।

কিন্তু কর্ডোভাবাসী খলীফা হিশাম আলমুআইয়াদের আত্মপ্রকাশ-দাবিতে প্রবঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং তাকে নিজেদের তথা আন্দালুসের মুসলিম জামাতের ইমাম হিসেবে ঘোষণা করে। তারা ইবনে জাহওয়ারকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। ফলে কর্ডোভায় ইবনে জাহওয়ারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির উপক্রম হয়। বাধ্য হয়ে তিনি তার জনৈক দূতকে প্রকৃত অবস্থা যাচাইয়ের জন্য সেভিলে পাঠান। কিন্তু দূত বিশ্বাসভঙ্গ করে এবং পার্থিব সম্পদের মোহে নিজের দ্বীনকে বিক্রি করে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে। ফলে বাধ্য হয়ে ইবনে জাহওয়ার কর্ডোভা থেকে হামুদীদের দাবি প্রত্যাখ্যান, কর্ডোভাবাসীকে সন্তুষ্টকরণ এবং নিজের আত্মরক্ষার জন্য ইবনে আব্বাদের দাবিকে সত্য বলে ঘোষণা করেন। এরপর তিনি হিশাম আলমুআইয়াদ দাবিদার ব্যক্তির নামে বাইআত গ্রহণ করেন এবং কর্ডোভার কেন্দ্রীয় মসজিদ ও অন্যান্য মসজিদসমূহে খোতবায় খলীফা হিসেবে তার নাম পাঠের আদেশ জারী করেন।

অবশ্য কিছুদিন পরই ইবনে জাহওয়ার তার এই বাইআত প্রত্যাহার করে নেন এবং এ দাবিকে মিথ্যা ঘোষণা করেন। এর ফলে তার ও ইবনে আব্বাদের মাঝে যুদ্ধ-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ৪২৭ হিজরীর শুরুর দিকে ইবনে আব্বাদ তার সৈন্য-সামন্ত সমবেত করে জোরপূর্বক দখল করার লক্ষ্যে কর্ডোভার উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং গন্তব্যে পৌঁছে নগরী অবরোধ করেন।

---

[৯৯২] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯০ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৫৫।

Scanned with CamScanner

ইবনে জাহওয়ার নগরপ্রাচীরের সকল দ্বার বন্ধ রাখার আদেশ দেন। দীর্ঘদিন অবরোধ করেও কোন সুফল না পেয়ে কাযী ইবনে আব্বাদ ব্যর্থতার লাঞ্ছনা কাঁধে নিয়ে তার সৈন্যবাহিনীসহ সেভিলে ফিরে যান।[৬৯৩]

এরপর কিছুদিন সেভিল ও কর্ডোভার মধ্যকার সম্পর্ক কিছুটা শান্ত থাকে এবং কাযী ইবনে আব্বাদ ও উযীর ইবনে জাহওয়ার উভয়ে আপন আপন রাষ্ট্র-ভিত্তি মজবুতকরণ ও অন্যান্য যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। কয়েক বছর পর ৪৩৩ হিজরীতে (১০৪২ খৃস্টাব্দে) সেভিল-শাসক ইবনে আব্বাদ মৃত্যুবরণ করেন, তার স্থলাভিষিক্ত হন মু'তাযিদ বিল্লাহ। ৪৩৫ হিজরীতে (১০৪৪ খৃস্টাব্দে) কর্ডোভার শাসক ইবনে জাহওয়ারও মৃত্যুবরণ করেন, তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র উযীর আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ বিন জাহওয়ার।

এরপরও উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্বের ন্যায় শান্ত পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু আবুল ওয়ালিদ ছিলেন শান্তি ও বিলাসপ্রিয়। তাই তিনি শাসনভার ত্যাগ করে বড় পুত্র আবদুর রহমানের পরিবর্তে কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল মালিককে কর্ডোভার শাসনভার প্রদান করেন। আবদুল মালিকের সঙ্গে সেভিল-শাসক মু'তাযিদের হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। অবশ্য এটি একেবারেই সুস্পষ্ট যে, এ সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ স্বার্থনির্ভর এবং কর্ডোভা কেড়ে নেওয়ার জন্য মু'তাযিদ বলতে গেলে মুখ হাঁ করে অপেক্ষা করছিলেন। তার এই কৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল আপন মনোবাঞ্ছা পূরণ করার একটি কৌশল মাত্র।

যাই হোক, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আবদুল মালিক বিন জাহওয়ার কর্ডোভার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি মানুষের মাঝে অন্যায় ও অনাচারের শাসন শুরু করেন। পুরো কর্ডোভা রাষ্ট্রে ব্যাপক নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে অনেকটা বাধ্য হয়ে তিনি ৪৪০ হিজরীতে কর্ডোভার নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব উযীর ইবনুস সাক্কার কাছে অর্পণ করেন। দায়িত্ব পেয়েই ইবনুস সাক্কা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন এবং জনগণের সঙ্গে ন্যায়সুলভ আচরণ করতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে পুনরায় শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসে। পতনোন্মুখ কর্ডোভা আবারও তার প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

মু'তাযিদ বিন আব্বাদ অতি নিকট থেকে কর্ডোভার সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছিলেন। ইবনুস সাক্কার সুদক্ষ পরিচালনায় কর্ডোভার এই নব উত্থান তার মোটেই ভালো লাগার কথা নয়। তাই তিনি কর্ডোভা-শাসক

---

[৬৯৩] বিস্তারিত জানতে : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/১৯০, ১৯৮-২০১ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৫৫।

Scanned with CamScanner

আবদুল মালিক ও তার উযীর ইবনুস সাক্কার মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে তৎপর হন এবং উযীরের বিরুদ্ধে আবদুল মালিকের অন্তর বিষিয়ে তোলেন। ইবনে আব্বাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে আবদুল মালিক ৪৫৫ হিজরীতে (১০৬৩ খৃস্টাব্দে) তার উযীর ইবনুস সাক্কাকে হত্যা করেন।[৬৬৪]

ইবনুস সাক্কাকে হত্যা করার মাধ্যমে কর্ডোভায় আবদুল মালিকের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আবারও প্রজাদের প্রতি অন্যায় আচরণ শুরু করেন। ফলে দেশ জুড়ে আবারও বিচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। স্বেচ্ছায় শাসনভার ত্যাগকারী (আবদুল মালিকের পিতা) আবুল ওয়ালিদ বিন জাহওয়ার এ সময় হস্তক্ষেপ করেন এবং রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা দু' পুত্র আবদুর রহমান ও আবদুল মালিকের মাঝে বণ্টন করে দেন। এটি ৪৫৬ হিজরীর ঘটনা। বড় পুত্র আবদুর রহমানকে প্রদান করা হয় শুল্ক ও কর মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধান, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধান, তাদের কর্মকাণ্ডের তদারকি, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকরণ ও সকল ব্যয়খাতের তদারকির দায়িত্ব; আর আবদুল মালিককে প্রদান করা হয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধান, সেনাবাহিনীর প্যারেড-প্রদর্শনীতে অভিবাদন গ্রহণ, তাদের রেশন-বেতন-ভাতার তদারকি, বিভিন্ন অভিযানে সেনাবাহিনী প্রেরণসহ সেনাবাহিনী সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব।

শুরুতে পিতার বণ্টন উভয়ে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আবদুল মালিক তার বড় ভাইয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে গৃহবন্দী করে ফেলেন এবং পুনরায় শুরু করেন স্বেচ্ছাচারী শাসন। জনগণ আবারো তার প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।[৬৬৫]

কর্ডোভার পরম শত্রু মু'তাযিদ সবকিছুই অতি নিকট হতে প্রত্যক্ষ করছিলেন। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি কর্ডোভা পরিস্থিতি হতে চোখ সরিয়ে নেননি। আবার অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর শাসকগণ বিশেষ করে টলেডো-শাসক আলমামুন বিন যিননূনও কর্ডোভা-পরিস্থিতির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন। এককথায় আমরা বলতে পারি, কর্ডোভা তখন একই সঙ্গে সেভিল ও টলেডোর মাঝে তীব্রতর এক সংঘাতের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কেননা, কর্ডোভার ভৌগোলিক অবস্থান ছিল উভয় রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী এলাকায় এবং উভয়ের মধ্যস্থলে। সুতরাং দেখা যাক, চলমান এই সংঘাতের সমাপ্তি কার

---

[৬৬৪] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/৬০৮-৬০৯, ৭/২৪১-২৪৫ ও ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ২/২৩২-২৩৩, ২৫১।

[৬৬৫] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/৬০৬-৬০৭, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৫৮-২৫৯ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ: ১৪৯।

Scanned with CamScanner

মাধ্যমে হয় এবং শেষ পর্যন্ত কে কর্ডোভার নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পারে?! সামনের আলোচনায় আমাদের সামনে এ প্রশ্নের উত্তরই সুস্পষ্ট হবে।

আবদুল মালিকের দুঃশাসনে পুরো কর্ডোভা জুড়ে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতি আবদুল মালিক বিন জাহওয়ারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। যারা কর্ডোভা আক্রমণ করতে সদা উন্মুখ ছিল, তাদের জন্য এ সময়টি ছিল এক পরম সুযোগ। পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা টলেডো-শাসক আলমামুন বিন যিননুন কর্ডোভা হামলা করার জন্য সৈন্য সমবেত করেন এবং দ্রুত অগ্রসর হয়ে কর্ডোভায় হামলা করেন। এটি ৪৬২ হিজরীর (১০৭০ খৃস্টাব্দের) ঘটনা। আবদুল মালিক সাহায্য চাওয়ার জন্য তার মিত্র ও বন্ধু সেভিল-শাসক মু'তাযিদ-পুত্র মু'তামিদ ব্যতীত অন্য কাউকে খুঁজে পেলেন না। উল্লেখ্য, এর পূর্বে ৪৬১ হিজরীতেই সেভিলের পূর্ববর্তী শাসক মু'তাযিদ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আবেদন পাওয়ামাত্রই মু'তামিদ আবদুল মালিকের সাহায্যার্থে তার দুই সেনাপতি খালফ বিন নাজাহ ও মুহাম্মাদ বিন মারতিনের নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সেভিলের সহায়তা-বাহিনী কর্ডোভায় পৌঁছে কর্ডোভার পূর্বদিকের উপকণ্ঠে অবতরণ করে এবং আলমামুন বিন যিননূনের বাহিনীকে কর্ডোভা থেকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

এরপরই বেরিয়ে পড়ে মু'তামিদের বন্ধুত্বের আসল রূপ। মূলত মু'তামিদ পূর্ব হতেই ফন্দি এঁটেছিলেন যে, তিনি সহায়তার নামে সৈন্য পাঠিয়ে কর্ডোভার কর্তৃত্ব দখল করবেন। তিনি তার সেনাপতিদ্বয়কে পুরো পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়ে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছিলেন। কর্ডোভার পরিস্থিতিও ছিল মু'তামিদের অনুকূলে। পুরো রাষ্ট্র জুড়ে তখন অরাজকতা-বিচ্ছৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়েছিল। আবদুল মালিক বিন জাহওয়ারের ওপর ত্যক্ত-বিরক্ত কর্ডোভাবাসী মু'তামিদের সেনাপতিদ্বয়ের কাছে বার্তা পাঠিয়ে আবদুল মালিককে গ্রেফতার করতে এবং কর্ডোভার শাসনভার মু'তামিদকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করে। মু'তামিদের পূর্বপরিকল্পনা আর কর্ডোভাবাসীর চিন্তা-ভাবনা উভয় পক্ষের স্বার্থ যখন একই দিকে প্রবাহিত হল, তখন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নও সহজ হয়ে যায়। সেভিলবাহিনীর সেনাপতিদ্বয় প্রত্যাবর্তনের ভান করে সৈন্যদেরকে নিয়ে আবদুল মালিককে বিদায় জানাতে নগরীর মূল প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হয়। আর তখনই সেভিলবাহিনী বলপূর্বক নগরদ্বার দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং নগরীর নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। এরপর সেভিল-বাহিনী শহর জুড়ে লুটপাট, রাহাজানি করতে থাকে। এভাবে ৪৬২ হিজরীর শাবান মাসে (১০৭০ খৃস্টাব্দে) কর্ডোভা মু'তামিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

শাসক আবদুল মালিক বিন জাহওয়ারকে তার পরিবার ও বড় ভাই আবদুর

Scanned with CamScanner

রহমানসহ গ্রেফতার করা হয় এবং গুরুত্ব বিবেচনা করে সেভিলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর স্বেচ্ছায় শাসনক্ষমতা ত্যাগকারী সাবেক শাসক আবুল ওয়ালিদ বিন জাহওয়ারকে শালতীশ দ্বীপে (Saltes Island) নির্বাসিত করা হয়। তার সে সময়কার একটি উক্তি ইতিহাসের পাতায় আজও সংরক্ষিত আছে; তিনি দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমার বিরুদ্ধে (জনগণের) দোয়া যেমন আপনি কবুল করেছেন, আমার দোয়াও আপনি কবুল করে নিন'। এই দুর্যোগ ও ক্ষমতা-পতনের চল্লিশ দিন পরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৬৬৬]

এ সময় থেকেই কর্ডোভার ইতিহাস সেভিলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। মু'তামিদ বিন আব্বাদ তার পুত্র 'আযযাফির' উপাধি ধারণকারী হাজিব সিরাজুদ্দৌলা ও তার উযীর মুহাম্মাদ বিন মারতীনকে কর্ডোভার দায়িত্ব প্রদান করেন। আযযাফির তার পিতার নামে কর্ডোভা শাসন করতে থাকেন।

এদিকে টলেডো-শাসক আলমামুন বিন যিননূন কর্ডোভা দখলের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েও হতোদ্যম হননি। তিনি পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে ৪৬৭ হিজরীতে এক কূটকৌশলের মাধ্যমে তিনি তার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করেন। হাকাম বিন উক্কাশা নামক জনৈক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে আলমামুন যাফির বিন মু'তামিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। ইবনে উক্কাশা যাফিরের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে হত্যা করে এবং তার মস্তক শরীর হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এরপর সে তার সৈন্যদের দিয়ে নগরীর প্রবেশদ্বারগুলো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। সুর-সুরায় নিমজ্জিত সেনাপতি ইবনে মারতীনকেও সে হত্যা করে। এভাবে কর্ডোভার নেতৃত্বে আবারও পালাবদল ঘটে। কর্ডোভা চলে যায় টলেডো রাষ্ট্রের অধীনে।

৪৬৭ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে আলমামুন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে কর্ডোভায় প্রবেশ করেন। কর্ডোভায় আগমনের অব্যবহিত পরেই আলমামুন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং রোগাক্রান্ত অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেন। দাফন করার জন্য তার মৃতদেহ ৪৬৭ হিজরীর যিলক্বদ মাসে টলেডোতে নিয়ে যাওয়া হয়।

এর কিছুদিন পর কর্ডোভা আবারও মু'তামিদের দখলে চলে যায়। ৪৬৭ হিজরীরই যিলহজ্ব মাসে কর্ডোভাবাসীর বার্তা পেয়ে তিনি তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কর্ডোভায় প্রবেশ করেন এবং ইবনে উক্কাশাকে পরাভূত করে তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুত্র যাফির হত্যার প্রতিশোধ নেন। এরপর মু'তামিদ তার আরেক পুত্র 'আলমামুন' উপাধিধারী ফাত্হকে কর্ডোভায় তার স্থলাভিষিক্ত করেন।[৬৬৭]

---

[৬৬৬] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ২/৬০৯-৬১১, ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৬০-২৬১ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৪৯-১৫২।

[৬৬৭] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৩/২৬৮-২৭২, ইবনে খালদূন, *তারীখে ইবনে খালদূন*, ৪/১৫৯ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৫১-১৫২, ১৫৮-১৫৯।

Scanned with CamScanner

চার. টলেডো ও জারাগোযার মধ্যে সংঘাত

টলেডো ও জারাগোযার মধ্যকার সংঘাত ছিল অত্যন্ত সহিংস ও তীব্র। শঠতা-প্রতারণা, একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তার করতে যখন তখন খৃস্টানদের সহায়তা কামনা এবং তাদেরকে মুসলিম ভূমিতে আক্রমণে প্ররোচিত করা ইত্যাদি ছিল এ দু' রাষ্ট্রের মধ্যকার সংঘাতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, টলেডো ও জারাগোযার মধ্যকার এ সংঘাতকে আন্দালুসের ইতিহাসের নিকৃষ্টতম সংঘাত হিসেবে গণ্য করা যায়। বরং এটি ছিল ইসলামী ইতিহাসেরই দুঃখজনক এক অধ্যায় যে, খৃস্টানরা মুসলিম জাতিকে নিষ্পেষিত করেছে, মুসলমানদের ভূমিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে স্বয়ং মুসলিম শাসকদের প্ররোচনায় বরং তাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়!

বড় বেদনাদায়ক এক ইতিহাস! অশ্রুসজল ও হৃদয়বিদারক এক দাস্তান! ব্যথা ও পরিতাপের এ ইতিহাস সংকলনে নিষ্প্রাণ কলমও বুঝি বোবা কান্নায় ভেঙে পড়ে!

টলেডো-শাসক আলমামুন বিন যিননূন ও জারাগোযা-শাসক সুলাইমান বিন হুদের শাসনামলে এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চরমে পৌঁছেছিল। আত্মঘাতী এ সংঘাতের প্রবল ঝড় মুসলমানদের অস্তিত্বকেই বিনাশ করে দিচ্ছিল এবং খৃস্টানশক্তির মাঝে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ভীতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখ্য, ভৌগোলিক দিক থেকে জারাগোযা ছিল টলেডোর উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। মুসলিম আন্দালুসের উচ্চ সীমান্ত অঞ্চল জারাগোযা ও মধ্য সীমান্ত অঞ্চল টলেডোর মাঝে অবস্থিত আইয়ুব দুর্গ থেকে শুরু করে হিজারা উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন নগরী ও দুর্গ ছিল এই দুই প্রবল প্রতিপক্ষের সংঘাত-সংঘর্ষের স্থল।[৩৯৮]

হিজারা উপত্যকা যদিও টলেডোর সীমানাভুক্ত ছিল; কিন্তু সেখানকার কিছু অধিবাসী জারাগোযার শাসক সুলাইমান বিন হুদের প্রতি অনুরক্ত ছিল। সুলাইমান একে পুঁজি করে টলেডোবাসীর মাঝে বিভক্তির চিন্তাধারা সৃষ্টি করে সেখানে সহজে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ছিলেন। তার এই দুরভিসন্ধি সফলও হয়। টলেডোর জনগণের মাঝে টলেডো ও জারাগোযাকেন্দ্রিক বিভেদ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৪৩৬ হিজরীতে (১০৪৪ খৃস্টাব্দে) সুলাইমান বিন হুদ তার পুত্র ও যুবরাজ (ওলিয়ে আ'হদ) আহমাদের নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে টলেডোর উদ্দেশে প্রেরণ করেন।

---

[৩৯৮] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৯৮।

Scanned with CamScanner

সেখানকার জারাগোযাপন্থীদের পরিকল্পনামতো তারা হিজারা উপত্যকায় অবতরণ করে। এ সংবাদ পাওয়ামাত্রই মামুন জারাগোযা বাহিনীর মোকাবেলা করতে দ্রুত হিজারায় চলে আসেন। উভয় পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে প্রচুর সৈন্য হতাহত হয়। যুদ্ধে আহমাদ বিন হুদ জয়লাভ করেন এবং তিনি তার বাহিনী নিয়ে পলায়নরত আলমামুনের পশ্চাদ্ধাবন করেন। আহমাদ বিন হুদ টলেডোর পশ্চিমে টাজু (Tagus) নদীর তীরে অবস্থিত টালাবিরা (Talavera) শহরে মামুনকে অবরুদ্ধ করে তার পিতা সুলাইমানকে বিস্তারিত অবহিত করেন। সুলাইমান তার পুত্রকে আলমামুনের পশ্চাদ্ধাবন ছেড়ে দিয়ে জারাগোযায় ফিরে আসতে আদেশ করেন। পিতার আদেশ পেয়ে আহমাদ অবরোধ প্রত্যাহার করে জারাগোযায় ফিরে আসেন। এভাবে আলমামুন এক নিশ্চিত মৃত্যু থেকে মুক্তি পান।[৩৯৯]

নিঃসন্দেহে এ ঘটনা ছিল আলমামুনের জন্য এক চরম পরাজয়। কিন্তু আলমামুন এতে মোটেও হতোদ্যম না হয়ে আত্মমর্যাদাবোধে বলীয়ান হয়ে ওঠেন। হায়! আলমামুনের এই মর্যাদাবোধ যদি সৃষ্টি হত আন্দালুসের খৃস্টশক্তির বিরুদ্ধে! ব্যক্তিস্বার্থ-কেন্দ্রিক চেতনার পরিবর্তে তিনি যদি উদ্বুদ্ধ হতেন ধর্মীয় চেতনায়! কিন্তু তার গাইরাত ও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল কেবল জারাগোযার মুসলমানদের বিরুদ্ধে। মুসলমানদের রক্তের কোন মূল্যই তার কাছে ছিল না। মুসলমানদেরকেই তিনি আপন সৈন্যদের ও মিত্র খৃস্টান বাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেন! যেমনটি আমরা ইতিহাসের পরবর্তী স্তরে প্রত্যক্ষ করব।

পরাজিত মামুন মোটেও হতোদ্যম হলেন না। তার দৃঢ়তা ও সংকল্পেও কোন ভাটা সৃষ্টি হল না। সুলাইমান বিন হুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, কী করবেন? তিনি তো পরাজয়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেছেন এবং তার সেনাবাহিনী ও সামরিক শক্তির বড় একটি অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। চিন্তা-ভাবনা করার পর মামুন বিন যিননুনের ভ্রান্ত চিন্তা আপন মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের সাহায্য গ্রহণে স্থির হয়। তিনি জিযিয়া প্রদানের বিনিময়ে ক্যাস্টোলার শাসক প্রথম ফার্ডিনান্ডের সহায়তা কামনা করেন। ফার্ডিনান্ডও খুশীমনে তার প্রস্তাবে সাড়া দেন।

এরপর কিছুদিন না যেতেই খৃস্টান বাহিনী সুলাইমান বিন হুদের শাসনভুক্ত এলাকায় হত্যা, লুটপাটের মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করে। কিন্তু আক্রান্ত জনগণকে

---

[৩৯৯] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৭৭-২৭৮ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৭৭-১৭৮।

Scanned with CamScanner

রক্ষা করতে এবং খৃস্টানদের হামলা প্রতিরোধ করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। কোথায় সুলাইমান বিন হুদের বাহিনী? কোথায় সুলাইমানের দাপট ও প্রতাপ? তার প্রতাপ ও প্রতিপত্তি, ক্ষমতার দাপট ও শক্তিমত্তা কি কেবল মুসলমানদের বিরুদ্ধেই? নাকি কবির ভাষায়:

أَسَدٌ عَلَيَّ وَفِي الْحُرُوبِ نَعَامَةٌ فَرْحَاءُ تَنْفِرُ مِنْ صَفِيرِ الصَّافِرِ

কেবল আমার সাথেই তার সিংহ-বাহাদুরি, রণাঙ্গনে তো সে উটপাখির ছানার মতো দুর্বল, সাফির (Oriole) পাখির শিস শুনলেও দৌড়ে পালায়![৭০০]

খৃস্টান বাহিনীর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে সুলাইমান বিন হুদ তার বাহিনীসহ পলায়ন করেন এবং সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেন। জনগণকে ফেলে যান খৃস্টানদের কৃপাণ কৃপাতলে!

জারাগোযার মুসলমানদের জন্য এটি ছিল এক চরম দুর্যোগ ও বিপদের সময়। খৃস্টানরা আক্রমণ করেছিল তাদের ফসল কাটার মৌসুমে। বর্বর খৃস্টান বাহিনী তাদের ফসল কেটে নেয় এবং এতেই ক্ষান্ত না হয়ে ক্ষেত ও ঘর-বাড়ি ধ্বংস করতে থাকে। ইচ্ছেমতো সম্পদ লুটপাট করে তারা নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। টলেডো থেকে আলমামুনও সুযোগ পেয়ে যান তার পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের। তিনিও সুলাইমানের এলাকায় হামলা চালিয়ে ইচ্ছেমতো লুটপাট করতে থাকেন।

এতটুকু করেই মামুন নিবৃত্ত হননি; বরং এরপর তিনি সুলাইমান বিন হুদের বিরুদ্ধে সহায়তা পেতে বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের অন্যান্য শাসকবর্গের সঙ্গে মিত্রতার চুক্তি করতে উদ্যোগী হন। প্রথমে তিনি সেভিলের প্রশাসক মু'তাযিদ বিন আব্বাদের কাছে হৃদ্যতা ও মিত্রতার প্রস্তাব পাঠান। উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েকবারের আলোচনার পর মু'তাযিদ এই শর্তে তার প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, বিনিময়ে আলমামুন হিশামের খেলাফতের স্বীকৃতি দেবেন এবং হিশাম আলমুআইয়াদের নামে টলেডোতে বাইআত গ্রহণের পাশাপাশি টলেডোর মসজিদসমূহে তার নামে খলীফা হিসেবে দোয়া করার আদেশ জারী করবেন। মামুন সকল শর্ত মেনে নেন। অথচ ইতঃপূর্বে তার পিতা ইসমাঈল বিন যিননূন এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু স্বার্থের কাছে যে সকল নীতি ও আদর্শ তুচ্ছ!

---

[৭০০] পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা ইমরান বিন হাত্তান আসসাদূসী।

Scanned with CamScanner

অবশ্য সেভিলের সঙ্গে মিত্রতা চুক্তি থেকে মামুনের প্রাপ্তি ছিল শূন্য। মু'তাযিদ তাকে সাহায্য করার পরিবর্তে নিজেই বাতালইয়ুসের শাসক ইবনুল আফতাসের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ফলে মামুন তার প্রত্যাশার কিছুই পাননি।[৭০১]

এরপর সুলাইমান বিন হুদ নিজেও সেই স্খলনের শিকার হন, যার শিকার ইতঃপূর্বে আলমামুন হয়েছিলেন। তিনিও আলমামুনের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের সহায়তা কামনা করে ক্যাস্টোলার নৃপতি ফার্ডিনান্ডের কাছে প্রচুর উপহারসামগ্রী পাঠান এবং তাকে টলেডো হামলায় প্ররোচিত করেন। ফার্ডিনান্ড তার প্রস্তাবে দ্রুত সাড়া দেন এবং তার বাহিনী পাঠিয়ে টলেডোতে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটান। খৃস্টান বাহিনী হিজারা উপত্যকা ও হিনারিস দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

আলমামুন এতে হতোদ্যম না হয়ে নাফারের নৃপতি গার্সিয়ার সহায়তা প্রার্থনা করেন। গার্সিয়া ছিলেন ক্যাস্টোলার নৃপতি ফার্ডিনান্ডের ভাই। উভয়ের মধ্যে পূর্ব থেকেই রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বিরোধ ও শত্রুতা ছিল। আলমামুন গার্সিয়ার কাছে উপঢৌকন পাঠিয়ে সুলাইমানের বিরুদ্ধে তার সামরিক সহায়তা কামনা করেন। গার্সিয়ার বাহিনী জারাগোযার ভূমিতে টুডেলা (Tudela) ও ওয়াশকার মধ্যবর্তী এলাকায় হামলা চালায় এবং টুডেলা সীমান্তের কালাবেরা দুর্গ জয় করে নেয়। আলমানসুর বিন আবু আমির তার শাসনামলে যে দুর্গটি জয় করেছিলেন, ৪৩৭ হিজরীতে এসে (১০৪৫ খৃস্টাব্দে) তা খৃস্টানদের দখলে চলে যায় এবং দুর্গের অভ্যন্তরে তারা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

এভাবেই আলমামুন ও সুলাইমান এই দুই শাসকের স্বেচ্ছাচারিতার বলি হতে থাকে টলেডো ও জারাগোযাবাসী। ক্যাস্টোলা ও নাফারের খৃস্টানশক্তি টলেডো ও জারাগোযার মুসলিম অধ্যুষিত ভূমিতে ইচ্ছেমতো ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। তাদের উভয়ের অশুভ ও নিন্দিত প্রচেষ্টার কারণে মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং মুসলমানগণ অবর্ণনীয় দুর্যোগের শিকার হয়। নিরুপায় হয়ে টলেডোবাসী তাদের গণমান্য ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধিদল জারাগোযার শাসক সুলাইমান বিন হুদের কাছে প্রেরণ করে সন্ধি প্রার্থনা করে এবং খৃস্টানদের সাগপাশ থেকে মুসলিম ভূমিকে রক্ষায় এ জাতীয় আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড পরিহারের অনুরোধ জানায়। এরপর উভয় শাসক বাহ্যিকভাবে সন্ধি ও সমঝোতার ভান করেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই সুলাইমান টলেডোবাসী ও আলমামুনের সঙ্গে কৃত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ

---

[৭০১] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৭৮-২৭৯ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৭৮।

Scanned with CamScanner

করেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের দু'জনের কেউ-ই সন্ধি ও শান্তি অবস্থা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না ; শত্রুতা যে তাদের শিরা-উপশিরায় মিশে গিয়েছিল!
সুলাইমান তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে টলেডো রাষ্ট্রের অধিভুক্ত সালিম নগরীর উদ্দেশে অভিযানে বের হন। সঙ্গে তার মিত্র খৃস্টানদের সহযোগী বাহিনী। সালিম নগরীর প্রতিরক্ষা বাহিনী সুলাইমান বাহিনীর মোকাবেলা করলেও নগরী রক্ষায় ব্যর্থ হয় এবং প্রচুর সৈন্য নিহত হয়। আলমামুন ইতঃপূর্বে যেসব দুর্গ কেড়ে নিয়েছিলেন, সুলাইমান এবারের অভিযানে সেগুলোর ওপর নতুন করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এসব অভিযানে সুলাইমানকে সহায়তা করেন আলমামুনের ভাই আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল বিন যিননূন। তিনি আলমামুনের শাসনাধীন অঞ্চলের কোন কোন এলাকাগুলো অরক্ষিত বা নিরাপত্তাব্যবস্থা দুর্বল, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সুলাইমানকে জানিয়ে দেন। আলমামুন যখন সুলাইমানের হামলার সংবাদ জানতে পারেন, তখন দ্রুত এসব শহর পুনরুদ্ধার ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মজবুত করতে টলেডো ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। সুলাইমানের মিত্র ফার্ডিনান্ড যখন দেখতে পান যে, আলমামুন টলেডোতে নেই, তিনিও সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং কয়েকটি বাহিনী পাঠিয়ে টলেডোর মাটিতে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালান। অসহায় টলেডোবাসী বাধ্য হয়ে ফার্ডিনান্ডের কাছে সন্ধি ও শান্তিচুক্তির দরখাস্ত করে। প্রত্যুত্তরে ফার্ডিনান্ড প্রচুর অর্থ-সম্পদ দাবি করেন এবং এমন কিছু শর্ত আরোপ করেন, যা টলেডোবাসীর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তারা ফার্ডিনান্ডকে উত্তর পাঠান, যদি আমরা এ পরিমাণ অর্থ-সম্পদ দিতে পারতাম এবং এসব দাবি মেনে নিতে পারতাম, তাহলে তো আমরা মাগরেবের বার্বারদের জন্যই এ অর্থ ব্যয় করতাম এবং এ সমস্যা থেকে উদ্ধার পেতে তাদেরই শরণাপন্ন হতাম।
টলেডোবাসীর বার্তার প্রত্যুত্তরে ফার্ডিনান্ড বলেন, দেখ, বার্বারদের তলব করার হুমকি তোমরা আমাদেরকে বহুবার শুনিয়েছ। এমন হুমকি তোমরা বহুবারই দিয়েছ। কিন্তু বাস্তবে তা তোমরা কোনদিনই পারবে না। কেননা, তাদের সঙ্গে তোমাদের রয়েছে বিদ্বেষ ও শত্রুতা। তোমাদের পক্ষে কে আসবে-না আসবে, তাকে আমাদের কোন পরোয়া ও ভ্রুক্ষেপ নেই; আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় থেকেছি ও থাকব। অতীতে তোমরা আমাদের এই দেশে পা রেখে আমাদের পরাভূত করে আমাদের ভূমি দখল করে নিয়েছিলে। আমরা আমাদের ভূমি ফিরে পেতে চাই। এতদিন তোমাদের ভাগ্যে ছিল বলে তোমরা নিশ্চিন্তে এ ভূমিতে বসবাস করেছ। এখন তোমাদের নিকৃষ্টতা ও দোষের কারণে আমরা তোমাদের ওপর বিজয়ী

Scanned with CamScanner

হয়েছি। সুতরাং সাগর পাড়ি দিয়ে তোমরা তোমাদের পারে (অর্থাৎ মাগরেব ভূমিতে) চলে যাও এবং আমাদের দেশ আমাদের জন্য ছেড়ে দাও। আজকের পর থেকে আমাদের সঙ্গে আমাদের ভূমিতে বাস করে তোমরা এক মুহূর্তের জন্যও কল্যাণ বা শান্তি পাবে না। আর মহান প্রভু আমাদের ও তোমাদের এই লড়াইয়ের একটি ফয়সালা করার পূর্বে আমরা তোমাদের ছেড়ে ফিরেও যাব না।[৭০২]

হায়! কত নির্মম ও অবমাননাকর ছিল ফার্ডিনান্ডের এই উত্তর! আন্দালুসের মুসলমানদের জন্য চরম অবমাননাকর এ উত্তর যদি তিনি না দিতেন!

এভাবে টলেডোবাসী খৃস্টানশক্তির কাছে সন্ধির প্রস্তাব রেখেও ব্যর্থ হয়। ওদিকে আলমামুনের মিত্র গার্সিয়া ও তার সৈন্যদল সুলাইমান বিন হুদের সাম্রাজ্যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। পরবর্তী তিন বছর অর্থাৎ ৪৩৫ হিজরী হতে ৪৩৮ হিজরী (১০৪৩-১০৪৬ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য অভিশপ্ত এ দুই শাসকের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং ক্ষতিকর প্রভাব অব্যাহত থাকে। অবশেষে জারাগোযা-শাসক সুলাইমান বিন হুদের মৃত্যুতে এ অবস্থার অবসান ঘটে এবং আলমামুন বিন যিননূন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।[৭০৩]

টলেডো ও জারাগোযা! সুলাইমান বিন হুদ ও আলমামুন বিন যিননূন! মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে সংঘাত ও আত্মঘাতী যুদ্ধের এক দুঃখজনক অধ্যায়ের নাম! এ সংঘাতকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল মুসলিম আন্দালুসের বিভক্ত শাসকবর্গের শাসনামলে মুসলমানদের জন্য এক অভিশপ্ত কাল।

সুলাইমান বিন হুদের মৃত্যুর পর কিছুদিন উভয় রাষ্ট্রের পরিস্থিতি শান্ত থাকে। এ সময় প্রয়াত শাসক সুলাইমানের পাঁচ পুত্র তাদের পিতার রেখে যাওয়া রাজত্ব নিয়ে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে মুকতাদির বিল্লাহ আহমাদ বিন হুদ তার ভাইদের পরাভূত করে একক প্রতিপত্তি বিস্তারে সক্ষম হন। ৪৫২ হিজরীতে (১০৬০ খৃস্টাব্দে) তিনি তুরতুশা-কে তার সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত করেন। এর ফলে জারাগোযা সাম্রাজ্য বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।[৭০৪] এরপর ৪৬৮ হিজরীতে (১০৭৬ খৃস্টাব্দে) তিনি তার জামাতা আলী ইকবালুদ্দৌলার শাসনাধীন দানিয়া নগরী

---

[৭০২] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৮২।

[৭০৩] বিস্তারিত জানতে : ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৭৭-২৮৩, ইবনুল খত্বীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৭৮ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৯৮-১০১।

[৭০৪] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৫০।

Scanned with CamScanner

অবরোধ করে তাও কেড়ে নিতে সক্ষম হন।[১০৫] এবার জারাগোযা পরিণত হয় বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের সবচে' বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে।

অপরদিকে আলমামুনও আশেপাশের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে জয় করে নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন। তিনি পূর্বে ভ্যালেন্সিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল শক্তিশালী এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। এর কিছুদিন পরই তেত্রিশ বছরের শাসনামল শেষে ৪৬৭ হিজরীতে (১০৭৫ খৃস্টাব্দে) কর্ডোভায় আলমামুনের মৃত্যু হয়। টলেডো ও সংলগ্ন অঞ্চলসমূহের শাসনভার গ্রহণ করেন আলমামুনের পৌত্র ইয়াহইয়া আলকাদির।

টলেডোর নতুন শাসক ইয়াহইয়া তার পিতামহ মামুনের ন্যায় সামরিক ও রাজনৈতিক দক্ষতার অধিকারী ছিলেন না। রাষ্ট্র পরিচালনা করার মতো যথেষ্ট বিবেচনা-বোধ, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা তার ছিল না। ভৃত্য-পরিচারক, রাজপরিবারের নারী ও অসৎ সঙ্গীদের কথায় তিনি পরিচালিত হতে থাকেন। তারা তাকে বিভিন্ন কুবুদ্ধি দিতে থাকে এবং তার উপদেষ্টা ও পরামর্শক উযীর ইবনুল হাদীদীর বিরুদ্ধে তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে। এদের প্ররোচনাতেই ৪৬৮ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে তিনি তাকে হত্যা করেন, যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতঃপূর্বে তুলে ধরেছি।

রাষ্ট্রের প্রধান পরামর্শক গত হওয়ার পরই এতদিনের অতি আপনজনেরা ইয়াহইয়ার চরম শত্রুতে পরিণত হয় এবং জনসাধারণকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। এমতাবস্থায় ইয়াহইয়া চরম অসহায় হয়ে পড়েন। জারাগোযা-শাসক মুকতাদির বিন হুদ একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে দ্রুত সৈন্যসমাবেশ ঘটান এবং মিত্র খৃস্টান বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে টলেডোর বিভিন্ন প্রদেশে আক্রমণ করেন। ইয়াহইয়া কাদির বিন যিননূন এ আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন। ফলে মুকতাদির বিন হুদ তার কাছ থেকে সান্তাবরিয়া (Celtiberia) নগরী কেড়ে নিতে সক্ষম হন।[১০৬]

এরপর অতি দ্রুত টলেডো ও জারাগোযা উভয় রাষ্ট্রের পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ষষ্ঠ আলফোন্সো এ সময় মুসলিম আন্দালুসের বিভক্ত রাষ্ট্রগুলোর ওপর কঠিন হামলা চালান এবং কখনো কর আরোপ করে, কখনো একের পর এক অব্যাহত আক্রমণ করে বিভক্ত রাষ্ট্রগুলোকে পুরোপুরি দুর্বল ও বিধ্বস্ত করে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে টলেডোতে ইয়াহইয়ার অবস্থা ছিল বড় শোচনীয় ও দুর্বল। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে

---

[১০৫] প্রাগুক্ত, ৩/২২৮।

[১০৬] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/১০৮।

Scanned with CamScanner

উঠেছিল। এ কারণে ৪৭২ হিজরীতে তিনি টলেডো থেকে পালিয়ে ওয়াবজা দুর্গে আশ্রয় নেন। অবশ্য কিছুদিন পরই তিনি আলফোন্সোর সহায়তায় পুনরায় টলেডোর ক্ষমতা ফিরে পেতে সক্ষম হন এবং এর কিছুদিন পরেই টলেডো থেকে চরম লাঞ্ছিত ও পরাজিত অবস্থায় বের হয়ে যেতে বাধ্য হন। আলফোন্সোর হাতেই ৪৭৮ হিজরীর সফর মাসে (১০৮৫ খৃস্টাব্দে) টলেডোর পতন ঘটে এবং টলেডোবাসীর ওপর নেমে আসে চরম দুর্যোগ। ক্যাস্টোলার খৃস্টান বাহিনীর ছত্রচ্ছায়ায় ৪৭৮ হিজরীর শাওয়াল মাসে ইয়াহইয়া আলকাদির ভ্যালেন্সিয়ায় চলে যান।

তার জ্ঞাতসারেই খৃস্টান বাহিনী নির্বিচারে মুসলমানদের হত্যা করতে থাকে, ধ্বংস করে ঘর-বাড়ি, জনপদ। কিন্তু ইয়াহইয়ার অন্তরে তাতে সামান্য স্পন্দনও সৃষ্টি হয়নি। এই চরম দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই ভ্যালেন্সিয়ায় মাগরেব থেকে মুরাবিতী বাহিনীর আন্দালুসে আগমনের সংবাদ এসে পৌঁছয়। আন্দালুসী-মুরাবিতী সম্মিলিত বাহিনীর হামলা থেকে রক্ষা পেতে ভ্যালেন্সিয়ার খৃস্টানরা দ্রুত আলফোন্সোর কাছে ছুটে যায়। যাল্লাকা প্রান্তরে ৪৭৯ হিজরীর রজব মাসে (১০৮৬ ঈসায়ীর অক্টোবর মাসে) সংঘটিত হয় উভয় পক্ষের প্রবল যুদ্ধ, যাতে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। খৃস্টানদের বিতাড়ন ও মুসলিম বাহিনীর জয়ে ভ্যালেন্সিয়াবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সমর্থ হয়। আর এভাবেই ইয়াহইয়া আলকাদিরের সাম্রাজ্য টলেডো থেকে স্থানান্তরিত হয় ভ্যালেন্সিয়ায়।

অপরদিকে জারাগোযায় ৩৫ বছর শাসন করার পর আলমুকতাদির আহমাদ বিন হুদ ৪৭৫ হিজরীতে (১০৮১ খৃস্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন। এরপর মুকতাদিরের দুই পুত্র ইউসুফ ও মুনযির পিতার সিংহাসন দখল করা নিয়ে পরস্পর সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন এবং উভয়ে আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের সহায়তা গ্রহণ করেন। ইউসুফ সাহায্য গ্রহণ করেন এলসিড কম্পেডোর (El Cid El Campeador) ও তার নেতৃত্বাধীন ক্যাস্টোলার ভাড়াটে সৈনিকদের আর মুনযির সাহায্য গ্রহণ করেন অ্যারাগোন-এর শাসক স্যাঞ্চো ও বার্সেলোনা-প্রশাসক র‍্যামোনের।

ইউসুফ আলমু'তামিনের জারাগোযার নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে এ সংঘাতের সমাপ্তি ঘটে। মুনযির লারেডা ও তুরতুশায় আপন বিচরণ সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হন। এরপর ইউসুফ ভ্যালেন্সিয়ার দিকে তার রাষ্ট্রসীমা বিস্তৃতিতে সচেষ্ট হন; কিন্তু ভ্যালেন্সিয়া-প্রশাসক আবু বকর বিন আবদুল আযীযের দৃঢ়তার কারণে তিনি ভ্যালেন্সিয়া দখল করতে ব্যর্থ হন। আবু বকর বিন

Scanned with CamScanner

আবদুল আযীয যখন দেখতে পান যে, ইউসুফের দৃষ্টি ভ্যালেন্সিয়ামুখী এবং প্রবল প্রতিপক্ষের সামনে তিনি টিকে থাকতে পারবেন না, তখন তিনি সমঝোতা ও সুসম্পর্কের পথে অগ্রসর হন এবং ইউসুফের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করেন। ৪৭৭ হিজরীতে তিনি তার মেয়েকে ইউসুফের পুত্র আহমাদ আলমুসতাঈনের কাছে বিয়ে দেন। এ কারণে ভ্যালেন্সিয়া জয়ের স্বপ্ন পূরণ না করেই ইউসুফ আলমু'তামিন ৪৭৮ হিজরীতে (১০৮৫ খৃস্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন। তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র আহমাদ আলমুসতাঈন।

টলেডো ও জারাগোযা পরিস্থিতি এভাবেই অগ্রসর হতে থাকে। যাল্লাকার যুদ্ধের কারণে ৪৭৯ হিজরীতে ক্যাস্টোলার খৃস্টান বাহিনী টলেডো থেকে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে আহমাদ বিন হুদ নতুন করে আবারও টলেডোর অধীনস্থ বাকি অঞ্চলগুলো দখল করার মাধ্যমে তার পূর্বতন বনু হুদের শাসকবর্গের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়ে যান। এদিকে তার পিতৃব্য মুনযিরও এ সময় ভ্যালেন্সিয়া দখলের সুযোগ খুঁজছিলেন।

৪৮১ হিজরীতে (১০৮০ খৃস্টাব্দে) মুনযির তার বাহিনী নিয়ে ভ্যালেন্সিয়া অবরোধ করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে ভ্যালেন্সিয়ার শাসক ইয়াহইয়া আলকাদির দ্রুত তার মিত্র আহমাদ আলমুসতাঈনের সহায়তা কামনা করেন। আহমাদ তো এ সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। মিত্রকে সাহায্যের নাম করে প্রকৃতপক্ষে ভ্যালেন্সিয়া দখলের উদ্দেশ্যে তিনি দ্রুত তার বাহিনী নিয়ে ইয়াহইয়ার আহ্বানে সাড়া দেন। সঙ্গে নেন তার 'পরীক্ষিত' খৃস্টান মিত্র কম্বেডোর ও তার ভাড়াটে সৈন্যদের।

এরপর অতি অল্প সময়ে দ্রুত পট পরিবর্তন হতে থাকে। ভাতুষ্পুত্রের আগমনের সংবাদ পাওয়ামাত্র মুনযির অবরোধ তুলে নেন এবং ইয়াহইয়ার কাছে মিত্রতা ও বন্ধুত্বের প্রস্তাব পাঠান। এদিকে আহমাদ ও তার সঙ্গী কম্বেডোরের মধ্যে শুরু হয় নতুন তামাশা। তারা একে অন্যের সঙ্গে কৌশলের খেলা খেলতে শুরু করেন। উভয়ের মিত্রতা শেষ হয়ে যায় এবং উভয়েই যে সাহায্যের নাম করে মূলত ভ্যালেন্সিয়া দখলের দুরভিসন্ধি মনে লালন করছিলেন, তা প্রকাশ পেয়ে যায়। অবশেষে ৪৮৮ হিজরীতে কম্বেডোরের ভ্যালেন্সিয়া দখলের মাধ্যমে এ খেলা শেষ হয়। ভ্যালেন্সিয়ার মুসলমানদের জন্য এটি ছিল চরম দুর্যোগকাল। পরবর্তী প্রায় সাত বছর

Scanned with CamScanner

ভ্যালেন্সিয়া খৃস্টানদের দখলেই ছিল। অবশেষে ৪৯৫ হিজরীতে মুরাবিতী বাহিনী ভ্যালেন্সিয়া পুনরুদ্ধার করে।[৭০৭]

যাই হোক, ভ্যালেন্সিয়া দখলের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এবং হতাশা ও পরাজয়ের লাঞ্ছনাকে সঙ্গী করে আহমাদ আলমুসতাঈন জারাগোযায় ফিরে আসেন। এরপর ৫০৩ হিজরীর রজব মাসে (১১১০ ঈসায়ীর জানুয়ারি মাসে) অ্যারাগোন-এর শাসক আলফোন্সোর সঙ্গে ব্যালটিরার প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র ইমাদুদ্দৌলা আবদুল মালিক।

আবদুল মালিকের হাতেই বনু হুদের শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে। ৫০৩ হিজরীতেই (১১১০ খৃস্টাব্দে) মুরাবিতী বাহিনী জারাগোযায় প্রবেশ করে। জারাগোযাই ছিল মুরাবিতীদের হাতে পতন হওয়া সর্বশেষ বিভক্ত রাষ্ট্র। ৫১২ হিজরীর রমযান মাসে (১১১৮ খৃস্টাব্দে) অ্যারাগোন-নৃপতি প্রথম আলফোন্সোর হাতে পতন হওয়ার আগ পর্যন্ত জারাগোযা মুরাবিতীদের শাসনভুক্তই ছিল।

আর এভাবেই সমাপ্তি ঘটে টলেডো ও জারাগোযার মধ্যকার সংঘাত-প্রবাহের। উভয় পক্ষই সরাসরি খৃস্টান ও ভাড়াটে সৈন্যদের ওপর নির্ভর করত। উভয় রাষ্ট্রের পরিস্থিতির অবনতি এবং সবশেষে রাষ্ট্রদু'টির পতনের ক্ষেত্রে এই খৃস্টাননির্ভরতার বেশ বড় ভূমিকা ছিল।

---

[৭০৭] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/৩০৩-৩০৬ ও ইমান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/২২৯,২৮৭।

Scanned with CamScanner

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
খৃস্টান আন্দালুসের দৃশ্যপট
খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিস্থিতির ক্রমবিবর্তন

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে বা খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আন্দালুসের উত্তরাঞ্চলীয় খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা ছিল দক্ষিণের মুসলিম আন্দালুসের মতোই। কখনো প্রতাপ ও উদ্যমের ধারা, কখনো-বা বিভেদ ও সংঘাতের পালা। এভাবে অবস্থার পালাবদলই ছিল তৎকালীন আন্দালুসের হিলাল ও ছলীব উভয় পতাকাধারী দলের বৈশিষ্ট্য। যখনই বিবাদমান রাষ্ট্রগুলো এক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, খৃস্টশক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অভিযান তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে; আর যখনই সৃষ্টি হয়েছে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিভেদ ও অনৈক্য, তখনই এসেছে দুর্বলতার পালা। মুসলিম আন্দালুসে বিভক্ত রাষ্ট্রগুলো যেমন পরস্পর সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে, হানাহানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকেছে; এমনকি একচেটিয়া ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে শাসকবর্গ আপন ভাই-পিতা ও পরিবার-পরিজনকে হত্যা করেছে, তেমনই অবস্থা বিরাজমান ছিল খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোতেও।
জানি না, কোন পক্ষ অপর পক্ষের নীতি-আদর্শের অনুকরণ করছিল! কারা ছিল অনুসারী, আর কারা ছিল অনুসৃত!
সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা সমকালীন খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিস্থিতি, বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করব। পাশাপাশি আমরা তুলে ধরব– কীভাবে খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো এ সময় এক ও একক রাষ্ট্র হিসেবে সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিম আন্দালুসের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্র পুনরুদ্ধার যুদ্ধ' শুরু করেছিল।

এক. উত্তরের তৎকালীন খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিচিতি

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকে অর্থাৎ খৃস্টীয় দশম শতকে উত্তর আন্দালুসের খৃস্টান-অধ্যুষিত অঞ্চল তিনটি রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। রাষ্ট্রগুলো হল,
১. নাফার রাষ্ট্র : এটি ছিল সর্ববৃহৎ খৃস্টান রাষ্ট্র। স্যাঞ্চো দ্যা গ্রেট ছিলেন নাফারের শাসনকর্তা।
২. লিওন রাষ্ট্র : ৯৮২ হতে ৯৯৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত লিওনের শাসনকার্য

Scanned with CamScanner

পরিচালনা করেছিলেন দ্বিতীয় বার্মোডো (Bermudo II)। এরপর তার পুত্র পঞ্চম আলফোন্সো তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং আমৃত্যু শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১০৩৭ খৃস্টাব্দে পর্তুগালের উত্তরাঞ্চলে মুসলিম এলাকায় অভিযান পরিচালনাকালে তিনি বাজু নগরী অবরোধ করেন এবং সেখানেই বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হয়ে মারা যান। তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র তৃতীয় বার্মোডো।

৩. ক্যাস্টোলা রাষ্ট্র : ১০২১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এ রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা ছিল স্যাঞ্চো গার্সিয়ার হাতে। এরপর তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র গার্সিয়া বিন স্যাঞ্চো ।

সবক'টি রাষ্ট্রই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জড়িয়ে ছিল এবং বিভক্ত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ন্যায় একে অন্যের রাষ্ট্রে আক্রমণ করে দখল করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

এর প্রতিফলন শুরু হয় যখন ক্যাস্টোলার শাসক গার্সিয়া বিন স্যাঞ্চো লিওনের শাসক তৃতীয় বার্মোডোর বোনকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে লিওন গমন করেন। বিবাহ অনুষ্ঠান চলাকালে গির্জার মধ্যেই প্রতারণা করে তাকে হত্যা করা হয়। ১০২৮ খৃস্টাব্দে সংঘটিত এ ঘটনার ফলে ক্যাস্টোলা রাষ্ট্র শাসক ও নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এ ঘটনার বড় ভূমিকা ছিল।

এ সময় নাফার রাষ্ট্রের শাসক ছিলেন স্যাঞ্চো দ্যা গ্রেট। অনেক দিন থেকেই তিনি তার পার্শ্ববর্তী দুই খৃস্টান রাষ্ট্রের পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন। গার্সিয়া বিন স্যাঞ্চোর হত্যা-ঘটনা ছিল তার জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ। কেননা, স্যাঞ্চো ছিলেন নিহত গার্সিয়ার ভগ্নিপতি। সুতরাং নিহত শাসকের বোনের পরিত্যাজ্য সম্পদ হিসেবে ক্যাস্টোলা রাষ্ট্রের বৈধ উত্তরাধিকারী এখন তিনিই। তাই স্যাঞ্চো দ্রুত সৈন্যসমাবেশ ঘটান এবং ক্যাস্টোলা রাষ্ট্র দখল করে তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এরপর তিনি তার পুত্র ফার্ডিনান্ডকে ক্যাস্টোলা অঞ্চলের প্রশাসকের দায়িত্ব দিয়ে নাফারে ফিরে আসেন। এর মাধ্যমে ক্যাস্টোলা ও নাফার এক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আর আন্দালুসের খৃস্টান অঞ্চল পরিণত হয় দু'টি রাষ্ট্রে। একটি ক্যাস্টোলা ও নাফারের সম্মিলিত রাষ্ট্র, যার শাসনকর্তা স্যাঞ্চো ও তার পুত্র ফার্ডিনান্ড; অপরটি লিওন রাষ্ট্র, যার শাসনকর্তা তৃতীয় বার্মোডো।

এবার স্যাঞ্চোর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় লিওন রাষ্ট্রের প্রতি। কেননা, লিওন দখল করতে পারলেই পুরো খৃস্টান আন্দালুস একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং তিনি হবেন সেই একক রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তার পুত্র ক্যাস্টোলার প্রশাসক ফার্ডিনান্ড লিওন-শাসক তৃতীয় বার্মোডোর বোনকে বিয়ে করেন। পিতা স্যাঞ্চো যেমন ক্যাস্টোলার নিহত শাসক

Scanned with CamScanner

গার্সিয়ার বোনকে বিয়ে করার সূত্রে ক্যাস্টোলার অধিপতি হয়েছেন, পুত্র ফার্ডিনান্ডও একই পদ্ধতিতে লিওন-শাসক বার্মোডোর বোনকে বিয়ে করে লিওনের অধিপতি হওয়ার পরিকল্পনা করেন।

কিন্তু ফার্ডিনান্ড বিলম্ব করে চাননি। 'কিছু ঘটবে' এই অপেক্ষা না করে তিনি নিজেই 'ঘটনা' সৃষ্টি করেন এবং হামলা চালিয়ে লিওন দখল করে নেন। লিওন-শাসক তৃতীয় বার্মোডো পলায়ন করেন এবং ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কয়েকবার চেষ্টাও করেন; কিন্তু সফল হওয়ার পূর্বেই আপন ভগ্নিপতির হাতে মৃত্যুবরণ করেন। এর মাধ্যমে ১০৩৭ খৃস্টাব্দে স্পেনের তিনটি খৃস্টান রাষ্ট্র মিলে স্যাঞ্চোর অধীনে একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

মৃত্যুর পূর্বে স্যাঞ্চো তার এই একীভূত রাষ্ট্রকে তার চার পুত্রের মাঝে বণ্টন করে দেন। ক্যাস্টোলা, লিওন ও জিল্লিকিয়ার শাসনভার প্রদান করেন ফার্ডিনান্ডকে, নাফারের শাসনভার বড় পুত্র গার্সিয়াকে, অ্যারাগোন রাষ্ট্রের দায়িত্ব রোমেরোকে এবং সোবরার্ব ও রিবাগোরজা প্রদেশের সমন্বয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের শাসনভার দেন গঞ্জালোকে। এর বাইরে ছিল উত্তর-পূর্ব স্পেনের বার্সেলোনা প্রদেশ, যার শাসনকর্তা ছিলেন প্রথম র‍্যামোন বেরনজার (Ramon Berenguer I)।

এভাবে রাষ্ট্র বণ্টনের মধ্য দিয়ে মূলত সহোদর ভাইদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্যের বীজ নতুন করে রোপিত হয়েছিল। স্যাঞ্চো দ্যা গ্রেটের মৃত্যুর পর বিভেদের এ বীজ ডাল-পালা মেলে গজিয়ে ওঠে।[৭০৮]

দুই. ফার্ডিনান্ড ও বিভক্ত খৃস্টান ফ্রন্টের একত্রিকরণ

স্যাঞ্চোর মৃত্যুর পর আন্দালুসের খৃস্টান-অধ্যুষিত অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা নিয়ে সহোদর ভাইদের মাঝে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তীব্র রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধে বিবাদমান প্রতিটি পক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা ও শঠতার আশ্রয় নিয়ে অপরকে পরাভূত করার জঘন্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

অ্যারাগোনার শাসক রোমেরো তার পিতৃপ্রদত্ত অংশ নিয়ে তুষ্ট হননি। তিনি তার ভাই গার্সিয়ার অংশ নাফার রাষ্ট্রও নিজের করে নিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের মতো যথেষ্ট সামরিক শক্তি রোমেরোর ছিল না। তাই তিনি প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র জারাগোযার শাসক ইবনে হুদের সঙ্গে মিত্রতা করে তার কাছে সামরিক সহায়তা প্রার্থনা করেন। ১০৪২ খৃস্টাব্দে রোমেরো তার নিজস্ব বাহিনী ও মিত্র জারাগোযার সহায়ক বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে নাফারের দিকে অগ্রসর হন এবং তাফাল্লা দুর্গ

---

[৭০৮] বিস্তারিত জানতে : ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৩৭৬-৩৭৮।

Scanned with CamScanner

অবরোধ করেন। আসন্ন বিপদ টের পেয়ে নাফার-শাসক গার্সিয়া ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার সেনাবাহিনীকে একত্র করেন এবং রাতের আঁধারে তার বাহিনী নিয়ে রোমেরোর বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। আকস্মিক এ হামলায় প্রচুর প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জারাগোযার মুসলিম সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য এ হামলায় নিহত হয়।

ওদিকে নাফারের শাসক গার্সিয়া মনে করতেন, জ্যেষ্ঠতার দাবিতে ভাই ফার্ডিনান্ডের পরিবর্তে তিনিই ক্যাস্টোলার শাসনক্ষমতা লাভের উপযুক্ত। কেননা, তিনি ভাইদের মধ্যে বয়সে সবার বড়। ছোট ভাই ফার্ডিনান্ডের প্রতি তার অন্তরে বিদ্বেষ দানা বাঁধে। তিনি ফার্ডিনান্ডকে হত্যা করে ক্যাস্টোলার ক্ষমতা দখলের ফন্দি আঁটেন। ফার্ডিনান্ডের নিকট তিনি এই সংবাদ পাঠান যে, তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত এবং মৃত্যুর পূর্বে ছোট ভাই ফার্ডিনান্ডকে একনজর দেখার আকাঙ্ক্ষা করছেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র ফার্ডিনান্ড বড় ভাইয়ের আহ্বানে নাফারে ছুটে আসেন। কিন্তু প্রহরীদের সন্দেহজনক আচরণে তিনি ভাইয়ের ষড়যন্ত্র বুঝে ফেলেন এবং দ্রুত ক্যাস্টোলায় ফিরে আসেন। বড় ভাইয়ের প্রতি তার মন ঘৃণা ও বিদ্বেষে ভরে ওঠে। এরপর তিনি বড় ভাই গার্সিয়াকে তার রাষ্ট্রে সফরের আমন্ত্রণ জানান। এদিকে ফার্ডিনান্ড যে গার্সিয়ার পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র বুঝে ফেলেছিলেন, গার্সিয়া তা জানতেন না। তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে ছোট ভাইয়ের আমন্ত্রণ রক্ষা করেন। তিনি ক্যাস্টোলায় পৌঁছতেই ফার্ডিনান্ড তাকে বন্দী করে ফেলেন। কিন্তু গার্সিয়া কৌশলে জেল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তার অন্তরে জেগে ওঠে প্রতিশোধস্পৃহা। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে যায়। গার্সিয়া তার মুসলিম মিত্র জারাগোযা-শাসক মুকতাদির বিন হুদের সহায়তায় বিশাল সৈন্যসমাবেশ ঘটান। এদিকে ফার্ডিনান্ডও ক্যাস্টোলা ও লিওন থেকে প্রচুর সৈন্য সমবেত করেন। বারগুশের পূর্বে আতাবুরকার বিস্তৃত সমতল ভূমিতে উভয় পক্ষ প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধে গার্সিয়া ও তার মিত্র মুসলিম বাহিনী প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। যুদ্ধে গার্সিয়া নিহত হন এবং তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফার্ডিনান্ড তার বাহিনী নিয়ে প্রতিপক্ষের কেবল মুসলিম অংশের পশ্চাদ্ধাবন করেন। পলায়নরত মুসলিম বাহিনী ফার্ডিনান্ডের বাহিনীর আক্রমণে পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয় এবং প্রচুর সৈন্য হতাহত কিংবা বন্দী হয়। এরপর ফার্ডিনান্ড তার নিহত

Scanned with CamScanner

ভাই গার্সিয়ার পুত্র স্যাঞ্চোকে পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে নাফারের প্রশাসক নির্বাচিত করেন।[৭০৯]

এভাবে খৃস্টান আন্দালুসের রাষ্ট্রগুলো পুনরায় একক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কেননা, স্যাঞ্চো দ্যা গ্রেটের পুত্র ফার্ডিনান্ডের করতলে এখন ক্যাস্টোলা, লিওন, নাফার, জিলিকিয়্যা ও অ্যারাগোনসহ খৃস্টান আন্দালুসের সকল নগরী।

তিন. ফার্ডিনান্ড ও প্রথম পুনরুদ্ধার যুদ্ধ

বাস্তবেই ইতিহাস বারবার ফিরে আসে। তাই তো অতীতের পৃথিবীর সঙ্গে আজকের পৃথিবীর কত মিল। কত সাদৃশ্য! খৃস্টান আন্দালুস যখন ফার্ডিনান্ডের নেতৃত্বে একতা ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছিল, আর ফার্ডিনান্ডও তার সহজাত নেতৃত্বগুণের মাধ্যমে পুরো খৃস্টান আন্দালুসকে একত্র করে একক ক্রুশেড ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, ঠিক একই সময়ে মুসলিম স্পেন বা মুসলিম আন্দালুস একই ধর্মের সন্তানদের পারস্পরিক বিভেদ, বিভক্তি ও হানাহানির আগুনে দগ্ধ হচ্ছিল। ৪২২ হিজরীতে (১০৩১ খৃস্টাব্দে) কর্ডোভায় খেলাফতে উমাইয়া বিলুপ্ত হওয়ার পরই মুসলিম আন্দালুস পরিণত হয়েছিল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দল, বিভক্ত অঞ্চল এবং বিবাদমান ও যুদ্ধরত পক্ষে।

এই সংঘাত ও বিবাদকে কেন্দ্র করে বিবাদমান প্রতিটি পক্ষ অপর পক্ষের ওপর প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে অন্যদের সঙ্গে মিত্রতা, জোট স্থাপন ও সামরিক সহায়তা গ্রহণ করত এবং এর মাধ্যমে আপন মুসলিম প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করত। কখনো কখনো তার প্রতিবেশী পিতা বা ভাইও হত। মিত্রতা তার সঙ্গেই করা হত, যিনি নিজে শক্তিশালী হতেন এবং অন্য কারও সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতেন। এ কারণেই মিত্রতা গড়ার লক্ষ্যে বিভক্ত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শাসকবর্গের দৃষ্টি এবার নিবদ্ধ হয় একক খৃস্টান রাষ্ট্রের প্রতি। সেই খৃস্টানগণ, যারা মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের চেতনা ধারণ ও লালন করাকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করে থাকে।

একদিকে ফার্ডিনান্ডের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ খৃস্টান আন্দালুস, অপরদিকে বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের শাসকবর্গের পারস্পরিক হানাহানি ও সংঘাত– স্বাভাবিকভাবেই আইবেরিয়ান উপদ্বীপের দুই অংশে তথা হিলাল ও ছালিবের

---

[৭০৯] বিস্তারিত জানতে : ইমাম, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৩৭৮-৩৮১।

Scanned with CamScanner

পতাকাবাহী দু' দলের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির পাল্লা এবার উল্টো দিকে হেলে পড়ে। নতুন শক্তিতে বলীয়ান খৃস্টানশক্তি এবার শুরু করে মুসলিম আন্দালুসের রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে ক্রুশেড-ভূমি পুনরুদ্ধার অভিযান।

ক্যাস্টোলা-শাসক প্রথম ফার্ডিনান্ডের নেতৃত্বে পরিচালিত পুনরুদ্ধার অভিযান একাধিক ফ্রন্টে কেন্দ্রীভূত ছিল। ফার্ডিনান্ডের এ অভিযানের লক্ষ্য ছিল বিভক্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সামরিক শক্তি দুর্বল করা এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমি দখল বা কর-জিযিয়া আরোপ করে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে মুসলিম শাসকদেরকে আপন প্রভাব ও ক্ষমতার অধীনে নিয়ে আসা। ফার্ডিনান্ড এ উদ্দেশ্যে বিভক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্য থেকে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে বাদ দিয়ে টলেডো, সেভিল, জারাগোযা, বাতালইয়ুস ইত্যাদি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকে তার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেন।

ভাইদের পরাভূত করে সমগ্র খৃস্টান আন্দালুসকে এক পতাকাতলে নিয়ে আসার কাজ সম্পন্ন করার পর ফার্ডিনান্ড প্রথমে তার দৃষ্টি ও শক্তি নিবদ্ধ করেন বাতালইয়ুসের শাসক-পরিবার বনু আফতাসের প্রতি। উদ্দেশ্য তাদেরকে পরাভূত করে বাতালইয়ুস রাষ্ট্রকেও আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা। ভৌগোলিক দিক থেকে বাতালইয়ুস আন্দালুসের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রতিনিধিত্ব করত। অর্থাৎ লিসবন, সান্তারিন (Santarém), কুলুমরিয়াসহ (Colomera) বর্তমান পর্তুগালের পুরোটাই তৎকালীন বাতালইয়ুস রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৪৪৯ হিজরীতে (১০৫৭ খৃস্টাব্দে) প্রথম ফার্ডিনান্ড পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে তার সেনাবাহিনীসহ বাতালইয়ুস রাষ্ট্রের উদ্দেশে অভিযানে বের হন। দোরু নদী ও টোরমিস নদী পাড়ি দিয়ে ফার্ডিনান্ড বাতালইয়ুসের উত্তর সীমান্তে হামলা করেন এবং পর্তুগালের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত বাজু ও লামেজো শহরদু'টি বশীভূত করতে সক্ষম হন। দখল করার পরপরই তিনি শহরদু'টিতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান এবং সেখানে বসবাসরত মুসলিম নাগরিকদের বিরুদ্ধে জাতিগত শুদ্ধি ও নির্মূলীকরণ অভিযান পরিচালনা করেন। মুসলমানদের তাড়িয়ে দিয়ে তিনি সেখানে খৃস্টানদের এনে বসতি স্থাপন করান।[৭১০]

নগরীদু'টিতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পর ফার্ডিনান্ড বাতালইয়ুসের শাসক মুযাফফার বিন আফতাসের কাছে জিযিয়া ও কর দাবি করেন। কিন্তু মুযাফফার ফার্ডিনান্ডের দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফার্ডিনান্ড পুনরায় বাতালইয়ুস রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে হামলা চালান।

---

[৭১০] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৮৫-৮৬, ৩৮৩।

Scanned with CamScanner

এবার তিনি দশ হাজার সৈন্য সহকারে বাতালইয়ুসের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালান। মুযাফফারের সৈন্যদের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন না হওয়ায় খৃস্টান বাহিনী মুসলিম ভূমিতে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে চালাতে সান্তারিন নগরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুযাফফার বিন আফতাস খৃস্টান বাহিনীর অভিযানের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখছিলেন। তাই তিনি খৃস্টান বাহিনীর পূর্বেই সান্তারিন পৌঁছে যান। তিনি উপলব্ধি করছিলেন যে, তার পক্ষে খৃস্টান বাহিনীর মোকাবেলা করার সামর্থ্য নেই। তাই তিনি ফার্ডিনান্ডের কাছে সন্ধি ও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠান। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়, মুযাফফার প্রতিবছর ফার্ডিনান্ডকে জিযিয়া হিসেবে পাঁচ হাজার দীনার প্রদান করবেন।[৭১১]

বাতালইয়ুসের শাসকগোষ্ঠী বনু আফতাস নতি স্বীকার করায় ফার্ডিনান্ড তুষ্ট হন এবং আপাতত সামনে অগ্রসর না হয়ে তার দ্বিতীয় লক্ষ্য টলেডোর উদ্দেশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। পূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, এ সময় টলেডোর শাসকগোষ্ঠী বনু যিননূনের সঙ্গে জারাগোযার শাসক পরিবার বনু হুদের প্রচণ্ড সংঘাত চলছিল। বনু হুদের সঙ্গে মিত্রতার সূত্রে এ সময় ফার্ডিনান্ড টলেডোর শাসনাধীন এলাকাতে উপর্যুপরি হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছিলেন। অপরদিকে টলেডোর তৎকালীন শাসক আলমামুন বিন যিননূন যেহেতু নাফারের শাসক গার্সিয়ার সাহায্য কামনা করেছিলেন, তাই গার্সিয়াও তার বাহিনী নিয়ে জারাগোযার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় একের পর এক আক্রমণ করে প্রচুর জান-মালের বিনাশ সাধন করছিলেন। এভাবে অশুভ দুই মুসলিম শাসকের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় খৃস্টান বাহিনী মুসলমানদের ভূমিতে হত্যা ও ধ্বংসের উল্লাসে মেতে উঠেছিল।

খৃস্টান আন্দালুসকে একক নেতৃত্বে নিয়ে আসার পরই ফার্ডিনান্ড উপলব্ধি করেছিলেন যে, খণ্ডিত মুসলিম আন্দালুসের শাসকবর্গের তাকে প্রতিরোধ করার কোন সামর্থ্যই নেই। কারণ, তারা পরস্পর হানাহানি ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে ব্যস্ত। আর তাই ৪৫৪ হিজরীতে (১০৬২ খৃস্টাব্দে) ফার্ডিনান্ড টলেডো রাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন এবং সালিম নগরী, হিজারা উপত্যকা ও হিনারিস দুর্গে হামলা করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান। আত্মঘাতী যুদ্ধে রণক্লান্ত টলেডো-শাসক আলমামুনের পক্ষে ফার্ডিনান্ডের এ হামলা প্রতিরোধের উদ্যম বা বীরত্ব কিছুই ছিল না। তাই তিনি দ্রুত ফার্ডিনান্ডের কাছে ছুটে যান এবং কয়েক টন স্বর্ণ-রূপা ও অন্যান্য উপঢৌকন

---

[৭১১] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৩৭-২৩৮।

Scanned with CamScanner

প্রদান করে ফার্ডিনান্ডের প্রতি আপন আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করেন। এরপর তিনিও ফার্ডিনান্ডকে জিযিয়া প্রদানের অঙ্গীকার করেন।[৭১২]

টলেডো-শাসক আলমামুন বিন যিননূনের বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট হয়ে ফার্ডিনান্ড এবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তার তৃতীয় লক্ষ্য সেভিলের প্রতি। ৪৫৫ হিজরীতে (১০৬৩ খৃস্টাব্দে) তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেভিলে আক্রমণ করেন এবং সেভিলের বিভিন্ন জনপদে আগুন লাগিয়ে দেন, ফসলের ক্ষেত নষ্ট করেন। বাধ্য হয়ে সেভিল-শাসক মু'তাযিদ বিন আব্বাদও বাতালইয়ুস-শাসক মুযাফফার ও টলেডো-শাসক আলমামুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন এবং ফার্ডিনান্ডের কাছে ছুটে গিয়ে প্রচুর হাদিয়া-উপঢৌকন প্রদানপূর্বক মিত্রতা ও আনুগত্যের স্বীকৃতি দেন। পাশাপাশি তিনি ফার্ডিনান্ডের কাছে শান্তি ও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব রাখলে ফার্ডিনান্ড তা মেনে নেন। ফার্ডিনান্ড দাবি জানান যে, তিনি সেভিলের ভূমিতে সমাধিস্থ খৃস্টান সাধু নারী খোস্তার দেহাবশেষ লিওনে স্থানান্তর করতে চান। সন্ন্যাসিনী নারী খোস্তা ডিওকলিডিয়ানুসের (Diocletian) আমলে নিহত হয়ে সেভিলে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। মু'তাযিদ সানন্দে ফার্ডিনান্ডের দাবি পূরণে সম্মত হন এবং কিছুদিন পর এক কর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সন্ন্যাসিনী খোস্তার দেহাবশেষ লিওনে স্থানান্তর করা হয়।[৭১৩]

এভাবে জিযিয়া আরোপ ও অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে প্রভাবিত করে ফার্ডিনান্ড একে একে বাতালইয়ুস, টলেডো ও সেভিলকে বশীভূত করতে সক্ষম হন। আর এ সবকিছুর মধ্য দিয়েই তিনি তার অন্যতম বৃহৎ পরিকল্পনা বাতালইয়ুস রাষ্ট্রের অন্যতম প্রদেশ কুলুমরিয়া দখলের প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

৩৭৫ হিজরীতে আলমানসুর বিন আবু আমির কুলুমরিয়া জয় করেছিলেন। ৪৫৬ হিজরীতে (১০৬৪ খৃস্টাব্দে) ফার্ডিনান্ড তার বাহিনী নিয়ে কুলুমরিয়া রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌঁছে নগরী অবরোধ করেন। কুলুমরিয়ার তৎকালীন গভর্নর রানদা গোপনে ফার্ডিনান্ডের সঙ্গে পত্র বিনিময় করে আপন পরিবারসহ নিরাপদে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যান। সেখানকার মুসলিম নাগরিকগণ খৃস্টান বাহিনীকে প্রতিরোধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও একপর্যায়ে তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। দীর্ঘ ছয় মাস অবরুদ্ধ থাকার পর কুলুমরিয়া নগরীর পতন হয় এবং সত্তর বছরেরও অধিক সময় ইসলামী শাসনে থাকার পর নগরীটি খৃস্টানদের দখলে চলে যায়।[৭১৪]

---

[৭১২] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/১০১, ৩৮৩-৩৮৪।

[৭১৩] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৩৮৪।

[৭১৪] ইবনে আ'যারী, *আলবায়ানুল মুগরিব*, ৩/২৩৮-২৩৯ ও ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ: ১৮৪।

Scanned with CamScanner

এখন ফার্ডিনান্ডের সামনে বাকি থাকে কেবল বনু হুদের শাসনাধীন জারাগোযাকে বশীভূত করা। কেননা, 'উচ্চ সীমান্তশহর' নামে প্রসিদ্ধ জারাগোযাই তখন একমাত্র রাষ্ট্র, যার শাসকগোষ্ঠী তখনও পর্যন্ত ফার্ডিনান্ডকে তাদের ওপর আরোপিত জিযিয়া ও কর দিতে টালবাহানা করছিল। জারাগোযার পাশাপাশি ফার্ডিনান্ড ভ্যালেন্সিয়াকেও আপন কর্তৃত্বে আনতে মনস্থ করেন। ৪৫৭ হিজরীতে (১০৫৭ খৃস্টাব্দে) ফার্ডিনান্ড তার বাহিনী নিয়ে জারাগোযার দক্ষিণ সীমান্ত অতিক্রম করে ভ্যালেন্সিয়ায় আক্রমণ করার উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং পথিমধ্যে জারাগোযার সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক হত্যা-রাহাজানি ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পাশাপাশি ক্ষেত-খামার ও জনপদে লুটপাট চালান। সীমান্ত এলাকার সমস্ত ভূমি ও দুর্গ তিনি উজাড় করে ফেলেন। বাধ্য হয়ে মুকতাদির বিন হুদ তাকে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হন।
এরপরই ফার্ডিনান্ড ভ্যালেন্সিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন এবং নগরপ্রাচীরের সন্নিকটে পৌঁছে নগরী অবরোধ করেন। এভাবে দীর্ঘদিন কেটে যাওয়ার পর ফার্ডিনান্ড যখন উপলব্ধি করলেন যে, ভ্যালেন্সিয়া নগরীর দুর্গগুলো যথেষ্ট সুরক্ষিত এবং দুর্গের অভ্যন্তরে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও উপকরণ যথেষ্ট শক্তিশালী, তখন তিনি কৌশল ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেওয়ার মনস্থ করেন এবং অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ভান করে রওয়ানা হন। নগরবাসী বিজয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ব্যর্থ ফার্ডিনান্ড-বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করতে বেরিয়ে পড়ে। তাদের চলনে-বলনে যুদ্ধভাব নয়; বরং বিজয় ও আড়ম্বরতার ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। ভ্যালেন্সিয়াবাসী ও তাদের প্রশাসক আবদুল মালিক বিন আবদুল আযীয আলমানসুরের এই উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে খৃস্টান বাহিনী ফিরে আসে এবং ভ্যালেন্সিয়াবাসীকে নির্বিচারে হত্যা ও বন্দী করতে থাকে। এভাবে উপস্থিত কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ফার্ডিনান্ড ভ্যালেন্সিয়া নগরী জয় করতে সমর্থ হন। কিন্তু ভ্যালেন্সিয়া বিজয়ের অব্যবহিত পরেই শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করায় ফার্ডিনান্ড লিওনে প্রত্যাবর্তন করেন। এর কিছুদিন পরই ৪৫৭ হিজরীতেই (১০৬৫ ঈসায়ীর ডিসেম্বর মাসে) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৭১৫]
এভাবে ফার্ডিনান্ড একই সঙ্গে আন্দালুসের খৃস্টান ও মুসলিম অংশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন এবং আপন ক্ষমতা ও সামরিক শক্তির মাধ্যমে বাহ্যিক প্রভাব এবং জিযিয়া ও কর আরোপপূর্বক বিভক্ত আন্দালুসের শাসকবর্গকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার মাধ্যমে মানসিক প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হন।

---

[৭১৫] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/২২৪-২২৫, ৩৮৬-৩৮৭।

Scanned with CamScanner

চার. ফার্ডিনান্ডের মৃত্যু ও উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

মৃত্যুর পূর্বে ফার্ডিনান্ড তার সুবিশাল একক খৃস্টান রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা তার তিন পুত্র ও দু' কন্যার মাঝে বণ্টন করে দিতে মনস্থ করেন। এক্ষেত্রে ফার্ডিনান্ড তার পিতা স্যাঞ্চো দ্যা গ্রেট-এর ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। আমরা পূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, তার পিতা স্যাঞ্চো একক খৃস্টান রাষ্ট্রকে তার পুত্রদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন এবং এর কারণে ভাইদের সঙ্গে সৃষ্ট বিভক্তির গরল-স্বাদ স্বয়ং ফার্ডিনান্ডও আস্বাদন করেছিলেন। কিন্তু ফার্ডিনান্ড সেই একই ভুল করেন এবং সন্তানদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা বণ্টনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে ১০৬৪ খৃস্টাব্দে রাষ্ট্রের গণমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ধর্মীয় যাজকদের সমবেত করেন। পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, বড় পুত্র স্যাঞ্চো পাবেন ক্যাস্টোলার শাসনভার এবং জারাগোযা থেকে জিযিয়া গ্রহণের অধিকার, মেঝো পুত্র আলফোন্সো পাবেন লিওনের শাসনভার এবং টলেডো থেকে জিযিয়া গ্রহণের অধিকার, কনিষ্ঠ পুত্র গার্সিয়া পাবেন জিল্লিকিয়া ও পর্তুগালের শাসনভার এবং সেভিল ও বাতালইয়ুস থেকে জিযিয়া গ্রহণের অধিকার। মেয়েদের মধ্যে উরাকা পাবেন সুরক্ষিত নগরী সামুরার কর্তৃত্বভার আর এলভেরা পাবেন টোরা নগরী ও দোরু নদী-সংলগ্ন অন্যান্য এলাকার কর্তৃত্বভার।

বস্তুত এভাবে শাসনক্ষমতা বণ্টন সহোদর ভাই-বোনদের মধ্যে বিভক্তির বীজ রোপণ করেছিল এবং অনৈক্য ও সংঘাতের পথ উন্মুক্ত করেছিল। অল্প কিছুদিন পরই এর ফল প্রকাশ পেতে শুরু করে।

এ সময় নাফার রাষ্ট্র ছিল স্যাঞ্চো বিন গার্সিয়ার হাতে আর অ্যারাগোন রাষ্ট্র ছিল স্যাঞ্চো বিন রোমেরোর হাতে। তৃতীয় আরেক স্যাঞ্চো অর্থাৎ সদ্য প্রয়াত ফার্ডিনান্ডের বড় পুত্র ক্যাস্টোলার প্রশাসক (ফার্ডিনান্ড-পুত্র) স্যাঞ্চো এ সময় এই দুই রাষ্ট্রকে আপন রাষ্ট্রসীমার অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করেন। ক্যাস্টোলা শাসকের এই অভিপ্রায়ের কথা অনুভব করে নাফার ও অ্যারোজোনার শাসক দুই স্যাঞ্চো পরস্পর চুক্তি করেন এবং ১০৬৭ খৃস্টাব্দে ফিয়ানার যুদ্ধে ফার্ডিনান্ড পুত্র স্যাঞ্চোকে প্রতিহত করে নিজেদের রাষ্ট্রক্ষমতা রক্ষা করতে সক্ষম হন। একবছর পর ১০৬৮ খৃস্টাব্দে স্যাঞ্চো তার ভাই আলফোন্সোর লিওন রাষ্ট্রে আক্রমণ করেন। আলফোন্সো তার বড় ভাইয়ের হামলা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করলেও পরাজিত হন এবং আপন রাজত্বের কিছু এলাকা ভাই স্যাঞ্চোকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

১০৭১ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে স্যাঞ্চো আবারও তার ভাই আলফোন্সোর রাজত্বে হামলা চালালে এবার সূচনাতেই পরাজিত হন। কিন্তু ধুরন্ধর স্যাঞ্চো

Scanned with CamScanner

কুট-কৌশলের আশ্রয় নেন এবং (কম্বেডোর নামে পরিচিত) রডরিকোর কৌশলের মাধ্যমে আলফোন্সোকে পরাভূত করতে সক্ষম হন। রাতের অন্ধকারে লিওনের বাহিনীর ওপর হামলা করে স্যাঞ্চো বিজয়ীবেশে লিওনে প্রবেশ করেন, এরপর বন্দী করেন ভাই আলফোন্সোকে।

পরবর্তী সময়ে অবশ্য বন্দী আলফোন্সো বোন উরাকার মধ্যস্থতায় মুক্তি পান এবং তার বিচরণ সাহাগুন আশ্রমের মধ্যে সীমিত করে দিয়ে তাকে একপ্রকার গৃহবন্দী করে রাখা হয়। এরপর বোন উরাকারই পরিকল্পনা ও কৌশলে তিনি সেখান থেকেও পালাতে সক্ষম হন এবং পালিয়ে টলেডো-শাসক আলমামুন বিন যিননূনের কাছে আশ্রয় নেন। আলমামুনের কাছে আলফোন্সো উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করেন এবং তার তত্ত্বাবধানে শান্তি ও নিরাপদে দিন কাটাতে থাকেন।

আলফোন্সো তার এই নির্বাসিত জীবন আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের মাঝে কাটাননি। তিনি টলেডোর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন এবং হৃদয়ে স্বপ্ন লালন করতেন, একদিন তিনি এই রাষ্ট্রের অধিকর্তা হবেন। ঐতিহাসিক র‍্যামন মেন্ডিজ পিডালের[৭১৬] একটি বর্ণনায়ও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,

> লিওনের পদচ্যুত শাসক (আলফোন্সো) মুসলিম নাগরিকদের সঙ্গে মিশতেন এবং (টলেডো) নগরীর সুরক্ষিত বিভিন্ন প্রান্তে হাঁটাহাঁটি করতেন আর পরিকল্পনা করতেন, কীভাবে কোন (দুর্বলতম) স্থান দিয়ে কোন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করে টলেডো জয় করা যায়।[৭১৭]

নির্বাসনের দীর্ঘ নয় মাস আলফোন্সো টলেডোতে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে কাটান। এরপর হঠাৎ করেই তার ভাগ্য তারকা চমকে ওঠে এবং ক্যাস্টোলার পরিস্থিতি হঠাৎ করেই বদলে যায়! কীভাবে, সে বর্ণনা সামনে আসছে।

এদিকে ভাই আলফোন্সোকে পরাজিত করে লিওন দখল করেই স্যাঞ্চো তুষ্ট হননি; তিনি এবার অপর ভাই গার্সিয়ার কাছ থেকে জিলিকিয়া ও পর্তুগালের শাসনক্ষমতা কেড়ে নিতে মনস্থ করেন এবং সফলও হন। ১০৭১ খৃস্টাব্দেই পরাজিত গার্সিয়া পালিয়ে সেভিল-শাসক মু'তামিদ বিন আব্বাদের কাছে আশ্রয় নেন।

এভাবে পিতার একক রাজত্বের প্রায় পুরোটাই স্যাঞ্চোর দখলে চলে আসে।

---

[৭১৬] র‍্যামন মেন্ডিজ পিডাল (Ramon Menendez Pidal) একজন বিখ্যাত স্প্যানিশ ঐতিহাসিক। জন্ম ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের ১৩ মার্চ, মৃত্যু ১৯৬৮ খৃস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর। তিনি স্প্যানিশ আর্য একাডেমি 'রিয়াল স্প্যানিশ একাডেমি' এর সদস্য ছিলেন। তার লেখা বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থের নাম La Chanson de Roland y el neotradicionalismo। (অনুবাদক)

[৭১৭]. দেখুন : মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৩৯১।

Scanned with CamScanner

বাকি কেবল দুই বোনের অধিকারে থাকা সামুরা ও টরো নগরী। এবার স্যাঞ্চো বোনদের রাজত্বও কেড়ে নিতে মনস্থ করেন এবং প্রথমে এলেভেরার কাছ থেকে টরো নগরী দখল করে নেন। এলেভেরা তার সামনে প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি তার বাহিনী নিয়ে সামুরায় পৌঁছেন। সামুরার শাসক উরাকা এ সময় তার সামনে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বাধ্য হয়ে স্যাঞ্চো সামুরা অবরোধ করেন। অবরোধ চলাকালে একদিন জনৈক সৈনিক স্যাঞ্চোকে অবরুদ্ধ নগরীর গোপন কিছু তথ্য জানাতে তার সেনাছাউনিতে তার সঙ্গে সাক্ষাত করার অনুমতি প্রার্থনা করে। সাক্ষাতের অনুমতি পেয়ে ভেতরে প্রবেশ করে উক্ত সৈনিক স্যাঞ্চোকে দেখামাত্র তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে এবং তাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে বোন উরাকার সুপ্ত কৌশলের কাছে হার মেনে ১০৭২ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্যাঞ্চোর সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্নের সমাপ্তি ঘটে। সামুরা নগরীর অবরোধও উঠে যায়। স্যাঞ্চোর আকস্মিক মৃত্যুতে বিশাল খৃস্টান রাষ্ট্র শাসকশূন্য হয়ে পড়ে। নিহত স্যাঞ্চোর ভাইদের মধ্যে আলফোন্সো আছেন টলেডোর রাজপরিবারের আশ্রয়ে আর গার্সিয়া আছেন সেভিলের শাসকপরিবারের আশ্রয়ে। স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী প্রশ্ন- দু' ভাইয়ের মধ্যে কার হাতে উঠতে যাচ্ছে এই সুবিশাল রাষ্ট্রক্ষমতা?

পাঁচ. লিওনের সিংহাসনে আলফোন্সো

ভাই-বোনদের অধিকারে জোরপূর্বক হস্তক্ষেপ করার শাস্তিস্বরূপ নিহত হলেন স্যাঞ্চো। এরপর খৃস্টান রাষ্ট্রের গণমান্য ব্যক্তিবর্গ পরামর্শ করে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য আলফোন্সোকে টলেডো থেকে তলব করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তারা শর্ত আরোপ করেন, এ জন্য আলফোন্সোকে শপথ করে বলতে হবে যে, তিনি কোনভাবেই তার ভাই স্যাঞ্চোর হত্যার ঘটনায় জড়িত ছিলেন না। বোন উরাকা পত্র পাঠিয়ে আলফোন্সোকে সবকিছু অবহিত করেন এবং তাকে লিওনে চলে আসতে আহ্বান জানান। সঙ্গে সঙ্গে আলফোন্সো টলেডো-শাসক আলমামুনকে এ সংবাদ জানান। আলমামুন অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সফরের প্রয়োজনীয় অর্থ ও বাহন দিয়ে তাকে লিওন পৌঁছতে সহায়তা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। বিনিময়ে তিনি কেবল আলফোন্সোর বন্ধুত্ব ও মুসলিম প্রতিবেশী ভাইদের বিরুদ্ধে চলমান সংঘাতে তার সহায়তার প্রতিশ্রুতি কামনা করেন। আলফোন্সো তাকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর আলমামুন বিশাল ও জাকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার মাধ্যমে আলফোন্সোকে টলেডোর সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে বিদায় জানান।

Scanned with CamScanner

হায় আলমামুন! হায় ইবনে যিননুন। আপন ভাইদের বিরুদ্ধে লড়তে তুমি কার কাছে সহায়তার প্রতিশ্রুতি চাইলে। কার ওপর ভরসা করলে! একজন খৃস্টানের প্রতিশ্রুতির উপর! শঠতা ও প্রতারণা যাদের নীতি, স্বার্থের জন্য যারা আপন ভাইয়ের গলায় ছুরি চালাতেও দ্বিধা করে না, তাদের উপর! হায়! দুধ দিয়ে এতদিন তুমি কোন কালসাপ পুষলে! হায় তোমার আশা ও আশাভঙ্গের বেদনা! তুমি কি জানতে যে, তোমার এই আস্থার পাত্র আলফোন্সোর হাতেই একদিন তোমার এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে? এই আলফোন্সোই তোমার পৌত্র আলকাদিরকে চরম লাঞ্ছিত করে টলেডো ছাড়তে বাধ্য করবে? আলমামুন! যদি জানতে, কী করতে তুমি? তাহলেও তুমি আলফোন্সোকে ...?!

যাই হোক, এভাবেই আলফোন্সো লিওন ও ক্যাস্টোলার সাম্রাজ্যের অধিকারী হন এবং পুনরায় খৃস্টান রাষ্ট্র এক ও একক রাষ্ট্রে পরিণত হয়, যেমনটি পূর্বে স্যাঞ্চো দ্যা গ্রেট ও আলফোন্সোর পিতা প্রথম ফার্ডিনান্ডের সময়ে ছিল।

তবে আলফোন্সোর জীবিত অপর ভাই গার্সিয়া চুপ করে বসে ছিলেন না। ঈর্ষা ও হিংসায় কাতর হয়ে তিনি ভাইয়ের রাজত্ব দখল করার পরিকল্পনা করতে থাকেন। বিষয়টি জানতে পেরে আলফোন্সো তার বোন উরাকার পরামর্শ ও ইঙ্গিতে গার্সিয়ার জন্য ফাঁদ পাতেন। তিনি সমঝোতার কথা বলে ভাই গার্সিয়াকে ডেকে পাঠান এবং গার্সিয়া পৌঁছতেই তাকে বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায়ই ১০৯০ খৃস্টাব্দে গার্সিয়ার মৃত্যু হয়। এভাবে আলফোন্সো পরিণত হন একক খৃস্টান রাষ্ট্রের একচ্ছত্র ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক-এ।[৭১৮]

---

[৭১৮] বিস্তারিত জানতে : ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/৩৮৯-৩৯৫।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ষষ্ঠ আলফোন্সো ও পুনরুদ্ধার যুদ্ধ

লিওন ও ক্যাস্টোলার শাসক ষষ্ঠ আলফোন্সো ছিলেন তৎকালীন সবচে' শক্তিধর খৃস্টান শাসক। আলফোন্সো এক মুহূর্তের জন্যও আন্দালুসের মুসলমানদের প্রতি তার পূর্বপুরুষদের শত্রুতার নীতিকে ভোলেননি। আর তাই আলফোন্সো যদি নতুন করে মুসলিম আন্দালুসে ক্রুশেড পুনরুদ্ধার যুদ্ধ সূচনা করেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বরং তার সময়েই আন্দালুসের ক্রুশেড যুদ্ধ সবচে' তীব্র, কঠিন ও উন্মত্ত স্তরে পৌঁছেছিল।

আলফোন্সোর শাসনামলের হিলাল-ছালিবের সংঘাত তথা ইসলাম ও খৃস্টবাদের লড়াই সম্পূর্ণই ধর্মকেন্দ্রিক ছিল। গির্জার পোপদের সরাসরি সমর্থনে এ যুদ্ধ পরিচালিত হত। এ কারণেই আন্দালুসের ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করার লক্ষ্যে গির্জার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যেশ্যে পরিচালিত এ যুদ্ধে পুরো খৃস্টানশক্তি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পূর্ণ উদ্যম, উদ্দীপনা ও বীরত্ব নিয়ে।

এক. বিভক্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর হামলা
দ্বিতীয় পুনরুদ্ধার যুদ্ধ

৪৬৬ হিজরীতে (১০৭২ খৃস্টাব্দে) আলফোন্সো যখন ক্যাস্টোলা ও লিওনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, মুসলিম আন্দালুসে তখন সেভিল ও গ্রানাডার মধ্যকার সংঘাত চরম স্তরে উপনীত হয়েছিল। আর আমরা পূর্বেই বিস্তারিত উল্লেখ করে এসেছি, কীভাবে উভয় রাষ্ট্র একে অন্যের বিরুদ্ধে আলফোন্সোর সহায়তা কামনা করেছিল এবং কীভাবে তিনি এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উভয় রাষ্ট্রের ওপর জিযিয়ার লাঞ্ছনাকর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে এবং রাষ্ট্রদু'টির সঙ্গে মিত্রতার নাম করে হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে উভয়কে বিপদে ফেলেছিলেন।

ওদিকে জারাগোযা রাষ্ট্রের সঙ্গে আলফোন্সোর সম্পর্ক দিনে দিনে চরম অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল। আলফোন্সোর হাতে যে বছর টলেডোর পতন হয়, ঠিক সে বছরই অর্থাৎ ৪৭৮ হিজরীতে (১০৮৫ খৃস্টাব্দে) জারাগোযার শাসক ইউসুফ আলমু'তামিন বিন হুদ ইন্তেকাল করেন। সংবাদ

Scanned with CamScanner

পেয়েই আলফোন্সো জারাগোযা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং নগরী অবরোধ করেন। কিন্তু আলফোন্সোর জারাগোযা দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবরোধ চলাকালে আলফোন্সোর কাছে সংবাদ পৌঁছয় যে, মাগরেব থেকে মুরাবিতী বাহিনী তাদের আন্দালুসী ভাইদের সাহায্যে রওয়ানা হয়েছে। তৎক্ষণাৎ আলফোন্সো অবরোধ প্রত্যাহার করে মুরাবিতী বাহিনীর মোকাবেলার প্রস্তুতি নিতে ক্যাস্টোলা চলে যান।

আরেক মুসলিম রাষ্ট্র ইয়াহইয়া আলকাদির বিন যিননূনের শাসনাধীন ভ্যালেন্সিয়া এ সময় রাজনৈতিক গোলযোগের শিকার হয়। ৪৭৮ হিজরীর শাওয়াল মাসে (১০৮৬ খৃস্টাব্দে) ইয়াহইয়া ক্যাস্টোলা বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে ভ্যালিন্সেয়ায় প্রবেশ করেছিলেন। এর পরপরই ভ্যালেন্সিয়া শিকার হয় তুরতুশা, দানিয়া ও জারাগোযা রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের শাসক মুনযির বিন হুদের নিষ্পেষণের। বাধ্য হয়ে ইয়াহইয়া খৃস্টান শাসক ষষ্ঠ আলফোন্সো ও জারাগোযা-শাসক আহমাদ আলমুসতাঈন উভয়ের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

জারাগোযার শাসক আহমাদ ভ্যালেন্সিয়া দখলের এ সুযোগ হাতছাড়া করবেন কেন! তৎক্ষণাৎ তিনি ছুটে যান তার পিতা ও পিতামহের দীর্ঘদিনের ভাড়াটে মিত্র কম্বেডোরের কাছে। সিদ্ধান্ত নেন উভয়ে মিলে সাহায্যের নাম করে ভ্যালেন্সিয়া যাবেন এবং ...। কিন্তু স্বার্থের সংঘাতে আহমাদ ও কম্বেডোরের মিত্রতায় ফাটল ধরে এবং প্রকাশ পেয়ে যায় যে, কম্বেডোরের উদ্দেশ্য আহমাদকে সাহায্য করা নয়; বরং নিজেই ভ্যালেন্সিয়া দখল করা। বাধ্য হয়ে আহমাদ বার্সেলোনার প্রশাসক র‍্যামোনের কাছে সহায়তা চান; অপরদিকে কম্বেডোর সহায়তা নেন ষষ্ঠ আলফোন্সোর। কম্বেডোর র‍্যামোনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং ভ্যালেন্সিয়ার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

কম্বেডোর এ বিজয়ের মাধ্যমে ভ্যালেন্সিয়াসহ পূর্ব আন্দালুসে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এ অঞ্চলের ওপর জিযিয়া আরোপ করেন। ইয়াহইয়া নিজের প্রতিরক্ষার বিনিময়ে কম্বেডোরকে বার্ষিক এক লক্ষ দীনার প্রদানের চুক্তি করেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই কম্বেডোরের সঙ্গে আলফোন্সোর সম্পর্কে ভাটা পড়ে। আলফোন্সো কম্বেডোরের স্ত্রী-সন্তানদের আটক করেন এবং ভ্যালেন্সিয়ায় হামলা চালান। কম্বেডোর এ সময় মুরাবিতী বাহিনীর আসন্ন আক্রমণ হতে রক্ষা করতে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মজবুত করার উদ্দেশ্যে জারাগোযায় ছিলেন।[৭১৯]

---

[৭১৯] এ সময়কার ঘটনাবলি বিস্তারিত জানতে : ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/২৩৮-২৫২ ও মুহাম্মাদ সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ৪৭৬-৪৭৭।

Scanned with CamScanner

এভাবেই বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের সবক'টি রাষ্ট্র খৃস্টানশক্তির নিষ্পেষণের জোয়াল কাঁধে তুলে নেয় এবং মুসলিম শাসকবৃন্দের শক্তি ও ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। এ কারণেই পরবর্তী সময়ে পতন ঘটে টলেডো রাষ্ট্রের, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

দুই. মুসলমানদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায়

তৎকালীন বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের শাসকবৃন্দের যে নীতিটি অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও অবমাননাকর ছিল তা হল, তারা খৃস্টানদেরকে জিযিয়া প্রদান করতেন। চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ও অপমান স্বীকার করে তারা ষষ্ঠ আলফোন্সোকে এই আশায় জিযিয়া দিতেন যে, তিনি তাদের ভূমি রক্ষা করবেন, নিশ্চিত করবেন তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকা।

যে নীতি ও কৌশলের সহায়তায় আলফোন্সো তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং বিভক্ত রাষ্ট্রগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা মূলত দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল: ১. বিভক্ত রাষ্ট্রগুলোকে অব্যাহত হামলার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখা। ২. জিযিয়া ও করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে দুর্বল ও অক্ষম করে ফেলা। তার এই নীতির ফলে বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের শাসকবৃন্দ একই সঙ্গে সামরিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার শক্তি হারিয়ে ফেলেন।

বস্তুত তৎকালীন মুসলিম আন্দালুসের পরিস্থিতি এমন ছিল যে, পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদু'টি যেন তৎকালীন আন্দালুসবাসী সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিল।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾

হে মুমিনগণ! ইহুদি ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই একে অন্যের বন্ধু! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না। সুতরাং যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) ব্যাধি আছে, তুমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছ যে, তারা

Scanned with CamScanner

অতি দ্রুত তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তারা বলছে, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা কোন মসিবতের পাকে পড়ে যাব। [সূরা মায়িদা : ৫১-৫২]

বিভক্ত আন্দালুসের শাসকবর্গ নিজেদের আপন ভাইদের পক্ষ থেকে আগত সম্ভাব্য বিপদ ও দুর্যোগের আশঙ্কায় সম্পর্ক গড়েছিল খৃস্টানদের সঙ্গে, কল্যাণের আশা দেখতে পেয়েছিল খৃস্টানদের সঙ্গে হৃদ্যতা ও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের মাঝে। অথচ আল্লাহ তা'আলা আয়াতের পরবর্তী অংশে ইরশাদ করেছেন,

﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾

(কিন্তু) এটা দূরে নয় যে, আল্লাহ (মুসলিমদেরকে) বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে অন্য কিছু ঘটাবেন, ফলে তখন তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল, তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে। [সূরা মায়িদা : ৫২]

আয়াতে বর্ণিত তত্ত্বই বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছিল এই আমলের শেষাংশে, যেমনটি আমরা শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করব। যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বিজয়ের নির্মল বায়ু প্রবাহিত হল, তখন এ শাসকবর্গই খৃস্টানদের সঙ্গে তাদের বাহ্যিক ও আত্মিক অন্তরঙ্গতার বিষয়টি গোপন করল। আল্লাহ যখন তাদের হাকীকত সুস্পষ্ট করে দিলেন এবং মুমিন বান্দাদের সামনে পৃথিবীতেই তাদের স্বরূপ উন্মোচন করে দিলেন, তখন তারা লজ্জিত হল। কিন্তু তার পূর্বেই তো তারা হারিয়ে গেছে আলোচনার দৃষ্টিপথ থেকে। তখন কে জানবে তাদের বর্তমান অবস্থার কথা এবং অনুশোচনায় দগ্ধ হওয়ার কথা!

এ এক অনন্য ও অত্যুচ্চ শিক্ষা! এক সুস্পষ্ট ও অনুপম উপদেশ! মুসলিম উম্মাহর সর্বকালীন-সর্বজনীন সংবিধান ও কারিকুলাম ঐশীগ্রন্থ আল কোরআন এ শিক্ষা ও উপদেশকে চিত্রায়িত করেছে বড় সুস্পষ্ট ভাষায়।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে কৌতুক ও ক্রীড়ার বস্তু বানায়, তাদেরকে ও কাফিরদেরকে বন্ধু বানিয়ো না। তোমরা প্রকৃত মুমিন হলে আল্লাহকেই ভয় কর। [সূরা মায়িদা : ৫৭]

Scanned with CamScanner

অবশ্য এই ব্যাপক নতিস্বীকার-চিত্রের মধ্যেও আত্মসম্ভ্রমবোধ ও প্রত্যাখ্যানের একটি চিত্র উজ্জ্বলরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছিল বাতালইয়ুসে। আলফোন্সোর হামলা ও আক্রমণের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত শাসক ও প্রশাসকবর্গ প্রত্যেকেই যখন তাকে জিযিয়া দিতে শুরু করেছিল, তখন একমাত্র বাতালইয়ুস-প্রশাসক মুতাওয়াক্কিল বিন আফতাসই পরিষ্কার ভাষায় জিযিয়া দিতে অস্বীকৃতি জানান।

৪৮৭ হিজরীতে (১০৮৫ খৃস্টাব্দে) টলেডো জয় করার পর ষষ্ঠ আলফোন্সো অনুভব করেন যে, এখন তিনি বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের সকল শাসক-প্রশাসকের যে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম। আলফোন্সো এবার মুতাওয়াক্কিল বিন আফতাসের কাছে কঠোর ভাষায় একটি বার্তা পাঠান এবং প্রতিবেশী অন্যান্য মুসলিম শাসক যেমন আলফোন্সোকে জিযিয়া প্রদান করছে, মুতাওয়াক্কিলকেও জিযিয়া প্রদান করতে বলেন। উত্তরে মুতাওয়াক্কিল বিন আফতাস যে বার্তাটি প্রেরণ করেন, তাতে একাধারে তার জ্ঞান, আত্মসম্ভ্রমবোধ, দ্বীনী চেতনা ও দৃঢ় সংকল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লেখেন,

> আমাদের কাছে রোমের (খৃস্টান) শাসকের প্রেরিত করের পরিমাণ উল্লেখসহ একখানা পত্র পৌঁছেছে। আমি জানি, তিনি হুঙ্কার দেন, গর্জন করেন, বজ্রের ন্যায় ঝলসে ওঠেন, কখনো একত্র করেন; কখনো-বা বিচ্ছিন্ন করেন। তিনি তার সুবিশাল সেনাবাহিনী ও একতাবদ্ধ পরিস্থিতির কারণে হুমকি-ধমকি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি হয়তো জানেন না যে, মহান আল্লাহর এমন কিছু সৈনিক (ভূপৃষ্ঠে) এখনও আছেন, যাদের দ্বারা আল্লাহ ইসলাম ধর্মকে সমুন্নত করেছেন এবং তাদের মাধ্যমেই আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনকে বিজয়ী করেছেন। কোরআনের ভাষায় তাদের পরিচয়-
>
> ﴿أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾
>
> তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। [সূরা মায়িদা : ৫৪] নিজেদেরকে তারা পরিচিত করেছেন তাকওয়া ও খোদাভীতির পরিচয়ে। আল্লাহর সঙ্গে তারা সম্পর্ক গড়েছেন তাওবা ও অশ্রুশোচনা এবং বিনয় ও কাতরতার মাধ্যমে। যদি রোমের পশ্চাতে কোন বজ্রমেঘ গর্জে ওঠে, তবে (আমাদের বিশ্বাসমতে তাও কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী) আল্লাহরই আদেশে এবং (প্রকৃত) মুমিনদের প্রকাশ

Scanned with CamScanner

করতে[৭২০], ভালো-মন্দের পার্থক্য প্রকাশ[৭২১] এবং মুনাফিকদের পরিচয় উন্মোচনে[৭২২]।

আলফোন্সো! তুমি তোমার পত্রে অবসন্নতা ও বিচ্ছিন্নতার কারণে মুসলমানদের হেয়-প্রতিপন্ন করেছ; তো শুনে রাখ, এ সবই আমাদের গোনাহ ও ত্রুটির কারণে। আজ যদি আমরা সকলে এক কালিমার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সকল শাসকবর্গ এক পতাকাতলে সমবেত হতাম, তাহলে অবশ্যই তুমি বুঝতে, কোন বিপদের স্বাদ তোমাকে আস্বাদন করাতাম, যেমন তিক্ততা গলাধঃকরণ করেছিল তোমাদের বাপ-দাদারা আমাদের মহান পূর্বপুরুষগণের মোকাবেলায়। আরে ভুলে গেলে! এই তো সেদিন তোমাদের বাপ-দাদারা আলমানসুরের জিযিয়ার দাবি মেটাতে প্রতিবছরের প্রদত্ত ধন-ভাণ্ডারের সঙ্গে তুলে দিয়েছিল আপন কন্যাকেও![৭২৩] ... আর আমাদের কথা বলছ; আমরা সংখ্যায় অল্প হতে পারি, পৃথিবীবাসীর কাছ থেকে আমাদের কোন প্রকার সাহায্য পাওয়ার আশা নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে; কিন্তু আমাদের ও তোমাদের মাঝে তো অতিক্রম করার মতো অতল সাগরও নেই, বশে আনতে হবে এমন কঠিন বাধার হিমাদ্রীও নেই। আছে কেবল আমাদের তরবারি-ধ্বনি, যার ধার শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করবে তোমার জাতির গীর্জাদেশ আর আছে ঘাতকের দুর্বার গতি, যার সাক্ষাৎ তোমরা পাবে প্রতিটি সকাল ও সন্ধ্যায়। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ও তার প্রেরিত সুবিন্যস্ত ফিরেশতাদলের দ্বারাই আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করব এবং সহায়তা নেব। আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোন চাওয়া নেই; তিনি ব্যতীত আমাদের কোন আশ্রয় নেই। আর আল্লাহ যেমন বলেছেন, আমরা তো কেবল দু' কল্যাণের কোন একটির প্রত্যাশা করি;[৭২৪] হয়তো তোমাদের বিরুদ্ধে প্রশান্তিদায়ক বিজয়; তবে তো তা বড় কল্যাণ ও নেয়ামত, কিংবা

---

[৭২০] সূরা আলে ইমরানের ১৬৬ নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (অনুবাদক)

[৭২১] সূরা আনকাবুতের ৩৭ নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (অনুবাদক)

[৭২২] সূরা আনকাবুতের ১১ নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (অনুবাদক)

[৭২৩] আলমানসুর বিন আবু আমির যখন খৃস্টান রাজন্যবর্গকে জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করেছিলেন, তখন এই ষষ্ঠ আলফোন্সোর পূর্বপুরুষ নাভারের তৎকালীন খৃস্টান রাজা তার কন্যাকে উপঢৌকন হিসেবে আলমানসুরের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, কেন এর মাধ্যমে আলমানসুরের সুদৃষ্টি লাভ করা যায়। আলমানসুরের পুত্র আবদুর রহমান বিন মানসুর, যার আমলে আমিরিয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল, তিনি এই নাভার-রাজকন্যার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

[৭২৪] সূরা তাওবার ৫২ নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (অনুবাদক)

Scanned with CamScanner

> আল্লাহর পথে শাহাদাত; তবে তো পরবর্তী গন্তব্য সুশীতল জান্নাত! যে বিষয়ে তুমি হুমকি দিচ্ছ, তাতে আল্লাহই আমাদের ভরসা আর তোমাদের প্রস্তুতি ও সৈন্য-সমাবেশের মোকাবেলায় আল্লাহই আমাদের উদ্ধারকর্তা।[৭২৫]

মুতাওয়াক্কিলের পত্র পাঠ করামাত্র ষষ্ঠ আলফোন্সো নির্বাক ও বাকরুদ্ধ হয়ে যান এবং তার সকল চিন্তা ও পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে যায়। আন্দালুসের সকল মুসলিম রাষ্ট্রে সৈন্য প্রেরণ করলেও একমাত্র বাতালইয়ুসে তিনি সৈন্য প্রেরণের বা হামলা করার দুঃসাহস দেখাননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পৃথিবীর সকল মানুষ মিলেও এদের প্রতিরোধ করতে পারবে না। মুতাওয়াক্কিল বিন আফতাস ও তার সঙ্গী অতি সীমিতসংখ্যক সৈন্য যখন আল্লাহকেই নিজেদের ভরসার স্থল বলে মেনে নিয়েছে এবং 'হয় বিজয়, নয় শাহাদাত'– এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিলালী পতাকা আন্দোলিত করেছে, তখন ইসলাম তাদের মর্যাদাবান করেছে; বরং মর্যাদা সমুন্নত করেছে।

অবশ্য এই ঈমানী-চেতনাসমৃদ্ধ পত্রের লেখক এবং জ্ঞান ও গুণের ধারক মুতাওয়াক্কিলের জীবন সমাপ্ত হয়েছিল বড় লাঞ্ছনাকর ও করুণ অবস্থায়। যখন আল্লাহর তাআ'লার পক্ষ হতে আন্দালুসে মুক্তি ও আনন্দের উপলক্ষ নেমে এসেছিল এবং পুরো আন্দালুস খৃস্টানদের মোকাবেলায় একতাবদ্ধ হয়েছিল, তখন ক্ষমতা ও রাজত্বের লালসার কাছে হার মেনে মুতাওয়াক্কিল সখ্যতা করেছিলেন ইসলামের শত্রু আলফোন্সোর সঙ্গে, যিনি একসময় তার প্রবল শত্রু ছিলেন এবং একদিন যাকে তিনি যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছিলেন। আলফোন্সোর সঙ্গে এই মিত্রতা তার কোন কাজে আসেনি। ধর্ম ও জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হিসেবে তিনি এমন নির্মমভাবে হত্যার শিকার হয়েছিলেন, যা পরিহার করাই তার জন্য শ্রেয় ছিল।

তিন. আকস্মিক বীরত্ব!

৪৮৭ হিজরীর সফর মাসে (১০৮৫ খৃস্টাব্দে) টলেডোর পতন ঘটানোর পর আলফোন্সো আরও বেশি দাম্ভিক ও দুর্বিনীত হয়ে ওঠেন। তিনি 'যুল মিল্লাতাইন' বা 'দুই ধর্মের শাসক' উপাধি ধারণ করেন এবং এরপর থেকে

---

[৭২৫] হিজরী অষ্টম শতকের জনৈক আন্দালুসী লেখকের গ্রন্থ *'আলহুল্লাতুল মুওয়াশশিয়া ফী যিকরিল আখবারিল মারাকিশিয়া'*, পৃ : ৩৬-৩৭।

Scanned with CamScanner

নির্বিচারে সকল শাসকদেরকে তুচ্ছজ্ঞান করতে শুরু করেন। টলেডো জয়ের পর তার পরবর্তী পরিকল্পনা ছিল সেভিল রাষ্ট্রকে আপন শাসনকর্তৃত্বে নিয়ে আসা। পূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, আলফ্রেন্সো সেভিলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে জিযিয়া আরোপ ও অব্যাহত হামলার ওপর নির্ভর করতেন। কিন্তু এর পরপরই এমন একটি ঘটনা ঘটে, যার কারণে আন্দালুসের সামগ্রিক পরিস্থিতিই পুরো উল্টে যায়।

আলফোন্সো এ সময় তার জনৈক ইহুদি উযীরের নেতৃত্বে জিযিয়া আদায়ের জন্য একটি প্রতিনিধিদল সেভিল-শাসক মু'তামিদ বিন আব্বাদের কাছে পাঠান। মু'তামিদ তখন আলমারিয়ার প্রশাসক ইবনে সামাদিহের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকায় জিযিয়া আদায়ের প্রতিশ্রুত সময় হতে বিলম্ব করছিলেন। এতে আলফোন্সো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং জিযিয়ার পাশাপাশি কিছু দুর্গের মালিকানাও দাবি করেন। এরপর আলফোন্সোর ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে যায়। তিনি দাবি করেন, তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী কর্ডোভা মসজিদে সন্তান প্রসব করবেন এবং আযযাহরা রাজপ্রাসাদে প্রসূতিকালীন অবকাশ যাপন করবেন। কেননা, খৃস্টান চিকিৎসকগণ আলফোন্সোকে পরামর্শ দিয়েছেন, এ সময় তার স্ত্রীর জন্য আযযাহরার মনোরম আবহাওয়ায় অবস্থান উপকারী হবে; আর ধর্মীয় পাদ্রীগণও জামে কর্ডোভায় সন্তান-জন্মদান কল্যাণজনক হবে বলে জানিয়েছেন! মু'তামিদ আলফোন্সোর এ দাবি শোনামাত্র প্রত্যাখ্যান করেন। আর তখন সেই ইহুদি উযীর, যে সামান্য একজন মুখপাত্র হিসেবে মু'তামিদের দরবারে আগমন করেছিল, সে সভাসদ ও মন্ত্রিপরিষদের সামনে মু'তামিদকে অবমাননাকর ভাষায় কথা বলতে থাকে।[৭২৬]

মু'তামিদের মাঝে স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতির কিছু কিছু অনুভূতি তখনও বিদ্যমান ছিল। আর তাই তার যাকে আত্মসম্ভ্রমবোধ জেগে ওঠে। হারানো মর্যাদাবোধে জাগ্রত হয়ে মু'তামিদ উঠে দাঁড়ান। তিনি তরবারির এক আঘাতে চরম উদ্ধত আলফোন্সোর ইহুদি উযীরের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং তার দেহ কর্ডোভায় শূলে চড়িয়ে দেন। এরপর তিনি অন্যান্য প্রতিনিধিদের বন্দী করেন।

সংবাদ পেয়ে আলফোন্সো উন্মাদ হয়ে যান। ক্রোধান্বিত আলফোন্সো তৎক্ষণাৎ সৈন্যসমাবেশ ঘটিয়ে ছুটে আসেন এবং সেভিলের ভূমিতে

---

[৭২৬] হিময়ারী, *আরফাউল রি'তার*, পৃ : ২৮৮।

Scanned with CamScanner

ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকেন। এরপর তিনি বাজা ও নিয়েব্লা নগরীর উদ্দেশে কয়েকটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন এবং সেভিলের মূল দুর্গের আশেপাশের সব জনপদে আগুন লাগিয়ে দেন। এরপর সাজুনায় ধ্বসংযজ্ঞ চালিয়ে আরও পশ্চিমে এগিয়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও অগ্নিসংযোগ করেন। সবশেষে তিনি সেভিল নগরী অবরোধ করেন।[৭২৭]

সেভিল অবরোধ

সেভিল রাষ্ট্রের অধীনস্থ সকল প্রদেশে ব্যাপক লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের পর ৪৭৮ হিজরীতে (১০৮৫ খৃস্টাব্দে) আলফোন্সো সেভিল নগরী অবরোধ করেন। এরপর তিনি 'বারাহনিস' নামীয় তার জনৈক কর্মকর্তার মাধ্যমে মু'তামিদের কাছে একটি বার্তা পাঠান। বার্তাটি ছিল হুমকি ও প্রতিশোধের প্রচ্ছন্ন ভাষায় পূর্ণ। বার্তায় তিনি লেখেন,

> দুই ধর্মের অনুসারীদের শাসক, নৃপতি আযফুনাশ[৭২৮] বিন স্যাঞ্চোর পক্ষ থেকে মু'তামিদ বিল্লাহর প্রতি; আল্লাহ তাকে সঠিক বিবেচনাবোধ দান করুন এবং শুভবুদ্ধির কল্যাণতা সম্পর্কে অবহিত করুন। আপনি নিঃসন্দেহে টলেডোর ভূমিতে ঘটে যাওয়া প্রকম্পন সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং বিগত কয়েক বছর অবরুদ্ধ থাকায় টলেডো কী দুর্যোগের শিকার হয়েছে, তাও নিশ্চয় জেনেছেন। সেখানকার সমগোত্রীয় ভাইদেরকে আপনারাই বিপদের কোলে ফেলে দিয়ে নিজেরা প্রশান্তি ও আরাম-আয়েশে ডুবে থেকে নিজেদেরকে কালের দুর্যোগের শিকার বানিয়েছেন। বিচক্ষণ তো ঐ ব্যক্তি, যিনি ফাঁদে আটকা পড়ার পূর্বেই নিজেকে জাগ্রত করেন। যদি আমাদের মাঝে পূর্ব সন্ধি ও শান্তিচুক্তি না থাকত এবং আমরা তার সম্মান রক্ষা করতে এবং অঙ্গীকার পূরণে সচেষ্ট হতে বাধ্য না থাকতাম, তাহলে আজ আপনাদের উদ্দেশে আমাদের আগমন হত প্রাণান্তকর জাগ্রত অভিযান, আজ পৌঁছে যেত যুদ্ধের বার্তা ও বার্তাবাহক। অবশ্য (সতর্কীকরণ ও ধীরস্থিরতারও দরকার ছিল;) সতর্কীকরণ সকল ওযরকে রহিত করে দেয় এবং তাড়াহুড়া কেবল সে ব্যক্তিই করে, যে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা করে। আপনার কাছে

---

[৭২৭] হিময়ারী, আরয়াযুল মি'আর, পৃ: ২৮৮ ও ইমাদ, মাওসাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, ৩/৭৩-৭৪।
[৭২৮] আলফোন্সোকে আরবী ঐতিহাসিকগণ এ নামে ডাকতেন।

Scanned with CamScanner

আমার পক্ষ থেকে এ বার্তা যিনি নিয়ে যাচ্ছেন, তার নাম এলসিড বারাহুনিস। তিনি আপনার মতো ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য উপযুক্ত বিবেচনাবোধ, আপনার দেশ ও জনগণকে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের যোগ্য ব্যক্তি। জটিল ও সূক্ষ্ম ইস্যুতে তাকে নিশ্চিন্তে স্থলবর্তী নিয়োগ করা যায় এবং তার পরামর্শ মেনে নিলে সমস্যা নয় বরং সংশোধনের পথই বেরিয়ে আসে। আপনি যদি তার সুপরামর্শ গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে তার পরামর্শ নিয়ে ভেবে দেখেন, আশা করি তা আপনার জন্য শান্তির বার্তা বয়ে আনবে; আপনার চারপাশে ও চতুর্দিকে বয়ে যাবে শান্তির বন্যা।[৭২৯]

বার্তাবাহক যখন বার্তা নিয়ে মু'তামিদের দরবারে উপস্থিত হল, মু'তামিদ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রিপরিষদ্ ও আলিমসমাজকে সমবেত করলেন। তাদের সামনে চিঠিটি পাঠ করা হলে তৎকালীন আন্দালুসের সর্বজনমান্য ফকীহ আবু আবদুল্লাহ বিন আবদুল বার কেঁদে উঠে বললেন, আমাদেরকে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল যে, এসব ধন-সম্পদের পরিণতি হল এই; দেখিয়ে দেওয়া হল যে, অভিশপ্ত শত্রুর সঙ্গে সমঝোতার অর্থ হল তার ক্ষমতা ও রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা। যদি আমরা নিজেরা পরস্পর একজোট হয়ে একে অপরকে সহযোগিতা করতাম, তাহলে আজ আমরা এই অনৈক্যের লাঞ্ছনায় আটকা পড়ে ধ্বংসের শিকার হতাম না। এখন আমাদের কেবল একটি করণীয়ই আছে– আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং কাফিরশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া।

এরপর মু'তামিদ আলফোন্সোর চিঠিটি নিয়ে তাতে লিখলেন,

اَلذُّلُّ تَأْبَاهُ الْكِرَامُ وَدِيْنُنَا ... لَكَ مَا تَدِيْنُ بِهِ مِنَ الْبَأْسَاءِ
سُنَّتَاكَ سِلْمًا مَا أَرَدْتَ وَبَعْدَ ذَا ... نَغْزُوْكَ فِي الْإِصْبَاحِ وَالْإِمْسَاءِ

সম্ভ্রান্ত-অভিজাত ব্যক্তিগণ অবমাননা ও লাঞ্ছনাকে প্রশ্রয় দেন না; আর তোমার সঙ্গে আমাদের একমাত্র নীতি হল যুদ্ধ ও লড়াই।
আমরা তোমাকে শান্তির প্রস্তাব দিয়েছি; তুমি তা চাওনি। সুতরাং এরপর আমরা তোমার বিরুদ্ধে লড়ে যাব সকাল-সন্ধ্যা।

اَللهُ أَعْلَى مِنْ صَلِيْبِكَ فَادْرِعْ ... لِكَتِيْبَةٍ خَطَبَتْكَ فِي الْهَيْجَاءِ
سَوْدَاءَ غَابَتْ شَمْسُهَا فِي غَيْمِهَا ... فَجَرَتْ مَدَامِعُهَا بِفَيْضِ دِمَاءِ

[৭২৯] যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ৩২/২৫ ও আলহুলালুল মুতরাশশিয়া, পৃ: ৩৮-৩৯।

Scanned with CamScanner

তোমার ক্রুশের চেয়ে (আমার) আল্লাহ অনেক বেশি সুমন্নত। সুতরাং তুমি এমন বাহিনীর মোকাবেলায় প্রস্তুত হও, পরিধান কর যুদ্ধ-পোশাক, যারা তোমাকে সমরের বার্তা পাঠ করাবে।

ভয়ঙ্কর কৃষ্ণদর্শন সে বাহিনীর তেজ ও শৌর্য-দীপ্তি মেঘের আড়ালে সুপ্ত আর তাদের অশ্বনালী প্রবহমান রক্তের স্রোতধারায়।

مَا بَيْنَنَا إِلَّا الْنِّزَالُ وَمِئْنَةٌ ... قَدْ حَمَّتْ زِنَادَ الصَّبْرِ فِي الْفَنَاءِ
فَلَتَقْدُمَنَّ إِذَا لَقِيتَ أَسِنَّةً ... زُرْقًا تُرَى بِالسَّوْجَنَوِ الْسَوْجَنَاءِ

আমাদের মাঝে এখন একটাই ফয়সালা– যুদ্ধ এবং যুদ্ধ। যুদ্ধ ভেঙে দিয়েছে ধৈর্যের বাঁধ। যখন তুমি আমাদের সাক্ষাৎ পাবে, তখন দেখবে নীলাভ শীতল দন্তরাজি, দেখবে ভয়ঙ্কর দর্শন চোয়াল!

এরপর তিনি লিখলেন,

আল্লাহর অনুগ্রহের সাহায্যপ্রাপ্ত, মু'তামিদ বিল্লাহ মালিক মুহাম্মাদ বিন মু'তাবিদ বিল্লাহর পক্ষ হতে স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী আযফুনাশের প্রতি, যে নিজেকে রাজাধিরাজ ও দু' ধর্মের শাসক বলে দাবি করে থাকে। শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর, যে হিদায়াত ও সৎপথের অনুসরণ করে। প্রথম কথা হল, তার এ দাবি মোটেও ঠিক নয় যে, সে দু' ধর্মের শাসক। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরাই এ উপাধির অধিক উপযুক্ত। কেননা, আমরা যে বিস্তৃত খৃস্টান অঞ্চল জয় করেছি, রণকুশলতার যে অনন্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছি, তোমাদের সামর্থ্যও কোনদিন তার কাছে পৌঁছবে না, তোমাদের ধর্ম কোনদিন এরূপ দক্ষতার পরিচয়ও পাবে না। এ তো সৌভাগ্য নয়, সৌভাগ্যের তন্দ্রা, যা থেকে তোমার আহ্বায়ক শিক্ষাগ্রহণ করেছে। আর তোমার বর্তমান সুদক্ষ আহ্বায়ক সঠিক চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণই উদাসীন। তাই বাধ্য হয়েই আমরা আরোহণ করেছি এমন বাহনে, যা বুদ্ধিমত্তাকে তীক্ষ্ণ করে। ভাগ্যের আনুকূল্যে যে সাফল্য তুমি পেয়েছ, তার ওপর ভিত্তি করে তোমার ত্বরা ও আত্মমুগ্ধতা দেখে আমার আশ্চর্য লাগছে। বল, কবে কোথায় আমাদের পূর্বসূরিদের ওপর তোমাদের বাপ-দাদাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল? কবে ছিল সাহায্য-সহযোগিতা? ভুলে গেলে, কারা ছিল সেবাভোগী আর কারা ছিল সেবক? সুতরাং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

Scanned with CamScanner

সবশেষে তিনি লিখলেন,

> সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি তোমার হুমকি-ধমকি ও বেপরোয়া ভাবের কারণে মৃত্যুকে আমাদের সামনে তুচ্ছ করে দিয়েছেন। আল্লাহই তার দ্বীনের নুসরত করবেন, কাফিররা যতই অপছন্দ করুক না কেন। আর তোমার বিরুদ্ধে আমরা তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি।[৭৩০]

এরপর মু'তামিদ সেভিলের নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করলেন। এদিকে মুসলমানদের অন্তরে মানসিক পরাজয়ের চেতনা ছড়িয়ে দিতে এবং তাদের শক্তিকে ধীরে ধীরে দুর্বল করতে ষষ্ঠ আলফোন্সো এবার নতুন চাল চাললেন। তিনি মু'তামিদ বিল্লাহর উদ্দেশ্যে কর্কশ ভাষার আরও একটি বার্তা পাঠালেন। এবার তিনি লিখলেন,

> মাছির প্রকোপের মাঝে আমার অবস্থান বেশ দীর্ঘায়িত হচ্ছে আর গরমও বেশ পড়েছে। তাই তোমার রাজদরবার থেকে আমাকে একটি পাখা উপহার পাঠাও, যেন পাখার বাতাসে আরাম পাই এবং মাছিও তাড়াতে পারি।

আলফোন্সো চরম দাম্ভিকতা ও অহঙ্কারের পরিচয় দিয়ে এ কথা বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, দীর্ঘদিন ধরে সেভিল অবরোধ করায় তার কষ্ট হচ্ছে কেবল গরম আবহাওয়া ও মশা-মাছির কারণে; অন্যথায় মু'তামিদ, তার সেনাবাহিনী, মুসলিম জাতি, মুসলিম অঞ্চলের দুর্গ, নগরপ্রতিরক্ষাব্যবস্থা– এগুলো যেন আলফোন্সোর কাছে মশা-মাছির চেয়েও তুচ্ছ!

> আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত মু'তামিদ চিঠিটি হাতে নিয়েই ওল্টালেন এবং অপর পিঠে উত্তর লিখে ষষ্ঠ আলফোন্সোর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মু'তামিদের এবারের জবাব দীর্ঘ ছিল না, বড় জোর এক-দু' লাইনের হবে! কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত জবাব পাঠ করামাত্র ভয়-ডর-আতঙ্ক একসঙ্গে আলফোন্সোকে ঘিরে ধরল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি তার সেনাবাহিনী নিয়ে যেদিক থেকে এসেছিলেন, সেদিকের পথ ধরলেন।

মু'তামিদ বেশি কিছু লেখেননি। তিনি লিখেছিলেন,

> হ্যাঁ, তোমার চিঠি পড়েছি এবং তোমার আত্মপ্রসাদ ও আত্মমুগ্ধতা

---

[৭৩০] যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৩২/২৪-২৬। আরো দেখুন : হিমইয়ারী, *আরয়াযুল মি'তার*, পৃ : ২৮৮ ও *আলহুল্লাতুল মুওয়াশশিয়া*, পৃ : ৩৮-৪২।

Scanned with CamScanner

> উপলব্ধিও করেছি। ইনশাআল্লাহ, তোমার যত্ন-আত্তি নেওয়ার জন্য শীঘ্রই আমি শামতী[৭৯১] চামড়ার তৈরি পাখার ব্যবস্থা করছি, যা মুরাবিতী সৈন্যদের হাতে থাকবে। দুঃখের বিষয়! সে পাখার বাতাস তোমার অনাচার থেকে আমাদের স্বস্তি দেবে, তোমায় কোন স্বস্তি দেবে না।[৭৯২]

মু'তামিদের সামনে তখন এই হুমকির ভাষা প্রয়োগ করা ছাড়া কোন বিকল্পও ছিল না। বাধ্য হয়েই তিনি মুরাবিতীদের কাছে সাহায্য তলবের বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। আর ষষ্ঠ আলফোন্সো ভালো করেই জানতেন যে, মুরাবিতী কারা? তিনি সমকালীন বহিঃবিশ্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। আর তাই কালবিলম্ব না করে তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করলেন এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে একপ্রকার পালিয়ে বাঁচলেন।

এতদিনে মু'তামিদ বুঝতে পারলেন খৃস্টানদেরকে জিযিয়া প্রদান করে তিনি কত মারাত্মক ভুল ও অপরাধ করেছেন। মুসলিম সাম্রাজ্যে খৃস্টানদেরকে আক্রমণের সুযোগ করে নিয়ে তিনি কত বড় আত্মঘাতী কাজ করেছেন। তিনি নিশ্চিত হলেন যে, এখন আলফোন্সোর মোকাবেলা করতে হলে মুরাবিতীদের সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নেই। তিনি যখন বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের অন্যান্য শাসকবর্গের সামনে এই প্রস্তাব রাখলেন, তখন তাদের কেউ কেউ এতে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলল, রাজত্ব ও শাসনক্ষমতা মানুষকে মায়াহীন করে দেয় আর এক খাপে দুই তরবারি একত্র হতে পারে না। প্রত্যুত্তরে মু'তামিদ তাদেরকে যা বলেছিলেন, তা আজ প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে,

'উকরের রাখালগিরি করার চেয়ে উট চড়ানো শতগুণে শ্রেয়'।[৭৯৩]

---

[৭৯১] মাগরেবের বিখ্যাত গোত্র লামতা-এর প্রতি সম্বন্ধিত করে বলা হয়েছে। দেখুন : ইয়াকুত আলহামাবী, মু'জামুল বুলদান, ৫/২৩।

[৭৯২] দেখুন : হিময়ারী, আররাওযুল মি'তার, পৃ : ২৮৮, নিফাতু জাযীরাতিল আন্দালুস, পৃ : ৮৫, যাহারী, সফহুত তীব, ৪/৩২৮ ও আননাসিরী, আলইসতিকসা লি আখবারি দুয়ালিল মাগরিবিল আকসা, ২/৩৮।

[৭৯৩] দেখুন : যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ৩২/২৫, হিময়ারী, আররাওযুল মি'তার, পৃ : ২৮৮ ও আননাসিরী, আলইসতিকসা লি আখবারি দুয়ালিল মাগরিবিল আকসা, ২/৩৮।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
টলেডোর পতন

মুসলিম আন্দালুসের বিভক্ত আমলের পারস্পরিক হানাহানি ও সংঘাতের অনিবার্য পরিণতিই হল টলেডোর পতন। ৪৭৮ হিজরীতে (১০৮৫ খৃস্টাব্দে) টলেডোর পতন ঘটে।

টলেডো তো সেই নগরীর নাম, যা ছিল মুসলিম আন্দালুসের দুর্ভেদ্য সীমান্ত-শহর।

টলেডো তো সেই অভিজাত নগরী, যা মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক মুসলিম বিজয়াভিযানের পূর্বে গোথ গোষ্ঠীর শাসনামলে ছিল গোথ সরকারের রাজধানী শহর।

টলেডো সেই নগরীর নাম, যা মাত্র ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে তারিক বিন যিয়াদ জয় করেছিলেন। পৌঁছার একমাসের দূরত্ব বাকি থাকতেই তিনি এ শহর জয় করেছিলেন মুসলমানের স্বভাবজাত ভীতির শক্তিতে।

টলেডো সেই সীমান্তশহরের নাম, যেখানে উপবিষ্ট থেকে খলীফা আবদুর রহমান আননাসির খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো থেকে আগত জিযিয়া গ্রহণ করতেন। এখান থেকেই তিনি ও তার উত্তরসূরি মুসলিম মুত্তাকী শাসকবর্গ উত্তরের খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামী বিজয়াভিযানের লক্ষ্যে রওয়ানা হতেন।

টলেডো সেই সুরক্ষিত সুবিশাল নগরীর নাম, যা কেবল দক্ষিণ দিক ছাড়া সবদিক থেকেই ঘন পর্বতমালা বেষ্টিত।

তাই আসুন, ঐতিহাসিক এ নগরীটির পতন-পর্বের প্রতিটি দিক কিছুটা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে পাঠ করি।

টলেডোর পতন যেভাবে ... যে পথে ...

খৃস্টান রাজা প্রথম ফার্ডিনান্ড ও তার পুত্র ষষ্ঠ আলফোন্সোর আমলে টলেডো বহুবার খৃস্টানশক্তির আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। এছাড়া মুসলিম শাসকবৃন্দের পারস্পরিক বিভেদ-বিভক্তির প্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য রাষ্ট্রের শাসকবর্গও বহুবার হামলা চালিয়েছে টলেডোতে। আন্দালুসের খৃস্টানশক্তি

Scanned with CamScanner

ভালো করেই জানত, মুসলিম আন্দালুসে টলেডোর অবস্থান মালার সুতার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ। কোনমতে যদি এ সুতা ছিঁড়ে ফেলা যায়, তাহলে নিশ্চিত করেই পর্যায়ক্রমে একে একে পতন ঘটবে কর্ডোভা, বাতালইয়ুস, গ্রানাডা, সেভিলসহ মুসলিম আন্দালুসের সকল রাষ্ট্রের।

এক. আলমামুন বিন যিননুনের অতিসরলতা

আলমামুন যদি জানতেন যে, এই আলফোন্সোই ক'দিন পর টলেডোর পতন ঘটাবেন, তাহলেও কি তিনি আলফোন্সোর এরূপ উদার আতিথেয়তা ও আদর-আপ্যায়ন করতেন? নিঃসন্দেহে আলফোন্সোর সঙ্গে আলমামুনের এ আচরণ ছিল অতিসরলতা; বরং চরম নির্বুদ্ধিতা।

ভাই স্যাঞ্চোর সঙ্গে গৃহযুদ্ধে পরাভূত আলফোন্সো আশ্রয় নেন মামুনের রাজত্বে আর মামুন তাকে সাদরে আতিথেয়তা প্রদান করেন দীর্ঘ নয়টি মাস! এরপর তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেন, তিনি টলেডোতে আলমামুন ও তার পরবর্তী বংশধরদের ক্ষমতা রক্ষায় সহায়তা করবেন। আলফোন্সোও হাসিমুখে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সম্ভবত আলফোন্সো তখন এই লোকটির নির্বুদ্ধিতা দেখে অবজ্ঞাভরে মুচকি হেসেছিলেন!

যে ফার্ডিনান্ড মামুনের স্কন্ধে বরং আন্দালুসের মুসলিম জনগণের স্কন্ধে কর-ট্যাক্স ও অব্যাহত হামলার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, আলমামুন সেই ফার্ডিনান্ডের পুত্র আলফোন্সোকে আতিথ্য প্রদান করলেন! যে আলফোন্সো আর ক'দিন পরই টলেডোর পতন ঘটাবেন, সেই আলফোন্সোকে জামাই আদরে রাখলেন টলেডোর মাটিতে! হায়! কী চরম নির্বুদ্ধিতা!

আলফোন্সো আলমামুনের তুলনায় প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি টলেডোর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন, টলেডোর জল-বায়ু সেবন করেছেন, জনগণের সঙ্গে মিশেছেন, টলেডোর স্পর্শকাতর বিষয়াদি, শক্তি ও দুর্বলতার দিকগুলো জানার চেষ্টা করেছেন এবং গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন নগরীর প্রতিটি প্রাচীরের খুঁটিনাটি। আলফোন্সো তার নির্বাসিত জীবনকে পরিণত করেছিলেন এমন এক গোয়েন্দা অভিযানে, যে অভিযানের প্রতিটি তথ্য-উপাত্ত শীঘ্রই তার কাজে আসবে।

এর কয়েক মাস পরই ১০৭২ খৃস্টাব্দে আলফোন্সো ক্যাস্টোলার শাসনক্ষমতা ফিরে পান আর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করেন টলেডোর পতন ঘটানোর সামরিক প্রস্তুতি।

Scanned with CamScanner

দুই. কাদির বিন যিননূনের দুঃশাসন

৪৬৭ হিজরীতে (১০৭৫ খৃস্টাব্দে) কর্ডোভায় আলমামুনের ইন্তেকালের পর তার পৌত্র ইয়াহইয়া বিন ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া বিন যিননূন তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং 'আলকাদির বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন।

টলেডোর এই নতুন শাসক কাদির বিল্লাহ ছিলেন অবিবেচক, দুশ্চরিত্র একজন শাসক। একদল অসৎ দুষ্ট চরিত্রের সঙ্গী দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত ছিলেন। তিনি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিলেন রাজপরিবারের নারীদের দ্বারা। আলকাদির বিল্লাহ তার রাত-দিন ব্যয় করতেন সুন্দরী নারী ও গায়িকাদের পেছনে। তার অসৎ সঙ্গীরাই তাকে প্ররোচিত করে রাষ্ট্রের লৌহমানব বিদগ্ধ উযীর ইবনুল হাদীদীর বিরুদ্ধে মন বিষিয়ে তোলে এবং তাদের প্ররোচনাতেই ৪৬৮ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে (১০৭৬ খৃস্টাব্দে) তিনি ইবনুল হাদীদীকে হত্যা করেন।[৭৩৪]

কিছুদিন অতিবাহিত না হতেই কাদির বিল্লাহ তার দুঃশাসন ও অসৎ সঙ্গ-নির্ভরতার শাস্তি ভোগ করতে শুরু করেন। বিদ্রোহ ও উদ্বেগমূলক পরিস্থিতি চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরে। একদিকে পার্শ্ববর্তী জারাগোযার শাসক মুকতাদির বিন হুদ আক্রমণ ও হামলার মাধ্যমে তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখেন, অপরদিকে তার করদ রাষ্ট্র ভ্যালেন্সিয়ার প্রশাসক আবু বকর বিন আবদুল আযীয তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ভ্যালেন্সিয়ার স্বাধিকার ঘোষণা করেন। তৃতীয় আরেক দিক থেকে খৃস্টানরা তার রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে হামলা চালাতে শুরু করে। বড় অঙ্কের কর প্রদান না করায় অ্যারাগোন-শাসক স্যাঞ্চো রোমেরো তার কাছ থেকে কোনকা নগরী কেড়ে নিতে উদ্যত হন। চারিদিক থেকে ধেয়ে আসা এতসব বিপদে উদ্বিগ্ন আলকাদির বিল্লাহ একজন সহায়ক ও বন্ধুকে হন্যে হয়ে খুঁজছিলেন। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি আশ্রয় নেন ষষ্ঠ আলফোন্সোর কাছে এবং তার কাছেই কামনা করেন সামরিক সহায়তা। আলফোন্সোও সহজেই সাহায্য করতে সম্মত হন। কিন্তু বিনিময়?!

আলফোন্সো এই শর্তে কাদির বিল্লাহকে সাহায্য করতে সম্মত হন যে, বিনিময়ে তিনি আলফোন্সোকে সীমান্তবর্তী কিছু দুর্গ সমর্পণ করবেন। কাদির বিল্লাহ শর্ত মেনে নেন, সমর্পণ করেন সারিয়া, ক্বোটরিয়া ও কানালিশ দুর্গের নিয়ন্ত্রণ। সঙ্গে দাবিমতো আরও প্রদান করেন বিশাল অঙ্কের সম্পদ। আলফোন্সোর দাবি মেটাতে গিয়ে আলকাদির বিল্লাহর তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। কিন্তু তারপরও মেটাতে হবে তার চাহিদা-দাবি; ক্ষমতার মায়া যে বড় কঠিন!

---

[৭৩৪] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৭/১৫০-১৫৫, ইবনুল খতীব, *আ'মালুল আ'লাম*, পৃ : ১৭৯ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/১০৭।

Scanned with CamScanner

তিন. টলেডোবাসীর বিদ্রোহ

চারিদিক থেকে ধেয়ে আসা বিপদের এই ঢলের মাঝে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে আলকাদিরের ওপর নেমে আসে নতুন এক বিপদ। টলেডোর অভ্যন্তরেই ষড়যন্ত্রকারীরা আলকাদির ও তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। আলফোন্সোর সঙ্গে আলকাদিরের এই মানহানিকর সমঝোতা চুক্তি এবং টলেডোর ভাগ্যে অশান্তি ও দুর্যোগ টেনে আনাকে জনগণ অপছন্দ করে এবং দেশের অভ্যন্তরেই তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। প্রতিকূল পরিবেশে বাধ্য হয়ে আলকাদির টলেডো ছেড়ে পালান এবং ওয়াবযা দুর্গে আশ্রয় নেন। টলেডোবাসী হয়ে পড়ে শাসক, সরকার ও শাসনহারা। বাধ্য হয়ে তারা ৪৭২ হিজরীতে বাতালইয়ুস-শাসক মুতাওয়াক্কিল বিন আফতাসকে টলেডোর শাসনভার গ্রহণ করার আবেদন জানায়।

চার. আলফোন্সো কর্তৃক আলকাদিরকে ক্রুসেড যুদ্ধ-বৃত্তে পুনঃআনয়ন

কিছুদিন পর আলকাদির তার আশ্রয়স্থল ওয়াবযা থেকে কোনকা নগরীতে চলে যান এবং সেখান থেকেই আলফোন্সোর কাছে সহায়তা প্রার্থনা করেন। তিনি আলফোন্সোকে তার পিতামহ আলমামুনের সঙ্গে তার হৃদ্যতা, তার প্রতি আলমামুনের দয়া-অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বস্তুত এটি ছিল আলকাদিরের ওপর প্রভাব বিস্তার এবং এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে পুরো টলেডো নগরীর নিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্য আলফোন্সোর একটি পরম সুযোগ। তাই আলফোন্সো আলকাদিরের প্রার্থনায় সাড়া দেন এবং একদল সৈন্য পাঠিয়ে তাকে পুনরায় টলেডোর কর্তৃত্ব ফিরে পেতে সহায়তা করেন। আলকাদির ক্যাস্টোলার শাসক আলফোন্সোর সহায়তায় পুনরায় টলেডোর ক্ষমতা ফিরে পান। খৃস্টান বাহিনী টলেডো অবরোধ করে। ফলে মুতাওয়াক্কিল বিন আফতাস টলেডো ছাড়তে বাধ্য হন। তবে টলেডো ত্যাগ করার পূর্বে তিনি আলকাদিরের সম্পদ থেকে আসবাবপত্র, বিছানা-পরিচ্ছদ, পাত্র, অস্ত্র-শস্ত্র, গ্রন্থাদি যা পেয়েছিলেন, সব বাতালইয়ুসে পাঠিয়ে দেন। আলফোন্সোর বাহিনী আলকাদিরকে টলেডোতে প্রবেশ করতে এবং স্বেচ্ছা-পলায়নের দশ মাস পর পুনরায় ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। খৃস্টান সৈন্যদের প্রত্যক্ষ প্রহরায় আলকাদির টলেডোতে প্রবেশ করেন। টলেডোবাসীর অবস্থা তখন কীরূপ ছিল তা সহজেই অনুমেয়; বাইরে খৃস্টান বাহিনীর অবরোধ, ভেতরে মুতাওয়াক্কিলের পলায়ন ও লুণ্ঠনপ্রস্তুতি। এটি ৪৭৩ হিজরীর (১০৮০ খৃস্টাব্দের) ঘটনা।[৭০৫]

---

[৭০৫] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৭/১৬৩-১৬৪ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/১০৮।

Scanned with CamScanner

পাঁচ. আলফোন্সোর টলেডো অবরোধ

আলফোন্সো অতি সন্তর্পণে টলেডো ধ্বংসের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করছিলেন। বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের সবগুলো রাষ্ট্র করায়ত্ত করার যে সুবিস্তৃত পরিকল্পনা আলফোন্সোর ছিল, তা বাস্তবায়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আলফোন্সো টলেডো দখলের সামরিক ছক প্রণয়ন করেন। এদিকে আলফোন্সোর ক্রমবর্ধমান শক্তি ও নিয়ন্ত্রণাতীত ক্ষমতার বিষয়টি উপলব্ধি করে সেভিল-শাসক মু'তামিদ বিন আব্বাদ ভাবছিলেন, আলফোন্সোকে রুখতে কী করা যায়? কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি একজন সম্ভ্রান্ত ও আত্মসম্ভ্রমবোধে উজ্জীবিত শাসকের ধারায় প্রবাহিত হয়নি। আক্রান্ত টলেডোকে সহায়তা করা কিংবা স্বপ্রণোদিত হয়ে সকল মুসলিম শাসকদের একত্র করার উদ্যোগ নেওয়ার চিন্তা একবারও তার মাথায় আসেনি। বরং ক্যাস্টোলা বাহিনীর আগ্রাসন অভিযানের পরবর্তী শিকার সেভিল হতে পারে– এই আশঙ্কায় তিনি এক কাপুরুষোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আপন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য আলফোন্সোর সঙ্গে সন্ধি ও শান্তি চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার উযীর ইবনে আম্মারকে আলফোন্সোর সঙ্গে সমঝোতার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

- মু'তামিদ প্রতিবছর ক্যাস্টোলার শাসককে জিযিয়া প্রদান করবেন।
- মু'তামিদকে টলেডোর দক্ষিণ অঞ্চলে অভিযান চালানোর সুযোগ দেওয়া হবে। বিনিময়ে তিনি সে অঞ্চলে অবস্থিত সিরামোরেনিয়ার উত্তরাঞ্চল (শারাত পর্বতমালা) ক্যাস্টোলা-শাসক (আলফোন্সো) কে প্রদান করবেন।
- আলফোন্সোর টলেডো দখল পরিকল্পনায় মু'তামিদ কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না।

এভাবে মু'তামিদ নিজের শাসন-ক্ষমতার ভবিষ্যৎ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ইসলামী দুর্গের পতনের সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল মু'তামিদের অসংখ্য বিচ্যুতির মাঝে বিরাট এক রাজনৈতিক বিচ্যুতি, যাতে উম্মাহ ও দ্বীনের প্রতি তার অবজ্ঞা ও দায়িত্বহীনতার বিষয়টি একেবারে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে।[৭৩৬]

৪৭৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে (১০৮২ খৃস্টাব্দে) আলফোন্সো টলেডো

---

[৭৩৬] সুহাইল তাকুশ, *তারীখুল মুসলিমীন ফিল আন্দালুস*, পৃ : ৪৪৩ ও ইমান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/১০৯।

Scanned with CamScanner

অবরোধ করেন এবং অব্যাহত আক্রমণের মাধ্যমে টলেডোর নিরাপত্তাব্যবস্থা দুর্বল করার চেষ্টা করেন। এভাবে অতিবাহিত হয় পূর্ণ চার বছর। এ সময় খৃস্টান বাহিনী টলেডোর নগরপ্রাচীরের বাইরের অংশের ফসল, ক্ষেত-খামার ও জনবসতিতে নির্বিচারে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। জনগণ প্রচণ্ড সংকট ও দুর্যোগের শিকার হয়। কিন্তু পুরো মুসলিম আন্দালুসে তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসার মতো কোন সাহায্যকারী ছিল না।

খৃস্টান বাহিনী যখন টলেডো অবরোধ করে, বিভক্ত মুসলিম আন্দালুসের অন্যান্য রাষ্ট্রের শাসকবৃন্দ তাদের মুসলিম ভাইদের সহায়তায় এগিয়ে আসার পরিবর্তে উল্টো জিযিয়া ও করের স্তূপ আলফোন্সোর সামনে পেশ করে তার প্রতি নিজেদের হৃদ্যতা ও মিত্রতা প্রমাণে সচেষ্ট হয়। কিছুদিন পূর্বে টলেডো থেকে বিতাড়িত মুতাওয়াক্কিল বিন আফতাস ব্যতীত একজনও আলফোন্সোকে প্রতিরোধ করার কিংবা ন্যূনতম আপত্তি করার দুঃসাহসটুকু দেখাতে পারেনি। আরও পরিতাপের বিষয়, যে সময় টলেডো খৃস্টান বাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ অবস্থায় পতনের প্রহর গুনছিল, তখনও খণ্ডিত মুসলিম আন্দালুসের শাসকবর্গ ব্যস্ত ছিল পারস্পরিক হানাহানি ও ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে কিংবা বিভিন্ন খৃস্টান বাহিনীর লাগাতার আক্রমণ প্রতিরোধে।

ছয়. ... এবং অবশেষে টলেডোর পতন

এভাবেই টলেডো হয়ে পড়ল নিঃস্ব ও রিক্ত! সহায়হীন ও আশ্রয়হীন!

টলেডো অপেক্ষা করতে লাগল সুনিশ্চিত পতনের এবং অনুতাপের প্রহরের!

টলেডোকে ফেলে রাখা হল দুর্ভাগ্যপীড়িত সুকরুণ পরিণতি ভোগ করার জন্য!

৪৭৭ হিজরীর শরতে আলফোন্সো নগরপ্রাচীরের আরও নিকটে চলে আসেন এবং অবরোধ আরও দৃঢ় ও মজবুত করেন। এ সময় টলেডো-শাসক আলকাদিরের অবস্থান ও ভূমিকা ছিল যথেষ্ট সন্দেহজনক। সম্ভবত তিনি খৃস্টানদের সঙ্গে গোপনে কোন সমঝোতা করেছিলেন। নগরবাসী অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিল অবশিষ্ট মুসলিম আন্দালুসের দিকে; হয়তো কেউ এগিয়ে আসবে সাহায্য নিয়ে, হয়তো কেউ ভাববে তাদের মুসলমান ভাইদের কথা। কিন্তু হায়! তখনকার আন্দালুসের মুসলমানদের মাঝে যে তাদেরকে উদ্ধার করার মানসিকতা কারও ছিল না!

দীর্ঘ অবরোধের মাধ্যমে আলফোন্সো যখন টলেডোবাসী মুসলমানদের অবস্থা সংকীর্ণ করে ফেলেন, টলেডোবাসী তাদের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল আলফোন্সোর কাছে প্রেরণ করে সন্ধি ও শান্তিচুক্তির বিষয়ে

Scanned with CamScanner

আলোচনা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বিজয়ের তীরে নোঙর করতে বিভোর সুবিনীত আলফোন্সো তাদেরকে সরাসরি অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে থাকেন এবং তাদের উপস্থিতিতেই অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের দূতদেরকে তলব করেন। টলেডোর প্রতিনিধিদলের সম্মুখে সকল রাষ্ট্রের দূতগণ আলফোন্সোর প্রতি মিত্রতা ও হৃদ্যতার কথা সগৌরবে ঘোষণা করে, প্রদান করতে থাকে নানা উপঢৌকন। টলেডোর প্রতিনিধিদল বুঝতে পারে সবকিছুই। তারা আশাভঙ্গ হৃদয়ে ব্যর্থ ও রিক্ত হস্তে ফিরে আসে। টলেডোবাসীও তাদের পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায়।[৭৩৭]

ইতোমধ্যে মূল নগরীর অবরোধের নয় মাস পেরিয়ে গেছে। সন্ধি বা যুদ্ধবিরতির সব আশা শেষ হয়ে গেছে। প্রতিরোধের সকল শক্তি ও সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর এবং সকল মুসলিম শাসকবর্গ টলেডোকে নিজেদের দ্বীন-ধর্ম, মর্যাদা ও আত্মমর্যাদার বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়ার পর টলেডো এবার আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হয়।

আত্মসমর্পণের শর্তাবলি

- নগরবাসীর জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।
- কেউ চাইলে তার সম্পদ নিয়ে টলেডো ত্যাগ করতে পারবে। আবার কেউ তার ধন-সম্পদ নিয়ে যাওয়ার জন্য টলেডো ফিরতে চাইলেও অনুমতি দেওয়া হয়ে।
- ইতঃপূর্বে নিজেদের মুসলিম শাসককে টলেডোর জনগণ যে হারে কর ও খাজনা প্রদান করত, সে পরিমাণ সম্পদই তারা ক্যাস্টোলার শাসককে জিযিয়া হিসেবে প্রদান করবে।
- মুসলমানগণ টলেডোর কেন্দ্রীয় মসজিদ চিরদিন সংরক্ষণ করতে পারবে। পাশাপাশি তারা শরীয়তে ইসলামীর শিআ'র ও প্রতীক, আচার ও রীতি সংরক্ষণ এবং শরীয়ত পালনের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে।
- টলেডো রাষ্ট্রের অধীন সকল দুর্গের নিয়ন্ত্রণ খৃস্টান বাহিনীকে প্রদান করা হবে।

টলেডো-শাসক আলকাদির বিল যিননূনের হিস্যা!

ক্যাস্টোলা-শাসক ষষ্ঠ আলফোন্সো আলকাদিরকে ভ্যালেন্সিয়ার প্রশাসনক্ষমতা লাভের সুযোগ দেন। ফলে পূর্বাঞ্চলের সবগুলো ঘাঁটি তার করায়ত্তেই থাকে।[৭৩৮]

---

[৭৩৭] ইবনে বাসসাম, *আযযাখীরা*, ৭/১৬৫-১৬৭ ও ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/১১২-১১৩।

[৭৩৮] ইনান, *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ৩/১১৩-১১৪।

Scanned with CamScanner

মূলত কাদির বিন যিননূন ও ক্যাস্টোলা-শাসক ষষ্ঠ আলফোন্সোর মধ্যকার এই অশুভ সম্পর্ক ছিল টলেডোর পতনের অন্যতম কার্যকারণ। টলেডো পতনের পর আলকাদির তার পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম অপমানিত অবস্থায় টলেডো থেকে বেরিয়ে যান। টলেডো ত্যাগের সময় আলকাদিরের অবস্থার অতি নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন ঐতিহাসিক ইবনে বাস্সাম রহ.। তিনি লিখেছেন,

> আশাভঙ্গের বেদনায় রিক্ত হয়ে আপন পাপের প্রায়শ্চিতরূপে বাকরুদ্ধ অবস্থায় ইবনে যিননূন বেরিয়ে গেলেন। তার অবস্থানের কারণে টলেডোভূমিও যেন চিৎকার করছিল এবং প্রতিশোধের অনুমতি চাচ্ছিল। আকাশ যেন কামনা করছিল তার জীবনলীলা চিরতরে সাঙ্গ করে দিতে কিংবা ঘন কালো মেঘমালা সৃষ্টি করে প্রবল বর্ষণের মাধ্যমে তাকে শেষ করে দিতে। ইবনে যিননূন আযকুনাশের (আলফোন্সোর) ছাউনিতে তার সৈন্যদের প্রহরায় হীন ও লাঞ্ছিত অবস্থায় কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। তার জন্য কোন দ্বার উন্মুক্ত ছিল না; তার পরিবারের জন্য পর্দার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেদিন তার অবস্থা স্বচক্ষে দেখেছেন এমন একজন আমাকে জানিয়েছেন, আলকাদিরের হাতে তখন ছিল একটি জ্যোতির্বিদ্যা যন্ত্র (Astrolabe)। যন্ত্রটির সাহায্যে তিনি তখন হিসাব করছিলেন কখন যাত্রা শুরু করবেন, কোন পথে কোন বাহনে করে গেলে ভালো হবে ইত্যাদি! মুসলিম জনগণ ও খৃস্টানরা ভীড় করে তার কাণ্ড-কারখানা দেখছিল। খৃস্টানরা তার আচরণে হাসছিল আর মুসলিম জনগণ তার নির্বুদ্ধিতা দেখে বিস্মিত হচ্ছিল।[৭৩৯]

৪৭৮ হিজরীর সফর মাসে (১০৮৫ খৃস্টাব্দে) ক্যাস্টোলা-শাসক ষষ্ঠ আলফোন্সো টলেডোতে প্রবেশ করেন। এর মাধ্যমেই টলেডোর পতন ঘটে এবং তা মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়ে খৃস্টানদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে পরিণত হয়। আলফোন্সো টলেডোর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং একে ক্যাস্টোলা সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন।

টলেডোর পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের পুরো ইসলামী বিশ্ব যেন একসঙ্গে কেঁপে উঠল। কবি ইবনে আ'সসাল তার কবিতায় তখনকার পরিস্থিতিকে এভাবে চিত্রায়িত করেছেন,

---

[৭৩৯] ইবনে বাস্সাম, *আযযাখীরা*, ৭/১৫৬-১৬৯।

Scanned with CamScanner

يَا أَهْلَ أَنْدَلُسٍ حُثُّوا مَطِيَّكُمْ فَمَا الْمُقَامُ بِهَا إِلَّا مِنَ الْغَلَطِ
اَلثَّوْبُ يُنْسَلُ مِنْ أَطْرَافِهِ وَأَرَى ثَوْبَ الْجَزِيرَةِ مَنْسُولًا مِنَ الْوَسَطِ
مَنْ جَاوَرَ الشَّرَّ لَا يَأْمَنْ بَوَائِقَهُ كَيْفَ الْحَيَاةُ مَعَ الْحَيَّاتِ فِي سَفَطِ

ওহে আন্দালুসবাসী! আর নয় দেরী, আর নয় কালবিলম্ব, আপন বাহনকে দ্রুতপদে পরিচালিত করে আন্দালুস ত্যাগ কর; আন্দালুসে আর এক মুহূর্তও নয়।

কাপড়ের ধর্ম হল (পুরোনো হলে) একদিক থেকে বুনন খুলতে শুরু করে; আর আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি যে, আন্দালুস উপদ্বীপের বসন মাঝখান থেকে ছিন্ন হতে শুরু করেছে।

দুষ্ট লোকের সঙ্গে বাস করে কেউ কি পারে দুষ্টের অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকতে? এক ঝুড়িতে সাপের সঙ্গে অবস্থান করে কীভাবে জীবন-নিশ্চয়তার আশা করা যায়?[৭৪০]

তৎকালীন এই স্বনামধন্য কবি আপন কবিতাপঙ্‌ক্তির মাধ্যমে সমকালের এক বিস্ময়কর চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি যেন তার কবিতার মাধ্যমে কেবল টলেডো নয়; পুরো আন্দালুসের সকল রাষ্ট্র ও জাতিগোষ্ঠীর জনগণকে আন্দালুস ত্যাগ করে অন্য কোথাও হিজরত করার আহ্বান জানাচ্ছেন। কেননা, পরিস্থিতির দাবি এখন একটিই; হিজরত ও দেশত্যাগ করা। আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা চালানো কিংবা কোনমতে পড়ে থাকা তার দৃষ্টিতে এখন সম্পূর্ণই ভুল ও নীতিহীন সিদ্ধান্ত। তার এই আহ্বান ও অবস্থানের স্বপক্ষে এ যুক্তি যথার্থ যে, স্বাভাবিক রীতি হল, যখন কোন মালার একটি দানা স্থানচ্যুত হয়ে যায়, তখন বাকিগুলোও নিশ্চিত খসে পড়বে। আর আন্দালুসের তো যে কোন সাধারণ দানা নয়; বরং টলেডো নামক কেন্দ্রস্থলের দানাটিই খসে গেছে। সুতরাং দেশত্যাগের এ আহ্বান মোটেও ঋসিকতা করে নয়। বরং তারা যদি এ দেশে বাস করতেই চায়, কীভাবে এসব বিষধর সর্পের প্রতিবেশী হয়ে বসবাস করবে?! সুতরাং বাঁচার উপায় একটাই– প্রস্থান এবং পলায়ন!

---

[৭৪০] আসসাকাণী, *ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান*, ৫/২৮ ও আলমাক্কারী, *নাফহুত তীব*, ৪/৩৫২।

Scanned with CamScanner

সাত. মুরাবিতীদের তলব

টলেডো পতনের পর সামান্য বিলম্ব না করে আলফোন্সো তার সামরিক শক্তিকে নতুন করে বিন্যস্ত করেন এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র বিশেষ করে সেভিল, বাতালইয়ুস, জারাগোযা ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলে হামলা চালাতে প্রস্তুত হন। আলফোন্সো এ সময় আন্দালুসের মুসলিম শাসকবর্গের সঙ্গে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও বিদ্রুপের নীতি অবলম্বন করেন। নিজেকে দাবি করেন আন্দালুসের উভয় ধর্মগোষ্ঠীর শাসক হিসেবে। এর পরপরই সেভিল অবরোধের ঘটনা ঘটে, যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতঃপূর্বে দিয়েছি। আর সেভিল অবরোধকে কেন্দ্র করেই অস্তিত্বে আসে মুরাবিতীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনার চিন্তা ও পরিকল্পনা।

তবে প্রিয় পাঠক! সে যুগের শাসকবর্গের নীতি ও নৈতিকতায় কী পরিমাণ অবক্ষয় ঘটেছিল, তা আপনি কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারবেন এ তথ্যটি জেনে যে, বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহের শাসকবর্গের অনেকেই এ সময় সেভিল-শাসক মু'তামিদের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন এবং দূত প্রেরণ করে তাকে মুরাবিতীদের কাছে সাহায্য তলবের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, মুরাবিতীদের আন্দালুস উপদ্বীপে অবতরণের সুযোগ দেওয়া হলে তারা নিজেরাই আন্দালুসের ক্ষমতা দখলের অভিলাষী হয়ে উঠতে পারে। নিঃসন্দেহে ক্ষমতার মোহ ও লিপ্সার কারণে এসব শাসকবর্গের ধর্মীয় বোধ, জ্ঞান-বিবেক, নীতি-নৈতিকতা, মানবিকতাসহ যাবতীয় উত্তম গুণাবলি লোপ পেয়েছিল। কত পরিতাপের বিষয়! আন্দালুসের ইতিহাসপাঠক অবাক বিস্ময়ে দেখবেন, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের দুর্বল ও ভঙ্গুর বস্তুবাদী প্রবৃত্তি কীভাবে এসব শাসকবর্গের মাঝে আবাস গেড়েছিল! তাদের বুকে শত্রুর সম্মুখে রুখে দাঁড়ানোর সামান্য সাহস নেই, নিজেদের ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির লালসার সামনে মুসলমানদের রক্তের সামান্য মূল্যও নেই, জিযিয়া প্রদানের লাঞ্ছনাকে তারা সাদরে বরণ করে নিতে রাজী; কিন্তু নিজেদের অবরুদ্ধ মৃতপ্রায় ভাইদের রক্ষায় তারা একেবারে নিশ্চুপ! এভাবে নিশ্চুপ-নিশ্চল বসে থাকার অনিবার্য পরিণতি যে সামনে তাদের পতন-পালা, এ বোধ ও উপলব্ধিও তাদের নেই। আর তাই ক্ষমতা অন্যের হাতে চলে যাবে এই আশঙ্কায় তারা নিজেরা উদ্যোগী হওয়া দূরে থাক, সাগর পাড়ি দিয়ে মাগরেবের মুরাবিতী শাসকগোষ্ঠী সাহায্য

Scanned with CamScanner

করতে এগিয়ে আসবে– তাতেও রাজী নয়। ধর্মীয় বোধ ও উপলব্ধি-বোধের কী চরম অবনতি! শুধু ধর্মীয় বোধের কথা বলি কেন, পচন ধরেছিল তাদের মস্তিষ্ক ও স্বভাব-প্রকৃতিতেও।

অবশ্য আল্লাহ তা'আলা সেভিল-শাসক মু'তামিদকে আপন সিদ্ধান্তে অটল-অবিচল থাকার শক্তি দান করেছিলেন। শাসকবর্গের আহ্বানের প্রত্যুত্তরে তিনি সেই চিরন্তন উক্তিটি করেছিলেন, যা পরবর্তী সময়ে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়:

رَعْيُ الْجِمَالِ خَيْرٌ مِنْ رَعْيِ الْخَنَازِيرِ

শুকরের রাখালগিরি করার চেয়ে উট চড়ানো শতগুণে শ্রেয়।

এর অর্থ হল মুরাবিতী শাসক ইউসুফ বিন তাশফীনের হাতে বন্দী হয়ে আফ্রিকার মরুভূমিতে উট চড়ানো আলফোন্সোর হাতে নিগৃহীত ও বন্দী হয়ে ক্যাস্টোলায় শুকর চড়ানোর চেয়ে শতগুণে উত্তম। নিন্দুক ও ভর্ৎসনাকারীদের উদ্দেশ্য করে মু'তামিদ আরও বলেছিলেন, দেখুন! আমার সামনে দু'টি পরিস্থিতি বিদ্যমান; একটি সুনিশ্চিত, অপরটি সংশয়ে ঘেরা আর একটি বেছে নেওয়া ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। সংশয়ে ঘেরা দিকটি হল: যদি আমি ইউসুফ বিন তাশফীন বা আযফুনাশ- দু'জনের কোন একজনের ওপর আস্থা রাখি, তাহলে হতে পারে তিনি আমার আস্থা রক্ষা করবেন, আবার হতে পারে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন। এটি হল সংশয়ে ঘেরা দিক। আর সুনিশ্চিত দিকটি হল– আমি যদি ইউসুফ বিন তাশফীনের প্রতি আস্থা রাখি, তাহলে আমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করব আর যদি আযফুনাশের প্রতি আস্থা রাখি, তাহলে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করব। সংশয়ে ঘেরা দিকটি যখন অস্থায়ী, সুতরাং আমি কিসের আশায় এবং কোন মরীচিকার সন্ধানে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে ত্যাগ করে তার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টিকে টেনে আনব? মু'তামিদের এ কথা শোনার পর সকলে তাকে নিন্দা করা থেকে নিবৃত্ত হন।[৭৪১]

অবশ্য বাস্তবতা হল, স্বয়ং মু'তামিদও তার এই পদক্ষেপ ও পরবর্তী সময়ে বাল্লাকার যুদ্ধে (যার বিবরণ সামনে আলোচিত হবে) অটলতা ও সংগ্রামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত তার পুরো জীবনে অন্য কোন কীর্তি ও কর্মের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেননি। এই সিদ্ধান্তের আগে ও পরে তিনি ছিলেন অন্য দশজন শাসকের মতোই; ক্ষমতার লিপ্সা যার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এমনকি বুদ্ধি-বিবেচনাবোধ ও স্বভাবগুণের কোন ছাপও তার মাঝে অবশিষ্ট ছিল না। আর তাই তো ক'দিন পরের ঘটনাপ্রবাহের বিবরণে আমরা

---

[৭৪১] মাক্কারী, নাফহুত তীব, ৪/৩৫৯।

Scanned with CamScanner

দেখব, কীভাবে তিনি প্রবল বিক্রমে মুরাবিতী মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমর-লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, যে বীরত্বের ছিটে-ফোঁটাও আমরা তার মাঝে দেখিনি ইতঃপূর্বে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে।

যাই হোক, চলমান প্রেক্ষাপট থেকে আমরা দূরে সরে পড়ব না। মু'তামিদের এই সাময়িক ঈমানী চেতনার সংস্পর্শে অন্যান্য শাসক-প্রশাসকদের মাঝেও ধর্মীয় চেতনাবোধ স্পন্দিত হল। বাতালইয়ুসের শাসক মুতাওয়াক্কিল বিন আফতাস ও গ্রানাডার শাসক আবদুল্লাহ বিন বুলুক্কিন মু'তামিদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলেন। এর ফলে মুরাবিতীদের তলবের সিদ্ধান্তে আন্দালুসের বড় বড় তিনটি প্রধান নগরীর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হল। একের পর এক প্রতিনিধিদল মাগরেবে গমন করতে লাগল। আল্লামা হিময়ারী লিখেছেন,

> আন্দালুসের সীমান্ত থেকে একের পর এক প্রতিনিধিদল ইউসুফ বিন তাশফীনের সকাশে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ ও ইসলামের দোহাই দিয়ে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে তার সহানুভূতি ও করুণা প্রার্থনা করতে লাগল। তারা মুরাবিতী রাষ্ট্রের আলিম-উলামা ও উযীরবর্গের মাধ্যমেও সহায়তার আবেদন জানাতে লাগল। ইউসুফ বিন তাশফীন তাদের দুর্যোগ ও আবেদনের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। সাগরের ওপারের মুসলিম ভাইদের দুর্দশার কথা শুনে তার হৃদয় গলে যেত।[৭৪২]

সুতরাং প্রিয় পাঠক! আন্দালুসের ইতিহাসের এই যুগ সন্ধিক্ষণে এসে নিশ্চয়ই আপনার মনে অনেকগুলো প্রশ্ন ভীড় জমিয়েছে।

- কারা এই মুরাবিতী জাতি-গোষ্ঠী?
- কী তাদের পরিচয়? কী তাদের পরিচয়-বৈশিষ্ট্য?
- কে এই ইউসুফ বিন তাশফীন? কোত্থেকে কীভাবে তার উত্থান?
- ইউসুফ বিন তাশফীন কি সাড়া দেবেন ওপারের মুসলিম ভাইয়ের আহ্বানে? মুরাবিতী বাহিনী কি অগ্রসর হবে মুসলিম আন্দালুসের সহায়তায়?
- কী হবে মুসলিম আন্দালুসের ভবিষ্যৎ? ষষ্ঠ আলফোন্সোর এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার সামনে কি টিকে থাকতে পারবে মুসলিম আন্দালুস?
- নাকি এখানেই টানা হবে মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদের মুসলিম আন্দালুসের সমাপ্তি-রেখা?

প্রিয় পাঠক! পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তরই খুঁজে নেব ইনশাআল্লাহ।

---

[৭৪২] হিময়ারী, *আরদাওযুল মি'তার ফী খবারিল আকতার*, ১/২৮৮-২৮৯।

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

কেন পড়বেন 'ইতিহাস'?

[illegible] ইস্যু [illegible] হতে আপন ইতিহাস;
এও কি মেনে নেওয়া যায়?!
আল্লাহ-ই তো ইরশাদ করেছেন–
'এসব ঘটনা শোনাতে থাক, যাতে তারা চিন্তা করে।'

মুসলিম উম্মাহ পথ চলবে হাজারো সমস্যাকে সঙ্গী করে;
এও কি মেনে নেওয়া যায়?!
অতীত-ইতিহাসেই তো আছে এসব সমস্যার সমাধান।
ইতিহাসের পাতাই যে মুসলিম জাতির চিরন্তন পাঠশালা!

ইতিহাস হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়–
কীভাবে একটি জাতি জেগে ওঠে কিংবা ঘুমিয়ে পড়ে
কীভাবে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে কিংবা ধসে পড়ে
কীভাবে একটি সভ্যতা নির্মিত হয় কিংবা ভেঙে পড়ে
কীভাবে একটি বিপ্লব পূর্ণতায় পৌঁছয় কিংবা মুখ থুবড়ে পড়ে।

ইতিহাস একটি জাতির শিকড়ের ন্যায়;
ইতিহাস-বিমুখতা তাই শিকড়চ্যুত হওয়ার নামান্তর।
আজকের পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর যে অবক্ষয় ও অধঃপতন,
নিজেদের অতীত-বিস্মৃতি তার অন্যতম কারণ।

আর তাই ইতিহাসঅধ্যয়নই পারে–
আপনাকে শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করতে
[illegible] ভবিষ্যৎ গঠনের নিশ্চয়তা দিতে
[illegible] অভিজ্ঞতার আলোকে আগামীর গন্তব্য নির্ধারণ করতে।

ISBN
B0001
9 789849 353300

মাকতাবাতুল হাসান

Scanned with CamScanner